রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

প্রথম খণ্ড

১২৬৮—১২৮৪

1861—1878

প্রশান্তকুমার পাল

শ্রীযুক্ত ভূদেব চৌধুরী
পূজনীয়েষু

মুখবন্ধ

1972-তে যখন কালানুক্রমিক ভাবে চিঠিপত্র-সহ সমগ্র রবীন্দ্র-রচনা পড়তে শুরু করেছিলাম, তখন লেখালেখির ভাবনা মনের সুদূর প্রান্তেও উপস্থিত ছিল না—পড়ার সুবিধের জন্য শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চার খণ্ডের রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ অবলম্বনে শুধু পাঠসূচীর একটি রূপরেখা চিহ্নিত করে নিয়েছিলাম। কিন্তু পাঠ যতই এগোতে লাগল, সেই রূপরেখার অসম্পূর্ণতা ও অন্যান্য সমস্যা ততই প্রকট হয়ে উঠল। ফলে আমার পাঠকক্ষের নিভৃত পরিবেশ থেকে নেমে আসতে হল পাঠাগারের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, বিশেষত তার ধূলি-ধূসরিত প্রান্তগুলিতে। নিজের পথরেখার হদিশ রেখে যাচ্ছিলাম খাতার পাতায়। তার পর 1976-এর শেষ ভাগে যখন রবীন্দ্রনাথের 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/বিচিত্র ছলনাজালে' কবিতায় এসে পৌঁছলাম, তখন দেখা গেল আমার পাঠের পথও বিভিন্ন অপ্রকাশিত ও অব্যবহৃত তথ্যের দ্বারা কন্টকাকীর্ণ—খাতা জমেছে প্রচুর।

সেই খাতাগুলি নিয়ে আমার বিশেষ শিরঃপীড়া ছিল না, হয়তো একদিন ওজন দরেই তারা বিক্রীত হয়ে যেত—কিন্তু বন্ধুবর অধ্যাপক অরূপরতন ভট্টাচার্য তা হতে দিলেন না, ক্রমাগত তাগিদায় এক দুঃসাধ্য ব্রতে আমায় নিয়োজিত করলেন। তারই পরিণতি এই গ্রন্থ।

১২৬৮ থেকে ১২৮০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রজীবনের প্রথম তেরো বছরের খসড়া বিবরণ যখন লেখা শেষ হয়, তখন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের কাছে সেগুলি দিয়ে আসি। কালিদাসের একটি বিখ্যাত প্রবাদপ্রতিম শ্লোক স্মরণ করিয়ে দেবেন—এইটাই যখন প্রত্যাশিত ছিল, তখন আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তার পর থেকে এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থের নামকরণও তিনিই করেছেন। তাঁর কাছে ঋণ আমার জীবনের বড়ো সম্পদ, অবশিষ্ট জীবনের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়েই তা শোধ করতে হবে। সহকর্মী ও বন্ধু অধ্যাপক অচিন্ত্যপ্রিয় ভট্টাচার্যের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল, এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞ চিত্তে সে-কথা স্মরণ করছি।

রবীন্দ্রজীবন-বর্ণনায় এখানে আমি একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, জানি না আর-কোনো জীবনীকার এই পথ গ্রহণ করেছেন কি না। এখানে 'পূর্বকথন' অংশে ঠাকুরবংশের ও দেশ-কালের পরিচয় দেবার পর 'জীবনকথা' বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রতিটি বৎসরের কালসীমায় এক-একটি অধ্যায়কে বিন্যস্ত করে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' অভিধায় একাধিক পরিশিষ্ট যোগ করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও দেশ-কাল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি। এই পদ্ধতিতে কোথাও-কোথাও পুনরুক্তি ঘটলেও রবীন্দ্রজীবনের প্রধান ঘটনাগুলিকে মোটামুটি তারিখের দ্বারা চিহ্নিত করার সুযোগ পাওয়া গেছে—যার ফলে তাঁর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে অনেক বিচার-বিভ্রাট এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে

করি। এক্ষেত্রে আমি সর্বদা সচেতন ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের রস-বিশ্লেষণকে লক্ষ্যের বহির্ভূত রেখেছি। সে কাজ রসজ্ঞ সমালোচকের জন্য তুলে রাখাই ভালো।

এই কাজে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড ভবতোষ দত্ত আমাকে প্রার্থিত সর্বপ্রকার সুবিধা দিয়েছেন। প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে তাঁর কাছে আমার দাবি ছিল সীমাহীন, আশাতিরিক্ত ভাবে তিনি তা পূরণও করেছেন। সেখানকার সমস্ত কর্মীও অকৃপণভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অপ্রকাশিত তথ্য প্রকাশের অনুমতি দান করে রবীন্দ্রভবন-কর্তৃপক্ষও আমাকে বাধিত করেছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগারের সংবাদপত্র-শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি ও স্টেট আর্কাইভ্‌স্‌, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ পাঠাগার প্রভৃতি স্থানে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

ড নরেন্দ্রনাথ কানুনগো, ড সরোজ দত্ত ও শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকে বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার রূপটি বোঝার ক্ষেত্রে কয়েকটি মূল্যবান সূত্রের সন্ধান দিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মুদ্রণের প্রতিটি পর্যায়ে আমার সহায়ক ছিলেন শ্রীসুবিমল লাহিড়ী, দু-একটি তথ্যের ভ্রান্তি-নিরসনেও তিনি সাহায্য করেছেন। এঁর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই মুদ্রাকর শ্রীনিশিকান্ত হাটই ও তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্মীদের, তাঁদের সহায়তা ছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করা সুকঠিন হত।

ড ভূদেব চৌধুরীর কাছে প্রায় চার বছর কলেজের পাঠ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু শুধু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব সমাপ্ত করেন নি, সাহিত্যবোধে দীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃদয়ও দান করেছিলেন। এই গ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করে আমার গুরুদক্ষিণা নিবেদন করলাম।

১ বৈশাখ ১৩৮৯

১০২/১ রামমোহন সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯ **প্রশান্তকুমার পাল**

আনন্দমোহন কলেজ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

রবিজীবনী প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। পরবর্তী গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে এর অনেক অংশই পুনর্লিখিত হওয়ায় একে পুনর্মুদ্রণ না বলে সংস্করণ নামে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র রায় এই বইয়ের অনেক তথ্য ও মতের প্রতিবাদ করে 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন' [১৩৯৩] নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটি পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। তাঁর যুক্তি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি, তবু তাঁর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অংশ পুনর্লিখিত হয়েছে। 'ভারতভূমি' কবিতা রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, তাঁর এই সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করেছি। অনাথনাথ দাস ব্যক্তিগত পত্রে অনেক সংশোধন ও সংযোজনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইরাবতী দেবীর জন্মসাল সম্পর্কে আমার পূর্বপ্রকাশিত মন্তব্য সম্পর্কে অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী প্রশ্ন তুলেছিলেন—বিষয়টি সংশোধিত হয়েছে। ড প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জুলা ভট্টাচার্যের লেখা কয়েকটি তথ্য সংশোধনে সাহায্য করেছে। এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

খণ্ডটির পূর্বতন প্রকাশক ভূর্জপত্র-এর স্বত্বাধিকারিণী শর্মিলা পাল এবং শিবনাথ পাল, অরিজিৎ কুমার ও অধ্যাপক স্বপন মজুমদারকে তাঁদের আনুকূল্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

১ কার্তিক ১৪০০ **প্রশান্তকুমার পাল**

পাঠ-নির্দেশ

এই গ্রন্থ-রচনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পুস্তকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে পৃষ্ঠাঙ্কের সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে উদ্ধৃতি বা উল্লেখের মূল খুঁজে পেতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না ভেবে সংস্করণ বা মুদ্রণ-তারিখ নির্দেশিত হয়নি। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে উল্লেখপঞ্জি-তে প্রথম উল্লেখের স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ-সন দেওয়া হয়েছে। দণ্ড চিহ্নের পরের সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।

গ্রন্থের মূল পাঠে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত তারিখগুলি সাধারণত পুরোনো পঞ্জিকা বা Ephimeris অবলম্বনে নির্ধারণ করা হয়েছে। উদ্ধৃতির মধ্যে এইরূপ বন্ধনী-মধ্যস্থ শব্দ বা শব্দগুলি আমরা যোগ করেছি। মূলের বানান সাধারণত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। লেখা বা ছাপা ভুল বানানের প্রতি '[য]' অক্ষর-যোগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, ইংরেজির ক্ষেত্রে যথারীতি '[sic]' শব্দটি ব্যবহৃত। [?]-চিহ্ন সংশয়-সূচক। উদ্ধৃতি ছাড়া অন্যত্র খ্রিস্টাব্দ সর্বদাই ইন্দো-আরবীয় [1, 2, 3... ইত্যাদি] হরফে লিখিত, 'শক' শব্দটির ব্যবহার না থাকলে বাংলা হরফে লেখা অব্দগুলিকে বঙ্গাব্দ বুঝতে হবে।

শব্দ-সংক্ষেপণ

জীবনস্মৃতি ১৭। ২৭৩ : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ, পৃ ২৭৩।

'পিতৃস্মৃতি', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [১৩৭৫]। ১৫২ : ১৩৭৫-এ প্রকাশিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধ, পৃ ১৫২।

কবি-কাহিনী অ-১। ১৩-২৮ : রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'কবি কাহিনী' গ্রন্থ, পৃ ১৩ থেকে ২৮।

র°র° ১৫ [শতবার্ষিক সং]। ১৩৮-৪৫ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ১৫শ খণ্ডের পৃ ১৩৮ থেকে ১৪৫।

বি.ভা.প. ১৮।৪। ৩৮৯ : বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩৮৯।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সা-সা-চ ৩। ৪৫।১০: সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩য় খণ্ড ৪৫ সংখ্যক 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থের পৃ ১০।

অগ্র : অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ব : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বিষয়সূচি

'ঘরের পড়া'; ম্যাকবেথ-অনুবাদ; কুমারসম্ভব পাঠ ও অনুবাদ; 'অভিলাষ'; হিন্দুমেলায় কবিতা পাঠ, 'হোক ভারতের জয়', 'হিন্দুমেলায় উপহার'; প্রথম চিত্র প্রদর্শনী [?]; সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবেশ; মাতার মৃত্যু; লেনু সিং; বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ; ২। সারদা দেবীর শেষ অসুখ; ৩। বিদ্বজ্জনসমাগম-এর প্রথম অধিবেশন; ব্রাহ্মসমাজ; মালতীপুঁথি; সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ

উল্লেখপঞ্জি

পঞ্চদশ অধ্যায়

১২৮২ [1875-76] ১৭৯৭ শক। রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চদশ বৎসর

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ; অসুস্থতা; রাজনারায়ণ বসু-কৃত পাঠসূচি; ইংরেজি কবিতা ও শকুন্তলার অনুবাদ; সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ত্যাগ; পিতার সঙ্গে শিলাইদহ-যাত্রা, গীতগোবিন্দের সঙ্গে পরিচয়; শিলাইদহে প্রথমবার; শিলাইদহে দ্বিতীয়বার; যদুভট্ট; বিদ্বজ্জনসমাগম-এর দ্বিতীয় অধিবেশন ও 'প্রকৃতির খেদ'; সরোজিনী নাটকের জন্য গান রচনা; 'প্রলাপ' ও 'বনফুল'; কলেজ রি-ইউনিয়নে কবিতা পাঠ ও বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দর্শন

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ; ২। 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'; ৩। যদুভট্ট; ৪। শিলাইদহ; ৫। কলেজ রি-ইউনিয়ন; ৬। হিন্দুমেলার দশম বার্ষিক অধিবেশন; ৭। রাজনৈতিক পটভূমি

উল্লেখপঞ্জি

ষোড়শ অধ্যায়

১২৮৩ [1876-77] ১৭৯৮ শক। রবীন্দ্রজীবনের ষোড়শ বৎসর

ব্রজনাথ দে; শিলাইদহে তৃতীয়বার; অসুস্থতা; ব্রহ্মদীক্ষা; 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখ সঙ্গিনী'; হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশনে 'দিল্লী-দরবার' কবিতা পাঠ; জাতীয় সংগীত; সঞ্জীবনী সভা; 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি'; 'ফুলবালা'; ভানুসিংহের কবিতা

প্রাসঙ্গিক তথ্য :১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ; ২। ব্রাহ্মসমাজ; ৩। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর-সরোজিনী', 'দুঃখসঙ্গিনী'; ৪। হিন্দুমেলার একাদশ বার্ষিক অধিবেশন; ৫। দিল্লী দরবার; ৬। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট; ৭। 'হামচুপামুহাফ'; ৮। সঞ্জীবনী সভা

উল্লেখপঞ্জি

সপ্তদশ অধ্যায়

১২৮৪ [1877-78] ১৭৯৯ শক। রবীন্দ্রজীবনের সপ্তদশ বৎসর

ভারতী-প্রকাশের পরিকল্পনা; প্রথম সংখ্যা; 'ভারতী'; 'মেঘনাদবধ কাব্য'; 'ভিখারিনী'; দ্বিতীয় সংখ্যা; 'হিমালয়'; 'হেকেটি'; তৃতীয় সংখ্যা; 'করুণা'; 'শৈশব সঙ্গীত'; 'উপহার গীতি'; 'কবিকাহিনী'; চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা; 'ঝানসীর রাণী'; ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা; 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব'; 'বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য';

পূর্বকথন

প্র থ ম অ ধ্যা য়

ঠাকুর-বংশের ইতিহাস

"কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।"—রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লিখিত প্রশস্তিপত্রের সূচনায় এই যে বাক্যটি লিখেছিলেন, তারই মধ্যে বিশ্বজনের মনের কথাটি যেন বিধৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী সহস্র সহস্র বৎসরের মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ফসলগুলি আত্মসাৎ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন ও সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। সেই কারণেই তাঁর জীবনকথার বর্ণনা শুধু ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না, বিশ্বকথায় পর্যবসিত হয়ে যায়। যিনি প্রাণসৃষ্টির আদিপর্বে এই পৃথিবীর তৃণ-লতা-তরুর হৃদয়স্পন্দনকে নিজের অন্তরে অনুভব করেন, মানবসভ্যতার বিকাশের প্রতিটি স্তরকে যাঁর হৃদয়পদ্মের পাপড়ি খোলার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাঁর জীবন বর্ণনার শুরু যে কোনখানে তা নির্ণয় করাই কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছিলেন ব্রাত্য। তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশ, তাঁর পূর্বপুরুষের বংশধারা, তাঁর পরিবারের ধর্মীয় ও ব্যবহারিক আচরণও 'ব্রাত্য নামে অভিহিত হতে পারে। কিন্তু সমাজ-পরিচয়ে ব্রাত্য হওয়ার সুবিধা এই যে, সে ক্ষেত্রে সমাজের আচার-বিধির কঠোর অনুশাসন ও সংস্কার [যার অনেকটা কু-সংস্কারও] মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকে না, অথচ সমাজের যা-কিছু ভালো তা দুহাত ভরে গ্রহণ করে প্রতিভার স্পর্শে তাকে নূতন রূপ দেওয়ার স্বাধীনতা থাকে অব্যাহত। বাংলাদেশ, ঠাকুর-বংশ, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

আর্যসংস্কৃতি, যাকে আমরা ভারতীয় সভ্যতার প্রধান ভিত্তি বলে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ তার স্পর্শ পেয়েছিল অনেক পরে। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে এই দেশকে আর্যরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর বেশিরভাগ সময়েও এদেশে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান অপেক্ষা বৌদ্ধ প্রভাবই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। সেই কারণেই নাকি মহারাজ আদিশূর এদেশে বেদবিহিত যজ্ঞাদি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনিয়েছিলেন। আধুনিক বাঙালি ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ নাকি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ। ঐতিহাসিকেরা অবশ্য মহারাজ আদিশূরের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান; পাঁচজন ব্রাহ্মণের নাম নিয়েও মতভেদ আছে। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ থেকে ঠাকুরগোষ্ঠীর উদ্ভব, এমন একটি মত বহুলপ্রচারিত—তাঁদের কৌলিক পদবী নাকি বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাই হোক, ইতিহাস অনুসরণ করে গেলে দেখা যায়, খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের পরবর্তীকালে বাংলার সমাজব্যবস্থা একটা প্রবল আলোড়নের সম্মুখীন হয়েছিল। কোথাও মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে, কোথাও বা তাঁদের সংস্পর্শের কারণেই বহু উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, বিশেষত ব্রাহ্মণ,

সামাজিক দিক দিয়ে অখ্যাতি লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আদিপুরুষেরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ সমাজে একটি বিশিষ্ট 'থাক'-ভুক্ত হয়েছিলেন, যার নাম 'পিরালী থাক'। নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের ব্রাহ্মণ কাণ্ডের তৃতীয় ভাগে ব্যোমকেশ মুস্তফী 'পিরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ' প্রথম খণ্ডে [পরে সর্বত্র 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' বলতে আমরা এই খণ্ডটিকেই বুঝব] কুলাচার্য নীলকান্ত ভট্টের কারিকা অবলম্বনে এই থাকের উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন [দ্র পৃ ১৫৪-৫৭]। এই বিবরণ অনুযায়ী যশোহর জেলায় চেঙ্গুটিয়া পরগনার জমিদার গুড়-বংশীয় দক্ষিণানাথ রায়চৌধুরীর চার পুত্র—কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেবের মধ্যে প্রথম দুজন মামুদ তাহির বা পীর আলি নামক এক স্থানীয় শাসকের চক্রান্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন ও তাঁদের সংস্পর্শে অপর দুই ভাই সমাজচ্যুত হয়ে পিরালী [বা পীরালি] থাকের অন্তর্ভুক্ত হন। ব্যোমকেশ মুস্তফীর অনুমান অনুসারে এইসব ঘটনা পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময়ে [1438][১] সংঘটিত হয়েছিল।

এই সমাজচ্যুতির ফলে স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পিরালীদের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা পুত্র-কন্যাদির বিবাহে কৌশল ও প্রলোভনের জাল বিস্তার করতে থাকেন। এইভাবেই শুকদেব ভগ্নী রত্নমালার সঙ্গে মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক এক দরিদ্র উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়ে নিজ অধিকারের মধ্যেই তাঁর বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দেন। শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারী। এই অপরাধে আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে জগন্নাথ শুকদেবের আশ্রয়ে নরেন্দ্রপুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে উত্তরপাড়া গ্রামের সঙ্গে সংলগ্ন বায়রাপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুর-বংশের আদি-পুরুষ। জগন্নাথ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর আর্থিক সমৃদ্ধিও উপেক্ষণীয় ছিল না, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক জাত্যংশে হীনতা স্বীকার করেও সংস্কার-মুক্তির যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করলেন তাঁর বংশের পরবর্তী ইতিহাসে তা আরও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর চার পুত্র—প্রিয়ঙ্কর, পুরুষোত্তম, হৃষীকেশ ও মনোহর। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যহ যে মন্ত্রটি আবৃত্তি করে পিতৃপুরুষদের স্মরণ করতেন তার আদিতে ছিল জগন্নাথ কুশারীর মধ্যম পুত্র পুরুষোত্তমের নাম—

> পুরুষোত্তমাদ্বলরামঃ বলরামাদ্ধরিহরঃ
> হরিহরাদ্রামানন্দঃ রামানন্দান্মহেশঃ
> মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামঃ
> জয়রামান্নীলমণিঃ নীলমর্ণেরামলোচনঃ
> রামলোচনাদ্দারকানাথঃ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।[২]

পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র রামানন্দের দুই পুত্র মহেশ্বর ও শুকদেব। শোনা যায়, মহেশ্বর বা তাঁর পুত্র পঞ্চানন জ্ঞাতিকলহে দেশত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় উপস্থিত হন। সময়টা প্রায় জোব চার্নকের কলকাতা-পত্তনের সমসাময়িক অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এর অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল। পর্তুগীজ, ডাচ প্রভৃতি বিদেশী বণিকদের আসাযাওয়া, বড়বাজারের কাছে শেঠ-বসাকদের সুতাবস্ত্রের হাট বহু লোককে এই অঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই একই আকর্ষণে

পঞ্চানন ও শুকদেব কলকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আদিগঙ্গার তীরে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তখন মৎস্য-ব্যবসায়ী জেলে, মালো, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির বাস, কিছু বণিক-বৃত্তিধারী পোদও সেখানে ছিল, তারা আগ্রহভরে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিল। বিদেশি যেসব জাহাজ এখানে আসত, পঞ্চানন ও শুকদেব প্রথমে সেইসব জাহাজে মালসরবরাহের কাজ শুরু করেন এবং এইভাবেই কিছু অর্থের অধিকারী হয়ে গোবিন্দপুরে গঙ্গাতীরে জমি কিনে বসতবাটী নির্মাণ ও শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে ঘটনাচক্রে তাঁদের পদবীরও পরিবর্তন ঘটে। নিম্নশ্রেণীর প্রতিবেশীদের কাছে তাঁরা 'ঠাকুরমশাই' অভিধায় সম্বোধিত হতেন, এদের দেখাদেখি সাহেবরাও তাঁদের ঠাকুর [Taguore, Tagoor বা Tagore] বলতে শুরু করেন। এইভাবেই পঞ্চানন 'কুশারী' হয়ে পড়েন পঞ্চানন 'ঠাকুর'। এই পঞ্চানন থেকেই কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো ও কয়লাঘাটার ঠাকুরগোষ্ঠীর উৎপত্তি এবং শুকদেব থেকে চোরবাগানের ঠাকুরগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

পঞ্চানন ঠাকুরের দুই পুত্র জয়রাম ও রামসন্তোষের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের মেলামেশা থাকায় তাঁরা কিছু কিছু ইংরেজি জানতেন, তা ছাড়া তৎকালীন রীতি-অনুসারে ফারসি ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখন পঞ্চানন চেষ্টায় জয়রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পে-মাস্টারের অধীনে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন।

কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর ইংরেজদের অধীনে আসার পর 1707 [১১১৪]-এ এই অঞ্চলে প্রথম জরিপ-কার্য হয়। তখন রাল্‌ফ্‌ সেল্‌ডন্‌ ছিলেন কালেক্টর। এই কার্যে দুজন আমীনের প্রয়োজন হলে পঞ্চাননের অনুরোধে সেল্‌ডন্‌ জয়রাম ও রামসন্তোষকে এই পদে নিযুক্ত করেন। জয়রাম পে-মাস্টারের অধীনে কর্মও বজায় রাখেন। এইভাবে তাঁরা ধীরে ধীরে বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। এরপর 1717 [১১২৪]-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার দক্ষিণে দশ মাইল পর্যন্ত স্থানের মধ্যে আটত্রিশটি গ্রাম ক্রয় করলে এগুলির জরিপকার্য জয়রাম ও রামসন্তোষই সম্পন্ন করেন। গ্রামগুলির পার্শ্ববর্তী অধিকাংশ ভূভাগ নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে ছিল; এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে জয়রামের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। জয়রাম যখন নিজগৃহে 'রাধাকান্ত' নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবসেবার জন্য নিজের জমিদারির মধ্যে ৩৩১ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। শোনা যায়, 1742 [১১৪৯]-তে মারাঠা খাল খননের সময়েও জয়রাম অন্যতম পরিদর্শক ছিলেন।

এর থেকে বোঝা যায়, নতুন পদবী-প্রাপ্ত পতিত পিরালী ব্রাহ্মণ ঠাকুরগোষ্ঠী ধনসম্পদ ও মান-মর্যাদার দিক থেকে কলকাতার নতুন সমাজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছিলেন। কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে যশোহরের পিরালী সম্প্রদায়ের বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। জয়রামের দুই স্ত্রী গঙ্গা ও রামধনি এবং রামসন্তোষের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী যশোহরের মেয়ে ছিলেন। রামসন্তোষের একমাত্র কন্যারও বিবাহ হয় যশোহরের দক্ষিণডিহি-নিবাসী গুড়-বংশীয় কৃপানাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে।

জয়রামের চারটি পুত্র—আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। তাঁর জীবৎকালেই জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দীরামের মৃত্যু হয়; পিতার অপ্রিয় কার্য করায় মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই তিনি পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

1756 [১১৬২]-এ জয়রামের মৃত্যু হয়। ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখেছেন, 'জয়রাম ও রামসন্তোষ আমীনীকার্য্যে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জন করিয়া ধনসায়র [বর্ত্তমান ধর্ম্মতলা] নামক স্থানে বাড়ী, বৈঠকখানা, জমাজমী এবং এখন যেখানে ফোর্ট-উইলিয়ম কেল্লা আছে, ঐ স্থানে বাগানবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।'*

জয়রামের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুর-পরিবারের বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে। ফোর্ট উইলিয়মের পুরোনো কেল্লা, যা বর্তমান ডালহৌসি অঞ্চলে জি. পি. ও.-র কাছে অবস্থিত ছিল, ইংরেজ গভর্নর ড্রেক যখন তার সংস্কার সাধন করছিলেন, Jun 1756-এ নবাব সিরাজদৌলা কলকাতা আক্রমণ করে তা ধ্বংস করেন। এই সময়ে ঠাকুর-পরিবারকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এরপর 23 Jun 1757 পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের হাতে সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হন। মীরজাফর নবাব হবার পর কলকাতা জয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে টাকা দেন, জয়রামের পুত্র নীলমণি তার থেকে ১৮ হাজার টাকা পান। *[১]

নীলমণি বাসস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনে ডিহি কলকাতা গ্রামে জমি কিনে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ২০ পৌষ ১১৭১ [1 Jan 1765*[২]] তারিখে কালেক্টরির নিজ অধিকারভুক্ত জমি থেকে দুবিঘা তেরো কাঠা জমি বার্ষিক ৭ ল৪ গণ্ডা সিক্কামুদ্রা খাজনায় বসবাসের জন্য পাট্টা করে নেন। এই জমিই পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়িসমেত সাড়ে দশ কাঠা জমি জনৈক রামচন্দ্র কলুর কাছ থেকে ৫২৫ টাকায় ক্রয় করেন ১৬ চৈত্র ১১৭১ সালে। এইভাবে ১১৭১ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে [1765] পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর-পরিবারের বসবাসের সূত্রপাত। কয়েক বছর পরে ২৫ অগ্রহায়ণ ১১৭৬ [Dec 1769] এইসব জমিরই সংলগ্ন চুঁচুড়া-বাসী জগমোহন দাস [সাহা]-এর ঘরবাড়িসমেত দুবিঘা সাত কাঠা জমি ৯০০০ টাকায় ক্রয় করেন। সব-ক'টি দলিলই সম্পাদিত হয় নীলমণি ঠাকুরের নামে।

এইসব ঘটনার সময়ে বা তার পূর্ব থেকেই নীলমণি ঠাকুর কোম্পানির অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। ব্যোমকেশ মুস্তফীর বিবরণ অনুসারে, ১১৭২ [1765]-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর নীলমণি উড়িষ্যার কালেক্টরেটের সেরেস্তাদার হয়ে উড়িষ্যা যান এবং সেখান থেকে উপার্জিত অর্থ কলকাতায় ভ্রাতা দর্পনারায়ণের কাছে পাঠাতে থাকেন। দর্পনারায়ণও হুইলারের দেওয়ান, নিমক ও বাজারের ইজারাদার, জমিদারির পত্তনিদার রূপে ও অন্যান্য ব্যবসায় সূত্রে বিরাট ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। বিনয় ঘোষ তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ থেকে দেখিয়েছেন যে, 1775-76 থেকেই দর্পনারায়ণের অগ্রগতির পরিচয় তাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে; কিন্তু নীলমণি ঠাকুর ও তাঁর পুত্রদের উল্লেখ না দেখে মনে হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক উন্নতির উদ্যম তুলনামূলকভাবে দর্পনারায়ণ ও তাঁর পুত্রদের মধ্যেই বেশি দেখা গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে এই পরিবারে কতকগুলি সংকট দেখা দেয়। জয়রামের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরামের ১১৭৮ বঙ্গাব্দে [1771] নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী ১১৮৯ বঙ্গাব্দে [1782] সম্পত্তি বিভাগের জন্য সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলা করেন। এর ফলে তিনি রাধাবাজারে ও জ্যাকসন ঘাটে দুটি বাড়ি লাভ করেন। হয়ত এই মামলার সূত্রেই নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মধ্যেও সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ দেখা দেয়। পরে আপসে এই বিবাদ মিটিয়ে নেওয়া হয়। পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ও রাধাকান্ত জীউর সেবার ভার দর্পনারায়ণ গ্রহণ করেন এবং নিজস্ব উপার্জন-লব্ধ অর্থ, নগদ এক লক্ষ টাকা ও লক্ষ্মী-জনার্দন শিলার ভার নিয়ে নীলমণি গৃহত্যাগ করেন। পঞ্চানন থেকে উদ্ভূত ঠাকুর-বংশ এইভাবে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় কলকাতার আদি-বাসিন্দা শেঠ-বংশীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠ মেছুয়াবাজার অঞ্চলে এক বিঘা জমি নীলমণিকে দান করতে চান। শূদ্রের দান গ্রহণে নীলমণি অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি লক্ষ্মী-জনার্দন শিলার নামে ঐ জমি দান করেন। দানপত্রটি না পাওয়ায় এই দান কবে সংঘটিত হয় বলা যায়

না। ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতে, আষাঢ় ১১৯১ [Jun 1784] থেকে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর-পরিবারের বসবাসের সূত্রপাত হয়।[৩] 'জোড়াসাঁকো' নামটি প্রাচীন নথিপত্রে পাওয়া গেলেও এ নামটি সেই সময়ে যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল না, স্থানটিকে মেছুয়াবাজারের অন্তর্গত বলেই উল্লেখ করা হত।

প্রথমে উক্ত জমিতে নীলমণি ঠাকুর একটি আটচালা বেঁধে বাস করতে শুরু করেন। পরে তিনি পাকা বাড়ি পত্তন করেন। একতলার দেওয়ালের গভীরতা থেকে ড হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন, বর্তমান ঠাকুরবাড়ির উত্তর-পূর্ব অংশই প্রথমে নির্মিত হয়েছিল।[৪] বৃদ্ধাবস্থায় নীলমণি কলকাতায় ও অন্যত্র আরও কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ১১৯৮ বঙ্গাব্দে [1791] নীলমণির মৃত্যু হয়।

নীলমণির কয়টি পুত্র ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে, তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল—রামতনু, রামরতন, রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ। ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতে, তাঁর তিনটি পুত্র—রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ এবং কমলমণি নামে এক কন্যা।[৫] রামলোচনের জন্ম সাল জানা যায়নি; রামমণি ১১৬৬ সালে [1759], রামবল্লভ ১১৭৪ সালে [1767] ও কমলমণি ১১৮০ সালে [1773] জন্মগ্রহণ করেন। ১১৯২ বঙ্গাব্দে [1785] বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারভুক্ত হরিশ্চন্দ্র হালদারের সঙ্গে কমলমণির বিবাহ হয়। দক্ষিণডিহি নিবাসী রামচন্দ্র রায়ের দুই কন্যার মধ্যে অলকাকে রামলোচন ও মেনকাকে রামমণি বিবাহ করেন। কনিষ্ঠ রামবল্লভের সঙ্গে কার কন্যার বিবাহ হয় জানা যায়নি।

রামলোচনের শিবসুন্দরী নামে একটি কন্যা জন্মালেও শৈশবেই তার মৃত্যু হয়। মেনকা দেবীর গর্ভে রামমণির দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা হয়—রাধানাথ [1790-1830], জাহ্নবী, রাসবিলাসী ও দ্বারকানাথ [1794-1846]। দ্বারকানাথের জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই মেনকা দেবীর মৃত্যু হয়। এরপর রামমণি দুর্গামণি দেবীকে বিবাহ করলে তাঁর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মায়—রমানাথ [1800-77] ও দ্রবময়ী।

রামলোচনের কন্যাটির মৃত্যু হলে তিনি মধ্যভ্রাতা রামমণির দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথকে ১২০৫ বঙ্গাব্দে [1799] দত্তক গ্রহণ করেন। এসম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একদিন একটি সন্ন্যাসী রামলোচনের গৃহে ভিক্ষা করতে এসে শিশু দ্বারকানাথকে দেখে অলকা দেবীকে বলেন যে, সুলক্ষণাক্রান্ত এই শিশুটি থেকেই বংশের গৌরব ও ধনসম্ভ্রম বৃদ্ধি পাবে। এ কথা শুনেই নাকি অলকা দেবী দ্বারকানাথকে দত্তক নেবার জন্য স্বামীকে প্ররোচিত করেন।

রামলোচন ঠাকুর-পরিবারে কিছু শৌখিন আভিজাত্য আনয়ন করেন। অপরাহ্নে হাওয়া খেতে বের হবার প্রথা নাকি তাঁর দ্বারাই প্রবর্তিত হয়। এ ছাড়া কবিওয়ালা ও কালোয়াতদের আহ্বান করে বাড়িতে মজলিস বসাননা ও আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে শোনানো তাঁর অন্যতম ব্যসন ছিল। কিন্তু তিনি প্রখর বিষয়বুদ্ধিরও অধিকারী ছিলেন; তাই পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করা ছাড়াও জমিদারি ও অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করে পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। রামলোচন ভ্রাতাদের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেবার পর দত্তক-পুত্র দ্বারকানাথকে ২২ অগ্রহায়ণ ১২১৪ [Dec 1807] তারিখে উইল করে যে সম্পত্তি দিয়ে যান, তার তালিকাটিতে দেখা যায়—

‘জায় জায়গা সোপার্জ্জিত		পৈত্রিক	
জমিদারি পরগণে বিরাহিমপুর মোতালকে			
জেলা জসোহর	১		
সহর কলিকাতার মধ্যে ডোম পিদুরু		নিজবাটী—	১
সাহেবের দঃ জায়গা—১	১।৪	ধর্ম্মতলার বাটী—	১
বামদেব বাইতির দঃ জায়গা—১	।৩	বড়বাজারের বটতলার বাটী—	১
কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবিরাজের দঃ জায়গা—১	।০	জানবাজারের হাড়িটোলার জায়গা—	১
তিলক বসাকের দঃ জায়গা—১	॥০॥	ডোমটোলার জায়গা—	১
শঙ্কর মুখোপাধ্যায় দঃ বাটী—১	।১	মাহুতের দঃ জায়গা—	১
রামকিশোর মিস্ত্রীর দঃ জায়গা—১	/২	কলিঙ্গা ব্রহ্মচারীর দঃ জায়গা—	১
রামনিধি সাহার দঃ বাটী—১	।০	পরগণে মাগুরা মৌজে ফতেপুর	
রতন রাড়ের দঃ বাটী—এ বাটী তোমার		ব্রহ্মত্তর জমি—	১
মাতাকে দিয়াছি—১	/৪	মৌজে কপিলেশ্বর ব্রহ্মত্তর জমি—	১
৯	৩।৪॥		৯’ ৬

—তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তিও কম নয়, যার মধ্যে বিরাহিমপুর পরগনার [এটি তখন যশোহর জেলার অন্তর্গত] জমিদারি অন্যতম। এই উইলে রামলোচন দ্বারকানাথকে নির্দেশ দেন, ‘এখনও তুমি নাবালক একারণ এই জমিদারি ওগায়রহ জে কিছু বিসয় তোমাকে দিলাম ইহার কর্ম্মকার্য্য জাবত আমি বর্ত্তমান থাকিব তাবৎ আমিই করিব আমার অবর্ত্তমানে জাবত তুমি বয়সপ্রাপ্ত না হও তাবৎ পরগণাদিগর এ সকল বিষয়ের কর্ম্মকার্য্য ও সহী দস্তখত বা বন্দবস্ত ও হুকুমহাকাম সকলি তোমার মাতা করিবেন তুমি প্রাপ্তবয়স হইলে জমিদারিদিগর আপন নামে হজুর লেখাইয়া এবং আপন এক্তারে আনিয়া জমিদারির ও সংসারের কর্ম্মকার্য্য ও জমিদারির বন্দবস্ত ও খরচপত্র ওগয়রহ তোমার মাতার অনুমতি ও পরামৃশে তুমি করিবা এবং জাবত তোমার মাতা বর্ত্তমান থাকিবেন তাবত পরগণার মুনাফা ওগায়রহ জে কিছু আমদানির তহবিল তোমার মাতার নিকট জেমন আমি রাখিতাম তুমিও সেইমত রাখিবা।’[৭] নিজের অবর্তমানে বিধবা স্ত্রীর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই কেবল এই নির্দেশ প্রদত্ত হয়নি, অলকা দেবীর স্বাভাবিক কর্ত্রীত্বশক্তির প্রতি সম্মানও এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ঠাকুর-পরিবারে এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল, সেটি আমার পরে দেখতে পাব।

এই উইল করার কয়েকদিন পরেই 12 Dec 1807 তারিখে রামলোচনের মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথ তখন তেরো বৎসরের বালক মাত্র। অলকা দেবী ও দ্বারকানাথের আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ তাঁর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেন।

বাল্যে দ্বারকানাথ তৎকালীন রীতি অনুযায়ী আরবি ও ফারসি ভাষা আয়ত্ত করেন। এ ছাড়াও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়ির নিকটে অবস্থিত শেরবোর্ন [Sherbourne] সাহেবের স্কুলে ভর্তি হন। তখন

পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রচারে আগ্রহী ছিলেন না, বরং প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি টোল-মাদ্রাসার প্রসারের দিকেই তাঁদের উৎসাহ ছিল। অথচ ইংরেজ শাসনের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি-জানা ভারতীয়দের চাহিদা বেড়ে উঠছিল। এই কারণে প্রধানত কয়েকজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেবের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে কয়েকটি ইংরেজি-শিক্ষার স্কুল গড়ে উঠেছিল, শেরবোর্নের স্কুল তাদের অন্যতম। এই সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ দ্বারকানাথ তাঁকে আজীবন মাসোহারা প্রদান করেছিলেন।[৮] এ ছাড়াও পরে রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডাম্‌স এবং জে. জি. গর্ডন ও জেম্‌স্ কলডর প্রভৃতির কাছেও তিনি ইংরেজি শিক্ষা করেন।

শেষোক্ত দুজন ছিলেন তখনকার বিখ্যাত সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ম্যাকিনটশ অ্যান্ড কোম্পানি [Mackintosh & Co.]-র অংশীদার। এঁদেরই সহায়তায় দ্বারকানাথ প্রথমে এই কোম্পানির গোমস্তা-রূপে রেশম ও নীল ক্রয়ে সাহায্য করতে থাকেন। ক্রমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি নিজেই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করেন। এইসময়ে পৈতৃক বিরাহিমপুর পরগনার জমিদারি পরিচালনা-সূত্রে তিনি জমিদারি-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুন সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এর ফলে তিনি বহু বিখ্যাত জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তির আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন। পরে সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার মিঃ ফার্গুসনের কাছে তিনি রীতিমতো আইনের পাঠ গ্রহণ করেন। এইভাবে অর্থোপার্জনের একটি নূতন পথ তাঁর সামনে খুলে যায় এবং তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সরকারী কর্মচারীর সংস্পর্শে আসেন। এর ফলে 1818-এ তিনি চব্বিশ পরগনার কালেক্টরের অফিসে সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার দ্বারা তিনি সহজেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 1822-তে দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগনার কালেক্টর ও নিমক মহলের অধ্যক্ষ প্লাউডেনের দেওয়ান নিযুক্ত হন। 1828-এ তিনি শুল্ক ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ান পদে উন্নীত হন। 1834 পর্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই কাজ করে স্বাধীন ব্যবসায়ে আরও বেশি মনোযোগ দেবার উদ্দেশ্যে এই পদ ত্যাগ করেন।

ম্যাকিনটশ কোম্পানির সঙ্গে দ্বারকানাথের সম্পর্কের কথা আগেই বিবৃত হয়েছে। 1828-এ কর্মকর্তারা তাঁকে এই কোম্পানির অংশীদার করে নেন। এই কোম্পানি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পরিচালক ছিল। দ্বারকানাথ এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হন। বিখ্যাত আধা-সরকারী বেঙ্গল ব্যাঙ্ক তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুর করতে পারত না। প্রধানত সেই উদ্দেশ্যে 17 Aug 1829 তারিখে যোলো লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন।* সরকারী কর্মচারী হওয়ার জন্য দ্বারকানাথ সম্পূর্ণভাবে ব্যাঙ্কের কাজে আত্মনিয়োগ করতে না পারায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথকে আলিপুরের সেরেস্তাদারের অফিস থেকে ছাড়িয়ে এনে ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন। এর পর দ্বারকানাথের সুপরামর্শে ক্রমেই ব্যাঙ্কের উন্নতি ঘটতে থাকে। এইসময়েই তিনি 1830-তে কালী গ্রাম ও 1834-এ সাহাজাদপুর পরগনার জমিদারি ক্রয় করেন।

এদিকে, 1833-তে ম্যাকিনটশ কোম্পানি ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পতন ঘটে। দ্বারকানাথই একমাত্র সংগতিসম্পন্ন অংশীদার ছিলেন বলে ব্যাঙ্কের দায়শোধের ভার তাঁকেই নিতে হয়। এর পর তিনি নিজেই একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা ভাবতে শুরু করেন। এরই ফলে তিনি 1 Aug 1834 তারিখে সরকারী কর্মে ইস্তফা দেন। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল এই পদে দ্বারকানাথের সততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ

করলেও কর্তৃপক্ষ তাঁর সততায় কতখানি সন্তুষ্ট ছিলেন তার প্রমাণ পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে সদর বোর্ডের সেক্রেটারি হিসেবে হেনরি মেরিডিথ পার্কারের 7 Aug-এর সরকারী চিঠি এবং 14 Oct-এর ব্যক্তিগত চিঠি।[৯]

সরকারী কার্যভার থেকে মুক্তি পেয়ে দ্বারকানাথ উইলিয়ম কার [William Carr] নামে একজন ইংরেজকে অংশীদার করে 1834-এই কার-ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক [1774-1839]-ই কার সাহেবের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন ও য়ুরোপীয় আদর্শে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনে উৎসাহিত করেন। পরে বিভিন্ন সময়ে মেজর হেন্ডারসন, মিঃ প্লাউডেন, ডাঃ ম্যাকফারসন, ক্যাপ্টেন টেলর, দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র প্রসন্নকুমার ও ডি. এম. গর্ডন প্রথমে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছিলেন। প্রসন্নকুমার পরে সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি শুরু করেন ও প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং ডি. এম. গর্ডন কোম্পানির অংশীদার পদে উন্নীত হন। কিন্তু দ্বারকানাথই ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা। আর্থিক দায়দায়িত্বও প্রধানত তিনিই গ্রহণ করতেন। অর্থের অভাবও তাঁর ছিল না—নিজের বিষয়সম্পত্তির আয়, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের আনুকূল্য, অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যকুঠির নিকট সুনাম প্রভৃতি কারণে প্রয়োজনীয় যে-কোনো পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। ফলে কার-ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসা বিচিত্র দিকে প্রসারিত হয়। 1833-এর সনদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুযোগ লুপ্ত হওয়ায় দ্বারকানাথ কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধাও পেয়েছিলেন। তাঁর পৈতৃক জমিদারি বিরাহিমপুর পরগনার কুমারখালি মৌজায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠিটি তিনি কিনে নেন। তা ছাড়া রামনগরে চিনির কল স্থাপন করেন ও রানীগঞ্জে খনি থেকে কয়লা তোলার জন্য বেঙ্গল কোল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। আসামের চা প্রথম কলকাতায় আমদানি করে কার-ঠাকুর কোম্পানি। অবশ্য এই কোম্পানির প্রধান ব্যবসা ছিল নীল চাষ। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের নীলের কুঠি ছিল।

এতকাল দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রা ও মাল-পরিবহনের ক্ষেত্রে জলপথে নৌকার ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর বাষ্পচালিত জাহাজ এন্টারপ্রাইজ প্রথম ইংলন্ড থেকে ভারতে আসে 1825-এ। লর্ড বেন্টিঙ্কের আগ্রহে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আভ্যন্তরীণ পরিবহনে কয়েকটি স্টীমারকে নিয়োগ করে 1834-36-এর মধ্যে। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে 'স্টীম টাগ অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি কোম্পানি 1837-এ দুটি ছোটো স্টীমার নিয়ে নদীমুখ থেকে জাহাজ টেনে আনার ব্যবসায় শুরু করে। কার-ঠাকুর কোম্পানি ছিল এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্ট। এই স্টীমারগুলির মেরামতের জন্য তাঁরা খিদিরপুরে একটি কারখানা খোলেন। সুয়েজ হয়ে ইংলন্ড ও ভারতের মধ্যে জাহাজ চলাচল শুরু করার ব্যাপারেও দ্বারকানাথ উদ্যোগী ছিলেন। পি অ্যান্ড ও কোম্পানির তিনি একজন অন্যতম অংশীদার ছিলেন। শোনা যায়, তাঁর নিজেরই একটি জাহাজ ছিল এবং 'ইন্ডিয়া' নামের সেই জাহাজে করেই তিনি প্রথমবার ইংলন্ডে গিয়েছিলেন।

তাঁর দৃষ্টি কেবল অর্থোপার্জনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল না। দেশ ও সমাজের উন্নতিমূলক যে-কোনো প্রচেষ্টার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। 1814-এ রংপুরের কালেক্টরের অফিসে সেরেস্তাদারের কাজ ছেড়ে রামমোহন রায় [? 1772-1833] যখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এলেন, তখনই দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর আলাপের সূত্রপাত এবং এই পরিচয় তাঁর জীবনে দিক্-নির্দেশকের মতো কাজ করেছে। রামমোহন তাঁর চেয়ে প্রায় বাইশ বছরের

বড়ো ছিলেন, তবু তাঁরা মিশেছেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। বলা চলে, রামমোহন ও দ্বারকানাথ এই জুড়ি ঘোড়ার টানেই আধুনিক সভ্যতার রথ বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ করেছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে প্রথম দিকে উদাসীন ছিল। অথচ রামমোহন ও দ্বারকানাথ দুজনেই অনুভব করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত না হলে এদেশ কখনোই আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। তাই 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে তাঁরা দুজনেই সাগ্রহ সমর্থন জানান। তাঁদের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে 20 Jan 1817 তারিখে গরানহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে রামমোহন যখন হেদুয়ার কাছে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন, তখন দ্বারকানাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে এই স্কুলে ভর্তি করে দেন। Jun 1835-এ পাশ্চাত্য প্রথায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে দ্বারকানাথ দেশীয় ছাত্রদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তিন বছরের জন্য বাৎসরিক দু হাজার টাকা দেবার প্রস্তাব করেন। তাঁরই উৎসাহে সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত 28 Oct 1836-এ দেশীয়দের মধ্যে প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার সময়ে [1845] তিনি প্রস্তাব করেন যে দুজন ছাত্রের বিলাতযাত্রার ও সেখানে থেকে চিকিৎসাবিদ্যার উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সমস্ত ব্যয় তিনিই বহন করবেন। সরকারও দুটি ছাত্রের জন্য বৃত্তি দেন। এই চারজন ছাত্র দ্বারকানাথের তত্ত্বাবধানে তাঁর সঙ্গেই বিলাত যান।

হিন্দুধর্মের সংস্কার ও সতীদাহ নিবারণ—রামমোহনের এই দুটি কীর্তির সঙ্গেও দ্বারকানাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রামমোহন 1815-এ একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। দ্বারকানাথ নিজে নিষ্ঠাবান মূর্তিপূজক হিন্দু হয়েও এই সব আলোচনায় যোগ দিতেন এবং যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয় তখন তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা করেন ও পরে নিয়মিত উপাসনাতেও উপস্থিত থাকতেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর কয়েক বছর প্রধানত তাঁর দানের উপর নির্ভর করেই ব্রাহ্মসমাজ বেঁচে থাকতে পেরেছিল। অনুরূপভাবে সতীদাহ-নিবারণের ব্যাপারেও দ্বারকানাথ সর্বপ্রযত্নে রামমোহনকে সাহায্য করেছিলেন। এ ছাড়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার, বেন্টিঙ্কের প্রতি বিদায়কালীন অভিনন্দন, কালা আইন, দেওয়ানী জুরির প্রবর্তন, পুলিস-সংস্কার প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দোলনের কোথাও সপক্ষে বা কোথাও বিপক্ষে দ্বারকানাথকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। বাংলাদেশের জমিদারদের শক্তিকে সংহত করতে এবং তাঁদের সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে সচেতন করার জন্য Apr 1838-এ যে জমিদার-সভা বা ল্যান্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করা হয়, দ্বারকানাথ তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এর থেকেই বোঝা যায় যে, তখনকার দিনে দ্বারকানাথ কতখানি সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত পুরুষ। সুতরাং ব্যবসায়ের ও সামাজিকতার প্রয়োজনে তাঁর বাড়িতে নানাবিধ ভোজসভার আয়োজন লেগেই থাকত এবং সেখানে য়ুরোপীয় স্ত্রীপুরুষেরই প্রাধান্য ছিল। *সমাচার দর্পণ*-এর 20 Dec 1823 [শনি ৬ পৌষ ১২৩০] তারিখের সংবাদে দেখা যায়—"নূতনগৃহ, সঞ্চার ॥—মোং কলিকাতা ১১ ডিসেম্বর ২৭ আগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয়

দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।"[১০] এই নূতন গৃহ সম্ভবত দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়ি এবং উক্ত 'ভাগ্যবান' শব্দটি প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায় দ্বারকানাথের ভোজসভায় আমন্ত্রিত হওয়াকে য়ুরোপীয়েরাও সৌভাগ্য বিবেচনা করতেন।

দ্বারকানাথ নিজে ছিলেন বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান ও অনুরূপ আহার-বিহারে অভ্যস্ত। সুতরাং প্রথম প্রথম সামাজিকতার অনুরোধে এই সব ভোজসভায় মদ্যমাংস পরিবেশিত হলেও তিনি নিজে তা স্পর্শ করতেন না। কিন্তু কালক্রমে তিনি এসব জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তাঁর পারিবারিক জীবনে একটি সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। আনুমানিক 1809-এ যশোহরের নরেন্দ্রপুরের রামতনু রায়চৌধুরী ও আনন্দময়ীর কন্যা দিগম্বরী দেবীর সঙ্গে দ্বারকানাথের বিবাহ হয়। তিনি নাকি আশ্চর্য সুন্দরী ছিলেন, বাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজার সময় দেবীমূর্তির মুখ নাকি তাঁরই মুখের আদলে তৈরি হত। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ও ওজস্বিনী রমণী ছিলেন। তাই স্বামীর ভ্রষ্টাচারে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তিনি তাঁর সাক্ষাৎ-সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। দ্বারকানাথও পত্নীর বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত হয়ে তদবধি বৈঠকখানা বাড়িতেই বাস করতে থাকেন এবং বেলগাছিয়ায় একটি বাগানবাড়ি কিনে বহুমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জিত করে সেখানেই ভোজসভা, নৃত্যগীত ইত্যাদির আয়োজন করতেন। এই সব ভোজে সর্বশ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের স্বচ্ছন্দে ও মন খুলে মেশবার সুযোগ করে দিতেন। তাঁর মধুর ব্যবহার ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হতেন। *Calcutta Courier* পত্রিকার 26 Feb 1841-সংখ্যায় দেখা যায়, দ্বারকানাথ 25 Feb [বৃহ ১৫ ফাল্গুন ১২৪৭] তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের ভগ্নী মিস্ ইডেনের সম্মানে একটি নৃত্য ও ভোজসভার আয়োজন করেন। ইতিপূর্বে অনুরূপ একটি ভোজসভায় লেডি বেন্টিঙ্ক যোগদান করেছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় দ্বারকানাথ কেন য়ুরোপীয় সমাজে 'প্রিন্স' বলে অভিহিত হতেন।

দিগম্বরী দেবীর মৃত্যু হয় 21 Jan 1839 [সোম ৯ মাঘ ১২৪৫]; তার দুদিন পূর্বে তাঁর চতুর্থ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। *সমাচার দর্পণ*-এর 26 Jan [শনি ১৪ মাঘ]-সংখ্যায় লিখিত হয়—'[19 Jan শনিবারের দ্বারকানাথের] ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক অতি গুণান্বিত এক পুত্রের লোকান্তর হইল এবং তাহার দুই দিবস পরেই তাঁহার ভার্য্যার পরলোক হইল।'[১১] দিগম্বরী দেবীর গর্ভে দ্বারকানাথের পাঁচটি পুত্র হয়—দেবেন্দ্রনাথ [1817-1905], নরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ [1820-54], ভূপেন্দ্রনাথ [?-1839] ও নগেন্দ্রনাথ [1829-58]। এঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় অল্প বয়সেই। 1817-এ জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের যখন জন্ম হয় তখন দ্বারকানাথের বয়স ২৩ বছর, দিগম্বরী দেবীর বয়স আনুমানিক তেরো থেকে চৌদ্দের মধ্যে। দেবেন্দ্রনাথকে তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রূপে গড়ে তোলবার জন্য দ্বারকানাথের তাঁকে 1834-এ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। পরে তাঁকে এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও কার-ঠাকুর কোম্পানির এক-আনা অংশের অংশীদারও করে নেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মতিগতি ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল ছিল না। প্রথমে বিলাসব্যসনে মগ্ন হয়ে ও 1834-এ পিতামহীর মৃত্যুর পর ধর্মচর্চায় লিপ্ত থেকে তিনি বিষয়কর্মে অবহেলা করতে থাকেন। দ্বারকানাথ তখন ব্যবসা ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর অবর্তমানে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবসার যদি পতন ঘটে তা হলে চিরকাল মহাসুখে লালিত

সন্তানদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়তে হবে, এই আশঙ্কায় তিনি 20 Aug 1840 [বৃহ ৬ ভাদ্র ১২৪৭] তারিখে একটি ট্রাস্টডীড সম্পাদন করে পৈতৃক ও স্বোপার্জিত কয়েকটি জমিদারি তার অন্তর্ভুক্ত করে যান। এইভাবে ডিহি সাহাজাদপুর, বিরাহিমপুর পরগনা, কালীগ্রাম পরগনা এবং পাণ্ডুয়া ও বালিয়া তালুককে ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত করে সম্পর্কিত ভ্রাতা প্রসন্নকুমার, বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ও ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উপর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। এই ট্রাস্ট-গঠন তাঁর দূরদৃষ্টির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এর কিছুদিন পরেই 9 Jan 1842 [রবি ২৭ পৌষ ১২৪৮] দ্বারকানাথ বিলাতযাত্রা করেন। তাঁর ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হন। ইংলন্ডে দ্বারকানাথ বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে ইংলন্ডের মার্শাল ডিউক অব্ নরফোক তাঁকে একটি 'আর্মোরিয়াল এনসাইন' দেন। লন্ডনের মেয়র তাঁকে একটি ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। স্কটল্যান্ডে গেলে তাঁকে এডিনবার্গ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে সেই মহানগরীর নাগরিক অধিকার প্রদান করা হয়। ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনিও একটি সান্ধ্যভোজে সম্রাট ও বিশিষ্ট অতিথিদের যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন। দ্বারকানাথ কলকাতায় ফিরে আসেন Dec 1842-তে। ফেরার সময়ে তিনি বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বিশিষ্ট বাঙালিদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। কলকাতায় ফেরার পর দ্বারকানাথ আবার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেও মনে হয় তিনি যেন আর আগের মতো কাজে উৎসাহ পাচ্ছিলেন না, হয়তো স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল। এইজন্যই বোধহয় স্থায়ীভাবে ইংলন্ডে বাস করার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাতযাত্রার পরিকল্পনা করেন। এর আগে 16 Aug 1843 [বুধ ১ ভাদ্র ১২৫০] তারিখে একটি উইল করেন। এতে তিনি ভদ্রাসন বাড়ি দেবেন্দ্রনাথকে, বৈঠকখানা বাড়ি গিরীন্দ্রনাথকে এবং ভদ্রাসন বাড়ির পশ্চিম দিকের সমস্ত জমি ও বাড়ি তৈরির জন্য ২০,০০০ টাকা নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। কার-ঠাকুর কোম্পানির যে অর্ধাংশ তাঁর অধিকারে ছিল, তার সবটাই তিনি দেবেন্দ্রনাথকে দেন। এ ছাড়া এই উইলে দরিদ্রসেবার জন্য এক লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট ছিল [পূর্বেও 3 Feb 1838 তারিখে তিনি 'ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্ল্ সোসাইটি'তে এক লক্ষ টাকা দান করেন]।

8 Mar 1845 [শনি ২৬ ফাল্গুন ১২৫১] তারিখে 'বেন্টিঙ্ক' নামক জাহাজে দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করেন। এবার সঙ্গে নিয়ে যান কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার্থী চারজন বাঙালি যুবককে। পর বৎসর 1 Aug 1846 [শনি ১৮ শ্রাবণ ১২৫৩] তারিখে লন্ডনের নিকটবর্তী সারেতে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, তার ভিত্তি রচনা করেছিলেন দ্বারকানাথ। অর্থ, আভিজাত্য, সম্মান ও প্রতিপত্তি দিয়ে তিনি এই পরিবারকে যে বিশিষ্টতা দান করেন, পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত করেন ধর্মমহিমা; পরবর্তী পুরুষে একদিকে পৌত্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্য দিকে প্রপৌত্র অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও শিল্পের গৌরব তার সঙ্গে যুক্ত করে এই বাড়িকে বাঙালির তীর্থস্থানে পরিণত করেছেন।

দ্বারকানাথের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক নিম্নলিখিত বইগুলি পড়তে পারেন—Blair B. Kling : *Partner in Empire : Dwarakanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India* [1976]; Krishna Kripalani *: Dwarakanath Tagore : A Forgotten Pioneer : A Life* [1981]।

উল্লেখপঞ্জি

১ দ্র ব্যোমকেশ মুস্তফী : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, পিরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ [১৩৩১]। ১৭৪

২ ঈশানচন্দ্র বসু : শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহোদয়ের জীবন বৃত্তান্তের স্বল্প পরিচয় [1902]। ১২৮

৩ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ৩১৭

৪ ড হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : ঠাকুরবাড়ীর কথা [1966] ২৩

৫ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ৩১৮

৬ ঐ। ৩২৪

৭ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত-সম্পাদিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের দ্বারকানাথ ঠাকুর [১৩৬৯]। ২৬০

৮ দ্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী [১৩৭৬]। ৪২

৯ দ্র ঐ। ৬১-৬২

১০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ [১৩৭৭]। ১২৩

১১ ঐ ২ [১৩৮৪]। ৪৫০

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ২৮৩; বিনয় ঘোষ এই তথ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন, দ্র 'ঠাকুর-পরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ' : বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯। ৩৮৯

*[১] Consultations, Sept. 18, 1758, Rev. Long's *Selections from Unpublished Records, 1748-1767,* p. 149. বিনয় ঘোষের উপরোক্ত প্রবন্ধ। ৩৯০

*[২] ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক উদ্ধৃত দলিলে ১১৭১ বঙ্গাব্দ ও 1764 খ্রিস্টাব্দ লিখিত আছে, আমরা বঙ্গাব্দটিকে সঠিক বলে ধরে নিয়েছি।

* ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী [১৩৭৬]। ১৪০; কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেন : 'Thus was founded in August-September 1828 the Union Bank with a capital of rupees twelve lakhs in 500 shares :—*Dwarakanath Tagore : A Forgotten Pioneer : A Life* [1981] 176

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৪ [বৃহ 15 May 1817] তারিখে। তাঁর রাশিচক্রটি[১] নিম্নরূপ :
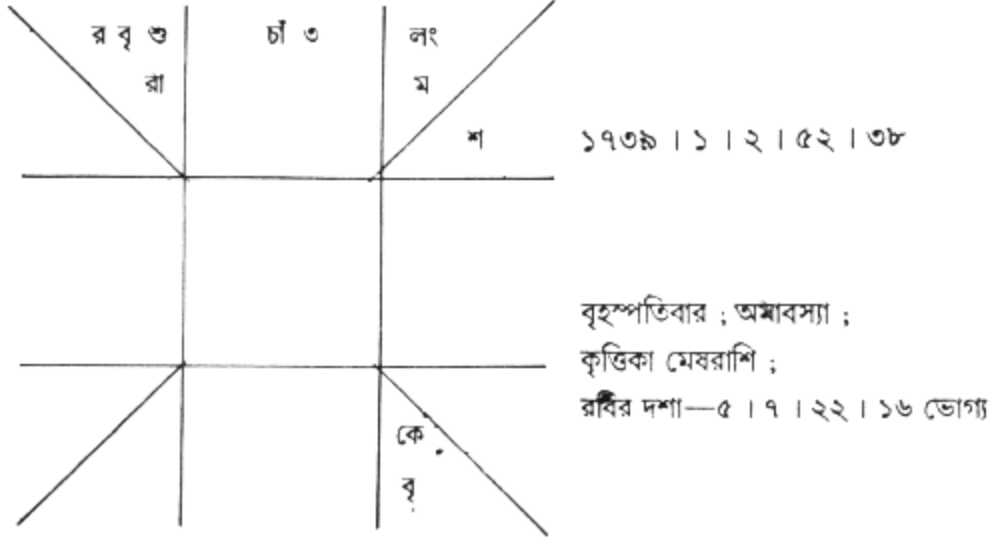
—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, এই দিন সূর্যগ্রহণের সময়ে তাঁর জন্ম হয়।[২]

রামমোহনের অনুরোধে দ্বারকানাথ পুত্রকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে ভর্তি করে দেন। 1827 ও 1828-এ দেবেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সঙ্গে যথাক্রমে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুরস্কার লাভ করেন। অনুমান করা যায়, 1830 পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে পড়েছিলেন। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর পদত্যাগের [25 Apr 1831] অব্যবহিত পরে তিনি সেখানে ভর্তি হন ও তিন-চার, বছর অধ্যয়ন করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ে কলেজ ত্যাগ করেন। এখানে পড়ার সময়ে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের নিয়ে ১৭ পৌষ ১২৩৯ [রবি 30 Dec 1832] তারিখে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয় ও দেবেন্দ্রনাথ তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভার উদ্দেশ্য ছিল 'গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চ্চনা' এবং সিদ্ধান্ত হয় যে 'বঙ্গভাষা ভিন্ন এ সভাতে কোন কথোপকথন হইবেক না।'[৩] এই সভা-সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা না গেলেও একটি জিনিস লক্ষণীয়। যে-সময়ে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত নব্যযুবকেরা ইংরেজি শিক্ষার মোহে দেশীয় ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিলেন, সেই সময়েই

এই সভার সভ্যেরা বাংলা ভাষা চর্চাকেই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। বোঝা যায়, এঁদের উপর রামমোহন রায়ের প্রভাবই অধিক কার্যকরী ছিল; আর সেই কারণেই ধর্মবিষয়ক আলোচনাও তাঁদের সভার অন্যতম লক্ষ্য হয়েছিল। এর থেকে দেবেন্দ্রনাথের মানসিক প্রবণতারও গতি নির্দেশ করা সম্ভব। বলা যেতে পারে, পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এই সভারই উত্তরসূরি।

আনুমানিক 1834-এর মধ্যভাগে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজ থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে কোষাধ্যক্ষ রমানাথ ঠাকুরের অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ নৃত্য-গীত-ভোজ-সভার আয়োজন করতেন। দেবেন্দ্রনাথ এই পরিবেশে কিছুদিনের জন্য বিলাসের স্রোতে নিমগ্ন হন। কিন্তু 1838-এ পিতামহী অলকা দেবীর মৃত্যুর সময়ে তাঁর মনে যে বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, তাইতেই তাঁর জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পিতামহীই ছিলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের প্রধান আশ্রয়; তাঁর ধর্মপ্রবণতা দেবেন্দ্রনাথের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পিতামহীর মৃত্যুর পর তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনা দেবেন্দ্রনাথের মনে তীব্রভাবে জেগে ওঠে। মহাভারত ও য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র প্রচুর পাঠ করেও তিনি আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাননি। এমন সময় ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং...' শ্লোকটি আকস্মিকভাবে তাঁর হাতে আসে। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহায়তায় তিনি যখন শ্লোকটির অর্থ বুঝতে পারলেন, তখন থেকেই উপনিষদের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায়। উপনিষদ-পাঠে মন যখন অভিষিক্ত, সেই সময়ে তিনি ২১ আশ্বিন ১২৪৬ [6 Oct 1839] রবিবার কৃষ্ণা-চতুর্দশীর দিনে জোড়াসাঁকো-বাড়ির পুষ্করিণীর ধারে একটি ছোটো ঘরে দশজন আত্মীয় ও বন্ধুকে নিয়ে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' স্থাপন করেন এবং নিয়ম হয় প্রতি মাসের প্রথম রবিবার সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন হবে। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে সভার আচার্য পদে অভিষিক্ত করা হয় এবং তিনিই সভার নাম পরিবর্তন করে 'তত্ত্ববোধিনী' রাখেন—'ইহার উদ্দেশ্য, আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রচার।'[৪] ক্রমেই সভার সদস্যসংখ্যা বাড়তে থাকে। পর বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে দেবেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে ৫৬ নং সুকিয়া স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা-স্থাপন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময়ের কিছু আগে থেকেই আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রভৃতি মিশনারিদের প্রচারে বেশ-কিছু ইংরেজিশিক্ষিত নব্যযুবক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তা ছাড়া অনেকেই প্রচলিত হিন্দুধর্মের নানাবিধ কুসংস্কারের জন্য এর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন। সে ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী সভা এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল। অনেকটা একই উদ্দেশ্য নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ Jun 1840-তে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করেন। 'ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্ট ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্মরূপে গ্রহণ—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদান করা'[৫] ছিল পাঠশালার উদ্দেশ্য। অক্ষয়কুমার দত্ত ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই বিষয়ে তাঁর লিখিত দুটি গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী সভা 1841-এ প্রকাশ করে। কিন্তু পাঠশালাটি যথেষ্ট জনসমাদর লাভ না করায় 30 Apr 1843 [রবি ১৮ বৈশাখ ১২৫০] তারিখে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। পিতার মৃত্যুজনিত ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে 1847-এ পাঠশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের যে পরিকল্পনা দেবেন্দ্রনাথ অনুমোদন করেছিলেন তাকে এই পাঠশালারই অনুবর্তন বলা যেতে পারে।

এরপর দেবেন্দ্রনাথের জীবনে একটি বড়ো ঘটনা হল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ। রামমোহনের বিলাতযাত্রা [1830]-র পর দ্বারকানাথের অর্থসাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজ কোনোরকমে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছিল। দ্বারকানাথের বিলাতযাত্রার পরেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে [? Jan 1842] এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর আগ্রহেই ১৭৬৪ শকের [1842] বৈশাখ মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের বক্তব্য প্রচারের জন্য ১ ভাদ্র ১৭৬৫ শক [বুধ 16 Aug 1843] তারিখে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* প্রকাশিত হয়। ধর্মতত্ত্ব প্রচার পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য হলেও ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও সেখানে প্রকাশিত হত। আধুনিক বাংলা গদ্যের রূপগঠনে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র দান অনস্বীকার্য। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ ছাড়াও বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীরাও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হেদুয়ার কাছে রামমোহনের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের বাড়িতে এই পত্রিকার যন্ত্রালয় ছিল এবং এখানেই দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ ও বেদান্তদর্শনের পাঠ গ্রহণ করতেন।

এদিকে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। অবশেষে ১৮৬৫ শকের ৭ পৌষ [১২৫০ : 21 Dec 1843] বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন তিনটের সময় ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ-সহ ২১ জন বিধিপূর্বক প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ঘটনাটি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি প্রধান দিক্-নির্দেশক ও দিনটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ। এরপর মহা উৎসাহে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দু-বছরের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মের সংখ্যা ৫০০ হলে তিনি ৭ পৌষ ১৭৬৭ শক [১২৫২ : শনি 20 Dec 1845] তারিখে গোরিটির [গৌরীহাটির] বাগানে মহোৎসবের আয়োজন করেন।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রভৃতি খ্রিস্টান মিশনারিরা এই সময়ে খ্রিস্টধর্মপ্রচার ও হিন্দুধর্মের ত্রুটিবিচ্যুতির আলোচনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন; যাঁরা তা করলেন না তাঁরাও প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁদের বিতৃষ্ণা গোপন করেননি। আর এর প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল হিন্দুরা হিন্দুধর্মের সব-কিছুকেই পবিত্র ও মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘোষণা করে যে-কোনো সংস্কারমূলক কাজকর্মেরই বিরোধিতা করতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকাকে আশ্রয় করে এই দুই স্রোতেরই গতিরোধ করার প্রয়াসী হন। 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়' স্থাপন এই প্রয়াসেরই কার্যকরী রূপ। খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলি খ্রিস্টধর্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুতরাং অনুরূপ দেশীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমেই এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া যেতে পারে এই বিবেচনায় দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীনপন্থী রাজা রাধাকান্ত দেব এবং নব্যপন্থী রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মিলিত করে এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে 25 May 1845 [রবি ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫২] তারিখে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন। বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির দানে পুষ্ট হয়ে 1 May 1846 [রবি ১৯ ফাল্গুন ১২৫২] তারিখে চিৎপুর রোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বৈঠকখানায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়; ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক ও রাজনারায়ণ বসু পরিদর্শক নিযুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যালয়ের অন্যতম সম্পাদক। অবশ্য নানা কারণে এর আয়ু দীর্ঘায়িত হতে পারেনি; কিন্তু এটি একটি

আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে এবং রক্ষণশীল, সংস্কারপন্থী ও নব্যপন্থী—হিন্দুসমাজের এই তিনটি শাখাকেই একসূত্রে গেঁথে যে একটি বড় কাজ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার কাজে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমেই এত বেশি জড়িত হয়ে পড়ছিলেন যে বৈষয়িক কাজকর্মে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ করতে পারতেন না। ইতিমধ্যে খবর এল বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়েছে [1 Aug 1846]। তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দেবেন্দ্রনাথের কাছে একটি মানসিক সংকটের আকারে এল। তিনি ও গিরীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চিরাচরিত হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী পূজার্চনা অব্যাহত ছিল। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধের সময় দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম এনে শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী শ্রাদ্ধ করতে সম্মত হলেন না, তিনি 'পৌত্তলিকতার সংস্রববর্জ্জিত দানোৎসর্গের একটি মন্ত্র' উচ্চারণ করে দানসামগ্রী উৎসর্গ করেন। এই ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ আত্মীয়েরা দেবেন্দ্রনাথকে সামাজিকভাবে পরিত্যাগ করেন। গিরীন্দ্রনাথ অবশ্য শাস্ত্রানুমোদিত শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

দ্বারকানাথের উইল অনুযায়ী দেবেন্দ্রনাথ কার-ঠাকুর কোম্পানির যে আট আনা অংশ পান, তা তিন ভাইয়ে সমান ভাগ করে নেন। তিনি বিষয়কর্ম উদাসীন হলেও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরই পরামর্শে ইংরেজ অংশীদারদের অংশ ক্রয় করে তাঁদের বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত করা হয় এবং ব্যবসায়-পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব গিরীন্দ্রনাথই গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হয়ে কাশীতে যান বেদ-চর্চা করতে। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যবসা-জগতের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে ওঠে। পরিণামে 1848-এর গোড়াতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং কার-ঠাকুর কোম্পানির পতন ঘটে। ফলে দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রমোহনের স্কন্ধে বিপুল ঋণভার এসে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতায় সমস্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিয়ে অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থার সঙ্গে এই জীবনযাত্রা সুসংগত হয়েছিল। অনন্যমনা হয়ে ধর্মালোচনায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হবার সুযোগ পেলেন তিনি। এই সময়ে তাঁর ধর্মমতেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। পূর্বে তিনি বেদকে অভ্রান্ত মনে করতেন। কিন্তু বেদচর্চার ফলে তাতে বহুদেবতা, যজ্ঞাদির বাহুল্য, পরস্পরবিরোধী উক্তির সন্নিবেশ ইত্যাদি দেখে ঐ মত পরিত্যাগ করেন। উপনিষদের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাও তাঁর অন্তরের সায় পেল না। তখন তিনি উপনিষদ থেকে তাঁর হৃদয়ের অনুকূল শ্লোকসমূহ সংকলন করে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রস্তুত করেন [1848] এবং তাকে ব্রাহ্মী উপনিষদ আখ্যা দেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দেবেন্দ্রনাথ বিপুল পরিশ্রমে মহাভারত, গীতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি থেকে শ্লোক সংগ্রহ করে ব্রাহ্মধর্মের নীতি ও অনুশাসন প্রস্তুত করেন।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর থেকেই দেবেন্দ্রনাথ দুর্গাপূজার সময় বাড়িতে না থেকে বিভিন্ন দেশ পর্যটনে ব্যাপৃত হন। এইভাবে 1849-এ আসাম, 1850-তে ব্রহ্মদেশের মৌলমীন, 1856-এ কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লি, মথুরা, বৃন্দাবন, লাহোর, অমৃতসর, সিমলা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। সিমলায় অবস্থান কালেই সিপাহি বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথ তখন হিমালয়ের আরও গভীরে সুঙ্গ্রী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিক দিয়ে এই ভ্রমণ যথেষ্ট মূল্যবান। অবশেষে ১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ [15 Nov 1858] তারিখে তিনি কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে 1854-এ গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাঁর সুপরিচালনায় পৈতৃক ঋণের অধিকাংশই শোধ হয়ে যায়। কিন্তু অবশিষ্ট ঋণ ও গিরীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঋণ ইত্যাদির জন্য সম্পত্তি বিষয়ে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখা

দেয়। এমন-কি পাওনাদারের নালিশে দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বের করে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর মধ্যস্থ হয়ে বাকি ঋণ পরিশোধের সুবন্দোবস্ত করেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ আবার ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য ঋণ করতে আরম্ভ করলে দেবেন্দ্রনাথ অসন্তোষ প্রকাশ করেন, অভিমানে নগেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করেন। 24 Oct 1858-এ তাঁর মৃত্যু হয়। ১৪ অগ্র ১২৬৪ [28 Nov 1857] ও ২৯ আষাঢ় ১২৬৫ [12 Jul 1858] নগেন্দ্রনাথ দুটি উইল করেন। তিনি গণেন্দ্রনাথকে সম্পত্তির ভাগ ও ২০০০০ টাকা দিয়ে যান [দ্র Deed No. 77]।

1858-এ দেশভ্রমণ করে ফিরে আসার পর দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের যোগাযোগ হয়। কেশবচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন এবং প্রধানত সেই সূত্রেই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এই যুবকের দীপ্ত ধর্মবোধ ও প্রবল কর্মশক্তি দেবেন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। এঁরই উদ্যোগে তিনি 1859-এ 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপন করেন এবং সেখানে তিনি নিজে বাংলায় ও কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। এর কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নিয়মিত শারদ-ভ্রমণে সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে নিয়ে ১২ আশ্বিন ১২৬৬ তারিখে সিংহল যাত্রা করেন। উল্লেখ্য যে, এই বৎসরের গোড়াতেই, খুব সম্ভব ২৬ বৈশাখ যে সাংবৎসরিক সভা আহূত হয়, সেখানেই, তত্ত্ববোধিনী সভার বিলোপ সাধন করে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করা হয়। ১১ পৌষ ব্রাহ্মদের সাধারণ সভায় দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রাণের জোয়ার এল। এর পূর্বে দেবেন্দ্রনাথের কাছে ব্রাহ্মধর্ম ছিল তত্ত্বানুসন্ধানের অন্যতম মাধ্যম। কেশবচন্দ্র তার সঙ্গে প্রচার যুক্ত করে একে একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মের রূপ দিলেন। ব্রাহ্মদের সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রণীত হল। এই পদ্ধতি অনুসারে দেবেন্দ্রনাথ ১২ শ্রাবণ ১২৬৮ [26 Jul 1861] তারিখে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহ দিলেন। লক্ষণীয় যে, শালগ্রামসাক্ষী ও অগ্নিসংস্কার ব্যতীত হিন্দুবিবাহের অন্যান্য প্রত্যেকটি অঙ্গই এই বিবাহে অনুসৃত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ সমাজের সংস্কার অবশ্যই চাইতেন, কিন্তু তা প্রচলিত প্রথাগুলি বর্জন করে নয়, যুগোপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমে। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি হিন্দুধর্মেরই অন্তর্গত করে দেখতেন, তার পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বাদ দিয়ে। তাই বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, উপবীত-ত্যাগ ইত্যাদি ব্যাপার তিনি সমর্থন করলেও মনেপ্রাণে স্বীকার করে নিতে পারেননি। আর সেই কারণেই কেশবচন্দ্র প্রভৃতি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নব্যপন্থী সভ্যেরা যখন এইগুলিকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন, তখন তিনি তা মানতে পারলেন না। ফলে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ২৬ কার্তিক ১২৭৩ [11 Nov 1866] তারিখে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন; কার্যত এই বিচ্ছেদ ঘটে 1864-এর শেষে। এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ মর্মান্তিক দুঃখ পান, অথচ নানাভাবেই তিনি এই নূতন সমাজের সঙ্গে যোগ রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, খ্রিস্টভক্তির বাড়াবাড়ি, বৈষ্ণবদের অনুকরণে নগরসংকীর্তন প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে নূতন ধরনের পৌত্তলিকতার আভাস দেখে তাঁর পক্ষে এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর থেকেই আমরা দেখি, তিনি ধীরে ধীরে সব-কিছু থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অবসর জীবন যাপন করতে থাকেন। অবশ্য জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্তই তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও বৈষয়িক উভয়বিধ ক্ষেত্রেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি

রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর সম্যক উৎসাহের অভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশই একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হয়ে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে ফেলে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ এবং দেবেন্দ্রনাথের শেষ জীবন এখানে আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই, কারণ তা রবীন্দ্রনাথের জীবন-বর্ণনা সূত্রেই আমরা উপস্থাপিত করতে পারব। বর্তমানে শুধু এইটুকুই উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, ৬ মাঘ ১৩১১ [বৃহ 19 Jan 1905] তারিখে বেলা ১-৫৫ মিনিটে ৮৮ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

উল্লেখপঞ্জি

১ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক রাশিচক্রের খাতা থেকে উদ্ধৃত [রবীন্দ্রভবন, Ms. 364]

২ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; রবীন্দ্র-কথা [১৩৪৯]।

৩ দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সা-সা-চ ৩। ৩৪।১০, ১২

৪ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী [১৩৬৮]। ২৬

৫ ঐ। ২৯৯-৩০০

তৃতীয় অধ্যায়

সারদাসুন্দরী দেবী

দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় যশোহর দক্ষিণডিহি-নিবাসী রামনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা সারদাসুন্দরী দেবীর*[১] সঙ্গে ১২৪০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে [Mar 1834]*[২]। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো বৎসর ও সারদা দেবীর আট [?]*[৩]। বিবাহের একটি বিবরণ দিয়েছেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : 'তাঁর [সারদা দেবীর] এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন যে, আমার শ্বশুরমশায়ের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। তিনি দেশে এসে আমার শাশুড়ীকে (তিনি তখন ছয় বৎসরের মেয়ে) কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন তাঁর মা বাড়ী ছিলেন না—গঙ্গা নাইতে গিয়েছিলেন। বাড়ী এসে, মেয়েকে তাঁর দেওর না বলে-কয়ে নিয়ে গেছেন শুনে তিনি উঠোনের এক গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর সেখানে পড়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মারা গেলেন।'[১]

সারদা দেবীর জীবনের সম্পূর্ণ চিত্রটি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়, সেকালের বাঙালি পরিবারের অন্তঃপুরচারিণী গৃহবধূর বৈচিত্র্যহীন জীবনে সেই স্পষ্টতা আশাও করা যায় না। তবু তাঁর বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন যে গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে তা নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি যখন বধূ হয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করেছেন তখন দ্বারকানাথের সৌভাগ্যসূর্য মধ্যগগনে। কল্পনা করা যায় তাঁর বিবাহে যথেষ্ট ধূমধাম হয়েছিল এবং দাসদাসী-পরিবৃত খুব জমকালো পরিবেশেই তাঁর প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য রূপবান স্বামী-পুত্রাদি নিয়ে সারদা দেবীর ভোগাকাঙক্ষা যে-সময় পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারত, সেই সময়েই দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এক বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় হল। এই অবস্থা সেই তরুণী বধূর কতখানি হৃদয়বেদনার কারণ হয়েছিল তার একটি করুণ চিত্র আছে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর এক অংশে। বিপুল ঐশ্বর্যের প্রভু না থেকে নির্জনে ঈশ্বরের পালনী-শক্তির আস্বাদ পাওয়ার জন্য দেবেন্দ্রনাথের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সেই নির্জনতা লাভের উদ্দেশ্যে "১৭৬৮ শকের [1846] শ্রাবণ [? ভাদ্র] মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্ম্মপত্নী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।' আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্য একটা পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন।"[২] এই নৌকাযাত্রার অবসান আর এক মহাসংকটের মধ্যে। পথিমধ্যে দ্বারকানাথের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল; যার পরিণতি আর্থিক বিপর্যয়ে ও দেবেন্দ্রনাথ অপৌত্তলিকভাবে শ্রাদ্ধ করায় শেষ পর্যন্ত আত্মীয়-বিচ্ছেদে, যা অবশ্যই সারদা দেবীর পক্ষে মর্মান্তিক হয়েছিল। সেই সময় তিনি ছিলেন সেই বৃহৎ পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী। তাই যে সমস্ত

সাংসারিক কৃচ্ছ্রতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, এতদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সেই ব্যতিক্রম তাঁর কাছে নিশ্চয়ই খুব উপাদেয় হয়নি। আর বিবাহাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে ও দুর্গোৎসবাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের অনুপস্থিতি তাঁর পক্ষে অবশ্যই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল।

সারদা দেবীর যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর শাশুড়ী দিগম্বরী দেবী ও দিদিশাশুড়ী অলকা দেবী দুজনেই জীবিতা। তাঁরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ মহিলা। সুতরাং তাঁদের শিক্ষায় দেবদ্বিজে অনুরক্তি প্রভৃতি হিন্দুনারীর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি যে তাঁর চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে যাবে, তা সহজেই অনুমেয়। দ্বারকানাথের সময় থেকেই বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা হত। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমেই জগদ্ধাত্রী পূজা উঠিয়ে দেন ও দুর্গাপূজার সময়ে বাড়িতে না থেকে দেশভ্রমণে বহির্গত হতে শুরু করেন। কালক্রমে দুর্গাপূজাও উঠে যায়,* পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে অপৌত্তলিক পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে ও গিরীন্দ্রনাথের পরিবারেও গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দন শিলার সেবার ভার গ্রহণ করে স্বতন্ত্র হয়ে যান। এই সব ঘটনা সারদা দেবীর ধর্মজীবনে অবশ্যই সংকটের সৃষ্টি করেছিল। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'আমরা প্রাচীনাদের মুখে শুনিছি সারদাদেবী স্বামীর কথায় নূতন ধর্ম্মানুষ্ঠান অনুশীলনে একটু দোদুল্যমান অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চিরদিনের অভ্যস্ত বাহ্যিক পূজা অনুষ্ঠান ৩৫ বৎসর বয়সে স্বামীর মতানুবর্ত্তিনী হইয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। বেদীতে বসিয়া কিন্তু নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ ও হরিনাম জপ করিতেন এবং স্বামীর ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেন। আবার চিরদিনের অভ্যাসের ফলে কখন কখন রমানাথ ঠাকুরের বাটির দুর্গোৎসবের পূজক কেনারাম শিরোমণির হস্তে, স্বামীর অজ্ঞাতে, কালীঘাটে ও তারকেশ্বরে পূজা প্রেরণ করিতেন।'[৩]

এই উদ্ধৃতি থেকেই সারদা দেবীর ধর্মজীবনের সংকটের প্রকৃত রূপটি বোঝা যাবে। অথচ স্বামীভক্তিও তাঁর জীবনের এক অন্যতম সংস্কার, বলা যেতে পারে এইটিই ছিল তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন : 'মা আমার সতীসাধ্বী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্বদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে সর্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময় কোনোমতেই পিতা বাড়িতে থাকিতেন না। এইজন্য পূজার উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যতকিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমারা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না। গ্রহাচার্যরা স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা পিতার সর্বপ্রকার আপদ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্বদাই যে কত অর্থ লইয়া যাইত তাহার সীমা নাই।'[৪]

স্বামীর জন্য এই উদ্বেগ তাঁর চিরসঙ্গী। 1857-এ দেবেন্দ্রনাথ যখন সিমলায়, সেই সময় উত্তর ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন : 'একটা গুজব উঠিল সিপাহীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। একে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখেন নাই, তাহার উপর এই গুজব—বাড়ির সকলে ভাবনায় অভিভূত হইল। মা তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।'[৫] সেইজন্য স্বামী যখন বাড়ি থাকতেন তখন তাঁর সেবার দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। এ বিষয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা' থেকে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি : 'আমার শাশুড়ীর একটু স্থূল শরীর ছিল, তাই বেশি নড়াচড়া করতে পারতেন না।...কেবল বাবামশায় যখন বাড়ী থাকতেন মা রান্নাঘরে নিজে গিয়ে বসতেন।' [পুরাতনী। ২৩] 'আমাদের বাড়িতে তখন রোজ উপাসনা হত,..মহর্ষি থাকলে তিনি উপাসনা করতেন, তখন মাও গিয়ে

বসতেন।' [ঐ। ২৬] 'আমার মনে পড়ে বাবামশায় যখন বাড়ী থাকতেন আমার শাশুড়ীকে একটু রাত করে ডেকে পাঠাতেন, ছেলেরা সব শুতে গেলে। আর মা একখানি ধোয়া সুতি শাড়ি পরতেন, তারপর একটু আতর মাখতেন; এই ছিল তাঁর রাতের সাজ।' [ঐ। ২৩] এই মনোযোগ ও প্রসাধনের বর্ণনা তাঁর আত্মনিবেদনের প্রকৃতিটিকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

সারদা দেবী প্রকৃত অর্থে শিক্ষিতা ছিলেন না সত্য, কিন্তু একেবারে নিরক্ষরও ছিলেন না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে লেখাপড়ার যথেষ্ট প্রচলন ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার' [*প্রদীপ,* ভাদ্র ১৩০৬। ৩১৪-২০] প্রবন্ধে তার সুন্দর পরিচয় আছে। মায়ের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত।' [ঐ। ৩১৬] চাণক্যশ্লোক, দেবেন্দ্রনাথেরও খুব প্রিয় ছিল, সারদা দেবীর এই চাণক্যশ্লোক-প্রিয়তা কি স্বামীর কাছে শিক্ষালাভেরই প্রত্যক্ষ ফল?

যাই হোক, এই শিক্ষা অবশ্য তাঁকে সংস্কার মুক্তির কোনো বিশেষ দিগন্তের সন্ধান দিতে পারেনি, তা সম্ভবও নয়। সেইজন্যই দেখি তিনি সেকালের অন্তঃপুরের স্বাভাবিক সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরেই আবদ্ধ থেকেছেন চিরকাল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর উক্তিতেও এই ধারণারই সমর্থন মেলে : 'বিয়ের দুতিন বৎসর পরে বাবামশায় মাকে সুদ্ধ নিয়ে এসে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে রইলেন। মা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য পালকি পাঠালেন। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ বল্লেন ভাড়া বাড়িতে বউ পাঠাবেন না। ...বাবামশায় যখন শুনলেন মা এই কারণে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না তখন নিজেই বাড়ির ভিতর চলে এলেন। এসে মাকে বল্লেন —সত্যেন্দ্রর বউয়ের মা তাঁকে নিতে পালকি পাঠিয়েছেন, তুমি নাকি ভাড়া বাড়ী বলে' তাকে যেতে দাও নি? ভাড়াবাড়ী কেন, মা গাছতলায় থাকলেও মায়ের কাছে যাবে, এখনি পাঠিয়ে দাও।'[৬] ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'শুনেছি সত্যেন্দ্র'কে বিলেত পাঠানো হয়েছে, এই অজুহাতে মেজবউমার গয়না নিয়ে কর্ত্তাদিদিমা তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন শুনে মহর্ষি রাগ করে তার বদলে মাকে হীরের কণ্ঠী দেন',[৭]—এগুলি অবশ্যই মানসিক ঔদার্যের পরিচয় বহন করে না। এই ধরনের মনোভাবের বর্ণনা পাওয়া যায় সৌদামিনী দেবীর লেখায় : 'আমার সেজ এবং ন বোন অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিল বলিয়া আত্মীয়েরা চারি দিক হইতে মাকে এবং পিতাকে তাড়না করিতেন। মা বিচলিত হইয়া উঠিতেন'[৮]; কিংবা সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে : 'আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?"'[৯] সত্যেন্দ্রনাথ এর চেয়েও বেশি দূর গিয়েছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর মার প্রতিক্রিয়ার কথা কোথাও বর্ণিত হয়নি। কিন্তু সারদা দেবীর এই মানসিক সংকীর্ণতার জন্য তাঁকেই একমাত্র দায়ী করা উচিত নয়, আমাদের সমাজই যে তখন অনেকটা পিছিয়ে ছিল এসব তারই প্রমাণ—আমাদের সমাজের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত পুরুষেরাই কি এর চেয়ে বেশি মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন?

সারদা দেবী বহু-প্রসবিনী ছিলেন; সর্বমোট পনেরোটি সন্তানের—নয়টি ছেলে ও ছয়টি মেয়ে—জননী। সুতরাং সন্তানদের প্রতি যথাযযাগ্য মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখনকার দিনে অভিজাত পরিবারে তার প্রয়োজনও ছিল না—আত্মীয়-স্বজন ও দাসদাসীরাই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করত। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন : 'আমার মা বহুসন্তানবতী ছিলেন এইজন্য তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না—মেজকাকীমার ঘরেই আমাদের সকলের আশ্রয় ছিল। তিনি আমাদের বড় ভালোবাসিতেন, তাঁহার 'পরেই আমাদের যত আবদার ছিল।'[১০] সত্যেন্দ্রনাথও অনুরূপ উক্তি করেছেন : 'মার কাছে আমরা বেশীক্ষণ থাকতুম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকাকিমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রাম-স্থান। বলতে গেলে মেজকাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয় ছিলেন।'[১১] সরলা দেবী তাঁর আত্মকথায় নিজের মা স্বর্ণকুমারীর সন্তান-বাৎসল্যের অভাবের কথা বলতে গিয়ে তাঁর দিদিমার প্রতিও কটাক্ষ করেছেন।[১২] সারদা দেবীর জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক যে সংকটের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই উদাসীনতার একটা যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য নয়।

অবশ্য তিনি সব কিছুতেই যে উদাসীন ছিলেন, তা নয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা'য় দেখি, 'শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলে যখন পালকি নামাল তখন বোধ হয় আমার শাশুড়ী আমাকে কোলে করে তুলে নিয়ে গেলেন। ...আমাকে নিয়ে পুতুলের মতো এক কোণে বসিয়ে রাখলেন। ...আমরা বউরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম। ...প্রথম বিয়ের পর শাশুড়ী আমাদের রূপটান ইত্যাদি মাখিয়ে রং সাফ করবার চেষ্টা করতেন। তিনি সামনে বসে থাকতেন তক্তপোষের উপর, আর দাসীরা আমাদের ঐসব মাখাত। দিন কতক পরে যতদূর হবার হলে ছেড়ে দিতেন।...আমি বড্ড রোগা ছিলুম। একদিন কাদের বাড়ীর বউরা বেড়াতে এসেছে সেজেগুজে, তাদের বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখে মা বল্লেন, "এরা কেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখ দেখি, আর তোরা সব যেন বৃষকাষ্ঠ!" তারপর আমাকে কিছুদিন নিজে খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমার একমাথা ঘোমটার ভিতর দিয়ে তাঁর সেই সুন্দর চাঁপার কলির মত হাত দিয়ে ভাত খাওয়াতেন। আমার কেবল মনে হত মা কতক্ষণে উঠে যাবেন আর আমি দালানে গিয়ে বমি করব।'[১৩]

পুত্রবধূদের প্রতি এই স্নেহ, পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের প্রতিও সমভাবেই বিস্তৃত ছিল, তার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব। মমতাময়ী গৃহকর্তীর চিত্রটি সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন ঠাকুরপরিবারের এক দুর্ভাগিনী গৃহবধূ বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবী : 'শ্বাশুড়ীর মত শ্বাশুড়ী পাইয়াছিলাম। তাঁর মত সৌভাগ্যবতী, পতিভক্তি পরায়ণা স্ত্রীলোক এখনকার দিনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।...ধর্মে মতি তাঁর যথেষ্ট ছিল। কেহ যদি তাঁহার সাক্ষাতে পুত্রকন্যাদের প্রশংসা করিত, তখনই তিনি মাথা নত করিয়া থাকিতেন, পাছে তাঁর মনে অহঙ্কার আসে। ...অত বড় বৃহৎ পরিবারের সমস্ত সংসারের ভার তাঁহারই উপর ছিল, তিনি প্রত্যেককে সমানভাবে আদর যত্নে অতি নিপুণ ভাবে সকলের অভাব দুঃখ, দূর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও কোনও বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া মনে ব্যথা দিবার কখনও চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার মনটি শিশুর মত কোমল ছিল। এত বড় লোকের পুত্রবধূ এবং গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মনে কোনরকম জাঁক, বা বিলাসিতার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। যতদূর সম্ভব সাদাসিধে ধরণের সাজ পোষাক করিতেন, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিত।'[১৪]

দেবেন্দ্রনাথও পত্নীকে সংসারে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর এস্টেটে সারদা দেবীর নামে তিনি একটি 'ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট' সৃষ্টি করেছিলেন ২৪,৭০০ টাকা দিয়ে এবং তাঁর সমস্ত উপস্বত্ব সারদা দেবীই ভোগ করতেন। এর উপরে ব্যক্তিগত মাসোহারা ছাড়াও কন্যা ও জামাতাদের মাসোহারাও 'সারদাসুন্দরী দেবী খাতে' প্রদত্ত হত। সেই সুদূরকালেও দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার গুরুত্ব এবং টাকার জন্য তাঁর উপর নির্ভর করার ফলে অন্তত কন্যা ও জামাতাদের সারদা দেবীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আদায় করে দেবে।

তাঁর মৃত্যু হয় ২৭ ফাল্গুন ১২৮১ [বুধ 11 Mar 1875] তারিখে রাত্রি ৩-৪৫ মিনিটে আনুমানিক ৪৯ বৎসর বয়সে। রবীন্দ্রজীবনের অনুষঙ্গে তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু জানার সুযোগ আমাদের হবে, সুতরাং বর্তমান আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি।

উল্লেখপঞ্জি

১ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : পুরাতনী [১৩৬৪]। ১৯

২ আত্মজীবনী। ৬৮

৩ রবীন্দ্র-কথা। ৪০

৪ সৌদামিনী দেবী : 'পিতৃস্মৃতি', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [১৩৭৫]। ১৫২

৫ ঐ। ১৫১

৬ পুরাতনী। ২১-২২

৭ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : জীবনকথা, *এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৯৯। ১৩

৮ 'পিতৃস্মৃতি'। ১৫৮-৫৯

৯ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস [1915] 18

১০ 'পিতৃস্মৃতি'। ১৫৪

১১ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ১৫

১২ দ্র সরলা দেবী চৌধুরানী : জীবনের ঝরাপাতা [১৩৮২]। ৫

১৩ পুরাতনী। ১৯-২১

১৪ প্রফুল্লময়ী দেবী : আমাদের কথা', *প্রবাসী*, বৈশাখ ১৩৩৭। ১১৩-১৪; অপিচ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ [1972]। ২২-২৩

---

*[১] ব্যোমকেশ মুস্তফী সারদা দেবীর একটি অতিরিক্ত নামের উল্লেখ করেছেন : 'শাকম্ভরী', দ্র বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ৩৫৫; খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রকথা [১৩৪৯] গ্রন্থেও এই নামটির উল্লেখ আছে।

*[২] দ্বারকানাথের নূতন গৃহপ্রবেশের বর্ণনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের কোনো বিবরণ বা সঠিক তারিখ আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। এ-সম্পর্কে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : '...আমাদের প্রপিতামহ ঁমদনমোহন চট্টোপাধ্যায় [দ্বারকানাথের দিদি রাসবিলাসী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র]...নিজের উপার্জ্জনের যে স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতেন তাহাতে দেখা যায় লৌকিকতা হিসাবে মাতাঠাকুরাণীকে দেবেন্দ্রের বধূকে আশীর্ব্বাদের যৌতুক দেন (২৪ ফাল্গুন ১২৪০ ইং ১৮৩৪) [বৃহ 6 Mar] পরে ৫ই আষাঢ় ১২৪২ (ইং ১৮৩৫ ২৯শে জুন) [বৃহ 18 Jun] দেবেন্দ্রের বধূর গর্ভাধান উৎসবে আশীর্ব্বাদী দেওয়া হয় এবং তাহার পরে ৫ই আশ্বিন ১২৪৫ (ইং ১৮৩৮ সেপ্টেম্বর) [বৃহ 20 Sep] দেবেন্দ্রর বধূর সাধের জন্য মিঠাই খরিদ হয়। নয়মাসে সাধ দেওয়া ঠাকুরবংশের কুলপ্রথা। ইহার দুই মাসের মধ্যে সারদাদেবীর প্রথম সন্তানের (কন্যার) জন্ম হয়।' —রবীন্দ্রকথা। ৪ [তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সংযোজন বা সংশোধন লেখককৃত]।

*[৩] সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধে [*প্রবাসী,* ফাল্গুন ১৩১৮। ৪৬৩; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৫৩] ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা'য় [পুরাতনী। ১৯] বিবাহের সময় সারদা দেবীর বয়স 'ছয় বৎসর' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

* '১৭১৮ শক [১২৬৬] হইতে তাঁহার বাড়ীতে দুর্গোৎসব বন্ধ হইয়াছে।'—রাজনারায়ণ বসু : 'দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ, উপাসনা ও দীক্ষাপদ্ধতি', *প্রবাসী,* মাঘ ১৩৩৪। ৪৬৫

চতুর্থ অধ্যায়

গিরীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ

দ্বারকানাথের পাঁচ পুত্রের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ সংসার-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে রেখে-মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে 24 Oct 1858 তারিখে পরলোকগমন করেন। ঘটনাচক্রে ত্রিপুরাসুন্দরীও মূল পরিবার থেকে দূরে বাস করতে থাকেন, সুতরাং কয়েকটি মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়া ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ কোনো স্থান নেই। গিরীন্দ্রনাথও মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে 19 Dec 1854 [মঙ্গল ৫ পৌষ ১২৬১] তারিখে মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী যোগমায়া দেবী, দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ এবং দুই কন্যা কাদম্বিনী ও কুমুদিনীকে রেখে যান। সম্ভবত 1859-এ গৃহদেবতার নিত্যপূজা ও অন্যান্য কয়েকটি বৈষয়িক কারণে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের মনোমালিন্য হয়, ফলে দ্বারকানাথের উইল অনুযায়ী বৈঠকখানা বাড়ি [৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন] তাঁদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে এবং দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ভদ্রাসন বাড়িতে [৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন] উঠে আসেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার বলতে এই দুটি পরিবারকেই বোঝায়। যদিও চিরকাল ছেলেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়। আনুষ্ঠানিক দিক দিয়েও দুটি পরিবারের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। গিরীন্দ্রনাথের পরিবার দোল-দুর্গোৎসব ইত্যাদি সমস্ত হিন্দু পৌত্তলিক আচার আচরণকে অনুসরণ করেছে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে পৌত্তলিকতার অংশ সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছিল।

গণেন্দ্রনাথের জন্ম হয় 1841-এ। হিন্দু স্কুলের ছাত্র হিসেবে ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি 1857-এ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর বিবাহ হয় 7 Feb 1858 তারিখে স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে ১৭ বৎসর বয়সে। পিতার বৈষয়িক বুদ্ধির সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার তিনি লাভ করেছিলেন, এসব ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে তাঁর উপর নির্ভর করতেন। তাছাড়া সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস-চর্চা, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ও সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ [রবি 16 May 1869] তারিখে কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। অকালে একটি পুত্রসন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁর আর কোনো সন্তানাদি হয়নি।

গিরীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠ কন্যা কাদম্বিনী দেবীর বিবাহ হয় যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এঁদের প্রথম পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশ রবীন্দ্রজীবনীতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী; ইনিই প্রথম তাঁকে

‘পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি’ বুঝিয়ে কবিতা-রচনায় দীক্ষা দেন। কাদম্বিনী দেবীর অপর পুত্র ইন্দুপ্রকাশ এবং দুই কন্যা নৃপবালা ও ধীরবালা।

গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা কুমুদিনীর বিবাহ হয় নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নীলকমলের এক ভ্রাতা যদুনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেজদিদি শরৎকুমারীর বিবাহ হয়। ‘নবনাটক’-এর [1866] অভিনয়ে নীলকমল নটের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এঁর একমাত্র পুত্র নীরদনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন।

কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথের জন্ম 1847-এ, মৃত্যু ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ [শুক্র 3 Jun 1881] তারিখে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে [‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৩২ বলে উল্লিখিত হয়েছে।] সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় সম্ভবত ১২৭০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে [Jan 1864]। এঁদের চারটি পুত্র ও দুটি কন্যা। পুত্র গগনেন্দ্রনাথ [1867-1938], সমরেন্দ্রনাথ [1870-1951], অবনীন্দ্রনাথ [1871-1951] ও কুমারেন্দ্রনাথ [‘র‍্যাট’—শিশুবয়সেই মারা যায়] এবং কন্যা বিনয়িনী [?-1924] ও সুনয়নী [1875-1962]। বিনয়িনীর স্বামী শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এঁদেরই দ্বিতীয়া কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে পরে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সুনয়নীর বিবাহ হয়েছিল রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, চিত্রশিল্পের জগতে তিনি স্মরণীয়া। এঁদেরই এক কন্যা বীণাপাণির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘সকল গানের ভাণ্ডারী’ দিনেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়েছিল প্রথম পক্ষে।

পাঠকের অবগতির জন্য গিরীন্দ্রনাথ থেকে চার পুরুষের একটি বংশলতিকা প্রদত্ত হল [রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে যুক্ত নামগুলিই সাধারণত গ্রহণ করা হয়েছে] :

১. গণেন্দ্রনাথ [1841-16.5.1869]
=স্বর্ণকুমারী দেবী

২. কাদম্বিনী দেবী
=যজ্ঞেশপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
জ্যোতিঃপ্রকাশ
নৃপবালা
=হরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ধীরবালা
=অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
ইন্দুপ্রকাশ
যামিনীপ্রকাশ
জীনপ্রকাশ
অমৃতনাথ
প্রমথনাথ
সরোজিনী
=হিতেন্দ্রনাথ
অমরনাথ
ক্ষিতিনাথ
রমণীনাথ
সলিলা
অনিলনাথ
অলকা
=ঋতেন্দ্রনাথ

৩. কুমুদিনী দেবী
=নীলকমল মুখোপাধ্যায়
নীরদনাথ=কিরণবালা
নরনাথ
নীরজা
সুরজা
মনোরমা
শান্তিলতা
নীলানাথ
=প্রতিমা দেবী
স্নেহলতা

৪. গুণেন্দ্রনাথ [1847-3.6.1881]
=সৌদামিনী দেবী [? -19.8.1911]
ক. গগনেন্দ্রনাথ
খ. সমরেন্দ্রনাথ
গ. অবনীন্দ্রনাথ
ঘ. বিনয়িনী
ঙ. সুনয়নী
চ. কুমারেন্দ্র [র‍্যাট]

৪ক. গগনেন্দ্রনাথ=প্রমোদকুমারী
গেহেন্দ্র
কনকেন্দ্র
সুনন্দিনী
পূর্ণিমা
নবেন্দ্র
সুজাতা
পুরীন্দ্র
ভোম্বল

৪খ. সমরেন্দ্রনাথ-নিশিবালা
সমীরেন্দ্র
সুরীন্দ্র
মাধবিকা
মালবিকা
সুপ্রিয়া
কমলা
ব্রতীন্দ্র
অণিমা
জয়ীন্দ্র

[চিত্রা দেব-সংকলিত ‘ঠাকুরবাড়ির বংশলতিকা’ অবলম্বনে]

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

দেবেন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ

দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ছিল আরো বড়ো। পুত্র-কন্যা মিলিয়ে তাঁর সন্তান-সংখ্যা পনেরোটি—তার মধ্যে নটি পুত্র ও ছটি কন্যা—এঁদের মধ্যে প্রথম সন্তান একটি কন্যা 1838-এ জন্মের পরেই মারা যায়।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম ২৯ ফাল্গুন ১৭৬১ শক [১২৪৬ : বুধ 11 Mar 1840]। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নোটবুকে [Ms. 364] দ্বিজেন্দ্রনাথের রাশিচক্রটি এইভাবে পাওয়া যায় :
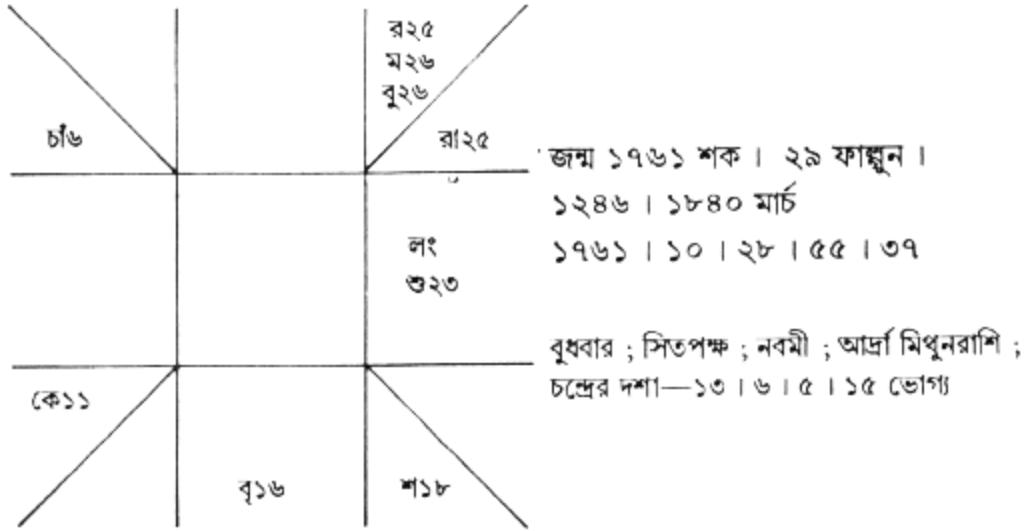
দ্বিজেন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা প্রধানত বাড়িতেই হয়। পরে সেন্ট পল'স স্কুলে দু-বছর পড়ে স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু এক বছর পরেই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। 6 Feb 1858 শনিবারে যশোহর নরেন্দ্রপুর-নিবাসী তারাচাঁদ চক্রবর্তীর কন্যা সর্বসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অল্প বয়সে তাঁর প্রধান ঝোঁক ছিল কাব্য-রচনায় ও চিত্রাঙ্কনে। এই আগ্রহের ফল কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের পদ্যানুবাদ [1860]। কিন্তু এর পরে তিনি ক্রমশ দুরূহ তত্ত্ববিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' [1875] রূপক-কাব্য বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য কীর্তি। বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী, অথচ যথেষ্ট নিষ্ঠার অভাব—এর ফলে বাংলা দেশ ও সাহিত্য তাঁর কাছে যা পেতে পারত, তার অনেকটাই অপ্রাপ্ত থেকে গেছে।

আর যেটুকু দিয়েছেন, তারও বেশির ভাগ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে—পুস্তকাকারে সেগুলিকে সংকলন করার প্রয়াস খুবই যৎসামান্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথ নটি সন্তানের জনক—এদের মধ্যে দুটি পুত্রসন্তানের মৃত্যু হয় জন্মের অব্যবহিত পরেই। অপর সাতটি সন্তানের মধ্যে পাঁচটি পুত্র—দ্বিপেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও কৃতীন্দ্রনাথ এবং দুই কন্যা সরোজা ও ঊষা। একটি মৃত পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে প্রসব-জনিত অসুস্থতায় সর্বসুন্দরী দেবী মাত্র একত্রিশ বৎসর বয়সে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি [Jun 1878] পরলোকগমন করেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন আটত্রিশ বৎসর। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ৪ মাঘ ১৩৩২ [সোম 18 Jan 1926] ছিয়াশি বৎসর বয়সে।

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৯ [বুধ 1 Jun 1842] তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রাশিচক্রটি পূর্বোক্ত নোটবুক থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :
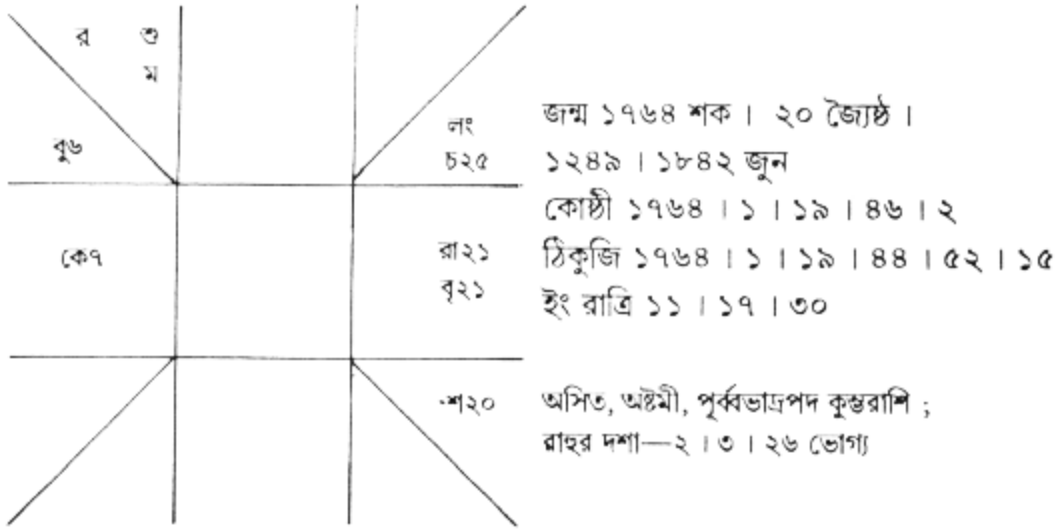
প্রথমে হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগে ও পরে সেন্ট পল্‌'স স্কুলে কিছু দিন পড়ে Apr 1957-এ সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও এক বৎসরের জন্য বর্ধমানরাজ-প্রদত্ত সিনিয়র স্কলারশিপ মাসিক দশ টাকা হিসেবে পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সম্ভবত ১২৬৬ বঙ্গাব্দের [1857] অগ্রহায়ণ মাসে যশোহরের নরেন্দ্রপুর গ্রামনিবাসী অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ও নিস্তারিণী দেবীর কন্যা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর [জন্ম ১২ শ্রাবণ ১২৫৭। শুক্র 26 Jul 1850 —'১৭৭২। ৩।১১। ৪। ৩'] সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিস্তারে এই দম্পতির অবদান অসামান্য, সভাসমিতি-স্থাপন প্রভৃতি প্রচারের ঢক্কানিনাদ ছাড়াই কেবল ব্যক্তিগত আচার-আচরণেই তাঁরা এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্য 23 Mar 1862 তারিখে বিলাত যাত্রা করেন ও প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. হিসেবে বোম্বাই প্রদেশকে তাঁর কর্মক্ষেত্র-রূপে বেছে নেন। তাঁর মৃত্যু হয় ২৪ পৌষ ১৩২৯ [9 Jan 1923] তারিখে ৮২ বৎসর বয়সে।

1868-এ একটি পুত্রসন্তানের জন্মের পরেই মৃত্যু হবার পর দ্বিতীয় পুত্র [জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবেই পরিচিত] সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় পুনায় ১২ শ্রাবণ ১২৭৯ [26 Jul 1872] তারিখে [মৃত্যু : ২০ বৈশাখ ১৩৪৭ শুক্র 3

May 1940]। একমাত্র কন্যা ইন্দিরা দেবীর জন্ম বিজাপুরের অন্তর্গত কালাদ্‌গিতে ১৫ পৌষ ১২৮০ [29 Dec 1873]; তাঁর মৃত্যু হয় ২৭ শ্রাবণ ১৩৬৭ [শুক্র 12 Aug 1960] তারিখে। অপর পুত্র কবীন্দ্রনাথের [? 1876-78] জন্ম হয় সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুরে। আর একটি পুত্রের জন্ম হয় 1877-এ ইংলন্ডে, কিন্তু জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী উভয়েই রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ৮ মাঘ ১২৫০ [শনি 20 Jan 1844] তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া ও ব্যায়ামের দিকে তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাড়িতে শিক্ষক রেখে তিনি ফরাসি ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। অন্তঃপুরে ও বালকদের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্মৃতিকথায় তাঁর এই আগ্রহের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ১১ অগ্রহায়ণ ১২৭০ [বৃহ 26 Nov 1863] তারিখে সাঁতরাগাছি-নিবাসী হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা নীপময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর তিন পুত্র ও আট কন্যা; পুত্রদের নাম—হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ এবং কন্যাদের নাম প্রতিভা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞা, মনীষা, শোভনা, সুনৃতা, সুষমা ও সুদক্ষিণা। প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবীকে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা ও সংগীতে অসামান্য পারদর্শী করে তুলেছিলেন। অন্যান্য সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হননি, মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ [বৃহ 12 Jun 1884] তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২৭ কার্তিক ১২৫২ [মঙ্গল 11 Nov 1845] তারিখে। তিনি বেঙ্গল অ্যাকাডেমি থেকে 1866-এ দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। এর পূর্বেই ৮ ফাল্গুন ১২৭২ [18 Feb 1866] তারিখে হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা প্রফুল্লময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে 1868-এর মাঝামাঝি সময়ে তিনি উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর একমাত্র পুত্র বলেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২১ কার্তিক ১২৭৭ [6 Nov 1870] তারিখে। ২২ মাঘ ১৩০২ [4 Feb 1896] তাঁর বিবাহ হয় সাহানা দেবীর সঙ্গে। কিন্তু মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ৩ ভাদ্র ১৩০৬ [19 Aug 1899] তাঁর মৃত্যু হয়। বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ২৭ বৈশাখ ১৩২২ [10 May 1915]-এ ৭০ বৎসর বয়সে।

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা [অল্পায়ু প্রথমা কন্যাকে সাধারণত গণ্য করা হয় না] সৌদামিনী দেবীর জন্ম 1847-এ। বেথুন স্কুলের বর্তমান গৃহ নির্মিত হলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পরীক্ষামূলকভাবে ওই স্কুলে প্রেরণ করেন।* তাঁর বিবাহ হয় সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্ভবত ১২৬৩ বঙ্গাব্দে [1856]।† তাঁদের প্রথম সন্তান একমাত্র পুত্র সত্যপ্রসাদের জন্ম হয় ৩১ আশ্বিন ১২৬৬ [রবি 16 Oct 1859]; মৃত্যু : ১ বৈশাখ ১৩৪০ [শুক্র 14 Apr 1933] ভোর ৫-২০ মিঃ। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় দু-বছরের বড়ো হলেও বিদ্যালয়ে সত্যপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। সৌদামিনী দেবীর আরও দুটি কন্যা হয়—ইরাবতী [1862—1918] ও ইন্দুমতী [?] ইরাবতী বা ইরু রবীন্দ্রনাথের বাল্য-সঙ্গিনী ছিলেন, জীবনস্মৃতি ও অন্যান্য কয়েকটি রচনায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায়। সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হয় রবীন্দ্রনাথের বিবাহের দিন ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০ [9 Dec 1883]

তারিখে রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে। সৌদামিনী দেবীর মৃত্যুর তারিখ ৩০ শ্রাবণ ১৩২৭ [রবি 15 Aug 1920] রাত্রি ৪-১৫ মিঃ, তাঁর বয়স তখন ৭৩ বৎসর।

রবীন্দ্রনাথের নতুন-দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম ২২ বৈশাখ ১২৫৬ [বৃহ 4 May 1849] তারিখে। তাঁর রাশিচক্রটি এইরূপ :
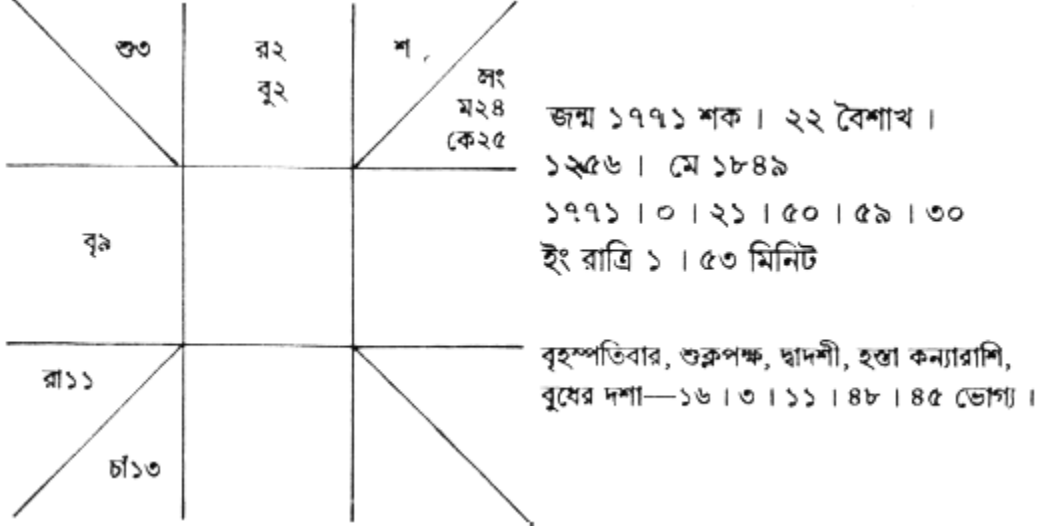
গৃহ অবস্থিত চণ্ডীমণ্ডপে গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়ার পর সেন্ট পল্’স্ স্কুল, মন্টেগু’স্ অ্যাকাডেমি ও হিন্দু স্কুলে পড়াশোনা করে কেশবচন্দ্র সেন-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা কলেজ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 1864-এ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন পড়ার পর তিনি ছাত্রজীবন শেষ করেন। ২৩ আষাঢ় ১২৭৫ [5 Jul 1868] তারিখে ১৯ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে। প্রায় ষোলো বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করার পর ১২৯১ বঙ্গাব্দে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। রবীন্দ্রমানস-গঠনে এই দুজনের অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। চিত্রবিদ্যা, সংগীত, নাটকাদি রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভার স্বাক্ষর দেখা যায়। সংস্কৃত, মারাঠি ও ফরাসি ভাষা থেকে নাটক, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি অনুবাদেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ৭৬ বৎসর বয়সে রাঁচিতে ২০ ফাল্গুন ১৩৩১ [4 Mar 1925] তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের অষ্টম সন্তান সুকুমারী দেবী [? 1850-64] দীর্ঘ জীবন লাভ করেননি। ১২ শ্রাবণ ১২৬৮ [শুক্র 26 Jul 1861] হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত অপৌত্তলিক ‘অনুষ্ঠান পদ্ধতি’ অনুসারে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম-মতানুযায়ী এইটিই প্রথম সামাজিক অনুষ্ঠান। জ্যৈষ্ঠ ১২৭১-এর [May 1864] প্রথম দিকে সুকুমারী দেবীর একমাত্র সন্তান অশোকনাথের জন্ম হয়। সম্ভবত প্রসবজনিত পীড়ায় ওই মাসেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও অপৌত্তলিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য, হেমেন্দ্রনাথ অন্যান্যদের মতো ঘরজামাই ছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথের নবম সন্তান পুণ্যেন্দ্রনাথ [? 1851-57] শিশু বয়সেই মারা যান। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, পুকুরের জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়।*

তৃতীয়া কন্যা শরৎকুমারী দেবীর [1854-1920] বিবাহ হয় গণেন্দ্রনাথের ভগিনীপতি নীলকমল মুখখাপাধ্যায়ের ভ্রাতা যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩-এ [Jun 1866]। ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন জনের স্মৃতিকথায় শরৎকুমারী প্রসাধন-প্রিয় রূপে চিত্রিত হয়েছেন। তাঁর চারটি কন্যা—সুশীলা, সুপ্রভা, স্বয়প্রভা ও চিরপ্রভা এবং দুটি পুত্র—যশঃপ্রকাশ ও জ্ঞানপ্রকাশ। ১০ আষাঢ় ১৩২৭ [24 Jum 1920] ৬৬ বৎসর বয়সে শরৎকুমারী দেবীর মৃত্যু হয়।

চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলার মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। তাঁর জন্ম হয় ১৪ ভাদ্র ১২৬৩ [বৃহ 28 Aug 1856] তারিখে [দ্র ড পশুপতি শাশমল : স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য (১৩৭৮)। ২৬] কোনো বিদ্যালয়ে না পড়েও আন্তরিক আগ্রহে কিভাবে নিজেকে স্বয়ংশিক্ষিত করে তোলা যায়, স্বর্ণকুমারীর জীবন তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য এব্যাপারে তাঁর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের [1840-1913] কৃতিত্ব অনেকখানি, যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ২ অগ্রহায়ণ ১২৭৪ [17 Nov 1867] তারিখে, স্বর্ণকুমারীর বয়স তখন এগারো বৎসর মাত্র। তাঁর তিনটি কন্যা—হিরন্ময়ী [1868-1925], সরলা [1872-1945] ও ঊর্মিলা [1874-79] এবং একটি পুত্র—জ্যোৎস্নানাথ [1870-1962]। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯ আষাঢ় ১৩৩৯ [3 Jul 1932] তারিখে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

কনিষ্ঠা কন্যা বর্ণকুমারী দেবী [? 1857†-1948] রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯ কার্তিক ১২৭৬ [3 Nov 1869] তারিখে। তাঁদের দুটি পুত্রসন্তান হয়—সরোজনাথ ও প্রমোদনাথ। সতীশচন্দ্র পরে দেবেন্দ্রনাথের ব্যয়ে স্কটল্যান্ডের অ্যাবারডিন থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আসেন।

রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত অগ্রজ দেবেন্দ্রনাথের সপ্তম পুত্র সোমেন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ২৯ ভাদ্র ১২৬৬ [মঙ্গল 13 Sep 1859]। প্রায় দু-বছরের বড়ো হলেও ইনি রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং বাল্য ও কৈশোরে অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। সংগীতে এঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, সংগীতরচনা ও অন্যান্য গুণও তাঁর কিছু কিছু ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার ইনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' [1878] প্রকাশের ব্যাপারে এঁর হাত ছিল, আর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বনফুল' [1880] 'দাদা সোমেন্দ্রনাথের অন্ধপক্ষপাতের উৎসাহে'ই মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু ১২৮৫ বঙ্গাব্দের শেষাশেষি [Feb-Mar 1879] তাঁর মধ্যে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যদিও তা কখনই বীরেন্দ্রনাথের মতো আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। এই কারণেই তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়নি, দেবেন্দ্রনাথের উইলে আজীবন মাসোহারার বিনিময়ে সম্পত্তির অধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। ৬২ বৎসর বয়সে ১৬ মাঘ ১৩২৮ 30 Jan 1922*] তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র রবীন্দ্রনাথ [1861-1941]। তাঁর সঙ্গে ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০ [রবি 9 Dec 1883] তারিখে যশোহরের ফুলতলি গ্রামের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর দশমবর্ষীয় কন্যা ভবতারিণী [মৃণালিনী] দেবীর [জন্ম : ১৮ ফাল্গুন ১২৮০ রবি 1 Mar 1874] বিবাহ হয়। মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ [রবি 23 Nov 1902] তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁদের তিনটি কন্যা—মাধুরীলতা [1886-1918], রেণুকা [1891-1903] ও মীরা [1894-1969] এবং দুটি পুত্র রথীন্দ্রনাথ [1888-1961] ও শমীন্দ্রনাথ [1896-1907]। সন্তানদের মধ্যে কেবল রথীন্দ্রনাথ ও মীরা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে বর্তমান ছিলেন। রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় প্রতিমা দেবীর [1893-1969] সঙ্গে, তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। মীরা দেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথ অল্পায়ু

ছিলেন এবং কন্যা নন্দিতা দেবীরও সন্তানাদি হয়নি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বংশধারা এখন লুপ্ত বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পরেও দেবেন্দ্রনাথের বুধেন্দ্রনাথ [1863-64] নামে একটি পুত্র হয়, কিন্তু নিতান্ত শৈশবেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে রবীন্দ্রনাথকেই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়, আমরাও দুই একটি ক্ষেত্র বাদে সেইভাবেই বর্ণনা করব।

দেবেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে উপরে বর্ণিত অনেকেরই বিস্তৃত জীবন-কথা রবীন্দ্রনাথের জীবনীর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক; কিন্তু পরে তাঁর জীবন-বৃত্তান্তের অঙ্গীভূত করেই এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে এক্ষেত্রে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

দেবেন্দ্রনাথের বংশতালিকাটি সুবৃহৎ হলেও পাঠকের সুবিধার্থে তাঁর থেকে তৃতীয় পুরুষ [কোনো কোনো ক্ষেত্রে চতুর্থ পুরুষ] পর্যন্ত সংকলন করে দিচ্ছি :

দেবেন্দ্রনাথের বংশলতিকা
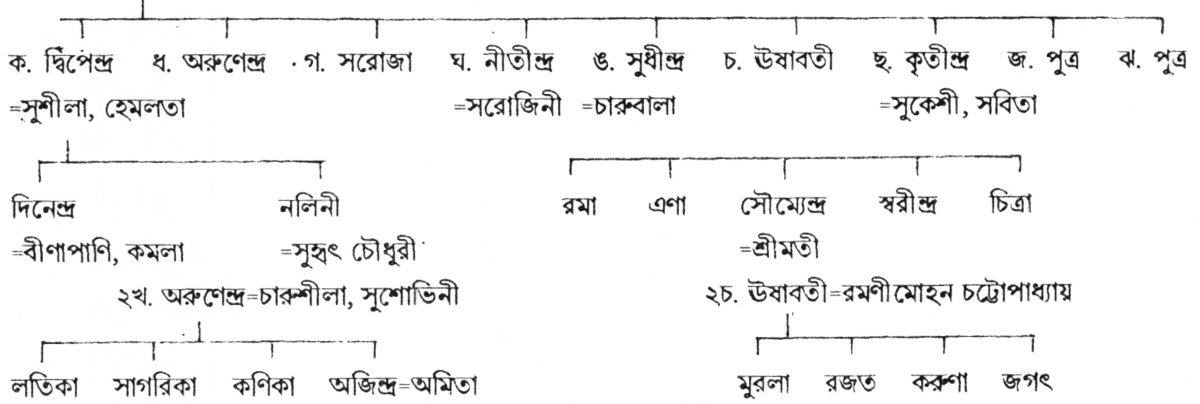
৪. হেমেন্দ্রনাথ=নীপময়ী

—প্রতিভা-আশুতোষ চৌধুরী

—হিতেন্দ্র-সরোজিনী]—গায়ত্রী, মেধা, হৃদীন্দ্র=অমিয়া

—ক্ষিতীন্দ্র-ধৃতিময়ী, সুহাসিনী]—গার্গী, বাণী, ক্ষেমেন্দ্র=মেনকা

—ঋতেন্দ্র-অলকা]—ঋদ্ধিন্দ্র, সুভগেন্দ্র [সুভো], সিদ্ধেন্দ্র, বাসবেন্দ্র

—প্রজ্ঞা=লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া

—অভিজ্ঞা

=দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

—মনীষা

—শোভনা=নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

—সুনৃতা=নন্দলাল ঘোষাল

—সুষমা=যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

—সুদক্ষিণা=পণ্ডিত জওলাপ্রসাদ
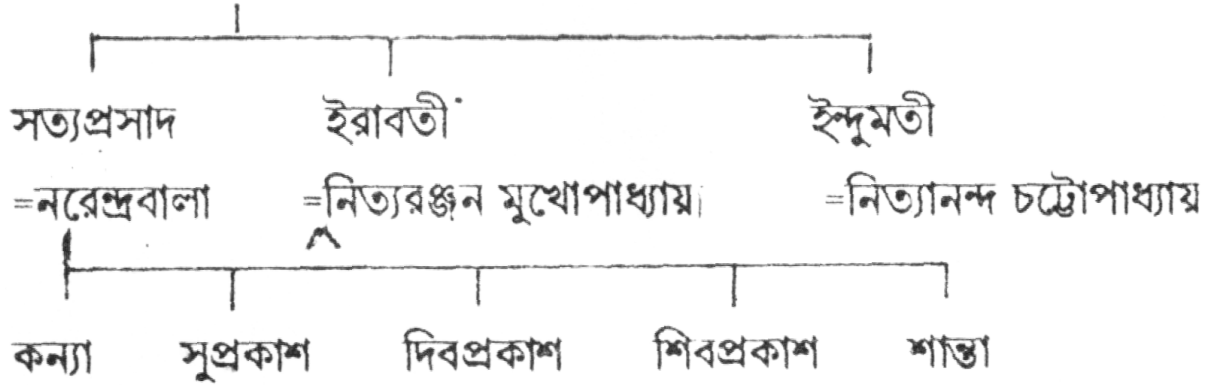
৭. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ=কাদম্বরী

৮. সুকুমারী=হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অশোকনাথ

৯. পুণ্যেন্দ্রনাথ
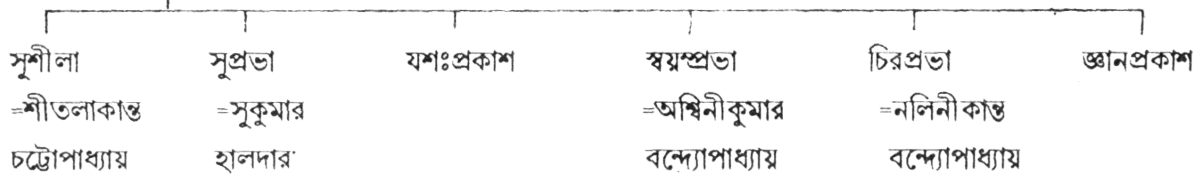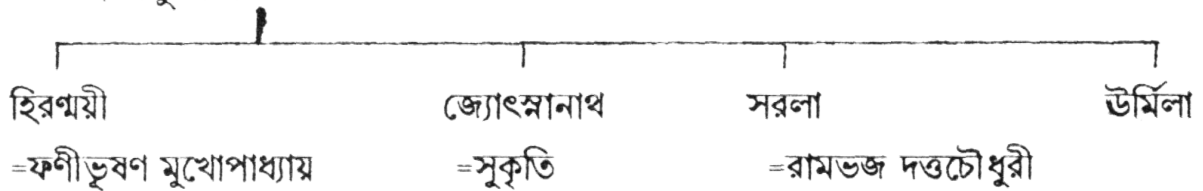
১২. বর্ণকুমারী=সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সরোজনাথ প্রমোদনাথ
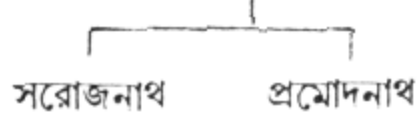
১৩. সোমেন্দ্রনাথ
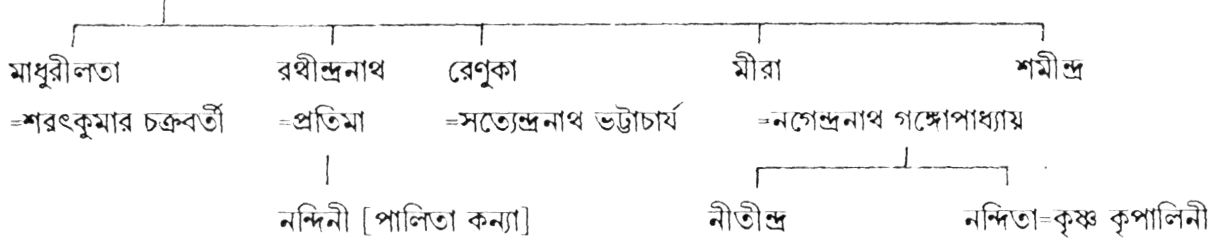
১৫. বুধেন্দ্রনাথ

[চিত্রা দেব-সংকলিত 'ঠাকুরবাড়ির বংশতালিকা' অবলম্বনে]

---

* 'আমরা কোন বিশেষ বিশ্বাসি বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম যে দেশ হিতৈষি সুবিখ্যাত মান্যবর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনরবিল মেং বেথুন সাহেবের স্থাপিত "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে" আপনার কন্যা ও ভ্রাতৃ কন্যাকে [? কুমুদিনী দেবী] বিদ্যানুশীলনার্থ প্রেরণ করিবেন এমত কল্পনা স্থির করিয়াছেন এবং বেথুন সাহেবের নিকট স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হইয়াছে।'—সংবাদ প্রভাকর, ২৪ আষাঢ় ১২৫৮; বিনয় ঘোষ-সম্পাদিত সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২ [১৩৮৫]। ৫৩; লক্ষণীয় দেবেন্দ্রনাথের আর কোনো কন্যা বিদ্যালয়ে প্রেরিত হননি।

† দেবেন্দ্রনাথ অমৃতসর থেকে ২৪ ফাল্গুন ১৭৭৮ শক [শুক্র 6 Mar 1857] রাজনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে লিখেছেন : '...আমার জামাতা সারদাপ্রসাদ এই ক্ষণে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। প্রথম প্রথম তাঁহার বাবুগিরির প্রবল ইচ্ছা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পরে দ্বিজেন্দ্র আমাকে আর এক পত্রে লিখিয়াছেন যে "মহাশয়কে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে উত্তম পোষাক পরিধান করিতে সারদাপ্রসাদের বড় ইচ্ছা কিন্তু এইক্ষণে আমারদিগের সঙ্গে সহবাস করাতে সে ইচ্ছা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।"—পত্রাবলী। ৬২; দেবেন্দ্রনাথ ১৯ আশ্বিন ১৭৭৮ শক [শুক্র 3Oct 1856] তারিখে কলকাতা ত্যাগ করে নৌকাপথে কাশী যাত্রা করেন, দ্র আত্মজীবনী। ১৭৫; এর থেকে অনুমান করা যায়, আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ দিয়ে আশ্বিনে পূজার সময়ে তিনি পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করেন।

* দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ১4; প্রভাতকুমার নামটি 'পূর্ণেন্দ্রনাথ' লিখেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি-তে প্রদত্ত বংশতালিকায় 'পুণ্যেন্দ্রনাথ' নাম পাওয়া যায়।

† বর্ণকুমারী দেবীর জন্মসালটি জীবনস্মৃতি-তে প্রদত্ত বংশতালিকায় এবং অন্যত্র 1858-রূপে উল্লিখিত হয়, কিন্তু এটি সম্পর্কে সংশয়ের কারণ আছে। দেবেন্দ্রনাথ ১৯ আশ্বিন ১২৬৩ [3 Oct 1856] তারিখে কলকাতা ত্যাগ করে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন এবং সিপাহি বিদ্রোহের দুর্যোগের মধ্যে ১ অগ্রহায়ণ ১৭৮০ শক [১২৬৫; সোম 15 Nov 1858] তারিখে বাড়ি ফিরে আসেন। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই 1858-এ বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হতে পারে না। এই কারণেই মনে হয় 1857-এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

* সোমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দশম দিবসে ২৬ মাঘ ১৩২৮ তারিখে ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রাদ্ধ করেন। দ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৪৩ শক [১৩২৮]। ২৮৯-৯০

[ক্রোড়পত্র; পৃ ২৮]

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেশ কাল ও পারিবারিক পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। বাংলাদেশে ইংরেজ-শাসনের শতবর্ষ-পূর্তি ঘটেছে মাত্র চার বছর আগে 1857-এ। আর ঐ বছরেই সিপাহি বিদ্রোহের নিষ্ফল প্রয়াসের পরিণামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে 1858-এ বাংলা তথা ভারতের শাসনভার এসেছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর প্রায় পঞ্চাশ বছরের সুনিয়ন্ত্রিত ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের অন্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হল 24 Jan 1857 [শনি ১২ মাঘ ১২৬৩] তারিখে। মেয়েদের জন্য বেথুন সাহেব স্কুল স্থাপন করেছেন 7 May 1849 [সোম ২৬ বৈশাখ ১২৫৬]। 1851-এ ইংরেজ-শাসকদের সঙ্গে দর-কষাকষির প্রয়োজনে স্থাপিত হয়েছে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। 1856-এ বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হল। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা তার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করে 1859-এ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, আর কেশবচন্দ্র সেনের যোগদানের ফলে ব্রাহ্মসমাজ শুধু ব্রহ্মোপাসনা ও উপনিষদ-চর্চার কেন্দ্র না থেকে একটা প্রবল ধর্মান্দোলনের সূচনা করেছে। অপর দিকে বিদ্যাসাগর-রচিত বিভিন্ন বাংলা গদ্যগ্রন্থ, প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল, রামনারায়ণ তর্করত্ন-মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাটক, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদনের নূতন ধরনের কাব্য বাংলা সাহিত্যের জগতেও বিরাট পরিবর্তন এনেছে। ইংরেজ-সাহচর্যে ও ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে লব্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক জীবনদৃষ্টি আমাদের মধ্যযুগীয় স্রোতোহীন জীবনধারায় যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, নানা দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্য দিয়ে তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এক বিমিশ্র সংস্কৃতির জন্মদান করল দ্বিতীয়ার্ধে। বাঙালীর মানসভূমি উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর ইংরেজি সাহিত্যের ভাবরসে সিক্ত হয়ে বিদেশী চিন্তা-পদ্ধতির কর্ষণযন্ত্রে কর্ষিত হয়েছে, এইবার এল তাতে বীজ বপন করে ফসল ফলানোর পালা। অর্থাৎ, রাজনীতি শিক্ষা সমাজ ধর্ম ও সাহিত্য—মানব-সভ্যতার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ তখন এক নূতন সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে।

অপর দিকে, রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশটিও তখন এক সন্ধিক্ষণে। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠা থেকে যদি ঠাকুরগোষ্ঠীর আভিজাত্যের সূচনা ধরা হয়, তা হলে রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে তা প্রায় শতবার্ষিকী মুখে। এই শতবর্ষ ধরে সরকারী চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে ঠাকুরগোষ্ঠী ক্রমশই সম্পদ, সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠার পর সেই সম্মান ও প্রতিপত্তির হ্রাস তো হয়-ই নি, বরং দ্বারকানাথের আমলে তা চরমতম সীমা স্পর্শ করে। কিন্তু দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পনেরো বছর আগে, সেই যুগ অবসিত হয়েছে। যে ঐশ্বর্যচ্ছটায়

একদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি দীপ্যমান হয়ে ছিল, তা ক্রমশই ম্লান হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় এই পরিবার সম্পূর্ণরূপেই জমিদারী-নির্ভর এক উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ধনগরিমার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের পুরোনো আচার অনুষ্ঠান ধর্মকর্মও অন্তর্হিত হয়েছে। দ্বারকানাথ রামমোহন ও ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হলেও পারিবারিক পূজাপার্বণ সবই নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণের পর থেকে পরিবারের পৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি আস্তে আস্তে তুলে দিতে থাকেন। দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধের সময় হিন্দুধর্মের আচার-পদ্ধতি না মানার জন্য পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরগোষ্ঠী তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রহিত করেন। এর পর দুর্গোৎসবও বাড়ি থেকে উঠে যাওয়ার ফলে অন্যান্য আত্মীয়দেরও আনাগোনা কমে যায়। আর এই-সব অনুষ্ঠানের স্থান করে নেয় মাঘোৎসব, বর্ষশেষ, নববর্ষ ইত্যাদি ব্রহ্মোপাসনামূলক অনুষ্ঠানসমূহ, যাতে যোগ দেন প্রধানত রক্তসম্পর্কহীন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অর্থাৎ সামাজিক দিক থেকেও জোড়াসাঁকো ঠাকুরগোষ্ঠী তখন অন্য এক পথের যাত্রী।

সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এই পরিবার ছিল ভিন্নপথগামী। তখনকার দিনে শিক্ষিতসমাজে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক—কথাবার্তা, লেখাপড়া ও চিঠিপত্রে। বাংলাভাষা ব্যবহৃত হত অন্দরমহলে মেয়েদের শিক্ষায়—তার প্রসারও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু ঠাকুর-পরিবারে বাংলাভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল, তাকে ব্যবহার করা হত সর্বত্র। 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা'র 'গৌড়ীয় ভাষার উত্তম রূপে অর্চনা'র আদর্শ দেবেন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছিলেন নিজের পরিবারে। কথিত আছে, তাঁর কোনো এক জামাতা তাঁকে ইংরেজিতে পত্র লিখেছিলেন বলে তিনি না পড়েই সে পত্র ফেরত দিয়েছিলেন। সেই যুগের পক্ষে এই আচরণ খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু এর ফলেই পরিবারের সন্তানদের মাতৃভাষা-চর্চার ভিত হয়েছিল সুদৃঢ় এবং তাঁদের কথিত ভাষা এমন এক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল যাকে লোকে বলত 'ঠাকুরবাড়ির ভাষা'। শুধু ভাষাই নয়—বেশভূষা, আদবকায়দা, চালচলনেও তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যকে আমরা নাম দিতে পারি সাংস্কৃতিক আভিজাত্য।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উপনিষদের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানদের ছোটোবেলা থেকেই বিশুদ্ধ উচ্চারণে উপনিষদের নির্বাচিত শ্লোক নিয়মিত আবৃত্তি করা প্রায় আবশ্যিক করে দিয়েছিলেন। আর তারই পরিণতি ঘটেছিল স্বদেশের প্রতি গভীর প্রতিবোধের উন্মেষে। পরবর্তীকালে এই স্বদেশপ্রীতিই তাঁদের বিচিত্র চিন্তা ও কর্মের প্রধান নিয়ামক শক্তি রূপে কাজ করেছে।

অনেকটা এই কারণে, আর কতকটা যুগধর্মবশত, এই পরিবারে য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চার আনন্দও উপেক্ষিত হয়নি। শেক্‌স্‌পীয়র, ওয়াল্টার স্কট প্রভৃতি ইংরেজি লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হাত বাড়িয়েছেন ফরাসি কাব্যসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদগুলির দিকেও। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা ও সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়ে স্বদেশীয় সাহিত্যিকে নব নব ভাবসম্পদে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে তোলা ছিল তাঁদের ব্রত। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীদের—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি— জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আনাগোনা ছিল। এইসব মিলে রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই এই বাড়ির আবহাওয়ায় একটা সাহিত্যরস-সম্ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

রামমোহনের সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজে ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাংগীতিক ঐতিহ্যও গড়ে উঠেছিল। কৃষ্ণ ও বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্রাহ্মণসমাজের বেতনভোগী গায়ক ছিলেন। রামমোহন হিন্দুস্থানী সংগীতের কাঠামোয়

বেশ কিছু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ হিন্দি গান ভেঙে ব্রহ্মসংগীত রচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। যদু ভট্টের মতো নামী সংগীতশিল্পীরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বসবাস করেছেন। এর ফলে তখন সেখানে একটি বিশুদ্ধ সাংগীতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বাহ্যিক চেহারাটিও ছিল বিচিত্র। এই বাড়ির পত্তন হয়েছিল আনুমানিক 1784-এ নীলমণি ঠাকুরের আমলে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় তার বয়স ৭৫ বৎসরেরও বেশি। এই সুদীর্ঘ সময় ধরে অনবরতই এই বাড়িতে নতুন নতুন অংশ যোজিত হয়েছে পরিবারের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এবং তাও কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই। পিরালী ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে পুত্রকন্যার বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন খুব সহজ ছিল না। সুতরাং যশোহর-খুলনা বা অন্যত্র থেকে যখন পাত্রী সংগ্রহ করা হত, অনেক সময়েই তখন কন্যার আত্মীয়স্বজনকেও প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে হত। আর কন্যার বিবাহ দেবার জন্য যে পাত্র সংগৃহীত হত, তাদেরও ঘরজামাই-রূপে এই বাড়িতেই স্থান করে দেওয়া প্রায় অপরিহার্য ছিল। স্বভাবতই পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী-ক্রমে পরিবারের আকৃতি বৃহৎ রূপ ধারণ করেছে, আর তার সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িও শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হয়েছে। দ্বারকানাথের দ্বারা নির্মিত বৈঠকখানা বাড়িও রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত এই বৃহৎ পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছে। পরিবারটি একান্নবর্তী ছিল গিরীন্দ্রনাথের স্ত্রী পুত্রাদি আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। ধান আসত জমিদারী থেকে, গোলাবাড়িতে তা মজুত হত, ঢেঁকিশালায় কোটা হত, রান্না হত এজমালি মাইনে করা ঠাকুরের হাতে। এই রান্নার চমৎকার একটি বর্ণনা দিয়েছেন সরলা দেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে। তাঁর বর্ণনা আরও পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে রচিত হলেও, যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে তার পক্ষেও খুব একটা অপ্রযুক্ত নয় :'সে বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বারজন বামুন ঠাকুর ভোর থেকে রান্না চড়ায়। সে প্রকাণ্ড রান্নাঘরের দুপাশে দুভাগ করা মেঝেতে পরিষ্কার কাপড় পেতে ভাত ঢালা হয়, সে ভাত স্তূপাকার হয়ে প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করে। তারই পরিমাণে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে দিনে সেই ভাতব্যঞ্জন ও রাত্রে লুচি-তরকারি—লোক গুণে গুণে পাথরের থালাবাটিতে সাজিয়ে মহলে মহলে ঘরে ঘরে দিয়ে আসে বামুনেরা।'[১]

তখনও কলকাতা পুরো শহুরে রূপ ধারণ করেনি। রাস্তাঘাট অধিকাংশই ছিল কাঁচা, পাশ দিয়ে বয়ে যেত কাঁচা নর্দমা। মিউনিসিপ্যালিটির কলের জলের আয়োজন তখনো হয়নি। অজস্র পুকুর ছিল এখানে ওখানে, স্নান ও পান চলত তারই জলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেলকলের ধোঁওয়ায় আকাশের মুখে তখনও কালী পড়েনি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর।'[২] ছেলেবেলায় এই প্রাচীন কলকাতার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে : 'আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চ'ড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই

সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ, পায়ে জুতো, দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি; তার মানে, লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। ...ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়োমানুষের ঝিবউদের পালকির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘেটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমরানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বদ্ধ পালকি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা।'[৩] অবশ্য এইটাই সেকালের কলকাতার সামগ্রিক রূপ নয়; তবে জোড়াসাঁকোর নিকটবর্তী অঞ্চলের ছবি এখানে অনেকটা ধরা পড়েছে। এর সঙ্গে যোগ করতে পারি হুতোমের একটি সরস মন্তব্য, 'চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে কাদা হয়'।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তখনকার রূপটিও ছিল একই রকম—আধা-শহুরে, আধা-গ্রাম্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'তখন শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের ভাইভগিনীর মতো অনেকটা এরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত।'[৪] সামনের দিকে ফটক পেরিয়ে একই প্রাঙ্গণে পাশাপাশি দুটো বাড়ি—আদি বসতবাড়ি ও তার দক্ষিণদিকে বৈঠকখানা বাড়ি, প্রথমটি দ্বিতল ও শেষেরটি ত্রিতল। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অনেকগুলো ঘর, অনেকগুলো মহল, অনেকখানি বাগান জুড়ে দুই বাড়ি মিলিয়ে একবাড়ি ছিল ছেলেবেলার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। ...একই নম্বর ছিল, ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। একই ফটক ছিল প্রস্থান-প্রবেশের। সেই একই তালাভাঙা লোহার খোলা ফটক; তার একধারে একটি বুড়ো নিমগাছ, তার কোটরে কোটরে পাপদুয়া, টুনটুনি পাখিদের বাসা; আর-এক ধারে একটি মাত্র গোলকচাঁপার গাছ, আগায় ফুল গোড়ায় ফুল ফুটিয়ে। এই ফটককে শ্যামমিস্ত্রি মাঘোৎসবের দিনে লোহার কিরীট পরাত; তাতে আলোর শিখায় জ্বলত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।[৫] ...বাড়ির ঈশানকোণে বিশাল একটা তেঁতুলগাছ, সে যে কত দিনের কেউ বলতে পারে না। দৈত্যের হাতের মতো তার মোটা মোটা কালো ডাল। এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে যত ছেলেমেয়ে জন্মেছি তাদের সবার নাড়ি পোঁতা ছিল ওই গাছের তলায়। সেই তেঁতুলগাছের ছায়ায় ছিরু মেথরদের ঘর। ...তাদের ঘরের পিছনে জোড়াসাঁকোর বাড়ির উত্তর দিকের পাঁচিল; তার গায়ে তিনটে বড়ো বড়ো বাদামগাছ, যেন শহরের আর-সব বাড়ি আড়াল করে মাথা তুলে উত্তরদুয়ার পাহারা দিচ্ছে। ...উত্তর-পশ্চিম দিকটা কথায় বোঝাতে হলে তিন-চারটে পাড়ার নাম করতে হয়—মালীপাড়া, গোয়ালপাড়া, ডোমপাড়া।'[৬] রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে এই বাড়ির চৌহদ্দির আরও খানিকটা বর্ণনা পাওয়া যায়। বাহির-বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চাকরদের মহলে যে ঘরে তাঁর দিন কাটত, সেই ঘরের 'জানলার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। ...তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত, তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী...।'[৭]

'বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল, তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেলগাছ তাহার প্রধান সংগতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে-ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তরকোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত।...

'আমাদের বাড়ির উত্তর-অংশে আর-একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সংবৎসরের শস্য রাখা হইত।'[৮]

আগেই বলা হয়েছে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বলতে দুটি বাড়িকে বোঝাত—আদি ভদ্রাসন বাড়ি ও বৈঠকখানা বাড়ি। কোনো-এক সময়ে, সম্ভবত দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর, বৈঠকখানা বাড়িতেই দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ সপরিবারে বাস করতে থাকেন। নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সম্পত্তি-সংক্রান্ত গোলযোগ ও ধর্মীয় কারণে দেবেন্দ্রনাথ বৈঠকখানা বাড়ি গিরীন্দ্রনাথের পরিবারকে ছেড়ে দিয়ে আদি ভদ্রাসন বাড়িতে উঠে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ী আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ ছিল। এ-বাড়ী ও-বাড়ীর সকলে আমরা একান্নপরিবারভুক্ত ছিলুম। ক্রমে আমরা পৃথক হয়ে পড়লুম। ...আমরা তেতালার বাড়ীতে ছিলাম—দোতালায় এসে পড়লুম। এই দোতালার বাড়ীই আমাদের আদিম বসদ্বাটী, তেতালার বাড়ী নির্ম্মাণ পরে হয়। বাড়ীর বাগান ভাগ হয়ে গেল, পুকুরটা বুঝি সাধারণ রইল। একদিন দেখি হাইকোর্টের একজন জজ এসে আমাদের বাড়ী তন্নতন্ন তদারক করে দেখে গেলেন, কি প্রণালীতে বিভাগ হবে তাই ঠিক করবার জন্যে।'[৯]

এই আদি ভদ্রাসন বাড়ি রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় ছিল দোতলা, পরে ক্রমবর্ধমান পরিবারের স্থান-সংকুলানের প্রয়োজনে প্রথমে ভিতর-বাড়ি বা অন্তঃপুরকে এবং পরবর্তীকালে বাহির-বাড়িকে তেতলায় পরিণত করা হয়।

এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। যে আঁতুড়-ঘরে তাঁর জন্ম হয় তাঁর অবস্থান নিয়ে কিছু মতদ্বৈধ আছে। অসিতকুমার হালদার লিখেছেন : 'এই দুই মহাত্মা পিতাপুত্রের [দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ] যে সূতিকাগৃহে জন্ম, তা প্রথম দেখার সুযোগ হয় যখন আমি ৯। ১০ বৎসরের বালক। বড়দিদিমা (সৌদামিনী দেবী) আমাকে কেন জানি না, একদিন নিয়ে গেলেন জোড়াসাঁকোর অন্দরমহলে আলো-আঁধারে সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায়। সূতিকাঘরটির দ্বার সিঁড়িতে ওঠার প[ো]থও আছে আর একটি আছে দোতলা দিয়ে নেবে প্রবেশ করার অর্থাৎ ঘরটি হরিশ্চন্দ্র [?] অবস্থা—যেন ঝুলছে, দোতলায়ও নয় নিচের তলায়ও নয়। ঘরটির মাত্র দুটি এইভাবে দ্বার থাকায় বেশ একটু অন্ধকার। বড়দিদিমা বল্লেন, "অসিত, দেখ্, এখানে কর্তামশাই এবং আমরা সবাই জন্মেছি, তোর মা আর তুইও এই ঘরে জন্মেছিস্"।'[*]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই উক্তিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন ও ঘরটির অবস্থান নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র অজিন্দ্রনাথের স্ত্রী অমিতা দেবীর সহায়তায় একটি ঘরের সন্ধান পান। এই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'সে ঘরটি একটি সিঁড়ির

সহিত সংলগ্ন। এই সিঁড়ি বাহিরের দিকে যে বড় ঠাকুর দালানের উঠোন আছে আর বাড়ির দক্ষিণপূর্ব অংশে আর একটি যে ছোট উঠোন আছে, তাদের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। ঘরটি ঠিক একতলায়ও নয়, বা দোতলায়ও নয়, মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। তবে সিঁড়ির সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। পূর্বে যে সংযোগ ছিল তার চিহ্ন কিন্তু বর্তমান আছে। সেটা যে পরে দেয়াল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বেশ বোঝা যায়। আমি উপরের দোতলা হতেও এ ঘরে ঢুকেছি। ঢুকে দেখেছি সত্যই ঘরটিতে দুই প্রান্তে দুটি দরজা ছাড়া আর কিছু নাই।'[১০] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হেমলতা দেবী বলেছেন : 'জোড়াসাঁকো বাড়ীর...দক্ষিণ দিকের অংশের মাঝখানে যে উঠোনটা আছে, তার দোতলার পূর্বদিকে একটা বাথরুম ছিল। তার পাশের ঘর আঁতুড়ঘর হিসাবে ব্যবহার হত। এই ঘরেই কাকামশাই এবং অন্যান্য ছেলেরা জন্মেছেন।...পরে যখন আমাদের পরিবার আরও বড় হল, সেই সময় বাথরুম আর সেই ঘর ভেঙে নতুন ঘর তৈরী হল।'[১১]

যাই হোক, ড বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত অসিত হালদার-উল্লিখিত ঘরটিকেই রবীন্দ্রনাথের সূতিকাগৃহ হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং বর্তমানে মহর্ষি-ভবনে ঘরটি সেইভাবেই নামাঙ্কিত হয়েছে।

বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি একটি গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল, সন্দেহ নেই। এই বাড়ির কথা ভাবতে গেলেই দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলি আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু এর পাশাপাশি বাড়িটির একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকও ছিল, যার দিকে সচরাচর আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় না। আমরা আগেই বলেছি, বিবাহাদি কারণে অনেক আত্মীয়স্বজনকে আশ্রয় দিতে হত এই বাড়িতে। প্রধানত গ্রামীন পরিবেশ থেকে আগত এঁদের স্থান হত ভিতরবাড়ির একতলার আলোবাতাসহীন ছোটো ঘরগুলিতে—তাঁদের জীবনযাত্রার মানও ছিল একই স্তরের। বাড়ির পরিবেশকে এঁরা কতখানি দূষিত করে তুলতেন, রবীন্দ্রনাথ তার আভাস দিয়েছেন 2 Jul 1940 [১৮ আষাঢ় ১৩৪৭] তারিখে নারী শিক্ষা সমিতিতে প্রদত্ত একটি ভাষণে :

> ছেলেবেলা থেকে আমাদের বাড়ীতে দেখেছি, কত নিঃসহায় অনাথ আশ্রয় পেয়েছে। প্রকাণ্ড বাড়ীটি তাদের বসবাসে একেবারে পায়রার খোপের মত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অধিবাসিনীদের অবস্থা তখন অতি শোচনীয় ছিল। তাদের অশিক্ষিত মন আত্মাবমাননাতে পূর্ণ হয়ে থাকত। তারা কখনও আত্মমর্যাদা অনুভব করতে পারেনি। তখনকার দিনে দেশের অন্যান্য মেয়েদের মত অভ্যস্ত অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের মধ্যে তারা জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা পরস্পরে ঈর্ষা করেছে, নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির দ্বারা যত রকম কুচিন্তার প্রশ্রয় দিয়েছে। মানুষের জগতে তাদের স্থান কত তলায়, তা বোধ করবার শক্তি তাদের ছিল না। এর ফলে হয়েছিল বাড়ীময় অশান্তি, পরস্পরের লাগালাগি ও কলহ বিবাদ। এতে করে বাড়ীর আবহাওয়া একেবারে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। এটুকু বোধও তাদের হয়নি যে, যে-বাড়ীতে তারা আশ্রিত, পালিত, নিজেদের ক্ষুদ্র আচরণে তারা সেই বাড়ীরই শান্তি ভঙ্গ করচে। মাকে অনেক সময় এসে তাদের দ্বন্দ্ব মেটাতে হত। এইটাই ছিল সকলের চেয়ে আফশোষের বিষয়। জ্ঞানের যে-অসীম সম্পদ তারা বিধাতার কাছে পেয়েছিল, পদে পদে তাদের মধ্যে তার অভাব দেখা যেত। অর্থের অভাব সকলের হয়, কিন্তু মানুষের যেটা স্বাভাবিক পাওনা, তার শুভবুদ্ধি, তারই যখন অভাব হয়, তখন গৃহে ঘোরতর বিপত্তি ঘটে।[১২]

এই বিপত্তি জোড়াসাঁকো বাড়ির সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে প্রায়ই দেখা দিত, মাঝে মাঝে আলোকিত অংশকেও তারা আক্রমণ করত। এই কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে এই বাড়ির পরিবেশ থেকে দূরে রাখা পছন্দ করতেন, রবীন্দ্রনাথও প্রায়শই তাঁর পরিবারকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন—পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা দেবীকে লেখা অনেক চিঠিতে এই পরিবেশ সম্পর্কে সতর্কবাণী দেখা যায়। আমাদের ধারণা, চার অধ্যায় [১৩৪১ : 1934] উপন্যাসের একটি বর্জিত অংশে এই অভিজ্ঞতাই ভাষারূপ লাভ করেছিল :

[এলার] মায়ের নাম মায়াময়ী। তাঁর সংসারে ছিল অনেকগুলি আশ্রিত অন্নজীবী। কর্ত্তৃত্বের যথেচ্ছাচার এই রকম অসহায়দের সাহায্যেই পুরো পরিমাণ প্রশ্রয় পেয়ে থেকে ওদেরও আত্মসম্মান কেবলি বিষিয়ে ওঠে। দুর্ব্বলকে ষড়যন্ত্রে পীড়িত করে তারা নিজের দুর্ভাগ্যের শোধ নিতে চায়, সকলের কাছে তোষামোদ ও লাগালাগির জালবিস্তার করার নৈপুণ্যে তাদের হাত পাকা হয়ে ওঠে। ওদের সামনে জীবনের সকল পথই রুদ্ধ, সঙ্কীর্ণ অস্বাস্থ্যকর আশ্রয়ে পরের অনুগ্রহনিগ্রহের জুয়োখেলায় তাদের রাত্রিদিন কলুষিত।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-আলোচনায় এই পরিবেশটির কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

উল্লেখপঞ্জি

১ জীবনের ঝরাপাতা। ৯-১০

২ 'অবতরণিকা' : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।১ল০

৩ ছেলেবেলা ২৬। ৫৮৯

৪ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৭৩

৫ জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮]। ৩৭

৬ ঐ। ৪৯

৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৬৯-৭১

৮ ঐ ১৭। ২৭৩

৯ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ৩৭

১০ ঠাকুরবাড়ীর কথা।১৪৪

১১ ঐ।১৪৫

১২ নারী শিক্ষা সমিতি/অষ্টবিংশতিতম বার্ষিক বিবরণী/১৯৪৬-৪৭। ৩৬, 'রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বচন'

---

* রবিতীর্থে। ৫; রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর স্মৃতিকথা-র [১৩৮২] ৩৯ পৃষ্ঠায় এ-প্রসঙ্গে অন্য ধরনের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, 'বড়োপিসিমার [সৌদামিনী দেবী] কাছে শুনেছি যে বাবার অন্য ভাইরা যে ঘরে জন্মেছেন বাবা সে ঘরে হন নি। বাবা জন্মাবার কিছুদিন আগে থাকতে আমার ঠাকুমার শরীর খারাপ হওয়াতে তাঁকে আঁতুড়-ঘরে না রেখে অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য বড়ো ঘরে রাখা হয়েছিল এবং বাবা সেই ঘরে জন্মেছিলেন। বাবা কোন্ ঘরে জন্মেছেন সেটা অনেকেই জানতে চান কিন্তু তার হদিশ দেওয়া সম্ভব নয়।'

জীবনকথা

প্রথম অধ্যায়

১২৬৮ [1861-62] ১৭৮৩ শক ॥রবীন্দ্রজীবনের প্রথম বৎসর

রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশটি কেমন ছিল তা আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বাহ্যিক রূপটিও বর্ণিত হয়েছে। এই সময়ে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের [১৭৮৩ শকাব্দ] ২৫ বৈশাখ সোমবার [ইংরেজি মতে 7 May 1861 মঙ্গলবার] রাত্রি ২টা ২৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড গতে জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। পিতা দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন চুয়াল্লিশ বৎসর ও মাতা সারদা দেবীর বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বৎসর। রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তাঁর জন্মকালটি ঠিকুজি থেকে নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেন :

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে রক্ষিত বলেন্দ্রনাথের দ্বারা সংকলিত রাশিচক্রের বিবরণ-সংবলিত খাতায় কিছু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায় :

‘...কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী সোমবার রেবতী মীন
শুক্রের দশা ভোগ্য ১৪।৩।১১।৩৯

৭ই মে (ইংরাজী মতে) প্রভাতে ২-৩৮-৩৭ সেকেন্ড গতে জন্ম'

—শেষের লাইনটি ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন কোষ্ঠীটি অবশ্য হারিয়ে গিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক হিসাবের খাতায় ১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৬ [27 Nov 1879] তারিখে লেখা আছে, জনৈক রামচন্দ্র আচার্যকে—'শ্রীযুত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্ঠী/হারাইয়া যাইবায় নূতন কুষ্ঠী তৈয়ারির জন্য/উক্ত আচার্য্যকে মূল্য দেওয়া যায়'—বারো টাকা নূতন কোষ্ঠী তৈরির জন্য দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন ইংলণ্ডে।

ধনীগৃহের তৎকালীন রীতি অনুযায়ী জন্মের পরেই মাতার কোল থেকে তিনি স্থানান্তরিত হন ধাত্রীমাতার কোলে। এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী চৌধুরানী লিখেছেন, 'সেকালের ধনিগৃহের আর একটি বাঁধা দস্তুর জোড়াসাঁকোয় চলিত ছিল—শিশুরা মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ধাত্রীস্তন্যে পালিত ও পুষ্ট হত। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মায়ের কোল-ছাড়া হয়ে তারা এক একট দুগ্ধদাত্রী দাই ও এক একটি পর্যবেক্ষণকারী পরিচারিকার হস্তে ন্যস্ত হত, মায়ের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকত না।'[১] রবীন্দ্রনাথের ধাত্রীমাতার নাম ছিল দিগম্বরী ওরফে দিগ্‌মী।[২] এই দাই সম্বন্ধে একটি বিশেষ খবর হল, দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক হিসাব-খাতায় ৯ ফাল্গুন ১২৭৯ [19 Feb 1873] তারিখে রবীন্দ্রনাথাদির উপনয়নের খরচের মধ্যে লেখা হয়েছে : 'রবীবাবুর দাইকে বিদায় কাপড়ের মূল্য ৪্ '।

সরলা দেবী নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ব্রাহ্মধর্মের নূতন পদ্ধতিক্রমে "জাতকর্ম" সংস্কার ও উপাসনাদি হল, আবার আটকৌড়েও হল, ঘরে ঘরে বন্টিত খইমুড়ি বাতাসাসন্দেশ ও আনন্দ নাড়ুতে ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দধ্বনি নতুন শিশুটিকে স্বাগত করলে।'[৩] অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পরও অনুরূপ আচার-অনুষ্ঠান হয়েছিল, কারণ পৌত্তলিকতাবর্জিত নির্দোষ মেয়েলি প্রথাগুলি রক্ষা করতে দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের কিছু পূর্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়—সেটি হচ্ছে গিরীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ। এতদিন পর্যন্ত দুই পরিবারই একই বসতবাড়িতে একান্নবর্তী হয়ে বাস করতেন। দেবেন্দ্রনাথের ও গিরীন্দ্রনাথের সন্তানেরা একই সঙ্গে থাকতেন। সেই কারণেই গণেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠদের কাছে 'মেজদাদা' রূপে সম্বোধিত হতেন ও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেজদাদা।[৪] সত্যেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি অনেকেই বলেছেন নিজের মায়ের চেয়ে মেজ কাকীর কাছেই তাঁদের সময় কাটত বেশি। কিন্তু পরিবারে গোলমাল দেখা দিল অন্য দিক থেকে। 20 Oct 1858 তারিখে দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করতে চান। এর ফলে গুণেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের ট্রাস্ট-ভুক্ত সম্পত্তির বেশিরভাগ উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করতেন। এই আশঙ্কাতেই দেবেন্দ্রনাথ 29 Jun 1859 সুপ্রীম কোর্টে এক মোকদ্দমা করেন। 15 May 1860-তে মোকদ্দমার ডিক্রী অনুযায়ী ত্রিপুরাসুন্দরীর দত্তক গ্রহণের অধিকার অস্বীকৃত হয় এবং নগেন্দ্রনাথের অংশের এক-তৃতীয়াংশ দেবেন্দ্রনাথ এবং এক-তৃতীয়াংশ গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ লাভ করেন, অপর এক-তৃতীয়াংশ সম্বন্ধে রায়দান স্থগিত থাকে।[৫] এই ঘটনা উভয় পরিবারের

মধ্যে সম্ভবত কিছু মনোমালিন্য সৃষ্টি করে থাকবে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসংস্কার-সম্পর্কিত কার্যকলাপ। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী হলেও এতদিন পর্যন্ত পরিবারে দুর্গোৎসব ও গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দন শিলার নিত্যপূজা প্রচলিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ যখন এগুলি রহিত করতে চাইলেন তখনই সংঘাত দেখা দিল। এ-সম্পর্কে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী যখন শুনিলেন যে গৃহদেবতা ঁ লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে বাটি হইতে স্থানান্তরিত করা স্থির হইয়াছে, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গণেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেবেন্দ্রনাথকে জানাইলেন যে গৃহদেবতা ঁ লক্ষ্মীজনার্দ্দনশিলা তাঁহাকে দেওয়া হউক, তিনি যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহার ফলে তিনি সপরিবারে দেবেন্দ্রনাথের গৃহ ত্যাগ করিলেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের উইলে তাঁহার স্বামীকে প্রদত্ত নূতন বৈঠকখানা বাটিতে দুই পুত্র ও পুত্রবধূ, দুই কন্যা ও জামাতা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী সহ গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অন্দরমহলের জন্য বৈঠকখানা বাটির তেতালার আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন হইল। নূতন ঘর প্রস্তুত না হইলে বাটিতে ঠাকুর রাখা সম্ভব হইবে না বলিয়া মহর্ষির সেজ পিসির পুত্র নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটবর্তী বাটিতে ঁ লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে রাখিয়া সেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পরে বাটির সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাঁচী ধোবানীর গলির উপরে জমি খরিদ করিয়া নূতন ঠাকুরবাটি প্রস্তুত হয়। ছয়মাস পরে ঁ লক্ষ্মীজনার্দ্দন সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।'[৬]

অবশ্য এই বর্ণনায় কিছু ত্রুটি আছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি, দেবেন্দ্রনাথ সপরিবারে ত্রিতল বৈঠকখানা বাটিতেই বাস করতেন ও এই সংঘর্ষের পরিণামে তিনিই গৃহত্যাগ করে আদি ভদ্রাসন বাড়িতে উঠে আসেন। ঁ লক্ষ্মীজনার্দন শিলা সম্ভবত এই ভদ্রাসন-বাড়ির ঠাকুরদালানে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং দুর্গোৎসবাদি সেখানেই অনুষ্ঠিত হত। এইগুলি স্থানান্তর সম্বন্ধে উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে যা বলা হয়েছে, সেগুলি যথার্থ বলেই মনে হয়।

এই বিচ্ছেদ আরও গভীর হল দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে [১২ শ্রাবণ শুক্র 26 Jul]। এইটিই ব্রাহ্মধর্মমতে প্রথম বিবাহ-অনুষ্ঠান। এই বিবাহ পৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি ছাড়া হিন্দুরীতি প্রায় সমস্তই রক্ষিত হয়েছিল। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন : 'বিবাহসভায় দানসজ্জাদি সাজানো ছিল। স্বস্তি বাচন করিয়া অর্ঘ্য, অঙ্গুরীয়, মধুপর্ক ও বস্ত্রাদি দ্বারা কন্যাকা দেবেন্দ্রনাথ বরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্ত্রী-আচার প্রভৃতি বাদ দেওয়া হয় নাই। নূতন অনুষ্ঠানের মধ্যে, কেবল ব্রহ্মোপাসনা ও উপদেশ। ব্রহ্মোপাসনার পর সম্প্রদান হিন্দুরীতি অনুসারেই সম্পন্ন হয়। শুভদৃষ্টি, গ্রন্থিবন্ধন প্রভৃতি হিন্দুবিবাহের সুন্দর অনুষ্ঠানগুলিও কিছুই বাদ পড়ে নাই।'[৭] *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় সংবাদটি এইভাবে পরিবেশিত হয় : 'ব্রাহ্মবিবাহ। গত ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বিবাহ সভায় লোকের বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। আর আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রায় দুই শত ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়া যথা-বিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। যথা-নিয়মে পাত্রের অভ্যর্থনা হইলে পর ব্রহ্ম-বিষয়ক একটী সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল; জন-কোলাহল আর কিছুমাত্র রহিল না—কেবল ব্রহ্মনামের মঙ্গল-ধ্বনি উঠিতে লাগিল। তৎপরে কন্যাদান কার্য্য সম্পন্ন হইলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় দম্পতীকে...উপদেশ করিলেন।'[৮] উক্ত পত্রিকার ভাদ্র

সংখ্যার ৮১-৮৪ পৃষ্ঠায় অনুষ্ঠানটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশিত হয়। রাখালদাস হালদার লণ্ডনে চার্লস ডিকেন্‌স্-সম্পাদিত *All the Year Round* পত্রিকার 5 Apr 1862 তারিখের সংখ্যায় (Vol. VII, p. 80) 'A Brahmo Marriage' প্রবন্ধে এই বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন।* ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখেছেন, 'এই বিবাহ স্বগোষ্ঠী মধ্যেই হয়। দর্পনারায়ণ ঠাকুর-বংশীয় শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত।'[৯]

এই বিবাহের ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে [২৫ ভাদ্র] লেখেন : 'ইহাতে আমার আর আর জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। গণেন্দ্র পর্য্যন্ত সেই বিবাহের দিনে উপস্থিত ছিলেন না।'[১০] পিতৃশ্রাদ্ধের গোলমালে পাথুরিয়াঘাটার আত্মীয়স্বজন তাঁকে ত্যাগ করলেও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর তা করেননি। কিন্তু এই বিবাহের পর তাঁরাও দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, 'আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল', এই ঘটনায় তা সম্পূর্ণ হল। এর পর অনাত্মীয় ব্রাহ্মবন্ধুরাই তাঁদের আত্মীয়ের স্থান গ্রহণ করলেন। অবশ্য এর শুভফল ঘটেছে এই যে, এর পর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্রেরা পরিবারে যে-সমস্ত সংস্কার-সাধন ও নূতন প্রথার প্রবর্তন করেছেন তার জন্য আত্মীয়স্বজনের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি।

এর পর রবীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ উৎসব হয়। সৌদামিনী দেবী সে-সম্বন্ধে লিখেছেন : 'রবির জন্মের পর হইতেই আমাদের পরিবারে জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল ভট্টাচার্যেরা পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত ছিল রবির জাতকর্ম উপলক্ষে তাহাদের সহিত পিতার অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার উপরে আলপনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোটো ছোটো গর্ত করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারিদিকে বাতি জ্বলিতে লাগিল—রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।'[১১] এই অনুষ্ঠান সম্ভবত অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তত্ত্ববোধিনী-র মাঘ সংখ্যায় ঐ মাসের দানপ্রাপ্তির বিবরণে 'শুভকর্ম্মের দান।/শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর...১৬' টাকা উল্লেখ দেখা যায়।†

১১ মাঘ ১২৬৮ [বৃহ 23 Jan 1862]-র দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম মাঘোৎসব। এইদিন কেশবচন্দ্র সেনের স্ত্রী প্রথম জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসেন। অন্তঃপুরের বিশেষ উপাসনায় কেশবচন্দ্র উপাসনা করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ব্রহ্মানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময়কার মাঘোৎসবের একটি চিত্র পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি-তে :

> এই সময়ে প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ তারিখে ইঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ব্রাহ্মোৎসবের খুব ঘটা হইত। সমস্ত বাড়ী পুষ্পমালায় ভূষিত হইত। প্রত্যূষে যখন রশুনচৌকিতে প্রভাতী বাজিয়া উঠিত তখন তাঁহার যে কি আনন্দ হইত তাহা তিনি কথায় বর্ণনা করিতে পারেন না। আদিব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপ্ত হইয়া গেলে দলে দলে ব্রাহ্মেরা জোড়াসাঁকোর বাটীতে আসিয়া সমবেত হইতেন। টেবিলের উপর বড় বড় দরবেশী মিঠাই ও কমলা লেবুর পিরামিড সাজান' থাকিত। ...মধ্যাহ্নভোজনের পর বৈঠকখানার ঘরে গগনভেদী উচ্চকণ্ঠে "সবে মিলে মিলে গাও", "আজ আনন্দের সীমা কি", "আজি সবে গাও আনন্দে" প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গানগুলি সকলে মিলিয়া গাহিতেন। জ্যোতিবাবু

বলিলেন, "সর্ব্বশেষে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিল' প্রভৃতি গান গাহিতেন, তখন যে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের মন ভরিয়া উঠিত, তাহা বর্ণনাতীত...।[১২]

২৭ চৈত্র [মঙ্গল 8 Apr 1862] ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভাতে দেবেন্দ্রনাথকে 'ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধানাচার্য' উপাধি প্রদান করা হয়। এই সভার উদ্দেশে লিখিত একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আগামী ১ বৈশাখ ১২৬৯ [রবি 13 Apr 1862] থেকে আচার্যপদে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই পত্রের প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। ঘটনাটির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। এতদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বা উপাচার্য পদে ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকে নিযুক্ত করা হত না। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও কর্মোৎসাহ দেবেন্দ্রনাথকে এমনভাবে অভিভূত করেছিল যে তিনি এতদিনকার প্রথা বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হলেন না। এর কিছুদিন পূর্বে তিনি কেশবচন্দ্রেরই প্রভাবে নিজের উপবীত ত্যাগ করেছিলেন।[১৩]

১৮ শ্রাবণ [বৃহ 1 Aug] তারিখে *Indian Mirror* পত্রিকা কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজ থেকে পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু মনোমোহন ঘোষ পত্রিকা-সম্পাদনে সেই সময়ে অন্যতম সহায়ক ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমমাহন ঘোষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ১১ চৈত্র [রবি 23 Mar 1862] প্রাতঃকালে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর সংবাদ উদ্ধৃত করে এ-সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে, 'The Indian Mirror states that two young Natives will proceed to England by the next mail steamer for the purpose of competing for the Civil Service Examination. The are very respectably connected. One of them is the grandson of the late Baboo Dwarakanath Tagore and the other the son of Baboo Ramlochun Ghose, the pensione Principal Sudder Ameen of Nuddea. We trust many more will follow their examples'[১৪]

সৌদামিনী দেবী ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইরাবতী এ বৎসর—মাসটি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি—জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত চৈত্র মাসে তাঁর অন্নপ্রাশন হয়—এরূপ অনুমানের কারণ, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র ১৭৮৪ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় : "চৈত্র মাসের দানপ্রাপ্তির বিবরণ। /শুভকর্ম্মের দান।/শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়...৪।' এইরূপ শুভকর্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা দান করা ঠাকুর-পরিবারে একটি প্রথারূপে পরিগণিত হয় এবং তা *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় প্রকাশিত হত। এইসব হিসাব থেকে আমরা অনেক সময়েই ঠাকুর-পরিবারের অনেকগুলি শুভানুষ্ঠানের কাল নির্ধারণ করতে পারি।

এই বছরের *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র আশ্বিন সংখ্যায় [পৃ ৯৬-৯৭] মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' ['আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়'] কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় রচয়িতার নামের পরিবর্তে 'কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' উল্লেখ দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন : 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ

আলাপ-পরিচয় ছিল।...তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা-ভাঙা। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের পাণ্ডুলিপি তাঁহার সেই ভাঙা গলায় সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই।'[১৫] সম্ভবত এই আলাপের সূত্রেই 'আত্মবিলাপ' কবিতাটি তত্ত্ববোধিনী-র জন্য সংগৃহীত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মেঘনাদবধকাব্য দুই খণ্ডে 1861-এ প্রকাশিত হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এই বৎসর জন্মগ্রহণ করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 11 Feb 1861 [১২৬৭] ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 1 Mar 1861 [ফাল্গুন ১২৬৭]; এঁরা দুজনেই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কয়েক মাসের বড়ো হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্ব-ভাবাপন্ন ছিল। এ ছাড়া কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ [২৭ জ্যৈষ্ঠ রবি 9 Jun], শরৎকুমারী চৌধুরানী [১ শ্রাবণ সোম 15 Jul], আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় [১৯ শ্রাবণ শুক্র 2 Aug], ডাঃ নীলরতন সরকার [১৬ আশ্বিন মঙ্গল 1 Oct], কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার [১২ কার্তিক রবি 27 Oct] প্রভৃতি এই বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের সকলের সঙ্গেই কোনো-না-কোনো সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

উল্লেখপঞ্জি

১ জীবনের ঝরাপাতা। ১

২ জগদীশ ভট্টাচার্য : কবিমানসী ১ [১৩৭৭]। ৫৬ ['সংবাদটি ঠাকুর-পরিবার থেকে শ্রীমতী রাধারানী দেবী কর্তৃক সংগৃহীত']

৩ জীবনের ঝরাপাতা। ১

৪ দ্র আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ৩৫

৫ দ্র ঠাকুরবাড়ীর কথা। ১০১

৬ রবীন্দ্র-কথা। ২৬-২৭

৭ অজিতকুমার চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৩৭৭]। ২৬১

৮ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ ১৭৮৩ শক। ৬৭-৬৮

৯ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ৩৫৬

১০ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী। ৩৩

১১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৫২

১২ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি [১৩২৬]। ৪৮-৫১

১৩ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় : আচার্য কেশবচন্দ্র ১ [1938]। ১৫৭

১৪ *The Hindoo Patriot*, 24 Mar 1862 / 89

১৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ৬৪-৬৫

* খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'প্রথম ব্রাহ্মবিবাহের বিবরণ—বিলাতী সংবাদপত্রে', তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮৫৪ শক [১৩৩৯]। ৩০১-০৫। বিবরণটি সূচিপত্রে 'Brahma Marriage, A' বলে উল্লিখিত, কিন্তু বিবরণের শীর্ষে আছে 'A Curious Marriage Ceremony'।

† অবশ্য তত্ত্ববোধিনী-র চৈত্র সংখ্যায় [পৃ ২০৯-১০] 'ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান ব্যবস্থা।/নামকরণ' প্রসঙ্গে 'অভিনব জাত কুমারের ষষ্ঠ মাসে নামকরণ কর্ত্তব্য' বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এই নিয়ম সর্বদা মানা হত না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১২৬৯ [1862-63] ১৭৮৪ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের দ্বিতীয় বৎসর

এই বছরের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১লা বৈশাখ [রবি 13 Apr] ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে সস্ত্রীক কেশবচন্দ্র সেন দ্বিতীয়বার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে আসেন। এই কারণে কেশবচন্দ্রকে সাময়িকভাবে গৃহত্যাগ করতে হয়। সৌদামিনী দেবী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'কেশববাবুর স্ত্রী তিন-চার মাস আমাদের কাছে ছিলেন। তখন আত্মীয়স্বজনেরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ আমাদের বাড়িতে আসিতেন না। সেই সময়ে কেশববাবুর স্ত্রীকে আমাদের আত্মীয়রূপে পাইয়া আমরা বড়ো আনন্দে ছিলাম। প্রথমটা তাঁহার মন বিমর্ষ ছিল—বিশেষত তাঁহার একটি ছোটো ভাইয়ের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইত। সেই সময় সোম, রবি ও সত্য শিশু ছিল—তাহাদিগকেই তিনি সর্বদা কোলে করিয়া থাকিতেন—বলিতেন, রবিকে তাঁহার সেই ছোটো ভাইটির মতো মনে হয়।...তাঁহাকে আমাদের ভগিনীর মতোই মনে হইত—তিনি যাইবার সময় আমরা বড়ো বেদনা পাইয়াছিলাম।'[১]

প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবীর বর্ণনাটি এইরূপ :

> ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কেশববাবু সস্ত্রীক আমাদের বাড়ী আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেদিন জোড়াসাঁকো ভবনে একটি পর্ব্বোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। যেন বহু পুরাতন আত্মীয়ের সহিত সেদিন আমাদের পুনর্ম্মিলন ঘটিল। কেশবাবুর স্ত্রীর ভারী একটি অমায়িক মধুর মুখশ্রী ছিল। আমি যদিও তখনও মাত্র ছয় বৎসরের বালিকা তথাপি তাঁহার সেই রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। সর্বদা তাঁহার কাছাকাছি থাকিতে আমার বড় ভাল লাগিত। তিনি দিদিদের সহিত গল্প করিতেন আমি চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। প্রীতি-আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। ... (কেশবচন্দ্র) বেশ গল্প করিতে পারিতেন। দেখা হইলেই আমরা গল্পের জন্য তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতাম। তাঁরও গল্পের ভাণ্ডার কখনো ফুরাইত না।[২]

এই ঘটনা দেবেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে বিশেষ কতকগুলি পরিবর্তনের সূচনা করে। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন : 'কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনরি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালি খ্রীস্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবল পড়াইয়া যাইতেন। মাস কয়েক এইভাবে চলিয়াছিল। অবশেষে একবার পিতৃদেব আমাদের পড়াশুনা কেমনতর চলিতেছে দেখিতে আসিলেন। একখানা শ্লেটে শিক্ষয়িত্রী আমাদের পাঠ লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন—তাহারই অনুসরণ করিয়া কপি করিবার জন্য আমাদের প্রতি ভার ছিল। শ্লেটে লিখিত সেই পাঠের বানান ও ভাষা দেখিয়া পিতা আমাদের এই নিয়মের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন।'[৩] পরবর্তীকালে স্ত্রী-শিক্ষার জন্যই আর-একজন অনাত্মীয় পুরুষ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অসূর্যম্পশ্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, কিন্তু তা আরও কিছুকাল পরের কথা।

ইতিমধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২১ আষাঢ় [শুক্র 4 Jul]; রবীন্দ্রনাথের থেকে তাঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্র মাত্র এক বছর দু'মাসের ছোটো।

এই বৎসরের আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৮ ফাল্গুন [রবি 1 Mar 1863] দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতির কাছ থেকে বোলপুরের নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামের বাঁধ-সংলগ্ন বিশ বিঘা জমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় মৌরসী-স্বত্ব গ্রহণ করেন। শোনা যায়, প্রতাপনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করতেন এবং তখনই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। দেবেন্দ্রনাথ ১২ শ্রাবণ ১৭৮০ শক [১২৬৫ : 1858] সিমলা থেকে রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন : 'তুমি শুনিয়া অবশ্য আহ্লাদিত হইবে যে বীরভূমনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।'[৪] হিমালয় থেকে ফিরে দেবেন্দ্রনাথ উপর্যুপরি অন্তত দুবার রায়পুরে গমন করেন। ১৮ চৈত্র ১৭৮৩ শক [১২৬৮] সিংহ-বাড়িতে তিনি যে উপাসনা করেন তা একটি পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়, তার আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'বীরভূমের রায়পুর নিবাসী বিখ্যাত গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সিংহ মহোদয়ের গৃহে ১৭৮৩ শকের চৈত্র মাসের অষ্টাদশ দিবসে যে ব্রহ্মোপাসনা হয় তাহাতে প্রধান আচার্য মহাশয় যে ব্যাখ্যা করেন এবং যে সকল ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হয় তাহা প্রকাশিত হইল।' উপাসনার শুরুতেই দেবেন্দ্রনাথ বলেন : 'আমরা পুনর্ব্বার এখানে উপাসনার নিমিত্তে সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়াছি। কেমন তাঁহার করুণা, আমরা এক মাস পূর্ব্বে এখানে মিলিত হইয়া তাঁহার চরণে পূজোপহার প্রদান করিয়াছি, আবার অদ্য স্নেহময় পিতার নাম এখানে প্রতিধ্বনিত হইবে।' এর থেকে বোঝা যায়, ফাল্গুন মাসেও দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরে এসে উপাসনা করেছিলেন। এই বিবরণ দিয়ে শান্তিনিকেতনের 'আশ্রমধারী' অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'রায়পুর যাতায়াত করিবার সময় এই দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে মহর্ষির চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই বিশাল প্রান্তরে দৃষ্টি অবারিত, অনন্ত আকাশ ব্যতীত দিগ্বলয়ে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তস্বরূপের এই উদাত্ত সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয়মন প্লাবিত হইল, উন্মুক্ত আকাশতলে এই নির্জ্জন প্রান্তর তপস্যার একান্ত অনুকূল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।'[৫]

স্থানটির প্রতি দেবেন্দ্রনাথের আকর্ষণ কিভাবে জন্মাল তার ইতিহাস বিবৃত করেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী : 'রায়পুরের সিংহ-পরিবারের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। একদিন সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুরের পথে শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়ায় তিনি ক্ষণকালের মতো দাঁড়াইলেন। সমস্ত প্রান্তরের মধ্যে তখন ঐ দুটি মাত্র গাছ ছিল; চারি দিকে অবারিত তরঙ্গায়িত ধূসর মাঠ, তাহার কোনো জায়গায় সবুজ রঙের আভাস মাত্র নাই। শুধু দূর দিক্‌চক্রবালে একশ্রেণী ঋজু তালগাছ ধ্যানমগ্ন মহাদেবের তপোবনপ্রান্তে স্তব্ধ পাহারার মতো দাঁড়াইয়া আছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কোনো বাধা নাই। কিছুই দেখিবার নাই। উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে এই স্থলসমুদ্র। এই জায়গাটি হঠাৎ তাঁহার মনকে টানিল। এই ছাতিমের ছায়াটিকে তাঁহার নির্জন সাধনার উপযুক্ত বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তার পর হইতে ঐ ছাতিম গাছের তলায় মাঝে মাঝে তাঁহার তাঁবু পড়িতে লাগিল।'[৬] লক্ষণীয়, অজিতকুমার এখানে তাঁর যাত্রাপথ উল্লেখ করেছেন বোলপুর স্টেশন থেকে রায়পুর অভিমুখে, যা আদৌ স্বাভাবিক যাত্রাপথ নয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'হিমালয় হইতে নামিয়া আসিবার পর দেবেন্দ্রনাথ রায়পুর আসেন; আমাদের মনে হয় নৌকাযোগে ভাগীরথী দিয়া কাটোয়া হইতে গুনুটিয়ার ঘাটে

নামেন ও সেখান হইতে পালকী-পথে রায়পুর আসেন। চীপ সাহেব নির্মিত সুরুল-গুনুটিয়া রাস্তার পাশেই বর্তমান শান্তিনিকেতন ও ছাতিম গাছ দুটি পড়ে। বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুর যাইতে শান্তিনিকেতন পথে পড়ে না।'[৭] প্রমথনাথ বিশী এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন : 'আমার বিশ্বাস, কোনো একবার পশ্চিম হইতে ফিরিবার সময়ে মহর্ষি আমদপুর স্টেশনে নামিয়া রায়পুর যাইতেছিলেন। শিউড়ি হইতে বোলপুর যাইবার যে সড়ক আছে আমদপুর স্টেশনে নামিয়া তাহা ধরিয়া বোলপুর হইয়া রায়পুর যাওয়া যায়। এই পথ ধরিয়া চলিলে পথে শান্তিনিকেতনের মাঠ অতিক্রম করিতে হয়।'[৮] পূর্বোক্ত অঘোরনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্গত কারণেই এইসব ঘুরপথ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, রায়পুরে আসার আগে দেবেন্দ্রনাথ গুসকরায় তাঁবুতে বাস করেছিলেন। তিনি নির্জন স্থান খুঁজছিলেন। রায়পুরে এসে পাল্‌কিতে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তিনি এই জায়গাটি পছন্দ করেন।'[৯] ভুবনমোহন সিংহের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভুবননগর মৌজার অন্তর্ভুক্ত কুড়ি বিঘা জমির পাট্টা নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'পাট্টা লওয়া হয়েছিল মহর্ষিদেবের রায়পুরে আসার এক বছর পরে ভুবনবাবুর পুত্রদের কাছ থেকে। সুতরাং তাঁর আগমন ও পাট্টা লওয়ার মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভুবনবাবু পরলোকগমন করেছিলেন এরূপ অনুমান করতে হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথের অনুমান সঠিক বলেই আমরা মনে করি।

যাই হোক, এই আকর্ষণের পরিণতি ঘটল 31 Mar 1863 [মঙ্গল ১৯ ফাল্গুন ১২৬৯], যেদিন এই জমি হস্তান্তরের দলিল রেজেস্ট্রি হয় দলিলসমূহের রেজিস্ট্রার গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী ও জজ ও. ডব্লিউ. ম্যালেট-এর সামনে। রায়পুরের অধিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ আট আনা দিয়ে স্ট্যাম্প কাগজ-বিক্রেতা নিত্যানন্দ পালের কাছ থেকে 28 Feb 1863 [শনি ১৭ ফাল্গুন] দলিলের কাগজ ক্রয় করেন ও পরদিন ১৮ ফাল্গুন [রবি 1 Mar] দলিলটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। মূল দলিলটি হারিয়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে এর একটি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রস্তুত করানো হয়। সেটি বর্তমানে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সুরক্ষিত। নীচে তার একটি প্রতিলিপি দেওয়া হল :

True Copy
J. M. Louis
Registrar

[আট আনার স্ট্যাম্প]

No 20

Presented 31st March 1863 and
Registered by me on the same day between
10 & 11 a.m.
Sd/ O. W. Judge Malet

Sd/ Govind Chandra
Chowdhuri
Regt. of Deeds

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণেষু। —

লিখিতং শ্রীপ্রতাপনারায়ণ সী°হ্ ও শ্রীউদয়নারায়ণ সী°হ্ স্বয়ং ও শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সী°হ্ ও নাবালগ শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সী°হ্ ও শ্রী তির্থনারায়ণ সী°হ্ তরফ অছী শ্রীউদয়নারায়ণ সী°হ্ ও শ্রীরসী ক লাল সী°হ্ কস্য মৌর............সী পট্টক· পত্রমিদং সন ১২৬৯ বার সত উন......................সত্তর সালান্দে লিখন° কার্য্যণঞ্চাগে আমাদীগে................র জমিদারি জেলা বির-

J. M. Louis
Registar

শ্রীপ্রতাপনারায়ণ সী°হ্ শ্রীউদয়নারায়ণ সী°হ্
ও অছি নাবালকগণ শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সী°হ্ ও। -
শ্রীতির্থনারায়ণ সী°হ্ ওরফে গগনচন্দ্র সী°হ্
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সী°হ্ শ্রীরসীকলাল সী°হ্
সাং রাইপূর চৌকী আমডহরা জেলাবিরভোম

৵

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠা]

ভোমের অন্ত
সেনভূম
মদ্ধে হুদা
নির ডৌল খারিজান

[আট আনার স্ট্যাম্প]

পাতি পরগণে
তালুক শুপুর
বৌলপুরের পত্ত
মৌজে ভুবন নগরের মধ্যে

বান্ধের উত্তরাংশে বিঃ নিচের চৌহদ্দী মোত্তাজী ২০/ বিঘা জমি আপুনী বাগীচা আদী করিবার জন্য পট্টক লইতে ইচ্ছা করায় আমারা সকলে এক ঐক্য হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত ২০/ কুড়ি বিঘা জমির সালীআনা কোম্পানী ৫৲ পাঁচ টাকা জমায় আপনকাকে বাগবাগীচা ও এমারত ও পুষ্কর্ণ্বি আদী করিবার জন্য মৌরূসী পাট্টা দিয়া লিখিয়া দিতেছি জে আপুনী উক্ত জমিতে বাগবাগীচা ও এমারত ও পুষ্কর্ণ্বি আদী প্রস্তুত করিয়া দান বিক্রয়ের সত্তাধিকারিত্তরূপে পুত্রপৌত্রাদীক্রমে ভোগ দখল করিতে রহেন। সন ২ কিস্তিবন্দীযুরত মালগুজারির সরবরাহ করিবেন কিস্তি খেলাপ করেন কি শাত......................কর মাহা ১৲ এক টাকা হিসাবে সুদ দিবেন.......................................মালগুজারি আদাএর ত্রুটী করেন মাফিক আইন আসলে.........[?] উক্ত জমার উপর

J. M. Louis
Registrar

৶

[তৃতীয় পৃষ্ঠা]

কখন কমী বে
শুকা কোন
অবধারিত মাল
সরবরাহ করিবেন এতদর্থে

[আট আনার স্ট্যাম্প]

শী হইবেক না হাজা
দফায় উজর না করিয়া
গুজারির মালগুজারির
কবুলতি লইয়া মৌরূসী পাট্টা

লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৬৯ সাল বার সত উন সত্ত এসাহী তারিখ

১৮ ফাল্গুন ইসাদী

তপশীল চৌহদ্দী	শ্রীরামধন ঘোষ	শ্রীশ্রীনাথসী°হ
বান্ধের উত্তরাংশে শান্তীনিকেতন	সা° রাইপুর	সা° রাইপুর
বান্ধের উত্তরাংশে শান্তীনিকেতন	শ্রীরামেশ্বর লাহিড়ি	শ্রীহরিচরণ
নামা গৃহের চতুপার্শ্বের মধ্যে	সা° সান্তীপুর	পরামাণিক
২০৴ বিঘা	মো° রাইপুর	সা° রাইপুর
	শ্রীরাধামোহন মিশ্র	শ্রীনিত্যানন্দ
	সা° মথুরাপুর মো°	ঘোষ সা°
	রাইপুর	রাইপুর

৩৭৪ নং

সাল ১৮৬৩। ২৮ ফিরওয়ারি শ্রীনিত্যানন্দ পাল

ইষ্টাম্প কোরফা মো° রাইপুর জেলা বিরভোম

খরিদার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ সা° রাইপুর

দাম ॥০ আনা

J. M. Louis

Registrar

—এই দলিলে যেটি লক্ষ্য করবার বিষয়, তপশীল চৌহদ্দীতে বর্ণিত 'বান্ধের উত্তরাংশে শান্তীনিকেতন নামা গৃহের চতুপার্শ্বের মধ্যে ২০৴ বিঘা' অংশটি। এর অর্থ, ১৮ ফাল্গুন তারিখে এই দলিল লিখিত ও স্বাক্ষরিত হবার পূর্বেই এখানে 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি গৃহ প্রস্তুত হয়েছিল, কাঁচা অথবা পাকা সে-গৃহের চেহারা যাই হোক-না-কেন। ১২৭১ বঙ্গাব্দের [1864-65] আগে দেবেন্দ্রনাথের বিস্তারিত হিসাব-সংবলিত কোনো ক্যাশবহি আমাদের হস্তগত হয়নি, সুতরাং এই গৃহ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

স্থানটি পূর্বে ছিল অত্যন্ত ভয়ের জায়গা। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন : 'শান্তিনিকেতনের সামনে ভুবনডাঙা গ্রাম, সে গ্রামে থাকিত এক ডাকাতের দল। বোলপুর হইতে নানা গ্রামে গ্রামে পথ গিয়াছে, পথের মধ্যে এই বিশাল প্রান্তর, চারি দিক জনশূন্য। ডাকাতির পক্ষে এমন উপযুক্ত জায়গা আর হইতে পারে না। কত লোককে যে তাহারা খুন করিয়া ঐ ছাতিম গাছের তলায় তাহাদিগের মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই ডাকাতের দলের সর্দ্দার ধরা দিল; ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিল। যে জায়গা ছিল বিষম ভয়ের জায়গা, তাহাই হইল পরম আশ্রয়ের জায়গা —আশ্রম।'[১০] অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সেবক সম্পর্কে অন্যরূপ বিবরণ দিয়েছেন : 'মহর্ষির অবস্থিতিকালে শান্তিনিকেতনে একবার ডাকাতি হয়। এজন্য তিনি দস্যুদলের অবস্থাভিজ্ঞ একজন উপযুক্ত

দারোয়ান অনুসন্ধান করিতে থাকেন। শুনিয়াছি মানকরের জমিদার বাবু হিতলাল মিশ্র একজন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ লাঠিয়ালকে মহর্ষির নিকটে পাঠাইয়া দেন। ইহার নাম দ্বারিক সর্দ্দার। দ্বারিক সর্দ্দার এই কর্ম্মসূত্রে মানকর হইতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাসস্থাপন করিয়াছিল। ...দ্বারিক সর্দ্দার "ডাকাতের দলের সর্দ্দার" রূপে ধরা দেয় নাই, চাকরী করিতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাস করিয়াছিল। সুতরাং অজিতবাবুর উক্তি ভ্রমাত্মক।'[১১] একে বালক রবীন্দ্রনাথ, এমন-কি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম যুগের ছাত্ররা—প্রমথনাথ বিশী, সুধীরঞ্জন দাস প্রভৃতিরাও দেখেছিলেন বলে তাঁদের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ২০ শ্রাবণ [সোম 4 Aug] পিতার ষোড়শ সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে ভোজ্য উৎসর্গ করেন। এই উপলক্ষে যে ব্রাহ্ম সংসৎ-এর আয়োজন হয়েছিল, তার বিবরণ একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিবদ্ধ করে তার দুই সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করেন।[১২] কেশবচন্দ্র সেনও ব্রাহ্মধর্মের নূতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে পুত্রের জাতকর্ম সম্পাদন করেন। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় এক পত্রলেখক এই সংবাদ দিয়ে অভিযোগ করেন, 'তৎকালে পৌত্তলিকদের ন্যায় "আয়ু দাও শ্রী দাও" ইত্যাদি প্রার্থনা করা হইয়াছিল।'[১৩] ঘটনাগুলি সামান্য নয়; এই কারণেই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিভেদের বীজ রোপিত হয়। ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১৩ আশ্বিন সংখ্যার *সোমপ্রকাশ*-এ এই সংবাদটি পরিবেশিত হয় : 'কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীটে ৭৯ সংখ্যক ভবনে একটী "ব্রহ্মোপাসনালয়" সংস্থাপিত হইয়াছে। মূল ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা অনুষ্ঠানপ্রিয় হইয়া পড়াতে কয়েকজন ব্রাহ্ম স্বতন্ত্র হইয়া এই নূতন সমাজ করিলেন। গত ৫ই আশ্বিন রবিবার ইহার উপাসনাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।' [৫ম বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা]।

এই বৎসরের সম্ভবত শেষের দিকে [1863] রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুধেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর সাল-তারিখ সঠিক ভাবে জানা যায় না, সাধারণত জীবৎকাল 1863-64 এইভাবে উল্লিখিত হয়। কিন্তু 26 May 1862 [সোম ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯] তারিখে গণেন্দ্রনাথকে তাঁর কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি নীলকমল মুখোপাধ্যায় একটি পত্রে কৌতুক করে লিখেছেন, '...your aunt the wife of Babu D. T. [Debendranath Tagore] is pregnant, your cousin sister the wife of Sharoda is pregnant and you heard before that our Burro dada's wife is also pregnant.'[১৪] এই পত্র অনুসারে বুধেন্দ্রনাথের জন্ম পৌষ বা মাঘ মাসে অথবা তৎপূর্বে হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। 16 Nov 1863 [সোম ১ অগ্র ১২৭০] লণ্ডন থেকে পত্নীকে লেখা একটি পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন, 'রবির পরে আমার আর এক ভ্রাতা হইয়াছে শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম কি হইয়াছে?'[১৫] এই উদ্ধৃতি থেকে অবশ্য তাঁর জন্মমাস সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না, তবে অনুমান করা যায় যে তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতীর জন্মসাল আমাদের জানা নেই—উপরে উদ্ধৃত পত্রে হয়তো তাঁরই জন্ম-সম্ভাবনার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

রাজনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 23 Apr [বুধ ১১ বৈশাখী স্যার জন পিটার গ্রান্ট অবসর গ্রহণ করলে স্যার সিসিল বীডন বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর হন এবং 1 Jul [মঙ্গল ১৮ আষাঢ়] থেকে সুপ্রীম ও সদর আদালত একত্র হয়ে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ১ অগ্রহায়ণ [শনি 15 Nov] ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে [E. B. R.] কুষ্টিয়া পর্যন্ত যাত্রীচলাচল শুরু করে, এর ফলে ঠাকুরপরিবারের উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে যাতায়াত অনেক সুগম হয়ে পড়ে।

এই বৎসর ২৯ পৌষ [সোম 12 Jan] স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ জন্মগ্রহণ করেন ১২ চৈত্র [মঙ্গল 24 Mar] তারিখে।

উল্লেখপঞ্জি

১ 'পিতৃস্মৃতি', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৬৯

২ 'সাহিত্যস্রোত'; ড পশুপতি শাশমলের স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৪৯-৫০

৩ 'পিতৃস্মৃতি', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৫৫

৪ পত্রাবলী।

৫ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি', শান্তিনিকেতন আশ্রম [১৩৫৭]। ১০-১১

৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৪২

৭ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ৪০

৮ প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন [১৩৫৩]। ৫

৯ দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রম। ১১-১২

১০ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৪২

১১ শান্তিনিকেতন আশ্রম। ১৫-১৭

১২ দ্র *সোমপ্রকাশ*, ২৭ শ্রাবণ [৪র্থ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা]

১৩ ঐ, ৭ মাঘ [৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা]

১৪ Tagore Family Correspondence [পাণ্ডুলিপি] Vol. I, p. 117

১৫ পুরাতনী। ৪৮

তৃতীয় অধ্যায়

১২৭০ [1863-64] ১৭৮৫ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের তৃতীয় বৎসর

এই বৎসরের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১১ অগ্রহায়ণ [বৃহস্পতি 26 Nov] রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ। হেমেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৯ বৎসর ১০ মাস। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় সংবাদটি এইভাবে পরিবেশিত হয় : 'ব্রাহ্মবিবাহ। পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বেই শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে, গত ১১ অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে সাত্রাগাছী গ্রামে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যাকর্ত্তার নাম শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কন্যাটির নাম শ্রীমতী নীপময়ী দেবী। এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ২০০ কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম বরের অনুযাত্র হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে সাত্রাগাছীরও কোন কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। বিবাহরাত্রিতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪০০/৫০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রারম্ভাবধি একাল পর্যন্ত বিবাহ বিষয়ে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হইল।'[১] এই বিবাহ খুব সহজে সম্পন্ন হয়নি, বিরোধীদের আক্রমণের আশঙ্কায় পুলিশের সাহায্য নেবারও প্রয়োজন হয়েছিল। এর একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা হেমেন্দ্রনাথ নিজেই লিখে রেখে গেছেন।* বিবাহের পর তাঁর ইংলণ্ডে যাবার প্রস্তাব ওঠে, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় এই মর্মে সংবাদও প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে লেখা 26 Feb 64-এর [শুক্র ১৫ ফাল্গুন] পত্রেও[২] তার উল্লেখ আছে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, এ প্রস্তাব ফলপ্রসূ হয়নি।

স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না—তিনি ইংলণ্ড থেকেও পত্রে পত্নীকে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। হেমেন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখেছেন :

> বিয়ের পর আমার সেজদেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল।...আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমক দিলে চমকে উঠতুম। ...আমার যা কিছু বাংলা বিদ্যা তা সেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন। ...উনি বিলেত থেকে ঠাকুরপোকে লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ইংরেজী শেখাতে, কিন্তু সেটা অক্ষরপরিচয়ের বড় বেশি এগোয় নি।'[৩]

খ্রিস্টান মিশনারি শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টার পরিণতি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য পরেও 1865-এ [১২৭১-৭২] জনৈকা 'বিবি এ ডিশোজা বাটীর মধ্যে' পড়ানোর জন্য বেতন পেয়েছেন, পারিবারিক হিসাবের খাতায় আমরা এমন উল্লেখ দেখেছি। যাই হোক, বর্তমানে এই কাজে নিযুক্ত হলেন ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। কেশবচন্দ্রের পর এই প্রথম একজন অনাত্মীয় পুরুষ দেবেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে প্রবশে করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন :

তখন আমার মেজ [? সেজ]-দাদামশায়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল। বঙ্গ-মহিলার সাধারণ প্রচলিত একখানি মাত্র সাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল।[৪]

ঠাকুরপরিবারে অন্তঃপুরিকাদের বেশ-সংস্কারের ইতিহাসটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন : 'ছোটো মেয়েরা ভালো করিয়া কাপড় সামলাইতে পারিত না তাই তাহাদের শাড়ি পরা তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] পছন্দ করিতেন না। বাড়িতে দরজি ছিল—পিতা নিজের কল্পনা হইতে নানাপ্রকার পোশাক তৈরি করাইবার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে আমাদের পোশাক অনেকটা পেশোয়াজের ধরনের হইয়া উঠিয়াছিল।[৫] এ-সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন : 'বাঙ্গালী মেয়ের বেশের প্রতি অনেক দিন অবধিই পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা, এবং তাহার সংস্কৃরণে একান্ত অভিলাষ ছিল। মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু অবিশ্রান্ত তাঁহার শিশুকন্যাদের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও তিনি ত্রুটী করেন নাই। আমাদের বাড়ীতে সেকালে খুব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান বালক বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্ত্তে নিত্য নূতন পোষাকে সাজিয়াছি।'[৬] এর পরে উলেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কিছুদিন বোম্বাই অঞ্চলে বাস করে প্রত্যাগমন করার পর। যথাসময়ে আমরা তা আলোচনা করব।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের পোশাকটির প্রতিও একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

সে সময় যেমন ধুতির সহিত দোবজা (চাদর) না থাকিলে পরিচ্ছদ ভদ্রোচিত হইত না, সেইরূপ পায়জামা ও পিরহানের উপর জোব্বা (বড় চোগা) না থাকিলে, এবং বাহিরে যাইতে হইলে জরীর থোবা দেওয়া লাল মখ্‌মলের টুপি ও শুঁড়তোলা লপেটা জুতা পরিচ্ছদে অপরিহার্য্য ছিল। মহর্ষির পরিবারে পুরুষেরা বাড়ীতে সাধারণতঃ ধুতি পরিতেন না, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া ধুতি পরিতেন। সেকালে পর্ব্ব উপলক্ষে নীল কোর দেওয়া তিন আঙুল চওড়া পাড়ের দেশী তাঁতের ধুতি ও জরী দেওয়া হাতিসিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি সকলকেই পরিতে হইত।'[৭]

লক্ষণীয়, তখন বাংলাদেশের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মতো ঠাকুরপরিবারের পোশাকেও মুসলমানী প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে আনুমানিক বারো বৎসর বয়সে তোলা রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যে-ধরনের পোশাক দেখা যায়, সেইটাই ছিল তখনকার অভিজাত পুরুষদের পোশাকের আদর্শ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র অরুণেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২৪ অগ্রহায়ণ [বুধ 9 Dec] তারিখে।

সম্ভবত মাঘ মাসে গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে। সিরাজগঞ্জ থেকে ২৩ পৌষ তারিখে গণেন্দ্রনাথকে একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'শ্রীমান্ গুণেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ শীঘ্র সম্পন্ন হইবে ইহাতে আহ্লাদিত আছি।'[৮] এইসময়ে গুণেন্দ্রনাথের বয়স ষোলো-সতেরো বছর মাত্র। বলা বাহুল্য, এই বিবাহ হিন্দুমতে নিষ্পন্ন হয়।

এই বৎসর ৬ মাঘ [সোম 18 Jan 64] থেকে ১১ মাঘ [শনি 23 Jan] পর্যন্ত আলিপুরে কৃষি-প্রদর্শনী হয়। *সোমপ্রকাশ*-এর ৬ মাঘ সংখ্যায় লেখা হয় : 'প্রদর্শনের শেষ দিবসে ফুল, ফল এবং তরকারি প্রভৃতির প্রদর্শন হইবে এবং নানা প্রকার তৈল, তৈলের কল, ময়দার কল ও জল তোলা কল প্রদর্শনের ঐ কয় দিবসে বাষ্প কর্তৃক পরিচালিত হইবে।' যদিও এই প্রদর্শনী সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তবু দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে

তা প্রবল ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছিল। পরবর্তীকালে ‘জাতীয় মেলা’ বা ‘হিন্দু মেলা’ প্রবর্তনের পিছনে এই কৃষি-প্রদর্শনীর প্রেরণা কার্যকরী হয়েছিল, এইরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নয়।

এ বৎসরের মাঝামাঝি সত্যেন্দ্রনাথ আই. সি. এস.-এর প্রথম পরীক্ষা দেন ও নির্বাচিত ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৩তম স্থান অধিকার করেন। ২০ আশ্বিন-এর [5 Oct 63] *সোমপ্রকাশ*-এ লিখিত হয় : ‘ব্লাক আক্টের অধিবাস।/প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতম বিচারপতি অনরেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং নূতন সিবিল পদপ্রাপ্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে ব্লাক আক্টের অধিবাস হইয়াছে।’ [পৃ ৭০১]। ঐ সংখ্যাতেই আবার সংবাদ দেওয়া হয়েছে : ‘ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাইয়ে কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এরূপ নিয়োগের কারণ এই, যিনি যে প্রেসিডেন্সির লোক, তিনি সে প্রেসিডেন্সিতে কর্ম্ম পাইলে পাছে চিত্তবিকারাদি জন্মে, এই নিমিত্ত তথায় কর্ম্ম দেওয়া হইবে না। ... সত্যেন্দ্রবাবু দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।’ [৫ম বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, পৃ ৭১২] ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’-এর এই জল্পনার প্রতিবাদ করেন স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ। সেই সংবাদ দিয়ে *সোমপ্রকাশ* লেখে :

> ১লা অক্টোবরের ইণ্ডিয়ান মিররে সম্পাদকীয় উক্তিতে লিখিত হইয়াছিল, “যে প্রেসিডেন্সিতে যাঁহার নিবাস, তিনি সেই প্রেসিডেন্সির সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত হইতে পারেন না বলিয়া বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাইয়ে নিযুক্ত হইলেন।” বাবু সত্যেন্দ্রনাথ সেইটী পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি গত ২৬-এ নবেম্বরে ইংলণ্ড হইতে উক্ত সম্পাদককে এক পত্র লিখিয়াছেন “আপনি আমার নিয়োগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার দেশীয় লোকদিগের কেহই আর সিবিল হইতে ইচ্ছু[ক] হইবেন না। সুতরাং আমাকে দুঃখিত হইয়া আপনার ভ্রমবিজৃম্ভিত বাক্যের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। জন্মদেশে সিবিল হইতে পারিবে না [?], তবে এ বৎসর বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ৩৫টী মাত্র পদ খালি ছিল, আমার যোগ্যতা পত্র ৪৩ সংখ্য হওয়াতে আমার প্রতি মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের অন্যতম মনোনীত করিবার অনুমতি হয়, আমি তদনুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক বোম্বাই মনোনীত করিয়াছি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বোম্বাইও আমার বাঙ্গালার ন্যায় স্নেহের পাত্র।” সত্যেন্দ্রবাবু বোম্বাইয়ে [? মাদ্রাজে] কর্ম্ম করিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে যে জনরব হয়, উক্ত পত্র দ্বারা তাহার অলীকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। তিনি অন্ততঃ কিছু দিন কর্ম্ম করেন, সকলের এই ইচ্ছা।[৯]

বর্তমান ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গের দীর্ঘ আলোচনার কারণ, সত্যেন্দ্রনাথের ইংলণ্ডবাস, আই. সি. এস. হওয়া এবং বোম্বাইকে কার্যক্ষেত্র রূপে বরণ করা ঠাকুরপরিবারের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই পরিবার বাংলাদেশে নানা দিক দিয়ে সংস্কারমুখী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেও, দেশীয় ভাবধারার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাই-প্রবাস তার মধ্যে সর্বভারতীয়তার ও ইংলণ্ড-বাস আন্তর্জাতিকতার মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করে দিয়েছিল। এর পর থেকে এই পরিবারের জীবনধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও সেই সুফল থেকে বঞ্চিত হননি। মনে রাখতে হবে, পিতার সান্নিধ্যে স্বল্পকালীন হিমালয় ভ্রমণ ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের সূত্রেই আমেদাবাদ-বোম্বাই-এ সর্বভারতীয় জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত এবং তাঁর প্রথম য়ুরোপ-যাত্রা তো সত্যেন্দ্রনাথের হাত ধরেই।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এই বৎসর শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩০ বৈশাখ [মঙ্গল, 12 May] এবং কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৪ শ্রাবণ [রবি 19 Jul] তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

১ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, পৌষ। ১৪৭

২ পুরাতনী। ৫৬

৩ ঐ। ২৭

৪ ‘আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার’ : *প্রদীপ,* ভাদ্র ১৩০৬। ৩১৭-১৮

৫ ‘পিতৃস্মৃতি’ : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৫৮

৬ *প্রদীপ,* ভাদ্র ১৩০৬। ৩১৮

৭ রবীন্দ্র-কথা। ১৬৯-৭০

৮ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৯ *সোমপ্রকাশ,* ১৩ মাঘ [৬ষ্ঠ বর্ষ ১১ সংখ্যা], পৃ ১৬৯

---

* দ্র ‘আমার বিবাহ’, ৩৭৪ নং আপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা, “পুণ্যযন্ত্রে” এবাদত খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১৩১০ সাল ৭ই আষাঢ়।

চতুর্থ অধ্যায়

১২৭১ [1864-65] ১৭৮৬ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের চতুর্থ বৎসর

এই বৎসর থেকে আমরা রবীন্দ্রজীবনের অজস্র তথ্য সরবরাহ করবার সুযোগ লাভ করি। এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের লেখা জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা এবং কিছু কিছু চিঠি, কোনো প্রবন্ধের অংশবিশেষ, আর ঠাকুরপরিবারেরই কারোর কারোর লেখা স্মৃতিকথা—রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনী রচনার ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণ রূপে গণ্য হত। এখন সে ক্ষেত্রে আমাদের হাতে এসেছে দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক হিসাবের খাতাগুলি —'নিজ হিসাবের কেস বহি' 'বা 'ক্যাশবহি'—যেগুলি সাংসারিক খরচের বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্যে পরিপূর্ণ, যা এই পরিবারের অনেকেরই—রবীন্দ্রনাথের তো বটেই—জীবনের বাইরের কাঠামোটি যথাযথভাবে গড়ে তোলায় প্রভূত সাহায্য করতে পারে। জোড়াসাঁকোয় আদি ভদ্রাসন-বাড়ির বাইরের একতলায় জমিদারি কাছারি ছিল—এই খাতাগুলি সেখানকার কর্মচারীদের দ্বারাই লিখিত। প্রতি বাংলা নববর্ষে শুধু পারিবারিক হিসাব রাখার জন্যই একাধিক খাতার সূচনা করা হত এবং প্রায় প্রতিদিন বাংলা তারিখ, বার ও ইংরেজি তারিখ দিয়ে বিভিন্ন খাতে খরচের হিসাব যথাসম্ভব বর্ণনা দিয়ে লেখা হত। অবশ্য সব সময়ে যে প্রাত্যহিক খরচ সেইদিনেই লেখা হয়েছে, তা নয়; ভাউচার [খাজাঞ্চিদের পরিভাষায় 'বৌচর'] ও কোনো কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি বা দায়িত্বশীল কর্মচারীর প্রদত্ত ফর্দ দেখে পরবর্তী কোনো দিনেও লেখা হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ভাউচারের নম্বর ও তারিখটিও উল্লিখিত হয়েছে—ফলে সেই বিশেষ খরচটি কোন তারিখে করা হয়েছিল তা নির্ণয় করা শক্ত হয় না। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের মধ্যেই কেউ হিসাবগুলি পরীক্ষা করে ক্যাশবহির প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, মাঝে মাঝেই দু-এক বৎসরের খাতা পাওয়া যায়নি—কিন্তু যা পাওয়া গেছে তাও কম নয়। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে এইরূপ খাতা বা ফাইল আছে প্রায় সাড়ে তিনশো—যার শুরু ১২৬৭-৬৯ বঙ্গাব্দের 'এষ্টেটের হিসাববহি' দিয়ে, শেষ হয়েছে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের 'কালিম্পঙের ক্যাশবহি'তে। আমরা এই বৎসর থেকে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই খাতাগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যও বহুলপরিমাণে ব্যবহার করব। হিসাবের কচ্‌কচিতে পাঠকেরা বিরক্ত হতে পারেন, কিন্তু এগুলির তাৎপর্য এমনই অসামান্য যে এদের এড়িয়ে চলা যায় না। এর থেকে আমরা রবীন্দ্রজীবনীতে বহু নূতন তথ্য যোগ করতে পারি, বহু তথ্য সংশোধন করতে পারি ও বহু তথ্যের যথাযথ স্থান-কাল নির্দেশ করতে পারি।

১২৭১ বঙ্গাব্দের 'নিজ হিসাবের কেস বহি'তে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখ আমরা এইভাবে পাই ২২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 3 Jun] তারিখে : 'সোমেন্দ্রনাথ/রবীন্দ্রনাথ বাবুর/চাকর/কালিদাস/৩ ॥০ হিঃ—৭৲'। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর [ছেলেবেলা-য় তার নাম 'ব্রজেশ্বর'], শ্যাম এবং 'বেঁটে গোবিন্দ' চাকরেরই শুধু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমগ্র বাল্য ও কৈশোর জীবনে এরা তিনজন ছাড়া বিভিন্ন সময়ে আরও বহু চাকরের

সেবা লাভ করেছেন, যাদের নাম তিনি করেননি। এখানে তেমনিই একজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে—যখন তাঁর বয়স সবে তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। এই তারিখেরই হিসাবে আমরা জীবনস্মৃতি বা অন্যান্য স্মৃতিকথার মাধ্যমে পরিচিত আরও কয়েকজন কর্মচারীর সাক্ষাৎ লাভ করি—কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ সর্দার ও পিয়ারী বা প্যারী দাসীকে। 'তোষাখানার চাকর ঈশ্বর দাষ'-কেও আমরা এই দিনে বেতন পেতে দেখি—কিন্তু সে রবীন্দ্রনাথ-কথিত গ্রাম্য পাঠশালার প্রাক্তন গুরুমহাশয় ঈশ্বর চাকর কিনা বলা শক্ত, কারণ জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখেছিলেন : 'এই সময়ে ঈশ্বর নামে একটি নূতন চাকর আমাদের কাছে নিযুক্ত হইল, সে ব্যক্তি গ্রামে গুরুমহাশয়গিরি করিত।'—সে আরও পরের কথা। অবশ্য চাকরদের ক্ষেত্রে বদলিরও দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তারা গোয়ালিনির সাক্ষাৎও হিসাব-খাতায় পাওয়া যায়—তাকে দুধের দাম হিসেবে ফাল্গুন ১২৭০ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৭১ চার মাসের জন্য ২৪২ টাকা এগারো আনা এক পয়সা দেওয়া হয়েছে, 'মাহ আসাড়' ও 'মাহ শ্রাবণ'-এর বিলও মাসিক ৬৪ টাকা করে। যত বড়ো পরিবারই হোক, তখনকার দিনে দুধের দামের কথা বিবেচনা করলে মনে হয় দুগ্ধের স্রোতে বাড়ি ভেসে যেত!

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত এই বৎসরেই। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়; কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর প্রথা ও বঙ্গদেশের প্রচলিত নীতি অনুসারে শুভদিন দেখিয়ে বাগদেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক বালককে হাতে খড়ি ধরান হয় নাই। অন্য কোনও প্রকার অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানও এই উপলক্ষকে জয়যুক্ত করে নাই।'[১] তিনি বলেছেন, এই শিক্ষা আরম্ভ হয় গৃহস্থিত গুরুমশায়ের কাছে, তাঁর নাম ছিল মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাড়ি বর্ধমান জেলায়।[২] জোড়াসাঁকো বাড়ির ঠাকুরদালানে বসত এই পাঠশালা, তাতে শুধু বাড়ির শিশুরা নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেরাও পড়ত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও একজন গুরুমশায়ের বর্ণনা করেছেন এইভাবে : 'একেবারে সেকেলে পণ্ডিতের জ্বলন্ত আদর্শ। রং কালো, গোঁপ-জোড়া কাঁচাপাকায় মিশ্রিত মুড়া-খ্যাংরার ন্যায়।...মুখে কখনও এতটুকু হাসি দেখা যাইত না। ...তাঁহার একগাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সেটিকেও তিনি সযত্নে তেল মাখাইতেন। ...অপরাধে, বিনা-অপরাধে, যখন-তখন, এই বেতগাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠসংস্পর্শে আসিত...আর সেইসঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে না হইত, তাহাও নয়।'[৩] নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কথিত এই গুরুমশায়ই মাধবচন্দ্র কিনা। যদি না হন, তা হলেও স্বভাব-প্রকৃতিতে সেকালের গুরুমশায়েরা প্রায় একই রকম ছিলেন, তথাকথিত মাধবচন্দ্র নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। 'তথাকথিত' বলছি এইজন্য যে, এই নামের বা এইরূপ কাজের জন্য কোনো বেতনভোগী কর্মচারীর অস্তিত্ব আমরা ক্যাশবহি-তে পাই না; যদিও ১৮ শ্রাবণ ১২৭৩ [বৃহ 2 Aug 1866] 'ছেলেবাবুদিগের পণ্ডিতকে খয়রাত' খাতে চার টাকা খরচ করতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও শিশু কাব্যের অন্তর্গত 'পুরনো বট'[৪] কবিতায় জনৈক মাধব গোঁসাই-এর উল্লেখ করেছেন : 'ওখানেতে পাঠশালা নেই,/পণ্ডিতমশাই—/বেত হাতে নাইকো বসে/মাধব গোঁসাই।'[৪]

রবীন্দ্রনাথের দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ উভয়েই তাঁর চেয়ে বয়সে দু-বছরের বড়ো হলেও তাঁরা প্রতিপালিত হতেন তিনজনে একসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল, কিন্তু সে-কথা আমার মনেও নাই।'[৫] অন্যত্র তিনি একটু বিস্তারিতভাবেই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন : 'ঐখানে [বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে অর্থাৎ পুজোর দালানে]

গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদেরও ঐখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় ঐখানেই স্বরে-অ স্বরে-আ'র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌরলোকের সবচেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনাওয়ালা কোনো দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।'[৬]

বইয়ের ব্যবস্থাও ছিল! ক্যাশবহি-তে ২২ ভাদ্র-এর [মঙ্গল 6 Sep] হিসাবে দেখা যায়—'পুস্তক খরিদ—/.../ছেলেবাবুদীগের কারণ/প্রথমভাগ ২খান' বাবদ দু-আনা খরচ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তিন বছর চার মাস, সোমেন্দ্রনাথের পূর্ণ পাঁচ বছর ও সত্যপ্রসাদের পাঁচ বছর পূর্ণ হতে এক মাস বাকি। সুতরাং অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, বইদুটি সোমন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের জন্যই কেনা হয়েছিল অর্থাৎ তাঁরা দুজন এই সময় থেকে পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ করেছিলেন। সর্বক্ষণের সঙ্গী শিশু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অনুবর্তী হতে পারেন, কিন্তু সঠিক অর্থে শিক্ষার আয়োজন তাঁর জন্য অন্তত এই সময়ে করা হয়নি। এই আয়োজন দেখা গেল চার মাস পরে ২৪ পৌষ [শুক্র 6 Jan 1865] তারিখে—ওই দিন আবার 'ছেলেবাবুদীগের বহিখরিদ' করা হয়েছে দু-আনা দিয়ে দুখানা 'বর্ণপরিচয়' ও তিন আনা দিয়ে 'শিশুশীক্ষা' [ক'খানা উল্লেখ করা হয়নি, অনুমান করতে পারি এই বইটি তিনখানা কেনা হয়েছিল—1855-এ প্রকাশিত Rev. J. Long-এর *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* -এ বইটির দাম এক আনা উল্লেখ করা হয়েছে।[*]]—শিশুশিক্ষা-র তৃতীয় কপিটি রবীন্দ্রনাথের জন্যই কেনা হয়েছিল, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে, তাঁর বয়স তখন তিন বছর আট মাস মাত্র। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পঠিত প্রথম পুস্তকের গৌরব মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা—প্রথম-ভাগ-এর প্রাপ্য। এই গ্রন্থের মাধ্যমে অক্ষর পরিচয় ঘটায় এর একটি বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের মনে দুর্মর সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর বিখ্যাত বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ-এ[৭] বাংলা ভাষায় প্রয়োগ নেই বলে দীর্ঘ-ঋ ও দীর্ঘ ৯-কে স্বরবর্ণ থেকে এবং যুক্তাক্ষর বলে 'ক্ষ'-কে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে বাদ দিয়েছিলেন—কিন্তু বর্ণগুলি শিশুশিক্ষা-য় পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শেষোক্ত বই থেকেই অক্ষর পরিচয় ঘটেছিল বলে পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথ এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি, তার প্রমাণ মেলে 'পকেট-বুক' নামে বিখ্যাত তাঁর খসড়া রচনা-খাতায় :

> দুই বুড়ো ঋ ৠ
> চলে ধীরি ধীরি।
> দুই বোন ৯ ল
> হাসে খিলি খীলি।
> হ হাঁচে হ ক্ষ
> ক্ষ কাশে খ ক্ষ।

—এমন-কি 'সহজ পাঠ—প্রথম ভাগ' [বৈশাখ ১৩৩৭]-এ 'ৠ' 'ল' বর্জিত হলেও 'ক্ষ' অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে নিজের স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

যদিও রবীন্দ্রনাথের জন্য বিশেষ করে বর্ণপরিচয়-প্রথম ভাগ কেনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবু এই বইটিও তাঁর প্রথমশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেই মনে হয়। তিনি লিখেছেন : "তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের

তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।“[৮] এই বর্ণনা বর্ণপরিচয়-প্রথম ভাগ-কেই মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও আমাদের দ্বিধা সম্পূর্ণ কাটে না। কারণ উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় পাঠে ‘জল পড়ে’ বাক্যটি থাকলেও ‘পাতা নড়ে’ বাক্যটি নেই এবং অষ্টম পাঠে বাক্যদুটিকে পাওয়া যায় একেবারে গদ্যাত্মক চেহারায়—‘জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।’—যাকে আদিকবির প্রথম কবিতা বলা শক্ত।

পাঠশালার কথার পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘তার পরে বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষন্ডামার্ক মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ অবতার—বোধ করি সীসের ফলকে খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।’[৯]

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন সিদ্ধান্ত করেছেন, এই বই শিশুবোধক* ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি লিখেছেন, “গুরু মশায়ের ওই পাঠশালাতে অ আ ক খ শেখার অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ এই সচিত্র শিশুবোধক পড়েছিলেন। কেননা, এই বইএরই ‘প্রহ্লাদচরিত্র’-নামক শেষ কবিতায় আছে ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালায় পাঠগ্রহণ-কালে শিশু প্রহ্লাদের উপর পিতা হিরণ্যকশিপুর অমানুষিক অত্যাচারের এবং পরিণামে নৃসিংহের হাতে হিরণ্যকশিপুবধের ভয়াবহ বিবরণ। এই বইএ হিরণ্যকশিপুবধের যে ছবিটি আছে তাও রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে। তা ছাড়া, এই বইতেই প্রহ্লাদচরিত্রের পরে আছে ১০৫টি চাণক্যশ্লোক ও তার বাংলা পদ্যানুবাদ। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, এই সচিত্র শিশুবোধক রবীন্দ্রনাথের প্রথম পড়া বই বলে অসামান্য গৌরবলাভের এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হবার অধিকারী।’[১০]

কিন্তু উপরে ক্যাশবহি থেকে যে হিসাব উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে রবীন্দ্রনাথ পাঠশালায় পড়েছিলেন এ কথা মেনে নিলেও পাঠ্যপুস্তকরূপে শিশুবোধক-এর জন্য স্থান করে দেওয়া অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। কারণ এই পর্বে দু-দফায় যে বই কেনা হয়েছে, তাতে আমরা ‘প্রথম ভাগ’ [দাম দেখে বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ হওয়াই সম্ভব বলে মনে হয়], বর্ণপরিচয় ও শিশুশিক্ষা-র কথাই জানতে পেরেছি, শিশুবোধক কেনা হয়েছে এমন কোনো ইঙ্গিত মেলেনি। আসলে, শিশুবোধক তিনি পড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রথম-পড়া বই হিসেবে নয়, এটি তাঁর পঠিত তৃতীয় বই—এবং সেটি পড়েছিলেন, বাড়িতে পাঠশালা-পর্বে নয়, স্কুল-পাঠ্য বই হিসেবে বিদ্যালয়-পর্বে। ২৫ চৈত্র [বৃহ 6 Apr 1865] তারিখের হিসাবে দেখা যায় : ‘ছেলেবাবুদীগের ৩ জনের জন্য ইস্কুলের কেতাপ খরিদ ৩ খানা’, ব্যয়ের পরিমাণ ছ-আনা। আমাদের ধারণা, এই ‘ইস্কুলের কেতাপ’খানিই শিশুবোধক—লঙ্ সাহেবের ক্যাটালগে প্রদত্ত বইটির নাম আমাদের ধারণাকেই সমর্থন করে।

‘শিশুবোধক রবীন্দ্রনাথের প্রথম-পড়া বই’ এই মন্তব্য ছাড়া অধ্যাপক সেনের পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমাদের বক্তব্যের অনুকূল : ‘রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল শিশুশিক্ষা দিয়ে এবং তার পরে সম্ভবতঃ বর্ণপরিচয়ের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তারও পরে পড়েছিলেন শিশুবোধক, আর এই শিশুবোধকেই পেয়েছিলেন মূলপাঠসহ চাণক্যশ্লোকের বাংলা পদ্যানুবাদ।’[১১] আর এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পুরো ইতিহাসটিকে গুছিয়ে আনতে পারি এইভাবে : বর্ণপরিচয়-প্রথমভাগ দিয়ে সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ যখন ভাদ্র [Sep 1864] থেকে শিক্ষারম্ভ করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁদের সঙ্গী ছিলেন না; তিনি পাঠশালায় যেতে শুরু করলেন পৌষ মাস [Jan 1865] থেকে, শিশুশিক্ষা অবলম্বনেই তাঁর অক্ষর পরিচয় হয়, কিন্তু

'বর্ণযোজনা' শেখেন বর্ণপরিচয় থেকে—'কর খল' এবং 'জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে' পাঠই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভাবী মহাকবির 'সমস্ত চৈতন্য' গদ্যের সেই সাদাসিধে রূপের অন্তরে নিহিত ছন্দটুকু আবিষ্কার করে গদ্যের ঘটমান বর্তমানকে কবিতার নিত্য বর্তমানে পরিণত করেছে। * এর পরে এসেছে শিশুবোধক, সেখানে পুনরায় শিশুশিক্ষার 'ঋ ল ক্ষ' বর্ণ তিনটিকে পেয়ে এমন এক সংস্কারে পরিণত হয়েছে যার প্রভাব পরিণত বয়সেও তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

এর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

তাহার পরে যে-কথাটা মনে পড়িতেছে তাহা ইস্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম, দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর-কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে কোনদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যন ইস্কুল-পথের ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি-অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।"...কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অকালে ভরতি হইলাম।[১২]

ক্যাশবহির সাক্ষ্য কিন্তু অন্য কথা বলে। এমন হতে পারে , সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদকে স্কুলে ভর্তি ও গাড়ি চড়ে বাইরে যেতে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে ঈর্ষা-জনিত ক্রন্দনের বেগ উপস্থিত করেছিল ও সেই 'কান্নার জোরে' কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে হয়েছিল—কিন্তু তাঁরা ভর্তি হয়েছিলেন একই মাসে, তাঁদের ভর্তির হিসাব ক্যাশবহিতে একসঙ্গেই লিখিত হয়েছে। আর স্কুলটির নামও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নয়—'কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমি'।[১৩] ক্যাশবহি-তে ২৬ চৈত্র ১২৭১ [শুক্র 7 Apr 1865] লেখা হয়েছে :

পড়িবার খরচ খাতে/খরচ—৬৲

বঃ কলিকাতা ট্রেনি° একাডিমী

দঃ রবিন্দ্রনাথঠাকুরের/মার্চ্চ মহার/১ বিল°—২৲ /ডিপাজিট—২৲

সোমেরিন্দ্রনাথঠক/মার্চ্চমহার/১ বিল—২৲/ডিপাজিট—২৲

বাবুঃ সত্যপ্রসাদ গঙ্গপাধ্যায়/মার্চ্চ মাহার/১বিল°—২৲/ডিপাজিট—২৲

তিনজনের ক্ষেত্রেই ডিপজিটের উল্লেখ প্রমাণ করে যে তিনজনে একই মাসে স্কুলে ভর্তি হন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তিন বছর দশ মাস মাত্র।

উপরে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র হিসেবে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' এত দিন পর্যন্ত যে গৌরব লাভ করে এসেছে, এখন থেকে সে গৌরবের অধিকারী হবে 'কলিকাতা [ক্যালকাটা] ট্রেনিং একাডেমি', যার তৎকালীন ঠিকানা ছিল ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট এবং বর্তমানে স্কুলটি ১৩ নং ডাঃ নারায়ণ রায় সরণি [সিমলা স্ট্রীট] ঠিকানায় শ্রীমানী বাজারের ঠিক পিছনে অবস্থিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে স্কুলটি কেন 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'-রূপে চিহ্নিত হয়ে ছিল—এ প্রশ্নের কোনো সমাধান আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। এ কথা ঠিক যে, এই বয়সের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে স্পষ্ট থাকার কথা নয় সুতরাং কারো মুখে শুনেই এই ধারণা তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই ভুল সংবাদ তাঁকে কে কেন দিয়েছিলেন তা বোঝা যায় না; তাঁর জ্যেষ্ঠদের মধ্যেও কেউ এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন না। শুধু একটি সম্ভাবনার কথা মনে হয়।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন, এ কথা আমরা তাঁদের স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি। আমাদের আলোচ্য সময়েও তিনি মাসিক কুড়ি টাকা বেতন পেতেন, ক্যাশবহিতে তার উল্লেখ দেখা যায়। এমন হতে পারে, এই ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর অনুষঙ্গই রবীন্দ্রনাথের মনে উক্ত ধারণা সৃষ্টি কারণ।

বিশিষ্ট গবেষক গোপালচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের কথাকে অকাট্য ধরে নিয়ে লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হওয়ার প্রসঙ্গ এবং ঐ স্কুলে ছাত্র শাসন পদ্ধতির যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, সে কথা স্বীকার করে নিয়েও তো বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই সঙ্গী ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার আগে অল্প কয়েক দিনের জন্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়েছিলেন। অল্প কয়েকদিনের জন্য বললাম এই জন্য যে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত ছাত্র শাসনের কথা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকরা জানতে পেরে, ঐ স্কুল থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে তখনই সরিয়ে এনেছিলেন।[১৪]

বিখ্যাত রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ [1893-1972] একসময়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা সম্পর্কে তথ্যসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকেও প্রশ্ন করে তার উত্তর একটি খাতায় লিখে রাখেন, বর্তমানে খাতাটি রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহে এসেছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

কবির প্রথম স্কুলে যাওয়া [বরানগর, ৩০ জানুয়ারি ১৯৩২, কথাবার্ত্তা] পঞ্চম বৎসরে প্রথম স্কুলে যাই। জীবন-স্মৃতিতে একটু ভুল লিখেছি। Oriental Seminary আর আড্ডির স্কুল। কিন্তু পরে দাদাদের কাছে শুনেছিলাম যে ওর একটা স্কুল তার আগেকার আমলের।

এই বিবৃতিতেও ভুল আছে, পঞ্চম বৎসরের আগেই তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন—কিন্তু আশা করি, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি-সংক্রান্ত বিতর্ক সম্ভবত এই স্বীকারোক্তির সাক্ষ্যে পরিত্যক্ত হবে। তাছাড়া রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত ও সংশোধিত প্রথম সংস্করণ জীবনস্মৃতি-তে দেখা গেল, তিনি 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' শব্দগুলি ৫, ২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় প্রথমবন্ধনী-ভুক্ত করে মার্জিনে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বসিয়েছিলেন। এটিও একটি অতিরিক্ত যুক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

প্রসঙ্গত, কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমির ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করা যেতে পারে। 2 Jun 1859 তারিখে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ধর, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত এবং বৈষ্ণবচরণ [বৈষ্ণবদাস?] আঢ্য প্রসিদ্ধ ধনী শ্যামাচরণ মল্লিকের সহায়তায় 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের দক্ষিণে তখন বিখ্যাত ধনী শংকর ঘোষের একটি বৃহৎ জরাজীর্ণ বাড়ি ছিল। বাড়িটির তৎকালীন মালিক খেলাতচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে মাসিক ৫০ টাকা ভাড়ায় বাড়িটি নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নাম প্রথমে ছিল 'মেট্রোপলিটান ট্রেনিং স্কুল', পরে নাম পরিবর্তিত করে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' রাখা হয়। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলটির প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। Jan 1860 থেকে স্কুলটিতে শিশু বিভাগ খোলা হয়, বেতন ধার্য হয় মাসিক এক টাকা। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরকে সভাপতি, ঠাকুরদাস চক্রবর্তীকে সম্পাদক, মাধবচন্দ্র ধরকে কোষাধ্যক্ষ এবং পূর্বতন সভ্যদের সঙ্গে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি কয়েকজন নূতন সভ্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কিছুদিন পরে একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হলে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী পদত্যাগ করে সম্ভবত Apr 1861 থেকে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্পদিন পরে মাধবচন্দ্র ধরও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ট্রেনিং স্কুল নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 1864 থেকে 'মেট্রোপলিটান স্কুল' নাম গ্রহণ করে।*

২৫ চৈত্র [বৃহ 6 Apr] রবীন্দ্রনাথের তিনজনের জন্য তিনটি 'ইস্কুলের কেতাপ' ছ'আনা দিয়ে কেনার হিসাব পাওয়া যায়, এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এখন প্রশ্ন, এই বই তিনটি কী বই? আমাদের ধারণা, এই বই হচ্ছে 'শিশুবোধক'। রেভারেণ্ড লঙ্-প্রণীত দেশীয় পুস্তকের তালিকায় ২৩৫ সংখ্যক পুস্তকের বিবরণে লেখা আছে 'Shisubodhok, CHILD'S INSTRUCTOR, 1854, pp. 81, 2 as.' তখনকার দিনে পুস্তকের মূল্যের খুব একটা হেরফের হত না, আর যেখানে শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়-এর মতো উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তখন প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য 1854-এ প্রকাশিত দু—আনা দামের শিশুবোধক 1865-এও একই দামে বিক্রীত হত, এমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয় এবং এই দাম আমাদের প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ। আর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তীব্র মনোমালিন্যের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-রূপে গড়ে ওঠা 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি'তে বিদ্যাসাগর-রচিত বর্ণপরিচয় কিংবা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি' থেকে প্রকাশিত শিশুশিক্ষা পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হবে না এটাই স্বাভাবিক। এর বাইরে শিশুবোধক ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ তখন বাংলায় প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি'র শিশুশ্রেণীর ছাত্ররূপে রবীন্দ্রনাথ 'শিশুবোধক' থেকে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, এমন ধারণা অমূলক নয়।

এইবার বৎসরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। গত বৎসর সত্যেন্দ্রনাথ আই. সি. এস. পরীক্ষার যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষায় ৪৩তম স্থান অধিকার করেছিলেন, এই বৎসর June মাসে অপেক্ষাকৃত সহজ শেষ পরীক্ষায় ৫২ জনের মধ্যে ষষ্ঠ হয়ে উত্তীর্ণ হন এবং কার্তিকের গোড়ায় [Oct 1864] কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর বন্ধু ও সহ-পরীক্ষার্থী মনোমোহন ঘোষ এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ইংলণ্ডেই থেকে যান, তাঁর ইংলণ্ডে বসবাসের ও লেখাপড়ার সমস্ত খরচ দেবেন্দ্রনাথই বহন করতে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসবার পর ২৮ কার্তিক শনি 12 Nov সন্ধ্যায় বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি তিন শতাধিক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.-কে সংবর্ধিত করেন।[১৫] অনতিকাল পরেই অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতে [Nov 1864] সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর চতুর্দশী পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে তাঁর কর্ম্মস্থল বোম্বাই প্রদেশে যাত্রা করেন। স্বভাবতই ঘটনাটি ঠাকুরপরিবারে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবন থেকেই স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। লণ্ডন-প্রবাসে থাকার সময়ে স্ত্রীকে লিখিত পত্র থেকে জানা যায় তিনি কিশোরী স্ত্রীকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন এবং এ-বিষয়ে তিনি পিতাকে অনুরোধ করে পত্রও দেন। কিন্তু রক্ষণশীল পিতা যে তাতে সম্মত হননি, তা জানা যায় সত্যেন্দ্রনাথের 2 Jul 1864 [শনি ১৫ আষাঢ়] এ লেখা পত্র থেকে 'বাবামশায় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মানমর্য্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি।'[১৬] সুতরাং তিনি যখন পত্নীকে কর্মস্থলে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ সে-প্রস্তাবে যে সহজে সম্মত হননি, তা অনুমান করা শক্ত নয়। স্বর্ণকুমারী দেবী এই যাত্রার একটি বিবরণ দিয়েছেন :

তখন অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতে হইলে ঘেটাটোপ মোড়া পাল্কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্কী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে। স্ত্রীকে মেজ দাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই সমুদ্রপার, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী

চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই নূতন এতই লজ্জাজনক যে বাড়ী শুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্‌কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল। একজন ফ্রেঞ্চ মহিলা তাঁহার বহির্গমনের উপযোগী নূতন বেশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।'[১৭]

জাহাজ নানা জায়গায় থেমে বোম্বাই পৌঁছতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। সেখানে জাহাজ-ঘাটায় বিপুল সংবর্ধনা লাভের পর মানকজী করসদজী নামক এক পারসি ভদ্রলোকের গৃহে প্রায় তিন মাস অতিথি হয়ে থাকেন। এখানে প্রথম যে-সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা হল জ্ঞানদানন্দিনী হিন্দি বা ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত নন, সুতরাং কথাবার্তা বলা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় সমস্যা স্ত্রীলোকের শোভন পরিচ্ছদের। নানারকম পরীক্ষার পর পারসি শাড়ি ও জামার নমুনায় এবং গুজরাটী মেয়েরা যেভাবে শাড়ি পরে তার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে জ্ঞানদানন্দিনীর পরিচ্ছদ-সমস্যার সমাধান করা হল, যা কালক্রমে বাঙালি মেয়েদের সার্বজনীন পোশাক হয়ে দাঁড়ায়।

অন্তঃপুরের এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কেও দেবেন্দ্রনাথ এক পরিবর্তনের সম্মুখীন হলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের পক্ষপাতী হলেও এ ব্যাপারে তাড়াহুড়োর বিরোধী ছিলেন। হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মদের প্রতিকূল হয়ে উঠুক এমন পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর এই মনোভাব যে সুফলপ্রসূ হয়েছিল, তা বোঝা যাবে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের উক্তিতে : 'যদিও সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া এই সাধক-সম্প্রদায়ের [ব্রাহ্মদের] সহিত হিন্দু-সমাজের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল—তথাপি চিন্তাশীল হিন্দুমাত্রেরই সহিত এই সাধক-সম্প্রদায় ক্রমশ ঘনীভূত হইতেছিলেন। ...হিন্দুগণ ক্রমশ বুঝিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম কোন নবধর্ম্ম নহে—বেদ ও উপনিষদাদি-মথিত ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হিন্দুধর্ম্ম মাত্র।'[১৮] কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীরা দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে রক্ষণশীল বলে মনে করতেন। ফলে ভিতরে ভিতরে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রধানত কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় ১৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 2 Aug] প্রথম অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত হল। মাত্র কয়েক দিন পরে ৬ ভাদ্র [রবি 21 Aug] তাঁরই আগ্রহে সমাজে দু'জন উপবীত-ত্যাগী উপাচার্য নিযুক্ত হন—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ঘটনা-দুটির গুরুত্ব অসামান্য। যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এতদিন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কেহ জাতিচ্যুত হন নাই, কারণ, আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের ভিত্তিভূমি বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজ বর্ণাশ্রমের বিরোধী হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।'[১৯] এরপর ১৫ কার্তিক [রবি 30 Oct] কেশবচন্দ্র 'বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন উদ্দেশ্যে' 'প্রতিনিধি সভা' স্থাপন করেন এবং এই কার্তিক মাস থেকেই উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মুখপত্র হিসেবে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকা মাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে : 'ধর্ম্মনীতি; ধর্ম্মতত্ত্ব; সামাজিক উন্নতি; ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি; নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা; সাধুদিগের জীবন; বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক হইতে সত্য ধর্ম প্রতিপাদক ভাব; এই সমুদায় ঐ পত্রিকার লেখা বিষয়।' ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* থাকা সত্ত্বেও *ধর্মতত্ত্ব* পত্রিকার প্রকাশ ও অন্যান্য আচরণের মধ্য দিয়ে নব্যদল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন, এমন সন্দেহ স্বতই প্রাচীন দলের মনে উদিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ নিজেও কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও এতখানি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক ও পারিবারিক নানা নির্যাতন সহ্য করে যাঁরা ব্রাহ্মধর্মের বিস্তারে দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্য করে এসেছেন, তাঁদের পরিত্যাগ করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। এর ফলে অগ্রহায়ণ মাসে ব্রাহ্মসমাজের

ট্রাস্টী-রূপে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ট্রাস্টডীড অনুযায়ী উপাসনা-কার্য সম্পাদনের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথকে সম্পাদক নিযুক্ত করে তাঁর হাতে সমস্ত ট্রাস্ট-সম্পত্তি অর্পণ করেন ও তাঁকে সাহায্য করার জন্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন।[২০] কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা সমস্ত দায়িত্বভার ত্যাগ করলেন। যদিও এর পর ১১ মাঘ [সোম 23 Jan 1865] পঞ্চত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র যোগ দেন ও বক্তৃতা করেন, তবুও ব্রাহ্মসমাজের এই ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়নি, যার পরিণতি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠায়।

এই সব ঘটনা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য-মণ্ডিত। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্মসমাজে যে প্রচারের উদ্দীপনা এনেছিলেন, বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে যে ব্যাপক ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, তাঁদের হারিয়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ—যা পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে আখ্যাত হয়েছে—একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ নানা সময়ে তার মধ্যে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করেছেন—কিন্তু নিয়মিত উপাসনা, মাঘোৎসব ও *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* প্রকাশ ছাড়া কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর এই সমাজ আর রাখতে পারেনি। অপরপক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের সমাজসংস্কারমূলক অত্যুৎসাহী কার্যকলাপের ফলে ধীরে ধীরে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রথমে প্রবল বিরোধিতা ও পরে এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে, যার ফলে অন্তর ধর্মের দিক থেকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গ আমরা পরেও মাঝে মাঝেই উত্থাপন করব।

এই বৎসর ২০ আশ্বিন [বুধ 5 Oct] সকাল দশটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত প্রবল ঝড় হয়, যার ফলে কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু ঘরবাড়ি ভয়ংকারভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কারণে পরবর্তীকালে এই বৎসরকে অনেকেই 'আশ্বিনের ঝড়ের বছর' বলে উল্লেখ করেছেন। এই ঝড়ে চিৎপুর রোডে অবস্থিত ব্রাহ্মসমাজের ত্রিতল বাড়িটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় কার্তিক মাস থেকে বুধবারের সাপ্তাহিক সায়ংকালীন উপাসনা সাময়িকভাবে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই ঘটনাটিও উপরোক্ত মনোমালিন্যে বেশ-কিছু পরিমাণ ইন্ধন যোগায়।

১০ আষাঢ় [সোম 27 Jun] দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মদীক্ষা' বা 'ধর্মদীক্ষা' দেন। এই অনুষ্ঠানটি তাঁর ক্ষেত্রেই প্রথম প্রবর্তিত হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন : 'আমার উপনয়ন প্রচলিত প্রথা-অনুসারেই হইয়াছিল। আমার দীক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। আমার বোধ হয়, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান।'[২১] ব্রাহ্মসমাজে শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষ দেবেন্দ্রনাথ এই প্রথা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এইরূপ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানকে প্রণালী-বদ্ধ করবার চেষ্টা বহুদিন ধরেই করা হচ্ছিল। এইবার সেইগুলিকে একত্রিত করে 'অনুষ্ঠান পদ্ধতিঃ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।*

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারী দেবীর একমাত্র সন্তান অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে [May 1864]। সম্ভবত প্রসব-জনিত পীড়ায় দু-এক দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।† তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পুত্রের জাতকর্ম অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন হয়।

বোলপুর-শান্তিনিকেতনে গৃহ-নির্মাণের কিছু কিছু সংবাদ এই বৎসরের ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায়। ৯ বৈশাখ [বুধ 21 Apr] বোলপুরের হিসাবে 'চুন ও বরগা ও রং খরিদ' বাবদ ১৩৮ টাকা ৮ আনা ৩ পাই এবং ১ অগ্র [মঙ্গল 15 Nov] 'শান্তিনিকেতন খাতে' জনৈক রফিমদ্দী মিস্ত্রীকে 'শান্তিনিকেতনের গাথনির হিসাব সোদ' করা হয় ১৬ টাকা ৫ আনায়। অনুমান করা যায়, এই সব খরচ বর্তমান শান্তিনিকেতন-গৃহকে কেন্দ্র করেই। হেমেন্দ্রনাথ কয়েকবার বোলপুর যাতায়াত করছেন এমন হিসাবও আমরা ক্যাশবহি-তে দেখতে পাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বৎসর কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা কলেজ' [পরবর্তী নাম 'অ্যালবার্ট কলেজ'] থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এফ. এ. পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। লক্ষণীয়, তাঁর চেয়ে চার বছরের বড়ো দাদা বীরেন্দ্রনাথ তখনও স্কুলের ছাত্র, তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 1866-এ। হেমেন্দ্রনাথকে এই সময়ে জনৈক এল. এ. ডিকোরোজা [ডিক্রুজ?] সাহেবের কাছে ফরাসি ভাষা শিক্ষা করতে দেখা যায়। এই শিক্ষা আরও কয়েক বৎসর চলেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' এই বৎসর [Mar 1865] প্রকাশিত হয়।

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মতারিখ : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—১২ আষাঢ় [বুধ 29 Jun], রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—৫ ভাদ্র -[শনি 20 Aug]; কামিনী রায় [সেন]—২৭ আশ্বিন [বুধ 12 Oct]।

উল্লেখপঞ্জি

১ রবীন্দ্র-কথা। ১৬৩

২ দ্র ঐ। ১৬৪

৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ২৫-২৬

৪ *বালক*, ভাদ্র ১২৯২। ২২৬-৩০; শিশু ৯। ৯০-৯৪

৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৬৫

৬ ছেলেবেলা ২৬। ৬১১

৭ প্রথম প্রকাশ : Apr 1955 [বৈশাখ ১২৬২]

৮ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৬৫

৯ ছেলেবেলা ২৬। ৬১১

১০ 'শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়' : বিদ্যাসাগর স্মারক-গ্রন্থ [১৩৮১]। ১৩

১১ ঐ। ৩৮

১২ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৬৬

১৩ দ্র জীবনস্মৃতি [১৩৭৫]। ২৮৫, 'গ্রন্থপরিচয়'

১৪ গোপালচন্দ্র রায় : রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন [১৩৯৩]। ৩৪

১৫ দ্র *The Hindoo Patriot*, Vol. XI, No. 46, p. 362

১৫ পুরাতনী। ৫৮

১৭ *প্রদীপ*, ভাদ্র ১৩০৬। ৩১৮

১৮ 'বীরপূজা' : যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী ২ [২য় সং, বসুমতী]। ২২৪

১৯ ঐ। ২২৫

২০ দ্র 'বিজ্ঞাপন' : তত্ত্ব, পৌষ। ১৪৮

২১ 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' : *প্রবাসী*, মাঘ ১৩১৮। ৩৮৯

---

* '212 Sishu Sikha, pt. 1 by Madan Mahan [Tarkalankar], 1st ed. 1849. pp. 28, 10 ed. 1855, S. P. [Sanskrit Press], pp. 27, 1 an. A good elementary work, containing spelling to 3 syllables, simple reading lessons—the author was a Professor in the Sanskrit College.'

* 'Shisubodhok, CHILD'S INSTRUCTOR, 1854, pp. 81, 2as. 18 mo.' —Long's '*A Descriptive Catalogue...*' '*Catalogue of Bengali Books for Schools.* Vernacular Medical Classes, Normal Schools, &c.' [1875] গ্রন্থে শিশুবোধক-এর প্রণেতা হিসেবে 'The late Subhankar Das Pandit'-এর নাম করা হয়েছে। ১৩০৫ সালের একটি সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'শিশুবোধক,/অর্থাৎ/বালক শিক্ষার্থ।/বর্ণমালা, বানান, ফলা, পত্র, আর্য্যা, নামতা,/ অঙ্ক, অঙ্করীতি, গঙ্গার বন্দনা,/ গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, কলঙ্কভঞ্জন, চাণক্য-/ শ্লোক এবং প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি। প্রতিমূর্ত্তি সহিত।' ৯৬ পৃষ্ঠার এই বইটির চিত্রগুলি কাঠ-খোদাই—'শ্রীহীরালালকর্মকারের কৃত/সাং বটতলা' [অন্যান্য সংস্করণেও এই চিত্রগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে]।

* বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়'-এর বিভিন্ন সংস্করণে প্রচুর পাঠ-পরিবর্তন করতেন, এই যুক্তিতে গোপালচন্দ্র রায় আমাদের অনুমানের বিরোধিতা করে লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ যে বার বার বলেছেন—তিনি বর্ণপরিচয় ১ম ভাগে জল পড়ে, পাতা নড়ে, পড়েছিলেন, সে সম্বন্ধে ১৮৬৪। ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বর্ণপরিচয় ১ম ভাগে এর বিপরীত কিছু না দেখা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কথাকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।' [রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন। ২০]। আমরা দায়িত্বটি গোপালবাবুকেই সমর্পণ করছি। এরূপ কোনো পাঠ তিনি দেখাতে পারলে আমরা ভুল স্বীকার করে নেব।

* তথ্যগুলি বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা গ্রন্থ [1975]-এর অন্তর্ভুক্ত সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী লিখিত 'মেট্রোপলিটান ইন্‌সটিটিউসনের ইতিহাস : আদিপর্ব' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

* 'অনুষ্ঠান পদ্ধতিঃ /জাতকর্ম্মনামকরণোপনয়নদীক্ষা-/বিবাহান্ত্যেষ্টিশ্রাদ্ধেতি-/ সপ্তবিধসংস্কারাত্মিকা/ এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ৷৷০ আট আনা'—'বিজ্ঞাপন', তত্ত্ব, ফাল্গুন ১৭৮৬ শক। ১৮৪

† ক্যাশবহি-তে ১৫ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 27 May] তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'শ্রীমতী : শুকুমারি শুন্দরির/নবকুমার হওয়ার সংবাদ/ দেওয়া লোকের বকশীষ/১০' এবং 'শ্রীমতী শুকুমারি শুন্দরির পিড়া হয়ায় ডা° বেলি...ফিচ ১৬'। লক্ষণীয়, সুকুমারী দেবীর স্বামী দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য জামাতাদের মতো ঘরজামাই ছিলেন না, এবং তাঁর সন্তানও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হয়নি।

প ঞ্চ ম   অ ধ্যা য়

১২৭২ [1865-66] ১৭৮৭ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চম বৎসর

আমরা গত বৎসরের বিবরণেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হয়েছেন 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি'র শিশুশ্রেণীতে বছরের একেবারে শেষে। এখানে কী ধরনের শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, তা তাঁর মনে নেই। মনে আছে একটা শাসনপ্রণালীর কথা। পড়া না পারলে ছাত্রটিকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে তার প্রসারিত দুই হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করে চাপিয়ে দেওয়া হত। অর্থাৎ এখানকার স্মৃতিও কেবল কিলচড় আকারেই মনে আছে। তাই স্কুলে কেবলমাত্র ছাত্র হয়ে থাকার হীনতা মোচনের জন্য তিনি বাড়ির বারান্দার এক কোণে একটি ক্লাস খুলেছিলেন, কাঠের রেলিংগুলো ছিল তাঁর ছাত্র। একটি কাঠি হাতে করে চৌকি নিয়ে তাদের সামনে বসে মাস্টারি করতেন। রেলিংগুলোর মধ্যেও ভালো ছেলে ও মন্দ ছেলের শ্রেণীবিভাগ ছিল। দুষ্ট রেলিংগুলোর উপর ক্রমাগত লাঠির ঘা পড়ে তারা বিকৃতি লাভ করত; কিন্তু কী করলে যে তাদের যথেষ্ট শাস্তি হয়, তা কিছুতেই ভেবে পেতেন না। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে-সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম।...আমার সঙ্গে আর সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।'[১] এই বিশ্লেষণ অবশ্যই পরিণত-বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু শিক্ষার এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি তাঁর শিশুমনেও প্রথমাবধি যে বিরূপতার সঞ্চার করেছিল, ক্রমশই তা পুষ্ট হয়ে তাঁকে বিদ্যালয়বিমুখ করে তুলেছিল।

ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমিতে স্কুলের পড়া শুরু হলেও এখানে অবস্থান-কাল খুব দীর্ঘ নয়। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন যথাযথ পরিশোধ করা হয়েছে—ক্যাশবহি-তে তার উল্লেখ আছে। ১৭ কার্তিক [বুধ 1 Nov] 'সত্যপ্রসাদ বাবুর সোমবাবু ও রবিবাবুর মাহিনা ৩্' টাকা শোধ করা হয়েছে। [কোনো মাসের উল্লেখ করা হয়নি, সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের; 'বঃ কলিকাতা কালেজ' লেখা হয়েছে—স্পষ্টতই তা ভুল। উল্লেখ্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ-সময়ে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা কলেজে' পড়ছেন], কিন্তু একই তারিখে আর-একটি খরচও লেখা হয়েছে :

পড়িবার খরচ খাতে/ খরচ—২। ০
বঃ গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গবর্ণমেন্ট পাঠশালা
[দঃ] সত্যেপ্রসাদবাবু/সোমেন্দ্রবাবুঃ ও রবিন্দ্রবাবুর
তিনাজানার ইস্কুলের/অক্তবরমাহার/৩ বিল—২। ০

—এই হিসাব* থেকে অনুমান করা যায়, সেপ্টেম্বর মাসে পুজোর ছুটির পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবনে ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি-পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল এবং ছুটি শেষ হবার পর গবর্মেন্ট পাঠশালা-পর্ব আরম্ভ হয়েছিল ১২৭২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাস বা Nov 1865 থেকে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাড়ে চার বছর মাত্র। স্কুল-পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে এইটুকু অনুমান করতে পারি যে, হয়তো এই স্কুলে শিক্ষাপদ্ধতি অভিভাবকদের ভালো লাগেনি অথবা ছোটো ছোটো শিশুদের পক্ষে জোড়াসাঁকো থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের দূরত্ব সম্ভবত খুবই বেশি মনে করা হয়েছিল, যেখানে গবর্মেন্ট পাঠশালা বা নর্মাল স্কুল ছিল প্রায় বাড়ির পাশেই, যদিও যাতায়াতের জন্য 'ইস্কুল গাড়ী'র বন্দোবস্ত ছিল।

কয়েক মাসের মধ্যেই 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি'তে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের সমাপ্তি ঘটলেও, অন্যভাবে ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে স্কুলটির যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আনুকূল্যে ও নবগোপাল মিত্রের প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সভা বা ন্যাশানাল সোসাইটির বহু অধিবেশন এই স্কুল-ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক ভাষণ প্রদান করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিল না।

গবর্মেন্ট পাঠশালা[২] সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্মৃতি ক্লাস আরম্ভ হবার আগে ছাত্রেরা সমবেতভাবে যে ইংরেজি কবিতাটি সুর করে আবৃত্তি করত সেটি সম্বন্ধে। বালকদের মুখে মুখে ইংরেজি শব্দগুলি পরিবর্তিত হয়ে কিম্ভুতকিমাকার রূপ ধারণ করেছিল—'কলোকী পুললাকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি—কিন্তু 'কলোকী' কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকি অংশটা আমার বোধ হয় —Full of glee, singing merrily, merrily, merrily."[৩] পরিমল গোস্বামীর 'নেলসন্‌স ইন্ডিয়ান রীডার' গ্রন্থে সমগ্র কবিতাটি পাঠ করার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় 'কলোকী' শব্দটির মূল হচ্ছে 'Follow me'।*

প্রবোধচন্দ্র সেন *দেশ* পত্রিকার ২১ বৈশাখ ১৩৫৮ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি অমিয়কুমার সেনের সহায়তায় একটি পাঠ্যপুস্তক থেকে সমগ্র কবিতাটি সংগ্রহ ও উদ্ধৃত[৪] করে লিখেছেন, '...কবিতাটির লেখিকা...তার পুরো নাম Eliza Lee Cabot Follen (1787-1860)। তাঁর বাড়ি আমেরিকার বোস্টন শহরে। পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ সাহিত্যেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম *Hymns for Children* (1825), আরেকখানির নাম *Poems* (1839)। বিখ্যাত জর্মান কবি ও দেশপ্রেমিক Karl Theodor Christian Follen (1795-1840) তাঁর স্বামী। ...আমাদের আলোচ্যমান কবিতাটি সম্ভবত এলিজা ফোল্‌নের *Hymns for Children* গ্রন্থ থেকে সংকলিত।' [পৃ ১১]

রবীন্দ্রনাথ গবর্মেন্ট পাঠশালাতেও সম্ভবত শিশু শ্রেণীতেই ভর্তি হয়েছিলেন, বেতন ছিল মাসিক বারো আনা। খুব সম্ভব বর্ণশিক্ষা, ধারাপাত ও লিপিশিক্ষা ছাড়া এই শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে অন্য কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই সময় স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

সম্ভবত এই সময়েরই একটি স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। কৈলাস মুখুজ্যে [কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] † ছিলেন বাড়ির অনেকদিনের পুরোনো খাজাঞ্চি। অত্যন্ত রসিক ব্যক্তি, প্রায় ঘরের আত্মীয়ের মতো। "সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত।... বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।...আর মনে পড়ে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।"[৫] অত্যন্ত সংবেদনশীল কবিচিত্ত যে সেই শৈশব থেকেই সামান্য ছন্দের দোলায় অপূর্ব কল্পনাজগতের দ্বার খুলে দিত, এইটিই এখানে লক্ষণীয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি অভাবের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। বাল্যকালে মেয়েদের আদর পাওয়া শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু জন্মের পরেই রবীন্দ্রনাথ পরিবারের রীতি-অনুযায়ী মায়ের কোল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন দাসীর কোলে। আর-একটু বড় হবার পর নির্বাসন ঘটেছে অন্দর মহল থেকে বাইরে একেবারে চাকরদের মহলে। রাত্রে শোবার সময় ছাড়া সারাক্ষণই চাকরের তত্ত্বাবধানে বাইরেই কাটাতে হত, স্নান-খাওয়াদাওয়া সবই চাকরের হাতে। এদের সম্বন্ধে স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুখের নয়। তারা নিজেদের কর্তব্যকে সহজ করবার জন্য চেষ্টা করত শিশুর খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ বন্ধ করে চুপচাপ বসিয়ে রাখতে এবং প্রহারের দ্বারা সমস্ত রকম চাঞ্চল্যকে দমন করতে। সেইজন্য এদের অনেকের স্মৃতি কেবল কিল চড় আকারেই রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল—তার বেশি কিছু মনে পড়েনি। এইরূপ একজন বিস্মৃত ভৃত্য মানিক দাসের হাতে সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সমর্পিত হন এ বৎসরের ৬ বৈশাখ থেকে।

অবশ্য এই অনাদর-অবহেলা অন্তত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক থেকে সুফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল। তিনি লিখেছেন, 'অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।...কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল, তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহাকিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না।'[৬] এইভাবে বাইরের অনাদর তাঁকে অন্তর্মুখী করেছিল, যেটুকু নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়, সেটুকুর সমস্ত রস শোষণ করে আত্মস্থ করে ফেলার ক্ষমতা দিয়েছিল, আর যা পাওয়া যায়নি বা যা কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাকে নির্লিপ্তির দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছিল। পরবর্তী কালের রবীন্দ্রমানসের রূপগঠন এইভাবেই শুরু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকো বাড়ির আবহাওয়াটি ছিল আনন্দরসে পরিপূর্ণ। বড়ো বড়ো ওস্তাদেরা এসে গান শোনাতেন, বড়ো বড়ো যাত্রাওয়ালারা এসে যাত্রাভিনয় করে যেতেন। এসব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন গণেন্দ্রনাথ। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সমবয়সী বন্ধুর মতো, নানা রকম কল্পনায় তাঁদের মাথা খেলত চমৎকার। জ্যোতিরিন্দ্র বলেছেন, 'একদিন কথা

হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন "সংবাদ প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুতনাট্য" খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় মহা উৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম।'[৭] রবীন্দ্রনাথ ভুল করে এই 'কিম্ভুত কৌতুকনাট্য' [Burlesque]-টি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা মনে করে লিখেছেন : 'প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ-বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত।'[৮]

এরপর 'গোপাল উড়ের যাত্রা' দেখে তাঁদের মনে বাড়িতে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগে। গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা—'কমিটি অব্ ফাইভ।'* জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হল। এরপর নতুন নাটকের খোঁজে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত বিষয় 'বহুবিবাহ' অবলম্বনে একটি নাটক লেখার জন্য দুশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ'-এ 22 Jun [বৃহ ৯ আষাঢ়] তারিখে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। পরীক্ষক নিযুক্ত হন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিনের মধ্যেই 15 Jul [শনি ১ শ্রাবণ] 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার করা হয় ও সেই সময়কার প্রখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়* অভিনয় অবশ্য হয় পর বৎসর, আমরা যথাসময়ে সে-সম্পর্কে আলোচনা করব।

এই বৎসর ৮ ফাল্গুন [রবি 18 Feb 1866] তারিখে দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাঁত্রাগাছী-নিবাসী হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা প্রফুল্লময়ী দেবীর বিবাহ হয়। বীরেন্দ্রনাথ তখন বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র, বয়স কুড়ি বৎসর। উল্লেখযোগ্য, প্রফুল্লময়ী দেবীর অব্যবহিত জ্যেষ্ঠ ভগিনী নৃপময়ী বা নীপময়ী দেবীর সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। প্রফুল্লময়ী তাঁর আত্মস্মৃতি 'আমাদের কথা'য় যে লিখেছেন, 'আশ্বিনের ঝড়ের বছরেই আমার বিবাহ হয়'—সে-কথা অবশ্য ঠিক নয়, 'আশ্বিনের ঝড়' ১২৭১ বঙ্গাব্দে সংঘটিত হয়।

এই মাসেই [? ৬ ফাল্গুন শুক্র 16 Feb] দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠ কন্যা সরোজাসুন্দরী দেবীর জন্ম হয়, ক্যাশবহি-তে এই দিনের হিসাবে 'শ্রীমতিবড়বধূমাতার আঁতুড়ের খরচ ৪' টাকা এই অনুমানের ভিত্তিস্থল।

এই বৎসরের অন্যান্য ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবেন্দ্রনাথ-পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের মনান্তরের বৃদ্ধি। এরই পরিণতিতে কেশবচন্দ্র স্ব-সম্পাদিত *The Indian Mirror*-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে যান। অবশ্য ১১ মাঘ [মঙ্গল 23 Jan] ষট্‌ত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রাতঃকালীন উপাসনায় দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথকে নিয়ে বেদীর আসন গ্রহণ করেন এবং কেশবচন্দ্র 'বিবেক ও বৈরাগ্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। উল্লেখ্য, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এইটিই

কেশবচন্দ্রের শেষ বক্তৃতা। কিন্তু এর পূর্বে ও পরে স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে।

The Indian Mirror পত্রিকা হস্তচ্যুত হওয়ায় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজি মুখপত্র হিসেবে দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক সাহায্যে ও নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় *The National Paper* সাপ্তাহিকটি? 7 Aug 1865 [? সোম ২৪ শ্রাবণ]* থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পত্রিকাটি প্রতি বুধবার প্রকাশিত হত। দেবেন্দ্রনাথ মাসিক ৫৫ টাকা করে সাহায্য করতেন। এই পত্রিকায় রাজনারায়ণ বসু 'Prospectus of Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় চৈত্র সংখ্যার ২৫৮-৬১ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' নামে যে সভা স্থাপন করেন, তারই কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে এই Prospectus বা অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করেন। একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারেও প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত প্রবন্ধটির একটি অনুবাদ 'শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব' নামে রাজনারায়ণ বসুর বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড [1882] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৯] 'ইহাতে মোটামুটি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি রাজনারায়ণ স্বদেশবাসীদের মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন : স্বদেশীয় ব্যায়াম, সঙ্গীত, চিকিৎসাবিদ্যা, ইংরেজী শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বেই বালক-বালিকাদের যথোপযুক্তরূপে মাতৃভাষা শিক্ষাদান, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলন, বাংলা শব্দ ব্যবহার দ্বারা কথোপকথনে ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাংলা ভাষায় পরস্পরকে পত্র লেখা, বাঙালীর সভাতে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান, সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা এ দেশে যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কারকার্য্য সম্পাদন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রমুখ স্বদেশীয় সুপ্রথাসকল রক্ষা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার সম্পূর্ণ বর্জ্জন, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় প্রভৃতি।'[১০]

এই প্রবন্ধে প্রকাশের পর বৎসরই নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে 'হিন্দুমেলা' বা 'চৈত্র মেলা' অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তিনিকেতনে গৃহনির্মাণের কাজকর্ম এ বছরেও অব্যাহত ছিল, তার সঙ্গে ফুলের চারা কেনার খবরও ক্যাশবহি থেকে পাওয়া যায়। ভাদ্র মাসে বোলপুর থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি দেখে বোঝা যায়, এই সময় তিনি শান্তিনিকেতনের নির্জনতায় কতকগুলি দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

রবীন্দ্রনাথের ছাত্র-জীবনে বার বার স্কুল-পরিবর্তন ঘটলেও গবর্মেন্ট পাঠশালা-পর্বই দীর্ঘতম। এটিকে রবীন্দ্রনাথ বা অন্যেরা নর্মাল স্কুল বলে উল্লেখ করলেও, নর্মাল স্কুল ও গবর্মেন্ট পাঠশালা বস্তুত দুটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, যদিও একই কর্তৃপক্ষের অধীনে একই বাড়িতে স্কুল-দুটি পরিচালিত হত। গবর্মেন্ট পাঠশালার ইতিহাস নমাল স্কুলের চেয়ে অনেক পুরোনো। 1817-এ স্থাপিত হিন্দু কলেজে প্রধানত ইংরেজি শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হত এবং সমস্ত বিষয়ই পড়ানো হত ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু রাধাকান্ত দেব, রামকমল

সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভা বাংলা ভাষার মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজের অধীনে একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ইংরেজ শিক্ষানুরাগীর সমর্থনে হিন্দু কলেজের পশ্চিম দিকে, এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলেজেরই অধিকারভুক্ত জমিতে 14 Jan 1839 তারিখে ডেভিড হেয়ার এই আদর্শ বাংলা পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত একটি সাবকমিটি পাঠশালার জন্য অর্থ সংগ্রহ, ছাত্র-নির্বাচন, শিক্ষক-নিয়োগ, পাঠ্য-তালিকা-নির্ধারণ ও পুস্তক-রচনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হন। এক বছরের মধ্যেই গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হলে বাঙালি ও ইংরেজ বহু গণমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে 18 Jan 1840 তারিখে পাঠশালার উদ্বোধন হয়। প্রায় ছ-মাস রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। 1 Jul 1840 থেকে স্কুল সোসাইটির স্কুল-এর [পরবর্তীকালের হেয়ার স্কুল] শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন দত্ত তত্ত্বাবধায়ক [Superintendent] নিযুক্ত হন।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া পাঠশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 1843-44-এর শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে [p. 19] লেখা হয় : 'The Primary object contemplated in the establishment of the patshala were to provide a system of national education, and to instruct Hindoo youths in literature, and in the sciences of India and of Europe, through the medium of the Bengali Language.' উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর বার্ষিক বেতন চার টাকা ও দু টাকা ধার্য হয় এবং কমিটি ঠিক করেন যে, বারো বছরের বেশি বয়সের বালককে পাঠশালায় ভর্তি করা হবে না। কিছু দিন পূর্বে মিশনারি উইলিয়ম অ্যাডাম প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যে রিপোর্ট [Reports on Vernacular Education In Bengal and Bihar 1835, 1836, 1838] দেন, তাতে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী পাঠ্যবিষয়কে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করার সুপারিশ করেছিলেন। কমিটি বিষয়গুলিকে প্রায় একই রেখে অ্যাডামের চারটি শ্রেণীর পরিবর্তে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। বিষয়গুলির শ্রেণী-বিন্যাস এইরূপ : প্রথম শ্রেণীতে অক্ষর, বানান, হিতোপদেশক ইতিহাস, ব্যাকরণ ও গণিতের প্রাথমিক সূত্র, গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ, অঙ্ক, ক্ষেত্র-পরিমাপক বিদ্যা, গোলাধ্যায়, জ্যোতির্বিদ্যা, শুদ্ধরূপে ভাষাকথনের বিধি, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং পত্রলিখনরীতি; তৃতীয় শ্রেণীতে শুদ্ধরূপে ভাষাকথনের নিয়ম, জমিদারী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত, রাজনীতি, নীতিবিদ্যা, ক্ষেত্র-পরিমাপক বিদ্যা, গবর্নমেন্টের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবস্থা।[১১]

ছাত্রদের বারোটি ক্লাসে এই তিন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়াবার বন্দোবস্ত করা হয়। যৎকিঞ্চিৎ বেতন দিতে হলেও তারা বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পেত। পাঠ্যপুস্তকগুলির সাধারণ নাম দেওয়া হয় 'শিশু সেবধি'। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত দু-খণ্ডে 'বর্ণমালা' ['সন ১২৪৬'] রচনা করেন। বারোটি শ্রেণীর জন্য বারো জন শিক্ষকও নিযুক্ত হন।

পাঠশালাটি প্রথমে যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করলেও সরকারের নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় 1843-44-এ ছাত্রসংখ্যা কমে দেড় শতের কিছু বেশিতে দাঁড়ায়। বারোটি শ্রেণী কমে সাতটি শ্রেণীতে পরিণত হল, শিক্ষক-

সংখ্যাও স্বভাবতই কমে যায়।

কয়েক বছর পরে 15 May 1854 হিন্দু কলেজ বিভাগের নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ ও স্কুল বিভাগ হিন্দু স্কুল নাম ধারণ করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। এই কাজ ছাড়াও 1 May 1855 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের স্কুলগুলির সহকারী ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি মফস্বল-বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে একটি নর্মাল স্কুল বা শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। এর ফলে অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষক ও মধুসূদন বাচস্পতিকে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করে 17 Jul 1855 নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজের অধীন বাংলা পাঠশালা এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা ছিল পাঠশালার শিক্ষা দেবার ও পরিচালনার পদ্ধতি দেখে এবং কখনও কখনও নিজেরা পড়িয়ে নর্মাল স্কুলের ছাত্রেরা শিক্ষাদান-কার্যে পারদর্শী হয়ে উঠবে। তাঁর সুপরিচালনায় পাঠশালাটির ক্রমশ উন্নতি হতে থাকে, ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সাতটির জায়গায় আটটি শ্রেণী খোলা হয়, দুজন নূতন শিক্ষকও নিযুক্ত হন।

তখন থেকেই বাংলা পাঠশালা নর্মাল স্কুলের সহযোগী হিসেবে পরিচালিত হতে শুরু করে। বাংলা পাঠশালার বাড়ি ভেঙে নতুন করে তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় হিন্দু কলেজের কাছে একটি ভাড়া বাড়িতে পাঠশালাটি উঠে যায়। 1857-58-এর রিপোর্টে দেখা যায়, সেখান থেকে পাঠশালা বৌবাজারের একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছে। নর্মাল স্কুলও হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে উঠে যায়, কারণ 1860-61-এর রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, 1 Jan 1860 তারিখে নর্মাল স্কুল ও বাংলা পাঠশালা উভয়েই বৌবাজারের বাড়ি থেকে ৮৩ নং চিৎপুর রোডে শ্যামাচরণ মল্লিকের প্রশস্ততর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এই বাংলা পাঠশালাই ক্যাশবহি-তে উল্লিখিত ‘গবর্ণমেন্ট পাঠশালা’, রবীন্দ্রনাথ যেখানে পড়েছিলেন। যদিও বিদ্যালয়-ভবনটি সাধারণভাবে ‘কলিকাতা গবর্ণমেন্ট নর্মাল বিদ্যালয়’ বা সংক্ষেপে ‘নর্মাল স্কুল’ নামে অভিহিত হত।

আমরাও রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় বিদ্যালয়টিকে ‘নর্মাল স্কুল’ বলে অভিহিত করলেও, পাঠকদের স্মরণ রাখা দরকার, বিদ্যালয়টির আসল নাম ‘ক্যালকাটা গবর্মেন্ট পাঠশালা’ বা ‘ক্যালকাটা মডেল স্কুল’—সরকারী কাগজপত্রে সর্বত্র এই দুটি নামই ব্যবহৃত হয়েছে।

বাড়ি বদলের সমসাময়িক কালেই গবর্মেন্ট পাঠশালার পাঠক্রমে একটি পরিবর্তন সাধিত হয়। এখানে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের কথা উঠলে অভিভাবকদের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়। শতকরা নব্বই জন অভিভাবকই পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের অনুকূলে মত দেন। অবশ্য ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলেও কার্যক্রমে তার জন্য খুব অল্প সময়েই বরাদ্দ করা হয়, সমস্ত বিষয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থাই অব্যাহত থাকে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে তার একটি সুফল হল এই যে, এখান থেকে যে ছাত্ররা ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হত তাদের আর নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার দরকার ছিল না। অন্যান বিষয় বাংলায় ভালভাবে আয়ত্ত হওয়ার ফলে, ইংরেজি অল্প জানলেও তা শিখে নিতে খুব বেশি অসুবিধা হত না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল, তা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব।*

১ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৮০-৮১

২ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য :১

৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৮১

৪ দ্র সংযোজন ॥ তথ্যপঞ্জী, জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২৮৫-৮৬

৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৬৫-৬৬

৬ ঐ ১৭। ২৬৮-৬৯

৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ৭১-৭২

৮ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৩৫

৯ দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল : হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত [১৩৭৫]। ৯১-১১১

১০ যোগেশচন্দ্র বাগল : রাজনারায়ণ বসু, সা-সা-চ ৪। ৪৯। ৪৫

১১ দ্র সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২। ৩০

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গবর্মেন্ট পাঠশালা ও কলিকাতা নর্মাল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, যিনি রবীন্দ্রনাথকে 'উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে' করিতা লিখে আনতে আদেশ করেছিলেন। এ-সম্পর্কে আমরা পরে আরও আলোচনা করব।

* 'হাইস্কুলে যে ইংরেজী বই প্রথম পড়েছি তার নাম যতদূর মনে পড়ে নেলসন্‌স ইন্ডিয়ান রীডার। তাতে দু চার পাতা পরপর একখানা দুখানা রঙীন ছবি ছিল। একটি রেলগাড়ির ছবি, একটি জ্যোৎস্না রাতের ছবি। পড়া ভুলে সেই ছবির দিকে চেয়ে স্বপ্নজাল বুনতাম।

'একটা কবিতার এইটুকু এখনও মনে আছে—/Follow me full of glee/Singing merrily merrily merrily'—স্মৃতিচিত্রণ [২য় সং, ১৩৬৭]। ৩২-৩৩

† ক্যাশবহি-তে দেখা যায়, মাসিক ১৫ টাকা বেতনে তিনি জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন।

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি-তে [পৃ ৯৬] লেখা হয়েছে : 'কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু [চৌধুরী] এবং জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—এই পাঁচজনে এই নাট্যসমিতির সভ্য হইলেন।' কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথই 14 Jul 1867 গুণেন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্রে যদুনাথের দাবি অস্বীকার করেছেন; 'It was Gangooly [Saradaprasad], you and I that proposed it; and I don't think that Jadoo can claim the credit of being one of its projectors. I do think that he had no hand in the matter.'—সুশীল রায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [১৩৭০]। ৯৭

* দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১। ৫। ৩১; কিন্তু এই বিবরণে সম্ভবত কিছু ত্রুটি আছে, কারণ *Friend of India* পত্রিকার 27 Jul 1865 সংখ্যায় [Vol. XXXI, No. 1595] Sat. Jul. 22 তারিখ দিয়ে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হতে দেখা যায় : "The Committee of the Jorasanko Theatre" in Calcutta offered prizes of Rs 200 each for the best drama illustrating the condition and helplessness of Hindoo females, and the best tragedy on the evil effects of Polygamy. They offer a prize of Rs 100 for a play on the Village Zemindars. The dramas are to be in Bengali. The idea is a good one. The Miss Austen-like novels of Tek Chand show that there are capital materials for such dramas in native life, and it is time to prove that Bengalis can produce something better than the unutterably stupid *Nil Durpan*. [p. 868]

* *Friend of India*-র 10 Aug [No. 1597] সংখ্যায় Mon. Aug 7 তারিখ দিয়ে পত্রিকাটির প্রাপ্তি স্বীকার করে লেখা হয়, 'We have received the first number of the *National Paper*, a native paper in English, to be published in Calcutta every Wednesday as the organ of the conservative Brahmists. The first number does not promise well.' [p. 929] পত্রিকাটি 7 Aug প্রথম প্রকাশিত হয় বলে অনেক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু ওই দিন সোমবার ছিল, অথচ পত্রিকাটি প্রতি বুধবার প্রকাশিত হবার কথা, সুতরাং তারিখটি প্রশ্নাতীত নয়।

* অধিকাংশ তথ্যই যোগেশচন্দ্র বাগলের বাংলার জনশিক্ষা [১৩৫৬]। ৫৪-৬৩ এবং *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1860-61* থেকে গৃহীত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১২৭৩ [1866-67] ১৭৮৮ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ষষ্ঠ বৎসর

গত বৎসর অর্থাৎ ১২৭২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে পুজোর ছুটির পর রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি ত্যাগ করে গবর্মেন্ট পাঠশালার শিশুশ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। ভর্তির অল্পদিন পরেই সম্ভবত তাঁদের বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হয়, কারণ গবর্মেন্ট জেলা স্কুল ও নর্মাল স্কুলগুলির ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে [বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বহুদিন পর্যন্ত এন্ট্রান্স, এফ. এ., বি. এ. প্রভৃতি প্রধান প্রধান পরীক্ষা এই সময়েই সম্পন্ন হয়ে এসেছে এবং জানুয়ারি মাসের মধ্যেই গেজেটে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম প্রকাশিত হয়েছে]। তাই মনে করা যেতে পারে, 1866-এর গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যেরা শিশুশ্রেণীর পরবর্তী ধাপে উন্নীত হয়েছেন। এই বছর তাঁদের জন্য বই কেনার একটিমাত্র হিসাবই দেখতে পাওয়া যায় ৮ই চৈত্র ১২৭২ [20 Mar 1866] তারিখে : 'দ° সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সত্যপ্রসাদবাবু/গেজেট* ও পুস্তক খরিদে   লত'। ব্যয়ের পরিমাণ থেকেই বোঝা যায়, পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা খুব দীর্ঘ ছিল না। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব খুব বেশি না হলেও যাতায়াতের জন্য 'ইস্কুল গাড়ী'র বন্দোবস্ত ছিল, যার '৪টা ইস্পীরিং মেরামতি'র জন্য তিন টাকা খরচ দেখা যায় ইংরেজি বছরের প্রথম দিনেই। অবশ্য মাঝে মাঝে পালকি ভাড়ার উল্লেখ থেকে মনে হয়, কখনও কখনও যাতায়াতের জন্য পালকিও ব্যবহৃত হত।

নর্মাল স্কুলে এই বৎসরের পঠদ্দশার প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথরা সম্ভবত বাড়িতে পূর্বোক্ত গৃহ-পাঠশালার গুরুমশায়ের কাছেই পড়াশুনো করতেন। ১৮ শ্রাবণ [বৃহ 2 Aug 1866] তারিখের একটি হিসাবে দেখা যায় 'বং ব্রজেন্দ্রনাথ রায়/দং ছেলেবাবুদিগের/ পণ্ডিতকে খয়রাত বিঃ/এক ভাউচর ৪্'। হিসাবটি অবশ্য বেতন-সংক্রান্ত নয় বলেই মনে হয়, সুতরাং নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে উক্ত গুরুমশায় বা পণ্ডিত এই সময় পর্যন্ত গৃহশিক্ষক হিসেবেই নিযুক্ত ছিলেন। [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হিসাবে উল্লিখিত ব্রজেন্দ্রনাথ রায় সারদা দেবীর ভ্রাতা, ঠাকুর-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েই বাস করতেন এবং পারিবারিক হিসাবপত্র দেখাশোনা করতেন। †] এর পর পুরোদস্তুর গৃহশিক্ষক হিসেবেই নিযুক্ত হন নীলকমল ঘোষাল। ১৫ অগ্র [বৃহ 29 Nov] তারিখের হিসাবে দেখি : 'বঃ নিলকমল ঘোষাল (বালকদিগের পণ্ডিত)/ দং কার্তিক মাহার বেতন শোধ /বিঃ এক ভাউচার ১০্'। এঁর উল্লেখ ক্যাশবহি-তে এই প্রথম পাওয়া যায়, সুতরাং মনে হয় ১ কার্তিক [বুধ 17 Oct] থেকে তিনি মাসিক দশ টাকা বেতনে রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এঁর কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে উল্লেখ করেছেন : 'তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল

ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল।'[১] ছেলেবেলা-র বর্ণনাটি প্রায় একই রকম : 'নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। খটখটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, এক দিনের জন্যেও মাথাধরার সুযোগ ঘটল না।'[২] অবশ্য সারা বছর স্কুলে বা গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁরা কী পড়েছিলেন, তার হদিশ করা শক্ত। চৈত্র ১২৭২-এ গেজেটের সঙ্গে পুস্তক খরিদের উল্লেখ ছাড়া আর-কোনো বই কেনা হয়েছিল কিনা, ক্যাশবহি থেকে তা জানা যায় না। সুতরাং অনুমান করতে হয় দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয় থেকে যুক্তাক্ষর শেখা, শ্রুতিলিখন, ধারাপাত, মানসাঙ্ক ইত্যাদির মধ্যেই সম্ভবত তাঁদের লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিল। একটি কথা ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার দিনের একজন উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা ছিলেন। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থের নাম 'মানসাঙ্ক'*—সম্ভবত এই বৎসর কিংবা পরবর্তী বৎসরে বইটি রবীন্দ্রনাথদেরও অন্যতম পাঠ্যপুস্তক ছিল। দশটি পাঠে সমাপ্ত ৩২ পৃষ্ঠার এই বইটিতে মাঝে মাঝেই শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশ-সহ বিষয়টি এমন সুচারুরূপে উপস্থাপিত হয়েছে, মনে হয় এটিকে আজকের দিনেও শিশুদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, Jan 1867-এ দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথও নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন, তখন তাঁর বয়স সাড়ে চার বছর মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁদের তৎকালীন জীবনযাত্রাকে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন। এই ভৃত্যদের সম্পূর্ণ অধীন হয়ে তাঁর জীবন কিভাবে কাটত তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি—এদের শাসনকালের মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কোনোটারই সাক্ষাৎ মেলে না। তিনি লিখেছেন : 'এই-সকল রাজাদের পরিবর্তন বারংবার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল-তা'তেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।... মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুত, সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন। আমার বেশ মনে আছে, সেই সিডিশন সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার বড়ো বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দেবার চেষ্টা করা হইত।'[৩] এই বড়ো বড়ো জালাগুলি-ব্যবহৃত হত সারাবৎসরের পানীয় জল সঞ্চিত করে রাখার জন্য। তখনো কলকাতায় কলের জলের ব্যবস্থা চালু হয়নি, যদিও এই বৎসরেই Jan 1876 থেকে কলকাতার যোলো মাইল উত্তরে পলতায় গঙ্গার জল পরিশ্রুত করে পাইপের সাহায্যে কলকাতায় পাঠানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, অবশ্য কাজটি শেষ হয় তিন বছর পরে। ততদিন পর্যন্ত 'বেহারা বাঁখে করে কলসি ভ'রে মাঘ-ফাল্গুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করেছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মত, পা দুটো উলটো দিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিনে যখন বাড়িভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।'[৪] এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় ক্রন্দনরত শিশুদের অবাধ্য কান্নাকে সংযত করার পক্ষে ওই জালাগুলির উপযযাগিতা তর্কাতীত ছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথও সে-প্রশ্ন তুলেছেন, অভিজাত ঘরের সুকুমার-দর্শন এই বালকদের

প্রতি [বালিকাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহারের বিশেষ তারতম্য ছিল না, সরলা দেবী চৌধুরানীর জীবনের ঝরাপাতা-য় তার বিবরণ আছে] ভৃত্যদের এরূপ নির্মম ব্যবহারের কারণ কী। আসলে এই-সব ভৃত্যেরা সেবক-মাত্র ছিল না, একটি বা দুটি শিশুর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাদের বহন করতে হত—অভিভাবকেরা সে-দিকে কিছুমাত্র নজর দিতেন না। সুতরাং মাইনে-করা চাকরেরা তাদের দায়িত্বকে সহজ করে নেওয়ার তাগিদে শিশুদের সমস্ত চাঞ্চল্যকে সম্পূর্ণ দমন করার সরল পথটিই বেছে নিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমান বৎসরে নদের চাঁদ নামক একটি ভৃত্যকে সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। সত্যপ্রসাদের ভৃত্যের নাম ছিল মাধবদাস। এদের সকলেরই বেতন ছিল মাসিক সাড়ে তিন টাকা।

আমরা পূর্ব বৎসরের বিবরণে জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য নতুন বাংলা নাটক সন্ধান করার কথা লিখেছি। এ-বিষয়ে যে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে নিয়ে নাটক রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর। রামনারায়ণ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে অনেক দিন ধরেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন।[৫] রামনারায়ণ যে নাটক লেখেন, তার নাম 'বহু-বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক' [প্রকাশ : May 1866]। '১২৭৩ সনের ২৩ বৈশাখ এক প্রকাশ্য সভা আহূত হইল এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নাটকখানি আদ্যোপান্ত পঠিত হইল। সভাপতি প্যারীচাঁদ মিত্র রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত পাঁচশত টাকা† তর্করত্ন মহাশয়কে প্রতিশ্রুত পুরস্কার বলিয়া প্রদান করিলেন। কেবল ইহাই নহে, গণেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানির সহস্র খণ্ড মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় এবং গ্রন্থ-স্বত্বও নাট্যকারকে প্রদান করিলেন।'[৬]

কমিটি অব্ ফাইভ্', যাঁরা এই নাট্যাভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, গণেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে যখন তিনি এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন সমস্ত আয়োজন নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করতে তাঁর যত্ন ও অর্থব্যয়ের কার্পণ্য ছিল না। বৈঠকখানা বাড়ির দোতলায় স্টেজ বাঁধা হল, ভূমিকাগুলি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গের মধ্যে বন্টিত হয়ে সাত-আট মাস ধরে দিনে অভিনয়ের রিহার্সাল ও রাত্রে কনসার্টের মহলা চলতে থাকে। এই আয়োজন শিশু রবীন্দ্রনাথের মনেও দাগ কেটেছিল, তিনি লিখেছেন : 'মনে পড়ে, খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক-একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জ্বলিতেছে, লোক চলিতেছে, দ্বারে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কী হইতেছে ভালো বুঝিতাম না, কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। মাঝখানে ব্যবধান যদিও বেশি ছিল না, তবু সে আমার শিশুজগৎ হইতে বহুদূরের আলো।'[৭]

নব-নাটক প্রথম অভিনীত হয় ২২ পৌষ [শনি 5 Jan 1867] তারিখে।[৮] 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীলকমল মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্যালক অমৃতলাল ও বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই নাটকের অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। চিত্রপটগুলিও নিপুণ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। পঞ্চম দৃশ্যের চিত্রপটে নানাবিধ লতা পাতা এবং জীবন্ত জোনাকী পোকা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।'[৯] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকে নটী সেজেছিলেন এবং কনসার্টে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন। নাটকখানি জোড়াসাঁকো রঙ্গমঞ্চে ন'বার অভিনীত হয়েছিল।

বড়োদের এই আমোদপ্রমোদে রবীন্দ্রনাথের মতো ছোটদের কোনো অংশ ছিল না। কিন্তু সাহিত্য ও ললিতকলা-চর্চ্চার এই আবহাওয়া তাঁর মানসিক গঠনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'দূর থেকে কখনো কখনো ঝরনার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত ছিটকিয়ে আমাদের দিকে। এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোকময়। দেউড়ির সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপপাশ থেকে গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন, হতে-দিচ্ছেন, ছোটো একটি করে তোড়া। নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনো কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পারি নে। বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর পেতুম যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভগ্নীপতি।'[১০]

এর পর ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হল 'হিন্দুমেলা' [জাতীয় মেলা' বা চৈত্র মেলা' নামেও পরিচিত।] পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, রাজনারায়ণ বসু-কৃত 'অনুষ্ঠান পত্র' ছিল এই মেলার প্রেরণাস্বরূপ। এ-বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী 'দি ন্যাশনাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে স্বাদেশিকতার আবহাওয়া যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এই প্রস্তাবে তাঁদের সহযোগিতার অভাব হয়নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। 'নব-নাটক' অভিনয়ের মতো এই মেলার আয়োজনেও গণেন্দ্রনাথ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁকে সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্রকে সহকারী সম্পাদক করে মেলার প্রথম অধিবেশন হল রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরের চিৎপুরের বাগানবাড়িতে ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ ৩০ চৈত্র শুক্রবার 12 Apr 1867 তারিখে।[১১] এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে আয়োজিত এই প্রথম মেলা অবশ্য খুব ছোটো আকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মেলার অন্যতম উৎসাহী কর্মী নাট্যকার মনোমোহন বসুর ভাষায় : 'জন্মদিনে কেবল অনুষ্ঠাতা ও কতিপয় বান্ধব মাত্র উৎসাহী ছিলেন। সে যেন নিজ বাটী ও পাড়াটী বলিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা।'[১২] দেবেন্দ্রনাথ, দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ['বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক], প্যারীচরণ সরকার, কৈলাসচন্দ্র বসু, জয়গোপাল সেন, প্রসাদদাস মল্লিক, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ২৭ চৈত্র [মঙ্গল 9 Apr] তারিখে ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায় : 'দান খাতে খরচ—২০৲/ব° শ্রীযুত নব গোপাল মিত্র/দ° চৈত্র মেলার দান ২০'। পরবর্তী বৎসরসমূহে এই দানের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঠাকুরপরিবারের উপর তো বটেই, সমগ্র বঙ্গদেশ ও ভারতের উপরও হিন্দুমেলা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'জমিদার সভা', দেবেন্দ্রনাথ-প্রমুখের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা পরবর্তী কালে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থাপিত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' রাজনীতিকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেছিল, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু 'হিন্দুমেলা' বা 'জাতীয় মেলা' গঠনমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবর্তিত হয়েছিল। এর ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল 'স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি করা'। এই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য 'স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্যে নিয়োগ', 'প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ',

‘অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন’, ‘প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীয় লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য’ সংগ্রহ ও প্রদর্শন, ‘স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন ও ‘যাঁহারা মল্ল-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান...এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা’ প্রচলন—এই ছ-টি সাধনোপায় নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ছ-টি মণ্ডলীতে বিভক্ত করে তাঁদের উপর এক একটি বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। একথা স্বীকার করতেই হবে, যে বিরাট আদর্শ নিয়ে এই মেলার সূত্রপাত করা হয়েছিল, উপযুক্ত উৎসাহ ও সহায়তার অভাবে তার অনেকটাই সার্থক হতে পারেনি—শেষ পর্যন্ত নবগোপাল মিত্রের একক প্রযত্নের উপরই মেলার অনুষ্ঠান নির্ভর করত—কিন্তু স্বনির্ভরতার সাধনা ব্যতীত জাতির উন্নতি ঘটতে পারে না, এই সত্যকে হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা তার স্বল্পশক্তি দিয়েও প্রথম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল, এইখানেই তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব। লক্ষণীয়, মেলার কাজকর্ম সমস্ত বাংলা ভাষায় পরিচালিত হত। কেশবচন্দ্র ধর্মপ্রচারে ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বদেশবাসীর কাছেও ইংরেজিতে বক্তৃতা করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে দূরত্ব রচনা করেছিলেন, মেলার অনুষ্ঠাতৃগণ সে দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এই মেলা যখন শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ তখন নিতান্ত শিশু এবং তাঁর কৈশোর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই এর অবলুপ্তি ঘটেছিল, সুতরাং যৌবনের পূর্ণ শক্তি নিয়ে জাতীয় মেলার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। কিন্তু মেলার আয়োজন-অনুষ্ঠান আলাপ-আলোচনার আবহাওয়ায় বড়ো হওয়ার জন্য এবং পরে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় এবং প্রথমে উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে ও পরে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ব্যবহারিক কাজকর্মে হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার আদর্শের স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রজীবনী রচনা করতে গিয়ে এই দীর্ঘ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা সেইখানেই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য :১

এই প্রসঙ্গে আমরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেব।

দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা শরৎকুমারী দেবীর সঙ্গে যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের* বিবাহ হয় সম্ভবত বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে। সুকুমারী, স্বর্ণকুমারী বা বর্ণকুমারীর বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য়* প্রকাশিত হয়েছিল, আশ্চর্যের বিষয় শরৎকুমারীর বিবাহের কোনো সংবাদই উক্ত পত্রিকায় উল্লিখিত হয়নি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অনুমানের ভিত্তি উক্ত পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় [পৃ ৭২] প্রকাশিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের আয়ব্যয়ের বিবরণে ‘শুভকর্ম্মের দান।/ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০’ টাকার উল্লেখ ও ক্যাশবহি-র ১৬ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 29 May 1866] তারিখের একটি হিসাব : ‘শ্রীমতী সারদাশুন্দরি দেবি খাতে খরচ—৯১/বঃ ব্রজেন্দ্রনাথ রায়/দঃ সরতসুন্দরির শুভবিবাহের গহনা খরিদ’। শরৎকুমারীর বয়স তখন আনুমানিক বারো বা তেরো বৎসর। গণেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদিনীর স্বামী নীলকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন যদুনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সেই সূত্রে ছেলেবেলা থেকেই দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে

তাঁর অবাধ যাতায়াত ও মেলামেশা ছিল। এই কারণে বিয়ের পরও শরৎকুমারী স্বামীকে 'যদু, ও যদু' বলে ডেকে মায়ের কাছে বকুনি খেয়েছিলেন, ইন্দিরা দেবী তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনকথা' [দ্র *এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৯৯। ২৩]-য় উল্লেখ করেছেন। যদুনাথ তখনো স্কুলের ছাত্র, ৩ শ্রাবণের হিসাবে দেখা যায় 'দং বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের/বেঙ্গল এ্যাকাডেমির ফেবরুয়ারি মার্চ দুই মাসের বেতন/বিঃ দুই বিল ৭্ হি—১৪্'। তিনি সম্ভবত বীরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। স্কুলের পড়াও তিনি শেষ করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে, কেননা এই খরচের আর কোনো পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে না। এর পরিবর্তে তাঁকে একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে দেখা যায় ৩ মাঘ-এর [15 Jan 1867] হিসাবে : 'দ° জ্যোতী বাবু ও যদুবাবুর ইনড্রসট্রিএল আর্ট ইস্কুলে নিযুক্ত হইবার জানয়ারি মাহার ফি ২ বিলের কাত ২্ হিঃ ৪্'। অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, গুণেন্দ্রনাথও এই সময়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন।[১৩] কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ Mar 1867-এর শেষে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই যাত্রা করেন, সুতরাং এই শিক্ষাও যদুনাথ বেশিদিন লাভ করেছিলেন বলে মনে হয় না। দেবেন্দ্রনাথের এই জামাতাটি সম্পর্কে খুব অনুকূল মনোভাব ছিল না। ২৭ মাঘ ১২৭৪ [9 Feb 1868] সাহেবগঞ্জ থেকে গণেন্দ্রনাথকে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন : 'যদুনাথের এইক্ষণে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবার কোন সদুপায় দেখিতেছি না অতএব তিনি যেভাবে ট্রাস্টীর কর্ম্ম করিতেছেন [?] সেইভাবেই করিতে থাকুন এ বিষয়ে এইক্ষণে আর কোন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যক নাই।'[১৪] আবার ৫ ভাদ্র ১২৭৫ [20 Aug 1868] হিমালয়ের Murree Hills থেকে তাঁকে লিখেছেন : 'আমার নিকটে বাটীর এই একটি মন্দ সংবাদ আসিয়াছে যে যদু কতকগুলাণ ছোঁড়া জুটাইয়া আমাদের বাটীতে মাতলামি করে। তবে তুমি তাহাকে বিষয় কর্ম্মের যে ভার দিয়া বিরাহিমপুরে গিয়াছিলে, তাহা সে কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না।' [অপ্রকাশিত পত্র] সন্তানদের, বিশেষ করে কন্যাদের, শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি উদাসীন ছিলেন। সরলা দেবী লিখেছেন : 'সেজ মাসিমার ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার বেশি ধার ধারতেন না। সেকালের 'চারুপাঠে'র উপরে আর উঠেছিলেন কি না সন্দেহ। ...' অবশ্য সুরসিক ব্যক্তি হিসেবে যদুনাথের খ্যাতি ছিল, নব-নাটক ও অলীকবাবু নাটকে তাঁর অভিনয়ের কথাও জানা যায়।

হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবীর জন্মসাল জীবনস্মৃতি-তে প্রদত্ত বংশলতিকায় 1865 বলে উল্লিখিত হয়েছে : ২৩ পৌষ ১৩২৮ [শনি 7 Jan 1922] তাঁর মৃত্যুর পর *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র* মাঘ সংখ্যায় লিখিত হয় মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫৭ বৎসর হয়েছিল, সে-হিসেবেও তাঁর জন্মসাল 1865 [১২৭১]-ই হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা, প্রতিভা দেবীর জন্ম হয় আষাঢ় ১২৭৩ [Jul 1866]-এর শেষ দিকে। ক্যাশবহি-তে ২৪ আষাঢ় [শনি 7 Jul-এর তারিখের একটি হিসাব : 'আঁতুড় খরচ/কলেজের দাইকে দেওয়া প্রভৃতি ২৩ ', এবং ১ শ্রাবণ [সোম 16 Jul] তারিখে লেখা হয়েছে 'সেজো বধূ ঠাকুরাণীর আঁতুড়ে খরচ ৭্'—এই দুটি হিসাব মিলিয়ে আমরা উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান হিতেন্দ্রনাথের জন্মতারিখ আমরা ১৫ অগ্র ১২৭৪ [শনি 30 Nov 1867] বলে নিশ্চিতভাবে জানি। সুতরাং উপরোক্ত হিসাবটি প্রতিভা দেবীর জন্মকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছিল, এমন সম্ভাবনার কথাই মেনে নিতে হয়।

৪ ভাদ্র [রবি 19 Aug] দেবেন্দ্রনাথের বৈবাহিক দুই পুত্রবধূ নীপময়ী ও প্রফুল্লময়ী দেবীর পিতা হরদেব চট্টোপাধ্যায় অর্শ রোগে ৬৫ বৎসর বয়সে সাঁতরাগাছিতে পরলোকগমন করেন। দেবেন্দ্রনাথের তিনি অন্যতম ভক্তবন্ধু ছিলেন। প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছেন : 'পিতার সহিত তাঁহার এতদূর সৌহৃদ্য জন্মাইয়াছিল যে,

দুইজনের মধ্যে স্থির ছিল যে, যাঁহার আগে মৃত্যু হইবে, তাঁহার বিধিমত সৎকার যিনি জীবিত থাকিবেন তিনিই করিবেন। পিতার মৃত্যু পূর্ব্বেই হওয়াতে, আমার শ্বশুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া চন্দনকাষ্ঠে তাঁহার চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া সুচারুরূপে সৎকারকার্য সম্পন্ন করেন।[১৫] *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র বিবরণ [আশ্বিন। ১৩৮-৪২] থেকে জানা যায়, দেবেন্দ্রনাথ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ৯ শ্রাবণ থেকে ১৭ কার্তিক পর্যন্ত বোলপুর থেকে গণেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি দেখে মনে হয়, এই সময়ে তিনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন, ভাদ্রের প্রথমে তিনি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি তাঁকে উত্তরবঙ্গে জমিদারি পরিদর্শন করতে দেখা যায়, সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন সম্ভবত ফাল্গুনের শেষে বা চৈত্রের গোড়ায়। এর মধ্যে ৯ পৌষ তিনি রাজশাহির বোয়ালিয়ায় একটি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ 28 Oct [রবি ১২ কার্তিক] থেকে অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং 10 Nov থেকে 9 Dec এই একমাস হীরালাল শীলের কাশীপুরের বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে সস্ত্রীক সেখানে বাস করেন। ইতিমধ্যে তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষ ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে আসেন, তিনিও কাশীপুরে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে ওঠেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নব-নাটক-এর রিহার্সালের ফাঁকে সেখানে গিয়ে মনোমোহনের কাছে ফরাসি ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করেন। এর পর সত্যেন্দ্রনাথ যখন ফাল্গুন মাসে [Mar 1867] বোম্বাই যাত্রা করেন, এফ. এ.-পরীক্ষার্থী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরীক্ষা না দিয়ে তাঁর সঙ্গে বোম্বাই হয়ে আমেদাবাদে চলে যান।

এই সময়ের মধ্যেই ১৩ পৌষ [বৃহ 27 Dec 1866] গবর্নর জেনারেল লর্ড জন লরেন্সের পার্টিতে জ্ঞানদানন্দিনী যোগদান করেন। *সোমপ্রকাশ* এ-সম্পর্কে লেখে [৯। ৭, ১৭ পৌষ, পৃ ১০৮] : 'গত বৃহস্পতিবার গবর্ণর জেনেরলের বাটীতে রাত্রিকালে যে মজলিস হয়, তাহাতে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী আমাদিগের জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন হিন্দু রমণী রাজ প্রতিনিধির বাটীতে গমন করেন নাই।' সত্যেন্দ্রনাথ নিজে ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : 'আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেন্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজ-মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী—সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা—তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।'[১৬] জ্ঞানদানন্দিনী স্বয়ং ঘটনাটি সম্পর্কে একটু অন্য কথা বলেছেন : 'একবার এমনি যখন কলকাতায় এসেছি, উনি একবার লাটসাহেবের বাড়ীর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে অসুস্থ বলে যেতে পারেননি, আমাকে এক মেমের সঙ্গে পাঠালেন—বোধ হয় Lady Phaer। বড় ঠাকুরঝি আমাকে মাথায় সিঁথি প্রভৃতি দিয়ে খুব সাজিয়ে দিলেন, উনি শুয়েছিলেন, তাঁকে আবার নিয়ে গিয়ে দেখালেন। সেখানে ঠাকুরগুষ্টির যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঠাকুরবাড়ীর একজন বউ গিয়েছে শুনে লজ্জায় চলে গেলেন—পরে শুনলুম। ওঁকে ছেলেবেলায় একজন পড়িয়েছিলেন, তিনি আমার পরিচয় পেয়ে কাছে এসে কথা বল্লেন। বাড়ীর সকলে বল্লেন যে উনি নিজে গেলে ভাল হত, অন্য লোকের সঙ্গে পাঠানো ভাল হয়নি। শুনেছি আমাকে অনেকে মনে করেছিলেন ভূপালের বেগম, কারণ তিনিই একমাত্র তখন বেরতেন।'[১৭] ঠাকুরবাড়ির মানসিক পরিবর্তনটুকুও এখানে লক্ষণীয়। প্রথমবার বোম্বাই থেকে ফিরে যখন তিনি সকলের সামনে গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, তখন বাড়িতে এক শোকাবহ দৃশ্যের

অবতারণা হয়েছিল, আর এখন যেটুকু গুঞ্জন উঠেছিল তার কারণ স্বামীর সঙ্গে না গিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে লাটসাহেবের দরবারে গিয়েছিলেন!

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

১১ মাঘ বুধবার 23 Jan 1867 আদি ব্রাহ্মসমাজের [তখনো পর্যন্ত 'কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিত] সপ্তত্রিংশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ন ৮ ঘটিকায় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বেদীর আসন গ্রহণ করেন ও সন্ধ্যা ৭টায় দেবেন্দ্র-ভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় বেদীতে বসেন বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য। ৪টি ব্রহ্মসংগীত গাওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়। গানগুলি *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য়* উদ্ধৃত হয়নি, কিন্তু এগুলি প্রতি বৎসর স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয়ে সভাস্থলে বিতরিত হত : '১১ মাঘের গানের কাগজ'-এর মুদ্রণ-ব্যয়ের হিসাব থেকে তা অনুমান করা যায়।

১৭৮৮ শকে ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ নিযুক্ত হয়েছিলেন : অধ্যক্ষ—কাশীশ্বর মিত্র, হেমেন্দ্রনাথ ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, সম্পাদক—দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক—আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-*র সম্পাদক—অবোধ্যানাথ পাকড়াশী।[১৮]

এই বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজ উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণকে সাহায্যের জন্য একটি বিশেষ তহবিল সংগ্রহ করেন। এই কাজ পরের বৎসরেও অব্যাহত ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইতিপূর্বেই যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল, তা এই বৎসরেই সম্পূর্ণতা লাভ করল যখন ২৫ কার্তিক রবিবার 11 Nov 1866 তারিখে ৩০০ নং চিৎপুর রোডের ক্যালকাটা কলেজ ভবন প্রাঙ্গণে সভা আহ্বান করে কেশবচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। উল্লেখ, নবগোপাল মিত্র এই সভায় উপস্থিত হয়ে নানা প্রস্তাব উত্থাপন করে সভার কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। এই সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং এই সভাতেও তা প্রতিফলিত হয়, সেটি এই যে, পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সংকলন করার সময় যেমন কেবলমাত্র হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের উপরই নির্ভর করেছিলেন ভারতবর্ষীয় সমাজ সে ক্ষেত্রে বাইবেল, কোরান, আবেস্তা প্রভৃতি থেকেও 'ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক বচন' সংগ্রহ করে একটি সার্বজনীন ভিত্তি রচনার চেষ্টা করে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

নব-নাটক-এর অভিনয় প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমি ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার দুই বৎসর পরে ছুটী নিয়ে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের [গণেন্দ্রনাথের] বাড়ীতে 'নবনাটক' অভিনয়ের প্রভূত আয়োজন

হয়েছে—আমি সেই সমারোহের মধ্যে এসে পড়ি। রঙ্গমঞ্চে যননিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরত্নের নামে অঙ্কিত—

ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু-/র্বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং/রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য।

নবনাটকখানি রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত, বহুবিবাহপ্রথায় পারিবারিক দুঃখজ্বালা অশান্তি প্রকটন সূত্রে লোকশিক্ষা দেওয়া ঐ নাটকের উদ্দেশ্য। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু সেই নাটকের পাত্রপাত্রী সেজেছিলেন। মেয়ের পার্ট অবিশ্যি পুরুষের নিতে হয়েছিল। আমার পিতা এই অভিনয়ের সংবাদ পেয়ে কালীগ্রাম হ'তে মেজদাদাকে [গণেন্দ্রনাথ] লিখছেন; (৪ মাঘ ১৭৮৮ শক— 16th January 1867)

"তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্ব রসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্ব্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।"

'আমাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার নাট্যের প্রধান নায়ক গবেশবাবু সেজেছিলেন—নাট্য অভিনয়ে সেই তাঁর প্রথম উদ্যম; পরে তিনি ঐ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আরো উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন—তাঁকে ছেড়ে আমাদের কোন অভিনয় সিদ্ধ হ'ত না। হাস্যরসের অভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।'[১৯]

অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : 'আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি ঁ নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদি) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ঁ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় "চিত্ততোষ", আর এক ভগিনীপতি ঁসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড় স্ত্রী। ...শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী "কৌতুকে"র পাঠ লইয়াছিলেন। ... আমার এক শ্যালক অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগিন্নির ভূমিকায়... ঁ বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ) সুবোধের ভূমিকায়।'[২০] অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, গবেশবাবুর আর-এক স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মণিলাল মুখোপাধ্যায় [নীলকমলের ছোটো ভাই], কিন্তু তিনি ভ্রমবশত বিনোদলালকে অপর স্ত্রীর ভূমিকাভিনেতা বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] আর-একটি ভুল আছে ছেলেবেলা-র পাদটীকায় [দ্র ২৬। ৫৯৯], সেখানে ক্রন্দনরতা কুলীন-কন্যার প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, 'যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমারী দেবীর স্বামী', কিন্তু এই ভূমিকায় ছিলেন সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়—অবনীন্দ্রনাথও লিখেছেন, 'বড়ো স্ত্রী সেজেছিলেন ও বাড়ির সারদা পিসেমশায়।'[২১] ছোটোগিন্নি চন্দ্রলেখার ভূমিকায় অমৃতলালের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি কৌতুক-কবিতা রচনা করেছিলেন :

মনে পড়ে সেইদিন, নাটকের "হিরোইন্"
সম্মুখে আয়না ধরি,
গবেশ করিতে বন্দী, পাতিছেন নানা ফন্দী

পান খেয়ে ঠোঁট লাল করি।

মরি, মরি, মরি ॥[২২]

অবনীন্দ্রনাথ ঘরোয়া-তে [পৃ ৯৩-৯৭] এই নাট্যাভিনয়-সম্পর্কে বিস্তৃত সরস বর্ণনা করেছেন, অবশ্য সে-সবই শোনা কথা, তাঁর তখনো জন্মই হয়নি।

কথিত আছে, নব-নাটক জোড়াসাঁকো রঙ্গমঞ্চে ন-বার অভিনীত হয়েছিল। আমরা চারটি অভিনয়ের সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি : ২২ পৌষ [5 Jan], ৭ মাঘ [শনি 19 Jan], ১৪ মাঘ [শনি 26 Jan] ও সম্ভবত ২১ মাঘ [শনি 2 Feb]—শেষোক্ত অভিনয়টি হয়েছিল ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে। ন্যাশনাল পেপার [Vol. II No. 6, Feb 6] এই অভিনয়-সম্পর্কে লেখে : '... The latest one was that held at the house of Baboo Gonendra Mohun Tagore on the occasion of a performance of the *Nobo Natuck*. Many respectable European and Native gentlemen were present. Baboo Ganendro Mohun Tagore, Barrister at Law, entertained the whole party with lively conversations.' ১৪ মাঘের অভিনয়-প্রসঙ্গে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা-য় [৯। ১১, ১৬ মাঘ, পৃ ১৬৫-৬৭] বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয় : 'নবনাটক ও তাহার অভিনয়।/ শনিবার আমরা জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এখানে নাটক অভিনয়ের যে প্রণালী দর্শন করিলাম, তাহা যদি সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া উঠে। নাট্য শালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত ও দ্রষ্টব্যর্থগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতিমনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এ সমুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত। দর্শকদের উপবেশন প্রণালী অদ্যাপিও উৎকৃষ্ট হয় নাই। এজন্য গালারি করা আবশ্যক। সংকীর্ণ স্থানে অধিকসংখ্য চৌকি সন্নিবেশিত হয়। এককালে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া সকলেই সমুখের আসন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাত্রঘর্ষণ ও আসনভঙ্গ ইহার ফল হইয়া উঠে।

[এরপর নাটকের কাহিনী-বর্ণনা ও তার সমালোচনা করা হয়েছে।]

'অভিনয়ের বিষয় বক্তব্য এই, অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই স্বকর্ত্তব্য অভিনয়ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। গবেশ ও চিত্ততোষের ত কথাই নাই, কৌতুক ও রসমরীর অংশ উত্তম হইয়াছে এবং নাগর ও গ্রাম্যের চরিত্রও নৈসর্গিক হইয়াছে। রঙ্গভূমির নাগর যদি যাবতীয় যুবক কৃতবিদ্যের আদর্শ হন, তাহা হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়। এ ব্যক্তির অভিনয় দর্শনে সবিশেষ পরিতোষ লাভ হইয়াছে। সুধীর পণ্ডিতের চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সাবিত্রী দাসীর অংশটী জঘন্য হইয়াছে। সকলেরই বেশ প্রায় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাবিত্রী না স্ত্রীলোক না হিজড়ে রূপ ধারণ করে। এ ব্যক্তির কথার ভাবও তুষ্টিকর হয় নাই। সুবোধের শেষ অংশটি বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। অর্দ্ধ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেবল ক্রন্দন কোন্ ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারেন? যে যুবক অভিমানে অনায়াসে দেশান্তরে গমন করিতে পারেন, তাঁহার স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন সঙ্গত নয়।

'উপসংহারকালে বক্তব্য এই, কোন কোন অংশে কিছু কিছু ত্রুটি থাকুক সাকল্যে বিবেচনা করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হইয়াছে।'

সম্ভবত ফাল্গুন মাসে অন্যতম উদ্যোক্তা ও অভিনেতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোম্বাই যাত্রা করায় নব-নাটক অভিনয় বন্ধ হয়ে যায় ও জোড়াসাঁকো নাট্যশালাও ‘বিগতজীবন’ হয়।

আগেই বলা হয়েছে, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা থেকে তিনটি বিষয়ে নাটক রচনার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। বিপিনমোহন সেনগুপ্ত-রচিত হিন্দু মহিলা নাটক এই কারণে পুরস্কৃত হয়, কিন্তু নাটকটি এই নাট্যশালায় অভিনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি। গ্রন্থটির ‘বিজ্ঞাপন’-এ উল্লিখিত হয়েছে যে 1867-তেই এই ‘নাট্যশালা-সমাজ বিগত-জীবন’ হয়। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা-র ১৬ অগ্র ১২৭৫ [30 Nov 1868] সংখ্যায় ‘যোড়াসাঁকো অভিনয় সভা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত’ এই উল্লেখসহ নাটকটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, সম্ভবত গ্রন্থটি সেই সময়েই প্রকাশলাভ করে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

বহুকাল যাবৎ ধারণা ছিল হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্রসংক্রান্তির দিনে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে [ডন ক্যাস্টরের বাগান বা ডন্‌কিন সাহেবের বাগান নামেও পরিচিত]। হিন্দুমেলার ইতিহাসকার যোগেশচন্দ্র বাগল জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত [১৩৫২] গ্রন্থে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রন্থে এই ধারণাই ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ‘হিন্দুমেলা ও ভারতচিন্তা’ প্রবন্ধে [দ্র *দেশ*, সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৭৪। ৯৬-১০২] এই ধারণা সংশোধন করেন মেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র-সম্পাদিত *The National Paper*-এ প্রকাশিত বিবরণ অবলম্বন করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে *The National Paper*-এর প্রথম দিকে প্রকাশিত রাজনারায়ণ বসুর “Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal” প্রবন্ধটি থেকে [উক্ত পত্রিকার ওই বৎসরের ফাইল পাওয়া যায়নি, সুতরাং ঠিক কোন্ তারিখ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায় না। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র চৈত্র ১৭৮৭ শক সংখ্যায় প্রবন্ধটি. পুনর্মুদ্রিত হয়] নবগোপাল মিত্র এই মেলার প্রেরণা পান। অবশ্য Prospectus-টি প্রকাশিত হবার এক বৎসরেরও বেশি সময় পরে 20 Mar 1867 [বুধ ৭ চৈত্র ১২৭৩] উক্ত পত্রিকায় [Vol III, No. 12, pp. 138-39] ‘A National Gathering’-শীর্ষক একটি আবেদন প্রচারিত হয়, যাতে আসন্ন চৈত্রসংক্রান্তির দিন একটি সম্মিলনের আয়োজন করা যায় ‘to unite in one tie of brotherly love union the various races and tribes of the people, who though living in one common soil, having one common interest, feel themselves so many different nations.’ এই প্রস্তাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকের সহানুভূতি লাভ করতে সমর্থ হয়। পরবর্তী সংখ্যায় [No. 13, Mar 27] লিখিত হয় : ‘We can congratulate ourselves too heartily on the success of the appeal made by us to the leading members of the Hindoo community to get up a movement for National Gathering at the end of the Bengalee Year. Some of the most respectable gentlemen of Calcutta have expressed sympathy with the cause

by liberal contributions.' পরের সংখ্যায় [No. 14, Apr 3] ১৫ জন শুভানুধ্যায়ীর নাম ঘোষণা করে জানানো হয় : 'The movement for an annual National Gathering is drawing sympathy from all quarters... We understand that a meeting will soon be called of the subscribers to determine as to what should be the objects of the Gathering.' এর পরবর্তী সংখ্যাতেই [No. 15, Apr 10] মেলার অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয় : 'The Mela will be held on Friday next at the Garden House of Rajah Narsing Chunder Roy Bahadoor, Chitpore, commencing its proceeding at 3 P.M. there will be different sorts of Gymnastic and Atheletic exercises, Music, Concert, Exhibition of the works of Hindoo Females, and Chemical experiments &&&.' *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা-ও [৯। ২১, ২৬ চৈত্র] সংবাদ দেয় : 'নূতন বৎসর উপলক্ষে কলিকাতায় কয়েক জন ভদ্রলোক চৈত্র সংক্রান্তির দিবস একটি জাতীয় মেলা করিবেন। ঐ উপলক্ষে অনেক আমোদ হইবে। সর্ব্বসাধারণ মেলাদর্শনার্থ যাইতে পারিবেন। এ প্রকার সামাজিক একতা প্রার্থনীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতি বৎসর ইহা করিতেন। তাঁহার মৃত্যু অবধি নূতন বৎসর উপলক্ষে কোন উৎসবই নাই।' এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, মেলার উদ্যোক্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনও পর্যন্ত অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়নি। এমনকি কয়েক বৎসর মেলার পর ১২৭৬ বঙ্গাব্দের চতুর্থ অধিবেশন থেকে যখন চৈত্র-সংক্রান্তির পরিবর্তে মাঘ-সংক্রান্তি কিংবা ফাল্গুন মাসের প্রথম শনি ও রবিবার মেলা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* [৬ ফাল্গুন ১২৭৬ বুধ 16 Feb 1870] লেখে : 'কলিকাতার সুসভ্য যুবকবৃন্দ গাজন পর্ব্বের বিনিময়ে সেই বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রীঃ হইতে চৈত্রমেলা বাহির করিয়াছিলেন, ... যখন চড়কপর্ব্বের বিনিময়ে চৈত্রমেলার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন এ বৎসর একেবারে তাহার নাম ও দিন পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই' [এই বৎসর 'চৈত্র মেলা'র পরিবর্তে 'হিন্দু মেলা' নামকরণ করা হয়]। অর্থাৎ মেলার কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করেছিলেন; *The National Paper*-এর 15 Apr 1868 সংখ্যায় [Vol. V, No. 16] দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্যসূচি বর্ণনা করে লিখিত হয় : 'From the above programme it will be clear beyond doubt that the Mela was far from being a substitute of the Churruch Poojah or of any other existing festivity as is erroneously supposed by many.' বোঝা যায়, নবগোপাল মিত্র বা অন্যান্যেরা এই মেলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে চাইছিলেন, দেশ তখনও তার পক্ষে যথেষ্ট প্রস্তুত হতে পারেনি—হিন্দুমেলার আনুষ্ঠানিক দিকটি কিছু লোককে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু এটি কোনোদিনই একটি আন্দোলনে পরিণত হয়নি। মেলা বহুদিন থেকেই ভারতের সামাজিক মিলনক্ষেত্র রূপে গণ্য হয়ে এসেছে, কিন্তু সর্বত্রই তা কোনো-না-কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত—আর সেই কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতীয় মেলা 'হিন্দু মেলা' নাম নিয়েও জনজীবনে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি, অক্লান্ত কর্মী নবগোপাল মিত্রের জীবনব্যাপী সাধনার এইটিই বাস্তব পরিণতি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫

রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছিলেন, সেই সময়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ চিত্রটি বহুবিধ উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট নয়। স্কুলগুলিতে ক'টি করে শ্রেণী থাকত, প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা কী ছিল, বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি পরীক্ষা কোন্ কোন্ শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করার পর দেওয়া যেত—এ-সম্পর্কে ঠিকমতো তথ্য পাওয়া যায় না; যদিও প্রতি বৎসরই বিস্তৃত আকারে *General Report on Public Instruction* প্রকাশিত হত, কিন্তু সেগুলি উপরোক্ত প্রশ্নগুলির জবাব দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বস্তুত এখনকার স্কুলের শ্রেণী-বিভাগের ধারণা দিয়ে সে-যুগের শিক্ষাব্যবস্থা বোঝা খুবই শক্ত। ম্যাট্রিক, স্কুল-ফাইন্যাল বা মাধ্যমিকের মতো তখন স্কুলের শেষ পরীক্ষার নাম ছিল 'এন্ট্রান্স' —কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দায়িত্ব ছিল পরীক্ষা পরিচালনার—কৃতী ছাত্রেরা কলেজে পড়ার জন্য পেত জুনিয়ার স্কলারশিপ। কিন্তু এখন যেমন স্কুলে দশ বছর পড়ার পর এই শো পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাওয়া যায়, তখন এ-সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হত না। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় 'ছাত্রবৃত্তি'-শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে [৪। ৪২ ১৭ ভাদ্র ১২৬৯, 1 Sep 1862] লেখা হয়েছিল : 'এক্ষণে প্রায় যাবতীয় প্রথম শ্রেণির গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ে নয় বৎসর পাঠ করিয়া শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিয়ম হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণির বিদ্যালয় সকলেও সাত বৎসর অধ্যয়ন না করিয়া পরীক্ষা দিবার উপায় নাই। এরূপ স্থলে নিতান্ত পক্ষে গড়ে সাত বৎসর অধ্যয়ন না করিয়া পরীক্ষা দিবার উপায় নাই।' 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার 1 Aug 1864 সংখ্যায় [Vol. XI, No. 31] ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, ওই স্কুলে সিনিয়ার বিভাগে তিনটি, জুনিয়ার বিভাগে পাঁচটি ও শিশু শ্রেণী নিয়ে মোট ন'টি শ্রেণী ছিল; যেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগে দুটি প্রাথমিক শ্রেণী [Elementary class], প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ পাঁচটি শ্রেণী ও এন্ট্রান্স ক্লাস নিয়ে মোট আটটি শ্রেণী ছিল। মনীষী বিপিনচন্দ্র পালও [1858-1932] তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'There were eight classes in our school, counted from the first or Entrance class...to the last or infant class'।[২৩] এতেই বোঝা যায়, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শ্রেণীর সংখ্যা সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হত না। তবে পরীক্ষার্থীর নিম্নতম বয়ঃসীমাটি নির্দিষ্ট ছিল—পরীক্ষা দেবার পরবর্তী 1 Mar তারিখ তার বয়স ষোলো বছরের বেশি হওয়া দরকার। অবশ্য বর্তমান পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে স্কুলে পড়তেন, সেই গবর্মেন্ট পাঠশালা এন্ট্রান্স স্কুল ছিল না—ভার্নাকুলার স্কলারশিপ বা বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্যই এখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হত। আমরা আগেই বলেছি, এই স্কুলে সাতটি শ্রেণী ছিল।

তখন স্কুল-পর্য্যায়ে মোটামুটি তিনটি বৃত্তি-পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল— Primary Scholarship, Vernacular কিংবা Minor Scholarship এবং Junior Scholarship বা Entrance; কিন্তু এই পরীক্ষাগুলি ঠিক কোন্ পর্যায়ে গৃহীত হত, সে-সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল বলে মনে হয় না। পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা ও পাঠ্যতালিকা বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন ভাবে নির্ধারিত হয়েছে—সেখানেও কোনো অপরিবর্তনীয় নিয়ম অনুসরণ করতে দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ যদিও উপরোক্ত কোনো ধরনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা কখনোই দেননি, তবু কী ধরনের সিলেবাস অনুযায়ী তাঁকে পড়াশুনো করতে হয়েছিল সেটির একটি পরিচয় পাবার জন্য আমরা কয়েক বৎসরের পাঠ্যতালিকার পর্যালোচনা করছি।

1863-তে নিম্ন-পর্যায়ের দুটি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য *সোমপ্রকাশ*-এ [৫। ১৫, ৫ ফাল্গুন ১২৬৯, 16 Feb 1863] একটি 'বিজ্ঞাপন' প্রকাশিত হয় :

দশবৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকদিগকে পশ্চাল্লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইবে। যথা—
বাঙ্গালাসাহিত্য। /চারুপাঠ ১ম ভাগ, রণজিৎসিংহের জীবন বৃত্তান্ত, কবিতাপাঠ, শ্রুতলিখন ও হস্তাক্ষর।
ব্যাকরণ।/ সন্ধি, লিঙ্গ, ক্রিয়া, কারক।
ভূগোল।/ পৃথিবীর চারি প্রধানখণ্ডের ও ভারতবর্ষের মানচিত্র লিখন।
ইতিহাস।/ বাঙ্গালা ইতিহাস ২য় ভাগ।
অঙ্ক। ত্রৈরাশিক পর্যন্ত।
১১, ১২, ১৩ অর্থাৎ অপূর্ণ ত্রয়োদশ বৎসর বালকগণকে পশ্চাল্লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইবেক। যথা— বাঙ্গালা সাহিত্য।/ নবপ্রবন্ধসার, টেলিমেকস্ ১ম ভাগ, পদ্য পাঠ, শ্রুতলিখন ও হস্তাক্ষর।
ব্যাকরণ।/ সন্ধি, লিঙ্গ, ক্রিয়া, কারক, সমাস।
ইতিহাস।/ বাঙ্গালা ইতিহাস ২য় ভাগ ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস।
ভূগোল।/ তারিণীচরণকৃত ভূগোলবিবরণ সমুদয় পৃথিবীর চারি প্রধানখণ্ডের ও এসিয়ার সমুদায় দেশের মানচিত্র লিখন।
অঙ্ক।/ সামান্য ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

পরের বৎসর অর্থাৎ 1864-এর ভার্নাকুলার স্কলারশিপের জন্য ১০ থেকে ১২ বছরের বালকদের এক বছরে ষোলোটি পাঠ্যপুস্তক পড়ানো সম্পর্কে অভিযোগ করতে গিয়ে হিন্দু পেট্রিয়ট-এ [Vol. XI, No. 41, 10 Oct 1864] একজন পত্রপ্রেরক সেই বৎসরের পাঠ্য-তালিকাটি উদ্ধার করেছেন : 'সীতার বনবাস, ব্যাকরণ, চারুপাঠ ৩য় ভাগ, পদ্যপাঠ, বাংলার ইতিহাস ১ম ও ২য় ভাগ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান, মানসাঙ্ক, স্বাস্থ্যরক্ষা, জমিদারী দর্শন, অর্থ ব্যবহার, পত্রকৌমুদী, ভূগোল, পাটীগণিত ও জ্যামিতি'। আগের বছরের তুলনায় এ বছরের কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

1866-এর পাঠ্যতালিকাটি[২৪] [ভার্নাকুলার স্কলারশিপ] এইরূপ :

বাংলা সাহিত্য—রচনাবলী : হরিনাথ শর্মা; জ্ঞানাঙ্কুর : নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সদ্ভাবশতক : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
ব্যাকরণ—সন্ধি, লিঙ্গ, কারক, ক্রিয়াপদ, ধাতু, তদ্ধিত, সমাস। বিবরণাত্মক ও বর্ণনামূলক রচনাদি।
পাটীগণিত—সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ, সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদকষা, বর্গমূল, সমতল ক্ষেত্রের পরিমিতি, মানসাঙ্ক।
জ্যামিতি—ইউক্লিড ১ম খণ্ড।
প্রকৃতি-বিজ্ঞান [Natural Philosophy]—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ভাগ', প্রথম আটটি অধ্যায়।
ইতিহাস—তারিণীচরণ-কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস ১ম, কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রিটিশ ভারত।
ভূগোল—তারিণীচরণ-কৃত ভূগোল (ভারতবর্ষ বাদে), শশীভূষণের ভারতবর্ষের ভূগোল, মানচিত্র লিখন, ঐতিহাসিক স্থানগুলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান।
অতিরিক্ত বিষয়—দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের জমিদারী হিসাব, পত্র কৌমুদী, রাজকৃষ্ণের অর্থনীতি-বিজ্ঞান [Political Economy], রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যরক্ষা।

ভার্নাকুলার স্কলারশিপ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ছিল পনেরো বৎসর। মাইনর পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই সীমা ছিল ষোলো বৎসর, তারাও উপরোক্ত সিলেবাসেই পরীক্ষা দিত, কেবল বাংলার ব্যাকরণ-বিষয়ক পত্রটির পরিবর্তে তাদের দুটি ইংরেজি পত্রে উত্তর করতে হত। বুঝতেই পারা যায়, ছাত্রদের পক্ষে পাঠ্যসূচির বোঝা যথেষ্ট ভারী ছিল। বয়সের ঊর্ধ্বসীমা যাই থাকুক-না-কেন, গেজেটে কৃতী ছাত্রদের যে তালিকা প্রকাশিত হত তাতে দেখা যায় এগারো থেকে তেরো বছর বয়সের ছাত্রেরাই এই পরীক্ষা দিয়েছে।

উপরে প্রদত্ত বিবরণটি আরও দীর্ঘ করা চলে, কিন্তু আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থায় পাঠ্যসূচিটি কী ধরনের ছিল উপরোক্ত তথ্যের সাহায্যেই তা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েছে। মনে রাখা দরকার, এর উপরেও তাঁদের জন্য 'নানা বিদ্যার আয়োজন' মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ করেছিলেন, স্কুলের যা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তার চেয়ে অনেক বেশি পড়তে হত।

উল্লেখপঞ্জি

১ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৮৪-৮৫

২ ছেলেবেলা ২৬। ৬০৭

৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৭৬-৭৭

৪ ছেলেবেলা ২৬। ৫৯০

৫ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস। ২৭

৬ মন্মথনাথ ঘোষ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [১৩৩৪]। ১২

৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৩৩-৩৪

৮ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৫

১০ ছেলেবেলা ২৬। ৫৯৮-৯৯

১১ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

১২ বক্তৃতামালা। ১৫; যোগেশচন্দ্র বাগল : হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত। ৫-এ উদ্ধৃত

১৩ ঘরোয়া। ৯৩

১৪ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫। ২৫২, পত্র ১৪

১৫ 'আমাদের কথা' : বলেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। ১৫

১৬ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ৫

১৭ পুরাতনী। ৩৩

১৮ দ্র তত্ত্ব, বৈশাখ। ২২

১৯ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ৩৬-৩৭

২০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১০৪, ১১২

২১ ঘরোয়া। ৯৩

২২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ৩০৮

২৩ Bepin Chandra Pal : *Memories of My Life and Times in the days of My Youth (1857-1884)* [1932]/31

২৪ দ্র *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1865-66* [1866]/89-90

---

* গেজেটটি কেন কেনা হয়েছিল, বলা সম্ভব নয়। 'গেজেট' বলতে যদি 'ক্যালকাটা গেজেট' বোঝানো হয়ে থাকে, তার Oct 1865 থেকে Mar 1866 পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যাগুলি আমরা খুঁজে দেখেছি—এই বালকদের জন্য আবশ্যক, এমন কোনো সংবাদ তাতে নেই।

† ':.. আমার মামাশ্বশুর হিসাবপত্র দেখিতেন, কিন্তু তাঁরও মাথার দোষ থাকায় শ্বশুর তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হন।'—'আমাদের কথা' : প্রফুল্লময়ী দেবী, বলেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। ২০

* 'MENTAL ARITHMETIC/ FOR CHILDREN./ PART I./ BY GOPAL CHUNDER BANERJEE./ মানসাঙ্ক/প্রথম ভাগ।/ শিশুদিগের শিক্ষার্থ/ শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। /কলিকাতা।/ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে/ ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।/ বাং ১২৭১, ইং ১৮৬৪ সাল।'

† রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর 'আত্মকথা'য় এই পারিতোষিকের পরিমাণ '২০০্ টাকা' ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। দ্র সা-সা-চ ১। ৫। ৩৯

* চিত্রা দেব তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' [১৩৮৭] গ্রন্থে এঁর নাম সর্বত্র 'যদুকমল' বলে উল্লেখ করেছেন, স্পষ্টতই সেটি ভুল।

সপ্তম অধ্যায়

১২৭৪ [1867-68] ১৭৮৯ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের সপ্তম বৎসর

১২৭৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের দ্বিতীয়ার্ধ [Jan 1867] থেকে রবীন্দ্রনাথের গবর্মেন্ট পাঠশালা-পর্বের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয়েছে, বলা যেতে পারে। মাঘ মাস থেকে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথকেও এই স্কুলে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন, এ কথা আমরা আগেই জানিয়েছি। ক্যাশবহি-তে সেইজন্য প্রতি মাসে মাথা-পিছু বারো আনা হিসেবে মোট তিন টাকা বেতন শোধ করার হিসাব দেখতে পাওয়া যায়। নীলকমল ঘোষাল এ বৎসরও তাঁদের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, বেতন পেয়েছেন আগের মতোই মাসিক দশ টাকা। কিন্তু 1867 শিক্ষাবর্ষে কোনো পুস্তক-খরিদের হিসাব না পাওয়ায় বোঝা শক্ত তাঁরা কী ধরনের পড়াশোনা এই বছরে করেছিলেন। মনে হয়, বর্ণপরিচয়ের পালা সাঙ্গ করে বোধোদয়, ভূগোল-ইতিহাস-স্বাস্থ্যের প্রথম পাঠ, অঙ্কের প্রাথমিক সূত্র ইত্যাদি এই বৎসর তাঁদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আগের মতোই রবীন্দ্রনাথ এ-বৎসরেও ভৃত্যশাসনের অধীন, কিন্তু ১২৭৪ বঙ্গাব্দের বিস্তৃত হিসাব-সংবলিত ক্যাশবহি-টি পাওয়া যায়নি বলে ঠিক কোন্ ভৃত্যের হাতে তিনি সমর্পিত ছিলেন তা জানা যায় না। কিন্তু মনে হয় জীবনস্মৃতির 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' অধ্যায়ের কোনো কোনো বর্ণনা—যেমন, সন্ধ্যাবেলায় রামায়ণ-মহাভারত পাঠের যে আসরের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—সম্ভবত এই বৎসরের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরের বৎসর থেকেই সন্ধ্যাবেলায় গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরেজি শেখার পালা আরম্ভ হয়, সুতরাং ছুটির দিন ছাড়া এ-ধরনের আসর বসার সম্ভাবনা ছিল না—সেইজন্য এটিকে বর্তমান বৎসরের কালসীমায় আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর নামক ভৃত্যটিকে তোশাখানার দক্ষিণে বড়ো একটা ঘরের 'মাদুর-পাতা আসরে'-র সর্দার বলে যে সম্মান দিয়েছেন, সেটি তার প্রাপ্য নয়—কারণ ওই ভৃত্যটি কাজে লেগেছিল অনেক পরে ১২৭৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ন'বছর, সন্ধ্যাবেলাটি তখন অঘোর মাস্টারের দখলে। যাই হোক, কিছু লেখাপড়া-জানা কোনো এক ভৃত্য বালকদের সংযত রাখবার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে তাঁদের বসিয়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাত। চাকরদের মধ্যে আরো দু-চারটি শ্রোতা জুটে যেত—বালকেরা স্থির হয়ে বসে কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুনতেন প্রবল আগ্রহের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাঁদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলাকার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনো মনে পড়ে।'[১] কিন্তু এদিকে রাত গভীর হচ্ছে, বালকদের জাগরণ কালের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, অথচ কাহিনীর অনেকটাই বাকি : 'এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে* আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি[২] গাহিয়া

অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল;—কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।'[৩] ছেলেবেলা-য় একই বর্ণনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তার মুখে হাসি, মাথায় টাক ঝক ঝক করছে, গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা সুর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ। সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়ে ভাব-বাৎলানো।'[৪]

রামায়ণের সঙ্গে এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। এই সময়েই বা আরও কিছু পরে, যখন তিনি নিজেই পড়তে শিখেছেন—সেই সময়কার একদিন কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ার বর্ণনা দিয়েছেন জীবনস্মৃতি-তে। এক মেঘলা দিনে বাহিরবাড়িতে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটাতে খেলার সময় ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ হঠাৎ তাঁর ক্ষুদ্রতম মাতুলটিকে ভয় দেখানোর জন্য 'পুলিসম্যান' 'পুলিসম্যান' বলে ডাকতে লাগলেন। পুলিসম্যানের নির্মম শাসনবিধি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল। স্পষ্ট ধারণাও কিছু থাকা সম্ভব, কেননা শ্যামাচরণ মল্লিকের যে বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ির একাংশ নর্মাল স্কুল ও গবর্মেন্ট পাঠশালার জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, তারই অন্য অংশে একটি পুলিশ-থানা অবস্থিত ছিল। সুতরাং ভীত বালক অন্তঃপুরে পালিয়ে গিয়ে মাকে এই বিপদের আশঙ্কা জানালেন, কিন্তু পুত্রের এই সংকট তাঁকে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত করেছে এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না। কিন্তু বাইরে যাওয়াও যথেষ্ট নিরাপদ নয়, সুতরাং সারদা দেবীর সম্পর্কিত খুড়ি* শুভঙ্করী দেবী যে কৃত্তিবাসের রামায়ণখানা পড়তেন সেই 'মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন' বইটি কোলে নিয়ে মায়ের ঘরের দরজার কাছে বসে পড়তে আরম্ভ করলেন : 'সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো-একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।'[৫] কোথায় পুলিসম্যানের ভয়ে অন্তঃপুরে পলায়ন, আর কোথায় রামায়ণ-কাহিনীর মধ্যে নিঃশেষে নিমজ্জন, যার করুণ বর্ণনা দুই চক্ষুকে অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে—এই আত্মনিমগ্নতা রবীন্দ্র-চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ বলে মনে করি, যা বারবার পারিপার্শ্বিক দুঃখ-বেদনা অতিক্রম করতে তাঁকে সাহায্য করেছে।!

আমরা আগেই বলেছি, এই বৎসরই সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত 'বোধোদয়' [প্রথম প্রকাশ : Apr 1851] রবীন্দ্রনাথের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত ছিল। বাড়িতে গৃহশিক্ষক নীলকমল ঘোষালের কাছে এই গ্রন্থটি পাঠের একটি অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন জীবনস্মৃতি-তে—'যেদিন বোধোদয় পড়াইবার উপলক্ষে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আকাশের ওই নীল গোলকটি কোনো-একটা বাধামাত্রই নহে, † তখন সেটা কী অসম্ভব আশ্চর্যই মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও-না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না।" আমি ভাবিলাম, সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলই সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, "আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি;" শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনো লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম, এটা এমন একটা আশ্চর্য খবর যে পৃথিবীতে যাঁহারা মাস্টারমশায় তাঁহারাই কেবল এটা জানেন, আর কেহ

নয়।'[৬] আশ্চর্য হবার এই ক্ষমতা ও কল্পনাপ্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা-বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এ-বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে প্রথমেই যেটির কথা বলতে হয়, সেটি হল ২৪ শ্রাবণ [বৃহ 8 Aug 1867] শুক্ল নবমীর দিনে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সাংবৎসরিক পিতৃ-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। 'অনুষ্ঠান পদ্ধতি' প্রণয়নের পর থেকেই তিনি কয়েক বৎসর এটি করে আসছিলেন। বর্তমান বৎসরে একটু ঘটা করেই অনুষ্ঠানটি নিষ্পন্ন হয় এবং *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র ভাদ্র সংখ্যায় ১০৮-১২ পৃষ্ঠায় এর বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশিত হয়। সকাল ন-টায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আরম্ভ হয় ও দেবেন্দ্রনাথ ১০২টি ভোজ্য উৎসর্গ করেন। তিনটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়—১। বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, ২। তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও এবং ৩। জননী সমান করেন পালন—এর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা। *The National Paper*-এর [Vol. III, No, 34, Aug 14] বিবরণ অনুসারে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গটি সাধারণভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন মতবিরোধের আবহাওয়ায় এটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আমরা আগেই বলেছি, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের একটি তরুণগোষ্ঠী মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন। তাঁরা তাঁদের ধর্মমতে, প্রচারে ও আচরণে খ্রিস্টানুরক্তি, পাপবোধের আতিশয্য ও হিন্দুত্বের অত্যুগ্র বিরোধিতা ইত্যাদি আরম্ভ করেন, যা দেবেন্দ্রনাথের একেবারেই মনঃপূত ছিল না। তিনি চাইতেন পৌত্তলিকতা ও বিভিন্ন কুসংস্কারপূর্ণ আচার-বর্জিত বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার, মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মধর্ম বলতে তিনি এইরকমই বুঝতেন। উপরের বর্ণিত অনুষ্ঠানটির জাঁকজমক ও *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় তার প্রচার এই মনোভাব থেকেই করা হয়েছিল বলে মনে হয়। অথচ ২৩ বৈশাখ [রবি 5 May 1867] কেশবচন্দ্র যখন ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ সেখানে কয়েকদিন বাংলাভাষায় উপদেশ প্রদান করেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে [Jun 1867] বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিকে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র একত্রে বেদীর কার্য করেন, আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রহ্মদর্শন-বিষয়ে তাঁর উপদেশ শোনেন এবং তাঁরই উপদেশে আরাধনায় 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' এই বেদান্ত বাক্যটির সঙ্গে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' বাক্যটি যুক্ত করেন। পরস্পরের সঙ্গে আদানপ্রদানের পথ খোলা রেখে দুটি বিরোধী গোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার এ এক আশ্চর্য নিদর্শন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গত বৎসর ফাল্গুন মাস নাগাদ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে আমেদাবাদে চলে যান। সেখানে তিনি ফরাসি ভাষা, চিত্রাঙ্কন ও সেতার-বাদন শিক্ষা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ 4Sep [বুধ ২০ ভাদ্র] তারিখে আমেদাবাদ থেকে গণেন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লেখেন, 'Jotee is learning "sitar" this is the only amusement I can provide for him here.' এর কিছুদিন পরেই 16 Oct [বুধ ৩১ আশ্বিন] থেকে 15 Jun 1868 [৩ আষাঢ় ১২৭৫] বাত-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ আট মাসের ছুটি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ

কলকাতায় আসেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করেন। কয়েকদিন আগে 11 Oct থেকে কলকাতা-বোম্বাই রেলপথ খোলা হয় [পাঁচ দিন সময় লাগত, দ্র *বামাবোধিনী*, কার্তিক। ৬২৩], সম্ভবত রেলপথেই তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন।

২ অগ্রহায়ণ [রবি 17 Nov 1867] স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হয়। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় পৌষ সংখ্যায় বিবাহ-সংবাদটি প্রকাশিত হয় : 'ব্রাহ্মবিবাহ। গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থী কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে বহুসংখ্য ভাদ্রলোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এই শুভকার্য্য আরম্ভ হইল।' 20 Nov-এর *The National Paper*-এর [Vol. III, No. 47, p. 554] বিবরণে একটু অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়া যায় : 'We have much pleasure to record a Brahmo marriage which took place with great eclat on the night of Sunday last the 17th November. The bridegroom, Baboo Janoky Nauth Ghosal is an intelligent young gentleman holding the post of an Assessor in Beerbhom district and the bride an accomplished girl of good attainments is a daughter of Baboo Debendro Nauth Tagore, Prodhan Acharya Brahmo Somaj. Every one who witnessed the ceremony, even orthodox Hindoos returned home with a most favourable inpression on their minds.' জানকীনাথের জন্ম হয় 1840-তে, সুতরাং বিবাহের সময় তাঁর বয়স ২৭/২৮ বৎসর। তাঁর পিতা জয়চন্দ্র ঘোষালের অনুমতি ছাড়াই এই বিবাহ হয়, সেইজন্যই উপরের বিবরণে তাঁর নাম প্রকাশিত হয়নি। জানকীনাথ স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। ফলে ঠাকুরবাড়ির দুটি নীতি—বিবাহের পূর্বে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ও গৃহজামাতার জীবনযাপন—তিনি মানতে অস্বীকৃত হন। জানকীনাথের দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা দুজনেই লিখেছেন, কয়েক বৎসর পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ যখন কৃষ্ণনগরে যান তখনই তিনি এই 'সুদর্শন উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক যুবক'কে দেখে মুগ্ধ হন এবং তারই পরিণতি এই বিবাহ। বিবাহ অবশ্য খুব সহজে স্থির হয়নি, কয়েক মাস পূর্বে ১২ ভাদ্র [27 Aug] তিনি শান্তিনিকেতন থেকে এক পত্রে গণেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'তোমার যে প্রকার হৃদয়ের সদ্ভাব ও মমতা, ইহাতে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ বিষয়ে তোমার যে পরামর্শ দেওয়া তাহা তোমার পক্ষে কখনই অনধিকার চর্চ্চা নহে। ... অনেক বিষয়ে আমি তোমার বুদ্ধি ও পরামর্শের উপর নির্ভর করি। আমি স্বর্ণকুমারীর যোগ্যপাত্র এখনো স্থির করিতে পারি নাই। তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়াও ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিব না।'[৭] যাই হোক, জানকীনাথের শর্ত মেনে নিয়েই দেবেন্দ্রনাথ কন্যার বিবাহ দেন। স্বর্ণকুমারী কোনো স্কুলে না পড়লেও বাড়িতে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সহৃদয় উচ্চশিক্ষিত স্বামীর কাছে সেই শিক্ষা আরও পরিণতি লাভ করে। জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদ ও জানকীনাথ দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ধরনের আধুনিকতা তিনিই প্রবর্তন করেন। বিবাহের পরে বিলাত যাত্রার কথা হওয়ায় তিনি সরকারী কর্ম ত্যাগ করেন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব না হওয়ায় 'তিনি স্বাধীন জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন'। এই সময়ে তাঁকে অবশ্য গৃহজামাতার জীবনই যাপন করতে হয়েছে।

এই বিবাহের কয়েকদিন পরে ১৫ অগ্রহায়ণ [শনি 30 Nov] হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান হিতেন্দ্রনাথের এবং পরের দিন ১৬ অগ্রহায়ণ [রবি 1 Dec] দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ও চতুর্থ সন্তান নীতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এর আগে সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ/আষাঢ় মাসে হেমেন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা প্রতিভা দেবীর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়—*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র শ্রাবণ সংখ্যায় ব্রাহ্মসমাজের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের 'আয় ব্যয়' বিবরণে 'আনুষ্ঠানিক দান' শিরোনামায় হেমেন্দ্রনাথের ৪ টাকা দানের হিসাব এই অনুমানের কারণ।

এর মধ্যে ৩ আশ্বিন [বুধ 18 Sep] তারিখে গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গগনেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর নাম প্রথমে 'গৌরীন্দ্র' রাখার কথা ভাবা হয়েছিল, হয়তো দেবেন্দ্রনাথই তাঁর 'গগনেন্দ্র' নামকরণ করেন। ২৬ ফাল্গুন [8 Mar 1868] অমৃতসর থেকে গণেন্দ্রনাথকে তিনি একটি পত্রে লেখেন : 'গুণেন্দ্রের পুত্রের নাম গৌরীন্দ্র অপেক্ষা গগনেন্দ্র আমার ভাল বোধ হইতেছে।'[৮] অবশ্য প্রস্তাবিত দুটি নামের মধ্যে তিনি একটি বেছে নিয়েছেন, এমনও হতে পারে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহের পর কিছুদিন উত্তরবঙ্গে জমিদারি পরিদর্শন করে তিনি পশ্চিমে যাত্রা করেন। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি জায়গায় কাটিয়ে তিনি দীর্ঘদিনের জন্য হিমালয়ে মূরী পর্বতে ['Willow Banks/Muree Hills'] গিয়ে বাস করেন।

ঠাকুর-পরিবারের অন্তঃপুর-শিক্ষার বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, জনৈকা 'সবুরান বিবি'-র জন্য সত্যেন্দ্রনাথের খাতে সারা বছর আট টাকা করে বেতন দিয়ে যাওয়া হয়েছে; তা ছাড়া 'বাটীর ভিতর পড়াইবার বিবির বেতন' ত্রিশ টাকা প্রতি মাসে 'W. Robson Esq.'-কে দেওয়া হয়। এর থেকে বোঝা যায়, বাড়ির মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার এক ধরনের ব্যবস্থা এখানে অব্যাহত রাখা হয়েছিল। বিশেষ করে স্বর্ণকুমারী দেবীর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সর্বাধিক সুফল প্রসব করেছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

১৭৮৯ শকে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ নিযুক্ত হন : অধ্যক্ষ—কাশীশ্বর মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [পাথুরিয়াঘাটা], শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র ও ত্রৈলোক্যনাথ রায়; সম্পাদক—দ্বিজেন্দ্রনাথ; সহকারী সম্পাদক—আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ; তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক —হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য [দ্র *তত্ত্ববোধিনী*, বৈশাখ। ১৯]। শ্রাবণ মাসে উক্ত পত্রিকায় একটি 'বিজ্ঞাপন'-এর মাধ্যমে নবগোপাল মিত্রকে অন্যতর সহকারী সম্পাদক করা হয় এবং অধ্যক্ষ-সভায় তাঁর শূন্যপদে কালীকৃষ্ণ দত্ত নিয়োজিত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর যেভাবে নতুন উৎসাহে তাদের প্রচারকার্য ও কর্মধারা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করছিল, তার সঙ্গে তাল মেলাবার জন্যই সম্ভবত অধ্যক্ষ-সভার বিস্তার ও পরবর্তী পরিবর্তনটি করা হয়েছিল। অক্লান্ত কর্মী ও সংগঠক নবগোপাল মিত্রের নিয়োগ থেকে এরূপ ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

৫ কার্তিক [সোম 21 Oct 1867] তারিখে* কেশবচন্দ্র প্রমুখ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ১২ জন সভ্য দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাঁকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। প্রায় এক বছর আগে ২৬ কার্তিক

১২৭৩ তারিখে যে সভায় অনুষ্ঠানিকভাবে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাতেই প্রস্তাব গৃহীত হয় : 'এত দিন কলিকাতা সমাজের প্রধান আচার্য্য ভক্তিভাজন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেরূপ যত্ন, একাগ্রতা ও ধর্ম্মানুরাগ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়।'[৯] এই প্রস্তাবানুসারেই অভিনন্দনপত্রটি প্রদত্ত হয়। পত্রটির শীর্ষে লেখা হয় : 'ভক্তিভাজন মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।'—সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথকে 'মহর্ষি' বিশেষণে এই প্রথম অভিহিত করা হল, *তত্ত্ববোধিনী* অগ্রহায়ণ সংখ্যায় [পৃ ১৫৫] সংগত কারণেই শব্দটির পরিবর্তে '* * *' চিহ্ন দিয়ে অভিনন্দনপত্রটি মুদ্রিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এর উত্তরে যে প্রত্যভিনন্দনপত্র রচনা করেন [দ্র, ঐ। ১৫৭-৬১]; তাতে তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে ভারতবর্ষীয় সমাজের সাফল্য কামনা করেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবগর্ভ বর্ণনার দিক দিয়ে পত্রটির মূল্য অসামান্য। কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ এই অভিনন্দনপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যটি। যদিও স্পষ্ট করে কোথাও উল্লিখিত হয়নি, তবু অত্যগ্রসর দলের মনোভাবটি ছিল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের জন্য যে ভূমিকাটি নির্দিষ্ট ছিল সেটি সমাপ্ত হয়েছে—এর পরের কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করছে কেশবচন্দ্রের নির্দেশে চালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। উদ্দেশ্যটি যে আদি সমাজের বোধগম্য হয়নি তা নয়, সেইজন্যই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ৪ কার্তিকের সভায় 'বাবু নবগোপাল মিত্র সভাপতিকে এই অভিনন্দনপত্রী দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজ এক ঈশ্বরের পূজা করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রশংসা করিবার জন্য নহে। আজ বাবু দেরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইতেছে; কে জানে যে, আর এক দিন বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং শিবচন্দ্র দেবকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইবে না? যদি এই প্রণালীতে সমাজের কার্য্য চলিতে থাকে, তাহা হইলে অতি অল্পদিনের মধ্যে পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে।'[১০] সভাপতি অবশ্য এই প্রশ্নের বিচার পূর্বের অধিবেশনেই নিষ্পন্ন হয়ে গেছে [প্রকৃতপক্ষে সেখানে এ-বিষয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি] এই বলে তাঁর আপত্তি খণ্ডন করেন। এর পরে মহেন্দ্রনাথ বসু প্রস্তাব করেন দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে তাঁকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হোক, কারণ তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণেই এই সমাজের উদ্ভব।[১১] আমরা এই প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম ব্রাহ্মসমাজের ভিতরকার গোষ্ঠীতান্ত্রিক রাজনীতির স্বরূপটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য। এরই ফলে পারস্পরিক দোষারোপ, চরিত্রহননের চেষ্টা ইত্যাদি নানা ধরনের মালিন্য বিভিন্ন পর্বে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, দ্বিধাবিভক্ত সমাজ ত্রিধা হয়েছে এবং একসময়ে ইংরেজি-শিক্ষিত যে হিন্দু বাঙালি নিজেদের আচারে প্রতিষ্ঠিত থেকেও ব্রাহ্মধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, তাদের মনোভাবও ব্যঙ্গাত্মক হয়ে ওঠে, যা শেষ পর্যন্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রভৃতির চরম প্রতিক্রিয়াশীলতাকেও স্বাগত জানায় যার হাত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মনীষীরাও আত্মরক্ষা করতে পারেননি।

উপরোক্ত সভায় আর-একটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়, যা পরবর্তীকালে বহু অনর্থের কারণ হয়েছে। 'হিন্দুবিবাহসম্বন্ধে যে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা ব্রাহ্মবিবাহে বর্ত্তিতে পারে কি না? যদি না পারে তবে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করিবার ভার' দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, দুর্গামোহন দাস, দীননাথ সেন প্রভৃতি সাত জনের একটি কমিটির উপর অর্পণ করা হোক এবং ব্রাহ্মবিবাহ কী

তারও সংজ্ঞা নিধাররিত করা হোক[১২], এই ছিল প্রস্তাবটির মর্ম। এই প্রস্তাবের পরিণতি কী ঘটেছিল, তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

৯ অগ্রহায়ণ [রবি 24 Nov] কেশবচন্দ্রের কলুটোলার ভবনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় দেবেন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সায়ংকালীন উপাসনাকার্য সম্পন্ন করেন।

১১ মাঘ [শুক্র 24 Jan 1868] ব্রাহ্মসমাজের অষ্টত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসবের দিনে মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে [বর্তমান কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট] 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত উপাসনা-মন্দির'-এর ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই দিন কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রাতে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন ও ৪টি ব্রহ্মসংগীত হয় এবং সায়ংকালীন উপাসনায় হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর বক্তৃতার পর ৪টি ব্রহ্মসংগীত হয়ে সভা ভঙ্গ হয়। এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাঠ করে ২৭ মাঘ দেবেন্দ্রনাথ সাহেবগঞ্জ থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখেন : '১১ মাঘে তোমরা সকলে একত্রে ভোজনাদি করিয়া মনকে তৃপ্ত করিয়াছিলে এ সংবাদে আমার মন পরিতৃপ্ত হইল এবং সন্ধ্যার সময়ে উপাসনা কালীন পাকড়াশীর ব্যাখ্যান যে তোমারদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল ইহাতেও অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম।'[১৩]

৯ কার্তিক [শুক্র 25 Oct 1867] সন্ধ্যায় চিৎপুর রোড়ে ব্রাহ্মসমাজগৃহে পুস্তকালয়ের হলে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে Brahmo Union Society প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ কার্তিক দেবেন্দ্রনাথ এই সমিতির সভায় 'ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান' বিষয়ে উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন। এই ভাষণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সেই সংকটের মুহূর্তেও তাঁর পুরোনো বিশ্বাসের কথাই জোর দিয়ে বলেন :

> পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া অথচ হিন্দুসমাজের যোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এইক্ষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এমন সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আর কালবিলম্ব সহ্য হয় না। সন্তান হইলে পৌত্তলিক মতে ষষ্ঠীপূজা হয়, তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ব্রহ্মপূজা হয় ইহাতে হিন্দুসমাজের বড় আপত্তি নাই। ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন দিলেও হিন্দুসমাজের তত বিরক্তি নাই। ... পৌত্তলিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন ব্যবস্থানুগত ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করিলে তাহাতে হিন্দুসমাজের বড় অমত হইতে পারে না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হিন্দুধর্ম্মে দাহের বিধান, ব্রাহ্মধর্ম্মেও দাহের বিধান আছে, বরং পুরাণের মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বেদের মন্ত্র তাহাতে যুক্ত করিয়া দেওয়াতে সাধারণের আরো মনঃপূত হইয়াছে। এমন শুনা গিয়াছে, কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, যদিও আর কোন অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্ম-মতে না হউক, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেন ব্রাহ্মধর্ম্মমতে হয়। তেমনি শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তে পিতামাতার আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছি যে কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেই প্রার্থনা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ব্রাহ্মেরা এই প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে ক্রমে যুক্ত হইতে পারিবে—তবে কেন তাহা হইতে বিযুক্ত হইবে।[১৪]

এই মনোভাব থেকেই দেবেন্দ্রনাথ বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও আমন্ত্রণ জানাতেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে *ধর্ম্মতত্ত্ব, Indian Mirror* প্রভৃতি পত্রিকায় এসম্পর্কে বহু নিন্দাবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় প্রকাশিত দুটি মন্তব্য থেকে। ৯ চৈত্র ১২৭৩ [শুক্র 22 Mar 1867] তারিখে রাজনারায়ণ বসুর দ্বিতীয়া কন্যা হেমলতার সঙ্গে অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে দীননাথ দত্তের বিবাহ হয়। *তত্ত্ববোধিনী*, বৈশাখ ১৭৮৯ শক সংখ্যায় [পৃ ১৯] সংবাদটি দিয়ে মন্তব্য করা হয় : 'এই বিবাহোপলক্ষে বর-পক্ষ ও কন্যা-পক্ষ, কাহাকেই হিন্দুসমাজের বিশেষ আক্রোশে নিপতিত হইতে হয় নাই। এক্ষণে বোধ হইতেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান সহজ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি এইটি অসবর্ণ বিবাহ হইত, তাহা হইলে কোন প্রকারেই হিন্দু

সমাজের সহনীয় হইত না।' আবার ২৯ আশ্বিন ১২৭৪ [সোম 14 Oct 1867] তারিখে ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তার কর্মচারী প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে ব্রজসুন্দর মিত্রের তৃতীয়া কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মমতে নিষ্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে বর দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণীর ও কন্যা বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রেণীর, বল্লাল সেন-প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা অনুযায়ী যেক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। *তত্ত্ববোধিনী*-র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় [পৃ ১৬৩] এই সংবাদ দিয়ে লেখা হয়েছে : 'এই উভয় শ্রেণীর আদানপ্রদান প্রাচীন নিয়মানুসারে নিষিদ্ধ না থাকিলেও আধুনিক বল্লালী প্রথা রক্ষা করা অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর বোধে ব্রজসুন্দর বাবু ও প্রসন্নবাবু তাহা রক্ষা করেন নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতেও এই রূপ শ্রেণী তিরোহিত হয় তদ্বিষয়েও সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য।' সেই জন্যই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে যখন রাঢ়ী শ্রেণীর দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী প্রতিভা দেবীর বিবাহ হয় [৩০ শ্রাবণ ১২৯৩], তখন এটিকে উক্ত পত্রিকায় 'সমাজ সংস্কার' নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

আদি [কলকাতা] ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রসঙ্গে এই দীর্ঘ আলোচনার জন্য পাঠকদের কাছে আমাদের কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। যদিও এইসব ঘটনার সঙ্গে আপাতত রবীন্দ্রজীবনের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই, কিন্তু মনে রাখা দরকার পরবর্তীকালে দীর্ঘদিনের জন্য [১২৯১-১৩১৮] আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে ঐ বিষয়ে বিভিন্ন বিতর্ক ও নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে যুক্ত থাকতে হয়েছিল এবং অন্তত দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত [৬ মাঘ ১৩১১] তাঁর প্রবর্তিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি তিনি প্রায় বিনা প্রতিবাদেই মেনে চলেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনের সেই অধ্যায়টির যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতটি বুঝতে গেলে বর্তমান আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করতেই হয়। অথচ সেই সময়ে রবীন্দ্রজীবনের ব্যক্তিগত বিবরণের আধিক্য থাকায়, এই ধরনের আলোচনার সুযোগ অল্প। সেই কারণেই আমরা এখানেই বিষয়টির বিভিন্ন দিক দেখে নেবার প্রয়াস করেছি। তাছাড়া এই যুগটিকেও বর্তমান আলোচনার সাহায্যে খানিকটা বুঝে নেওয়া সম্ভব বলে আমরা আশা করি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

চৈত্র মেলা বা জাতীয় মেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ৩০ চৈত্র ১২৭৪ শনি 11 Apr 1868 তারিখে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে প্রথম বার্ষিক অধিবেশনটির আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বৎসরের গোড়া থেকেই এটিকে সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। *The National Paper*-এর 19 Jan 1867 সংখ্যায় [Vol. III. No. 25] মেলার উদ্দেশ্য ও ছ-টি সাধনোপায় নির্দিষ্ট করা হয়। পরের সংখ্যাতেই একটি ব্যায়ামাগার [gymnasium] স্থাপনের প্রস্তাব করা হয় ও পুজোর ছুটির পরে সার্কুলার রোডের ৬৪ নং ফরিদ পুকুর লেনে শিবচন্দ্র গুহের বাগানবাড়িতে ব্যায়াম-শিক্ষালয় খোলা হয়। 7 Dec চোরবাগানে গোপালচন্দ্র সরকারের প্রিপারেটরি ইনস্টিটিউশন ভবনে আর একটি ব্যায়ামশিক্ষা-কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। স্বনির্ভরতার যে আদর্শ মেলা-কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, এগুলি তারই গঠনমূলক নিদর্শন।

পূর্ব বৎসরে মেলাটিকে 'National Gathering' নামে অভিহিত করা হয়েছিল, বর্তমান বর্ষে সেই নামটি বহাল থাকলেও *The National Paper*এর 11 Mar 1868 সংখ্যায় [Vol. IV, No. 11, p. 132] 'চৈত্রমেলা' নামেই অনুষ্ঠান-পত্র [Prospectus] প্রকাশিত হয়। গণেন্দ্রনাথ সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাধারণ বিভাগ, প্রগতি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, প্রদর্শনী বিভাগ, সংগীত বিভাগ এবং ব্যায়ামশিক্ষা বিভাগের সদস্য ও হিসাবপরীক্ষকদের নামেও ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানের দিন বেলা প্রায় দশটার সময় ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন সভার উদ্বোধন করলে সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' [খাম্বাজ-একতালা] দিয়ে সভার কার্য আরম্ভ হয়। উল্লেখযোগ্য, অসুস্থতার ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে সত্যেন্দ্রনাথও মেলার কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন, উক্ত সংগীতটি মেলার জন্যই লেখা। বলা যেতে পারে, এই সংগীতটি দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জাতীয়-সংগীত শাখার সূত্রপাত। এই মেলাতেই গণেন্দ্রনাথ রচিত 'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে' [বাহার—যৎ] জাতীয়-সংগীতটিও গীত হয়। এই উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'জন্মভূমি জননী, স্বর্গের গরীয়সী"-শীর্ষক কবিতাটি লেখেন। এসম্পর্কে তাঁর জীবনস্মৃতি-তে আছে : 'নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা লিখিতেন না, বা ইহার পূর্ব্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ... সেবারকার মেলায় শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিন জনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন।'[১৫] গণেন্দ্রনাথ মেলার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করার পর নবগোপাল মিত্র ১৭৮৯ শকে 'দেশ মধ্যে বা দেশ সম্পর্কে কি কি প্রধান ঘটনা' ঘটেছে তার বিবরণ পাঠ করেন। পূর্বোক্ত তিনটি কবিতা পাঠ, মনোমোহন বসুর বক্তৃতা, সংস্কৃত কবিতা ও রচনা পাঠ, সংগীত, প্রদর্শনী, ব্যায়াম, রাসায়নিক পরীক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যা ৬টায় সভা ভঙ্গ হয়। এই উপলক্ষে যে কার্যবিবরণীটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-র ৬৭ বর্ষ ২য় সংখ্যায় [পৃ ১০৬-১৬০] সেটি সম্পূর্ণ আকারে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

এই বৎসর দ্বিজেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববিদ্যা ২য় খণ্ড—কর্মকাণ্ড' [১২ ফাল্গুন 23 Feb 1868] ও সত্যেন্দ্রনাথের শেকস্‌পীয়রের *Cymbeline* নাটক অবলম্বনে লিখিত 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক' [২০ ফাল্গুন 2 Mar] প্রকাশিত হয়। নাটকটির ভাষা ও প্রকাশের বন্দোবস্ত নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বৎসরের শুরু থেকেই গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে যে দীর্ঘ পত্রালাপ করেছিলেন, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে তার অনেকগুলিই রক্ষিত আছে; সত্যেন্দ্রনাথের মনের একটি স্বল্পজ্ঞাত দিক এই পত্রগুলিতে উদ্‌ঘাটিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সংশোধন যুক্ত নাটকটির একটি স্টেজ-কপি দেখে মনে হয়, কোনো-এক সময়ে এটি অভিনয়ের আয়োজনও করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টাটি সার্থক হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

উল্লেখপঞ্জি

১ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৭৮-৭৯

২ দাশরথি রায় [1803-57], বিখ্যাত পাঁচালীকার

৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৭৯

৪ ছেলেবেলা ২৬। ৫৯৭

৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৬৭

৬ ঐ ১৭। ২৭৬

৭ বি. ভা প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫। ২৫১-৫২, পত্র ১৩

৮ ঐ। ২৫৪, পত্র ১৭

৯ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১। ৩৩১

১০ ঐ ১। ৪০৪-০৫

১১ দ্র ঐ ১। ৪০৫

১২ দ্র ঐ ১। ৪০৯

১৩ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫। ২৫২, পত্র ১৪

১৪ তত্ত্ব, চৈত্র। ২৩৪-৩৫

১৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১২৮

---

* কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায় 1856-এর পূর্ব থেকেই দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুচর, সুবৃদ্ধ অবস্থায় অবসর নেওয়ার পরও ঠাকুরবাড়ি থেকে আমৃত্যু পেন্‌সন পেয়েছেন।

* '... মায়ের খুড়ী, কাকার দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা স্ত্রী...তিনি প্রায় মায়েরই সমবয়সী ছিলেন'—পুরাতনী। ২৪

† বস্তুত বোধোদয়-এ এ-ধরনের কোনো প্রসঙ্গ নেই; সম্ভবত 'বর্ণ' শীর্ষক অনুচ্ছেদটি পড়ানোর সময় প্রসঙ্গক্রমে গৃহশিক্ষক এই আলোচনা করেছিলেন।

* অভিনন্দনপত্রে এই তারিখটি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একমাস পরে দেবেন্দ্রনাথের হাতে দেওয়া হয়—'সভার নির্দ্ধারণানুসারে অভিনন্দপত্র (৫ই কার্ত্তিক না দিয়া) এক মাসের পর প্রদত্ত হয়। ব্রাহ্মগণের নাম স্বাক্ষরার্থ এই এক মাসকাল প্রতীক্ষিত হইয়াছিল।'—আচার্য কেশবচন্দ্র ১। ৪১২

অষ্টম অধ্যায়

১২৭৫ [1868-69] ১৭৯০ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের অষ্টম বৎসর

এই বৎসরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বধূ-রূপে কাদম্বরী দেবীর আবির্ভাব। এই ঘটনাকে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত গদ্যে-পদ্যে নানাভাবে তিনি স্মরণ করেছেন। সেই কারণে প্রসঙ্গটি কিছু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হচ্ছে।

বিবাহানুষ্ঠানটি হয় ২৩ আষাঢ় [রবি 5 Jul 1868] তারিখে। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় সংবাদটি পরিবেশিত হয় এইভাবে :

ব্রাহ্ম বিবাহ।/গত ২৩ আষাঢ় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভ বিবাহ সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় বহুসংখ্য ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদিগকে প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।[১]

উদ্ধৃতিটিতে একটি ভুল আছে; জ্যোতিরিন্দ্র-বধূ তাঁর পিতার 'দ্বিতীয়া কন্যা' নন, তৃতীয়া কন্যা। এই পরিবারটি বহুদিন থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে ঘনিষ্ঠ ছিল। নীলমণি ঠাকুরের ভ্রাতা গোবিন্দরামের স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্মোহন গাঙ্গুলিকে কলকাতা হাড়কাটা গলিতে বাড়ি করে দেন। তাঁরই চেষ্টায় কেনারাম রায়চৌধুরীর কন্যা দ্বারকানাথের মামাতো বোন শিরোমণি দেবীর সঙ্গে জগন্মোহনের বিবাহ হয়। জগন্মোহন সংগীতশিল্পে পারদর্শী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর শারীরিক শক্তিও ছিল অসামান্য। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে এঁর সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন [দ্র পৃ ২]। এঁরই চতুর্থ পুত্র শ্যামলালের কন্যা কাদম্বরী দেবী।

সত্যেন্দ্রনাথ এই বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। প্রথমত তিনি চেয়েছিলেন এই বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ না দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁকে ইংলন্ডে পাঠাতে। 8 Jun [সোম ২৭ জ্যৈষ্ঠ] আহমদনগর থেকে স্ত্রীকে লেখা এক পত্রে তিনি লিখেছেন : 'শ্যাম গাঙ্গুলীর ৮ বৎসরের মেয়ে—আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এ বিবাহ সম্মত হইত [হইতাম না। কোন্ হিসাবে যে এ কন্যা নতুনের উপযুক্ত হইয়াছে জানি না।'[২] বিবাহের পরেও 12 Jul [শুক্র ২৯ আষাঢ়]-এর পত্রে লেখেন : 'শ্যামবাবুর মেয়ে মনে করিয়া আমার কখনই মনে হয় না যে ভাল মেয়ে হইবে—কোন অংশেই জ্যোতির উপযুক্ত তাহাকে মনে হয় না।'[৩] তাঁর এই মনোভাবের কথা তিনি পিতাকে জানালে প্রত্যুত্তরে তিনি লেখেন : 'জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এইই ভাগ্য। একেত পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমারদিগকে ভয় করে।

ভবিষ্যৎ তোমাদের হস্তে—তোমাদের সময় এ সঙ্কীর্ণতা থাকিবে না।'[৪] জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর—হয়তো-বা সত্যেন্দ্রনাথেরও—ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। তিনি বলেছেন : 'যে সূর্যকুমার চক্রবর্তীকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ডাক্তারী শেখাতে বিলেত নিয়ে গিয়েছিলেন, তার বড় মেয়ে Miss Carpenter-এর সঙ্গে বিলেত থেকে এসেছিল।...সে আমার বড় ছিল। শ্যামলা রঙের উপর তার মুখশ্রী ভাল ছিল। তাকে আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয়েছিল; কলকাতায় এসে তাঁকে দেখিয়েওছিলুম।'[৫]

সে যাই হোক, কাদম্বরী দেবী বধূবেশে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বৌ, কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।'[৬]

জীবনস্মৃতি-তেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। তাছাড়াও পরবর্তীকালের বহু রচনায় কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো-বা আভাসে ইঙ্গিতে এই স্মৃতি প্রকাশ পেয়েছে—তাতেই বোঝা যায় বালকমনে এই আবির্ভাব কত গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।

বিবাহের সময় কাদম্বরী দেবীর বয়স ছিল ঠিক নয় বৎসর [জন্ম—২২ আষাঢ় ১২৬৬ মঙ্গল 5 Jul 1859];[৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স উনিশ বছর দু'মাস। আর এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত বছর দু'মাস। দেবেন্দ্রনাথ এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন না; গত মাঘোৎসবের আগেই দেশভ্রমণে বহির্গত হয়ে এ-সময়ে তিনি মূরী হিল্‌সে অবস্থান করছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন গণেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথের ৬ শ্রাবণ [সোম 20 Jul]-এর পত্র* থেকে বিষয়টি জানা যায়। পারিবারিক হিসাব খাতা থেকে দেখা যায় ঘটক বিদায়, কুলীন বিদায়, অধ্যাপক বিদায়, পাকস্পর্শ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুপ্রথা এই বিবাহে পালিত হয়েছে। আর সমারোহ-পূর্ণ এই অনুষ্ঠানে বালক-বালিকারাও বঞ্চিত হয়নি : 'বিবাহ উপলক্ষে বাটীর সমুদায় বালক বালিকাগণের পোসাক তৈয়ারির ব্যয়' বাবদ দু'শো বারো টাকা সাড়ে পনেরো আনা খরচের সঙ্গে সঙ্গে অরুণেন্দ্র, সোমেন্দ্র, রবীন্দ্র ও সত্যপ্রসাদ বাবুর জন্য 'ইংরাজের দোকান হইতে' জুতো কিনে আনা হয়েছে।

সম্ভবত নিরক্ষরা-রূপে কিংবা সামান্য অক্ষর-জ্ঞান সম্বল করেই কাদম্বরী দেবী শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করেছিলেন, কারণ এই বছরের হিসাবে দেখা যায় ৮ আশ্বিন [বুধ 23 Sep] তারিখে 'ছোট বধূ ঠাকুরাণী ধারাপাত পুস্তক' এবং ২৪ চৈত্র [সোম 5 Apr 1869] তারিখে 'শ্রীমতী ছোট বধূ ঠাকুরাণীর জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ দুই খানা পুস্তক ক্রয়' করা হয়েছে। প্রসঙ্গটি এখানে উত্থাপনের তাৎপর্য এই যে, এই আপাত-অশিক্ষিতা বালিকাটি কোন্ অবস্থা থেকে আপন অন্তর্নিহিত শক্তি ও পরিবেশের প্রভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই একটি সাহিত্যগোষ্ঠীর মক্ষীরানীতে পরিণত হয়েছিলেন—সেই দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছেন। নীলকমল ঘোষাল ১২৭৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাস থেকে তাঁদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, এখনও তাঁর কাছেই সকাল বেলা বাড়িতে পড়া তৈরি করতে হয়। নর্মাল স্কুলে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী করে ছাত্রদের পড়ানো হত—সুতরাং ইংরেজি ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারটি সেখানকার পাঠ্যসূচিতে তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি, সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তৎকালীন পরিবেশ অনুযায়ী ইংরেজি শিক্ষার দিকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকা অভিভাবকদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। সুতরাং বাড়িতেই ইংরেজি পড়ানোর আয়োজন করা হল। ২২ আশ্বিন [বুধ 7 Oct]

তারিখের হিসাবে দেখা যায় : 'বঃ রাখালদাস দত্ত/ বালকদিগের ঘরে ইংরাজি পড়াইবার মাষ্টার/ দ° উহার শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাহার/ বেতন শোধ ৬ হিঃ—/বিঃ এক বিল গুঃ খোদ/ রোক ১২' অথাৎ শ্রাবণ ১২৭৫ [Jul 1868] থেকে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ভাবে ইংরেজি শেখা শুরু করেন। জীবনস্মৃতি বা অন্য কোথাও রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকটির কথা উল্লেখ করেননি। অবশ্য এঁর কার্যকাল খুব দীর্ঘ নয়—এই বৎসরের ২রা ফাল্গুন [শুক্র 12 Feb 1869] পর্যন্ত বেতন মিটিয়ে তাঁকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ না করলেও রবীন্দ্রজীবনীতে রাখালদাস দত্ত একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাবার অধিকারী। এঁর কাছেই—সম্ভবত প্যারীচরণ সরকারের *First Book of Reading* [1853] অবলম্বনে—রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি বর্ণমালা থেকে আরম্ভ করে কয়েকটি পাঠ আয়ত্ত করেছিলেন, তথ্যটি অবহেলা করার মতো নয়। অবশ্য অনুমানটি নিশ্ছিদ্র নয়। ছেলেবেলা-য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তখনও বি-এ-ডি ব্যাড এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয়নি।'[৮]—এখানে তিনি যে বইয়ের কথা বলেছেন, তা প্যারীচরণ সরকারের *First Book of Reading* না হওয়াই সম্ভব। সেখানে Lesson 12-এ 'I am up' শেখবার পর ['He is down' বাক্যটি নেই] Lesson 13-এ 'dad' 'pad' জাতীয় বর্ণযোজনা শেখানো হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ-পঠিত প্রথম ইংরেজি বইটি অন্য কোনো বই হওয়াও সম্ভব। রাখালদাসের বিদায়-গ্রহণের কয়েকদিন পরে ২৩ ফাল্গুন [শুক্র 5 Mar 1869] থেকে এই পদে নিযুক্ত হন রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'অঘোর বাবু'—যাঁর পুরো নাম ছিল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে লিখেছেন : 'বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মাস্টার অঘোরবাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন।'[৯] অন্যত্র একই প্রসঙ্গ তাঁর উক্তি : 'মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট্ বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি।'[১০] মাস্টারমশায়ের অন্য ছাত্রেরা সোনার টুকরো ছেলে, ঘুম পেলে তারা চোখে নস্যি ঘষে—এইসব কথা শোনা কিংবা সব ছেলের মধ্যে একলা মুখ্যু হয়ে থাকার বিশ্রী ভাবনাও তাঁকে জাগিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি মিলত। এইভাবেই ইংরেজি ভাষার জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ। অঘোরনাথ ফাল্গুনের শেষে এই ভার গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং বর্তমান বৎসরে তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু বলার সুযোগ নেই। এই জন্য প্রসঙ্গটি আমরা পরে আবার উত্থাপন করব।

এইসময়ে বাড়ির অন্যদের শিক্ষার রূপটিও একটু পর্যালোচনা করা যেতে পারে। কাদম্বরী দেবীর প্রাথমিক শিক্ষার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ছোড়দিদি বর্ণকুমারী দেবীর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ছোড়দিদি আমাদের সঙ্গে সেই একই নীলকমল পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে পড়িতেন কিন্তু পড়া করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে যেমন বিধান, না করিলেও সেইরূপ। দশটার সময় আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়া ইস্কুল যাইবার জন্য ভালোমানুষের মতো প্রস্তুত হইতাম—তিনি বেণী দোলাইয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে বাড়ির ভিতরদিকে চলিয়া যাইতেন; দেখিয়া মনটা বিকল হইত।'[১১] আশ্চর্যের বিষয়, বাড়িতে মেয়েদের শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও, সৌদামিনী দেবীর পর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আর কোনো কন্যাকে স্কুলে প্রেরণ করেননি। বর্ণকুমারী দেবীও স্কুলে যাননি; তবে 'শ্রীমতী বর্ণকুমারির সিলেট একখানা...ও বর্ণকুমারির রাইটীং রাঁধিবার কাগজ ইত্যাদি ক্রয়'-এর

হিসাব দেখা যায়। এর পাশাপাশি 'শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর পড়িবার জন্য কপি বহি ও ফোর্থ বুক অফ রিডিং ক্রয়' করা হয়। মনে রাখা দরকার, এই হিসাব যখনকার [২৭ ভাদ্র] তখন তিনি সন্তান-সম্ভবা, এই সময়ে পড়াশুনোর চেষ্টা তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও স্বামীর উৎসাহের প্রমাণ। বছরের শেষভাগে ফাল্গুন [Mar 1869] মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র অরুণেন্দ্রনাথও নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন, দ্বিপেন্দ্রনাথ তখন পড়ছেন বর্ণপরিচয় তৃতীয় ভাগ।

কালিদাস ও নদেরচাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে গত বৎসর পৌষ মাসে সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দ্বারি দাস নামক ভৃত্যের অধীনে আসেন। সত্যপ্রসাদের জন্য অবশ্য আলাদা ভৃত্য ছিল—তার নাম মাধব দাস। ফাল্গুন মাসে উভয় পক্ষেই ভৃত্যের বদল হল। সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রের ভৃত্য হল গোবিন্দ দাস, এর কথা রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন—'বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে।'[১২] খুব বেশি দিন কাজ করা অবশ্য তার ভাগ্যে সম্ভব হয়নি, চৈত্র মাসের ২৫ তারিখে তার জবাব হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনীর স্পর্শ তাকে অমরত্ব দান করেছে, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল কাজ করেও যে সৌভাগ্য অনেকেই লাভ করতে পারেনি। ১৪ ফাল্গুন [বুধ 24 Feb] তারিখ থেকে সত্যপ্রসাদের ভৃত্য হিসেবে বহাল হল ঈশ্বর দাস, ১২৭৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকেই হিসাব-খাতায় তার নতুন পরিচয় লেখা হয়েছে 'সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবুদিগের চাকর'-রূপে—যার বেতন দীর্ঘকাল ছিল মাসিক সাড়ে তিন টাকা। এর কথা রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন, যথাস্থানে আমরা সে-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'কবিতা-রচনারম্ভ'। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ* আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। ...আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।" বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।'[১৩] জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপির বর্ণনা আরও একটু বিস্তৃত এবং অতিরিক্ত তথ্যবহুল : 'একদিন দুপুর বেলায় তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া কেমন করিয়া চোদ্দ অক্ষর মিলাইয়া কবিতা লিখিতে হয় আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন এবং আমার হাতে একটা স্লেট দিয়া বলিলেন পদ্মের উপরে একটা কবিতা রচনা কর। তাহার পূর্ব্বে বারম্বার রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া ও শুনিয়া পদ্যচ্ছন্দ আমার কানে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। গোটাকতক লাইন লিখিয়া ফেলিলাম। জ্যোতি খুব উৎসাহ দিলেন।' ছেলেবেলা-য় প্রসঙ্গটির বর্ণনা এইরূপ : 'আমার চেয়ে বড়ো বয়সের এক ভাগনে একদিন বাৎলিয়ে দিলেন চোদ্দ অক্ষরের ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা জমে ওঠে পদ্যে। স্বয়ং দেখলুম এই জাদুবিদ্যের ব্যাপার। আর হাতে হাতে সেই চোদ্দ অক্ষরের ছাঁদে পদ্মও ফুটল; এমন-কি, তার উপরে ভ্রমরও বসবার জায়গা পেল।'[১৪] এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। জ্যোতিঃপ্রকাশই কাব্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গুরু, আর রবীন্দ্র-রচিত প্রথম কবিতাটিই যে ফরমায়েশি কবিতা—একথা আমরা জানতে পারছি উদ্ধৃতিগুলি থেকে। আরও জানা যাচ্ছে কবিতাটি লেখা হয়েছিল শ্লেটে ও চৌদ্দমাত্রিক তানপ্রধান [পয়ার] ছন্দে—কবিতাটির বিষয়বস্তু প্রকৃতি এবং প্রথম সমালোচনা কবির পক্ষে অনুকূলই ছিল, জ্যোতিঃপ্রকাশের উৎসাহদানে তারই প্রমাণ।

এতগুলি কার্যকারণ-পরম্পরার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে দেরি হল না। এতদিন ছাপার বইতে দেখা পদ্য যে সম্ভ্রম লাভ করে এসেছিল, কয়েকটি শব্দ জোড়াতাড়া দিতে তাই যখন পয়ার হয়ে উঠল, তখন পদ্যের সেই মহিমা আর বজায় রইল না। জমিদারি-সেরেস্তার কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের ফুল্‌স্‌ক্যাপ খাতা* জোগাড় করে 'স্বহস্তে পেনসিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।'[১৫] দাদা সোমেন্দ্রনাথ ভাইয়ের এই কবিপ্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। একদিন একতলায় কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করে দুই ভাই বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় ন্যাশানাল পেপার-এর এডিটর নবগোপাল মিত্রকে দেখে সোমেন্দ্রনাথ তাঁকে কবিতা শোনানোর জন্যে ধরলেন : 'শুনাইতে বিলম্ব হইল না। কাব্যগ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারি হয় নাই। কবিকীর্তি কবির জামার পকেটে-পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে।...পদ্মের উপরে একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেটা দেউড়ির সামনে দাঁড়াইয়াই উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম।'[১৬] কবিতাটিতে একটি শব্দ ছিল 'দ্বিরেফ', শব্দটির উপর বালককবির আশা-ভরসা সবচেয়ে বেশি ছিল—কিন্তু নবগোপালবাবুর উপর প্রতিক্রিয়া হল অন্যরকম, এমন-কি তিনি হেসে উঠলেন। এই হাসিই রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম বিরূপ সমালোচনা। তার আঘাতে রবীন্দ্রনাথের মনে হল নবগোপালবাবু সমজদার লোক নন, যদিও শব্দটি পরিবর্তন করতেও তিনি রাজি ছিলেন না—'শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।'[১৬]

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আর-একটি তথ্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জ্যোতিঃপ্রকাশের ফরমায়েশে লেখা কবিতাটি পদ্মের বিষয়ে লেখা, আর নবগোপাল বাবুকে যে কবিতাটি শোনানো হয়, সেটিরও বিষয়বস্তু পদ্ম। দুটি কি একই কবিতা? প্রথম কবিতাটি লেখা হয়েছিল শ্লেটে, দ্বিতীয়টি শোনানো হয়েছিল নীল খাতা থেকে। শ্লেটের কবিতাটিই যদি খাতায় তোলা হয়ে থাকে, তাহলে একই কবিতা বারবার লেখার যে অভ্যাস আমরা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পাই এখানে তারই সূচনা। ছেলেবেলা-য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে, সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না।'[১৭] সব ক'টি কবিতাতেই ঘুরে ফিরে পদ্মের কথা এসেছে, এটা কি কোনো তাৎপর্য বহন করে?

উপরোক্ত কবিতাগুলি, অন্তত প্রথম দুটি কবিতা [না কি একটি?], রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে আদিতম কবিতা রূপে গণ্য হতে পারে। অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের আরও একটি কবিতার উল্লেখ তিনি করেছেন :

পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল, নইলে পূজো হয় না।—

সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যামকুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খট খট খটাস
পট পট পটাস।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালোবাসতুম। খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।*

কবিদের সব কথাই তো ধার-করা, তা থেকে যদি বিশেষ কিছু 'বোঝা' যায়, তা যদি কিছু 'জানিয়ে' দেয়, তাহলে তো সবটাই কবির নিজস্ব হয়ে দাঁড়ায়—'আখরোট' কথাটা ব্যবহার না করলেও। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রটির উল্লেখ করেছেন তাঁর রেলিং-ছাত্রদের প্রসঙ্গে, যেটি তাঁর প্রথম স্কুল জীবনের ঘটনা। তাই যদি হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার ইতিহাসকে আরও পিছনে টেনে নিয়ে যেতে হয়, তাঁর চার বৎসর বয়সে। মন্ত্রটি লৌকিক ছড়ার ছন্দে রচিত—সাধু পয়ারে নয়—এটিও এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।[১৮]

নীল খাতায় কবিতা লেখা শুরু করার পর তাঁর ভাগ্যে আরও একটি প্রচ্ছন্ন সমাদর জুটেছিল। জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সেজদাদাকে বড় ভয় করিতাম। সত্য একদিন আমার খাতা লইয়া তাঁহার হাতে দিল। পদ্যলেখায় সময়যাপনকে পাছে তিনি অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন এই ভয়ে আমি লুকাইয়া বেড়াইতেছি এমন সময়ে আমার খাতা ফিরিয়া আসিল এবং যাহা রিপোর্ট পাওয়া গেল তাহাতে নিরাশ্বাস হইবার কোনো কারণ দেখিলাম না।'

এই বছর থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-পরিবারে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করেন। সংগীতচর্চা তিনি অনেকদিন ধরেই করছিলেন, 'নব-নাটক'-এর অর্কেস্ট্রা-রচনা তারই পরিচয়। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই গিয়ে তিনি সেতারও শেখেন। সেই সাংগীতিক উৎসাহ এই বৎসর উনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসারিত হয়ে ওঠে [১১ মাঘ শনি 23 Jan 1869]। হিমালয়-প্রত্যাগত দেবেন্দ্রনাথের উপস্থিতিও এই সমারোহের কারণ। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এই প্রথমবার বহু সংগীতের মালায় [সর্বমোট ১৫টি গান] উৎসবটি সজ্জিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতাও করেন। বালক রবীন্দ্রনাথের উপরেও এই অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়েছিল তা জানা যায় জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপি থেকে : 'আমাদের পরিবারে গানচর্চার মধ্যে শিশুকাল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর-আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে' গান গাহিতেছি, বেশ মনে পড়ে।'[১৯] লক্ষণীয়, গণেন্দ্রনাথ-রচিত উক্ত ব্রহ্মসংগীতটি এই বৎসরে মাঘোৎসবের সায়ংকালীন অধিবেশনে গীত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত এইখানে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-শিক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর শৈশবে বিশিষ্ট পরিবারে সংগীতবিদ্যার অধিকার ছিল বৈদগ্ধ্যের অন্যতম প্রমাণ। এই ঐতিহ্যানুসারে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সংগীতের স্রোত প্রবাহিত হত। দেবেন্দ্রনাথ নিজে ছোটোবেলায় সাহেব শিক্ষকের কাছে পিয়ানো শিখেছেন, পরে ওস্তাদের কাছে গানবাজনার চর্চাও করেছেন। রামমোহনের সময় থেকে হিন্দি গানের সুরে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রহ্মসংগীত রচনার যে প্রথার সূত্রপাত, দেবেন্দ্রনাথের সময়ও তা অব্যাহত ছিল। তাঁর পুত্রেরা—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে

সংগীতচর্চা করেছেন। জামাতা সারদাপ্রসাদ বিখ্যাত সেতারী জুয়ালাপ্রসাদের কাছে সেতার শিখতেন, তাঁর বৈঠকখানায় অনেক নামী সংগীতশিল্পীর সমাগম হত। তাছাড়া ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি এবং এঁর দাদা কৃষ্ণ রামমোহনের সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজে গান গাইতেন। কৃষ্ণের মৃত্যুর পরেও তিনি এই কাজে বহাল থাকেন ও অতি বৃদ্ধ বয়সে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্রদের রচিত অনেক গানে তিনিই সুর দেন, কিংবা তাঁর প্রদত্ত অনেক হিন্দি গানের সুরে কথা বসিয়ে তাঁরা ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। ইনি ঠাকুর-পরিবারের সংগীতশিক্ষকও ছিলেন। স্বভাবতই শৈশব থেকে এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথকেও সংগীতের পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছে—রবিবার সকাল ছিল এই সংগীতশিক্ষার সময়। এই শিক্ষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায়।'[২০] কয়েকটি নমুনাও তিনি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন; যেমন—

'চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি

মোগল পাঠান হদ্দ হল,

ফার্সি পড়ে তাঁতি।'[২১]

কিংবা, 'গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,

তার একটি মোচা ফললে পরে

কত হবে ছানাপোনা।' ইত্যাদি।

বিষ্ণুর সংগীতশিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়মে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধানো, তার পরে হালকা গোছের হিন্দি গান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন [সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ] তিনি বুঝেছিলেন, ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ঐ হালকা বাংলা ভাষা হিন্দি বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তা ছাড়া, এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না। আপনা-আপনি নাড়িতে নাচতে থাকে।...তখন হারমোনিয়ম আসে নি এ দেশের গানের জাত মারতে। কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলামি করি নি।'[২২]

আর একটি প্রসঙ্গ আমরা এইখানেই আলোচনা করে নিতে চাই। জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা প্রভৃতি স্মৃতিকথামূলক রচনায় পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁদের দৈন্যদশার কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পারিবারিক হিসাবসম্বলিত ক্যাশবহি-গুলির সাক্ষ্য ভিন্ন ধরনের। আগেই বলা হয়েছে, ১২৭১ বঙ্গাব্দের পূর্বের এইধরনের কোনো খাতা আমাদের হাতে আসেনি। ২৪ পৌষ ১২৭১ [শুক্র 6 Jan 1865] 'রবিবিন্দ্রবাবুর ইজের ১২টা' বারো আনাতে যেমন কেনা হয়েছে, তেমনি ১৪ অগ্র [সোম 28 Nov 1864] 'রবিন্দ্রনাথ বাবুর ১২টা ইজের তৈয়ারি' করতে তিন টাকা পনেরো আনাও খরচ করা হয়েছে। আবার ৮ বৈশাখ ১২৭২ [বুধ 19 Apr 1865] 'রবীন্দ্রবাবুর পিরান ১২টা'-খাতে দু'টাকা দশ আনা ব্যয় হলেও ১৮ চৈত্র ১২৭১ [বৃহ 30 Mar 1865] 'রবিইন্দ্রনাথবাবুর ১২টা পীরান'-খাতে খরচের পরিমাণ পাঁচ টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। জামা এবং প্যান্টের কাপড়ের গুণগত মান সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব না হলেও, একই সংখ্যক ইজের ও পিরানের দামের পার্থক্যটুকু বুঝিয়ে দেয় আটপৌরে ও পোশাকী

দু'রকমের জামাকাপড়ের আয়োজন তাঁর জন্যে ছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সূক্ষ্মদর্শী পাঠককে তারিখগুলিও লক্ষ্য করতে বলি; এত কম সময়ের ব্যবধানে এত বেশি সংখ্যক জামা-প্যান্টের আয়োজন কি 'এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে'[২৩]? এরও উপরে ২১ চৈত্র ১২৭২ [সোম 2 Apr 1866] ১৪টা করে কামিজ ও ইজের তৈরি করার জন্যে 'নয়ানষুক' কাপড়ও কেনা হয়েছে! ১২৭২ বঙ্গাব্দে এরই মধ্যবর্তী কালে ৬ আশ্বিন [বৃহ 21 Sep 1865] ৬টি করে পিরান ও ইজের কেনা হয়েছে এবং ২৯ অগ্র [বুধ 13 Dec] 'রবিন্দ্রনাথবাবু ও সত্যপ্রসাদবাবুর ছিটের পীরান তৈয়ারি খরচ ৩ ৷৷৩/আস্তরের জন্য কেলিকো/১ ল০'—এই হিসাব দেখা যায়। শেযোক্ত পোশাকটি সম্ভবত শীতবস্ত্র, তারিখটিও সেই ইঙ্গিতই করে। ১২৭২-এর হিসাবেও দেখা যায়, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৮ পৌষ [মঙ্গল 10 Jan 1865] ১১০ টাকার 'বনাত ['পশমী বস্ত্রবিশেষ'—হরিচরণ বন্দ্যো°; 'পশুলোমজাত শীতবস্ত্রবিঃ'—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস] খরিদ বাবত' দেওয়া হয়েছে—বাড়ির সকলের শীতের পোশাক তৈরির কাজেই এই বনাত ব্যবহৃত হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। ৭ মাঘ ১২৭৪ [20 Jan 1868]-এর হিসাবে দেখি—'বালকদিগের বনাতের চাপকান/মেয়েদিগের ফেলানেলের পিরান/সোমবাবু ও রবিবাবুর লেপের বড় ওয়ার/স্বর্ণকুমারির চায়না কোট' তৈরির খরচ দেওয়া হয়েছে। আবার ১৩ আষাঢ় ১২৭৫ [শুক্র 26 Jun 1868] তারিখের হিসাবে লেখা হয়েছে 'দ° সোমেন্দ্র রবীন্দ্র সত্যেপ্রসাদ বাবুদিগের বনাতের চাপকান তৈয়ার হয় তাহার দরজির মজুরি ও বোতাম শোধ ৪৲' এই মজুরি নিঃসন্দেহে উপরে উক্ত চাপকানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল'[২৩]!

হিসাবগুলি রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত শৈশবের, চার-পাঁচ বছরের হলেও, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, পরবর্তীকালে অবস্থার কিছু অবনতি হয়েছে। একই ধরনের হিসাব আমরা পরের বছরগুলিতেও দেখতে পাই। আর শুধু জামা-প্যান্ট নয়, মশারি, গামছা, লেপ-তোশক, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান অব্যাহত থেকেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।'[২৩] কিন্তু এক জোড়া মাত্র 'চটিজুতা' নয়, 'হাপচটী', 'চটীবিনামা' ও 'বিনামা' ['জুতা; চর্ম্ম-পাদুকা'—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস] প্রভৃতি আখ্যায় যে-পরিমাণ জুতো রবীন্দ্রনাথের জন্যে কেনা হয়েছে, তার হিসেব নিলে প্রশ্ন জাগতে পারে, যাঁদের বাইরের জগতে যাতায়াত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল তাঁরা এত জুতো নিয়ে কী করতেন—যার মধ্যে 'ইংরাজের দোকান হইতে' কেনা জুতোও ছিল! 'বিনামা খরিদ'-এর সর্বপ্রথম হিসাব আমরা পাই ১৪ অগ্র ১২৭১ [সোম 28 Nov 1864] তারিখে, যেদিন বারো আনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্য এক জোড়া জুতো কেনা হয়েছে। এরপর ১৬ বৈশাখ ১২৭৩ [শনি 28 Apr 1866] দশ আনায় এক জোড়া এবং ৪ ফাল্গুন ১২৭৪ [শনি 15 Feb 1868] এক টাকায় এক জোড়া জুতো কেনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশি মনে হতে পারে; কিন্তু তার পরেই [শুধু তারিখ উল্লেখ করে যাচ্ছি] ২৮ চৈত্র ১২৭৪ [বৃহ 9 Apr 1868], ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ [শুক্র 29 May 1868], এবং একই বছরে ২০ আষাঢ়

['ইংরাজের দোকান হইতে ক্রয় হয়'], ৪ শ্রাবণ ['১৫ আষাঢ় আনা হয়'], ৯ শ্রাবণ ['বিনামা ক্রয় মায় বগলস'], ৬ আশ্বিন, ৩ পৌষ ['বিনামা মায় বগলস'] অন্যান্য বালকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জন্যেও জুতো কেনা হয়েছে!

জীবনস্মৃতি-র আর একটি মন্তব্যেরও—'বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই'[২৩] ['অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে'—ছেলেবেলা ২৬। ৫৯৫]—বিরোধিতা করে ক্যাশবহিগুলি। ২৪ পৌষ ১২৭১ [শুক্র 6 Jan 1865] তারিখের হিসাবে স্পষ্ট লেখা আছে—'মোজা খরিদ দঃ ২০ কাৰ্ত্তীক/রবিন্দ্রনাথ বাবুর/১ ডজন', দাম লেগেছে সাড়ে তিন টাকা। সেই যুগের মূল্যমানের কথা স্মরণে রাখলে অনুমান করা যায় সেগুলির গুণগত মানও খুব খারাপ ছিল না, যে-যুগে বড়োবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্যও দু'জোড়া ধুতি কেনা হয় মাত্র ন'টাকায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স এই সময়ে তিন বৎসর সাত মাস। এই খাতে পরবর্তী বৎসরগুলিতেও খরচ দেখতে পাওয়া যায়। [প্রসঙ্গটির পরিসমাপ্তির জন্য আমরা পরবর্তী কয়েক বৎসরের হিসাবও একই সঙ্গে সংকলন করে দিচ্ছি।] ৬ আশ্বিন ১২৭৪ তারিখে 'স্বর্ণকুমারীর বস্ত্র ক্রয় ও সোমন্দ্র রবীন্দ্রবাবুদিগের মোজা ক্রয়' উনিশ টাকা দু'আনা, ২৪ পৌষ ১২৭৫ তারিখে 'সোমেন্দ্র রবীন্দ্র বাবু দিগের মোজা ২ ডজন' সাড়ে এগারো টাকা, ১১ ভাদ্র ১২৭৬ তারিখে 'সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবুদিগের মোজা ২ ডজন' তেরো টাকা ও একই বৎসরে ১৫ ফাল্গুনে 'রবী ও সোম বাবু দিগের মোজা ক্রয় এক ডজন' সাড়ে পাঁচ টাকা, ২০ পৌষ ১২৭৭ তারিখে 'সোম রবী বাবু দিগের মোজা ২ ডজন' দশ টাকা ছ'আনা—এই হিসাবগুলি দেখতে পাওয়া যায় এবং সবগুলির তারিখই রবীন্দ্রনাথ দশের কোঠা পার হবার পূর্ববর্তী!

উপরোক্ত বিবরণের সম্মুখীন হয়ে যে প্রশ্ন মনে জাগতে বাধ্য, সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এইসব আয়োজন সত্ত্বেও কেন অন্যরূপ লিখেছেন। এমন নয় যে পোশাক-পরিচ্ছদের, বিশেষ করে মোজার, যথাযথ যোগান তাঁর শৈশবের ব্যাপার, পরবর্তীকালে যা তাঁর স্মৃতিতে ছিল না। মোটামুটি একই ধরনের আয়োজন তাঁর সমগ্র বাল্যজীবনেই অনুসৃত হয়েছে। আমাদের অনুমান, অন্তঃপুরের স্নেহপ্রীতির জগৎ থেকে নির্বাসিত তীব্র অনুভূতিশীল বালকের আন্তরিক ক্ষোভ তাঁর মনে এক সর্বব্যাপী বঞ্চনার ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। সেই ধারণার কাছে বাস্তব প্রাপ্তিগুলিও তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এরূপ মনে হওয়ার আরও কিছু কারণ থাকতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র একবছর দু'মাসের ছোটো ছিলেন। সত্যপ্রসাদ-সোমন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ এই ত্রয়ীর পাশাপাশি দ্বিপেন্দ্রনাথের জন্যও পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতোমোজা কেনা হয়েছে। কিন্তু তাদের পরিমাণ ও গুণমানে পার্থক্য যথেষ্ট। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ৪ শ্রাবণ ১২৭৫ [18 Jul 1868] তারিখের হিসাবে দেখি—'সোমেন্দ্র ও রবিন্দ্র বাবু দিগের বিনামা ২ জোড়া দ° ১৫ আষাঢ় আনা হয়' দু'টাকা এগারো আনা তিন পয়সা দিয়ে, কয়েকদিন বাদে ৭ শ্রাবণ [21 Jul] তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'দ্বিপেন্দ্রবাবুর বিনামা ক্রয় (সাহেবের দোকান হইতে)' দাম সাত টাকা চার আনা। পার্থক্যটি খুবই দৃষ্টিকটু, এবং সেটির সমর্থন পাওয়া যায় দ্বিতীয় হিসাবটির পাশে পেনসিলে লেখা একটি মন্তব্য থেকে—'এত মূল্য দেওয়া কৰ্ত্তামহাশয়ের অভিপ্রেত কিনা জানি না।' বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত বড়োদের সাজপোশাক, আমোদপ্রমোদ এবং পার্শ্ববর্তী ৫ নং বৈঠকখানা বাড়ির জীবনযাত্রায় যে শৌখিনতার পরিচয় ছিল, পরিবারের বালকদের জন্য সর্বপ্রকার আয়োজন সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল সুদুস্তর। এই-

সব কারণেই বালক রবীন্দ্রনাথের নিজেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত মনে করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আর এই ক্ষোভ তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া সম্ভব, যার ফলে যতটুকু পেয়েছেন তাকেও তুচ্ছ মনে হয়েছে।

গোপালচন্দ্র রায় বহু যুক্তিজাল বিস্তার করে উপরের বক্তব্যকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন [দ্র 'রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত তাঁর বাল্যকালের বেশভূষার কথা কি সত্য নয়?': রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন। ৫৯-৬৭]। তাঁর প্রধান যুক্তি, বেশভূষার অভাবের কথা যেহেতু রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন সেহেতু তা সত্য হতে বাধ্য; আর ক্যাশবহির হিসাবগুলি হয় আমলাদের কারচুপি, নয় ভৃত্যদের তস্করতার জন্যই কেনা পোশাকগুলি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করার সুযোগ পাননি—যেখানে ভৃত্য ঈশ্বর দাস যে জলখাবারের পয়সা এবং লুচি ও দুধ চুরি করত একথা তো রবীন্দ্রনাথই জানিয়েছেন। কিন্তু পয়সা-লুচি-দুধ চুরির সঙ্গে বোধ হয় জুতো-মোজা-শীতবস্ত্র চুরি বা তা নিয়ে হিসাবের কারচুপির কিছু পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনার দায়িত্ব প্রধানত ভৃত্যদের উপরেই অর্পিত ছিল, সুতরাং অভিযোগ না করলে ঈশ্বর দাসের দুধ-লুচি চুরির খবর অভিভাবকদের জানার কথা নয়, যে অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বছর বয়সে করেছেন, সাত-আট বছর বয়সে সেই অভিযোগ করলে তার প্রতিকার অবশ্যই হত—হঠাৎ-হঠাৎ চাকর-বদল কিংবা কারোর 'জবাব' হয়ে যাওয়ার সংবাদ তো আমরা ক্যাশবহি থেকেই দিয়েছি। তাছাড়া সেরেস্তার হিসাবপত্র পরীক্ষা কেবল বিকৃত-মস্তিষ্ক মামা ব্রজেন্দ্রনাথ রায় বা দাদা বীরেন্দ্রনাথই করতেন, তা তো নয়—সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথও করতেন, বালকদের শিক্ষাদীক্ষার আয়োজনের প্রতি যাঁর ছিল অতন্দ্র দৃষ্টি। সুতরাং জুতো-মোজা-শীতবস্ত্রাদি, বালকদের জন্য কেনা হচ্ছে অথচ পরানো হচ্ছে না এ ব্যাপার তাঁর চোখে পড়বে না এটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। খাওয়া-দাওয়ায় আপত্তি, পোশাক-পরিচ্ছদে অনাগ্রহ অনেক বালকের মধ্যেই দেখা যায়—কিন্তু এগুলি সবসময়ে অভাবের প্রমাণ নয়। দেবেন্দ্রনাথ অনেক সময়েই বাড়িতে থাকতেন না, কিন্তু যখন আসতেন তখন সকলকেই যথোপযুক্ত পোশাক পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হত, মাঘোৎসবাদি উৎসবেও নিশ্চয়ই বালক-বালিকাদের পোশাকে বৈলক্ষণ্য ঘটার সুযোগ ছিল না। কিন্তু এভাবে প্রমাণ জড়ো করার চেষ্টাই অর্থহীন, নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে ছাড়া 'শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট' বলে উল্লেখ করা নিঃসন্দেহে সত্যের অপলাপ। উল্লেখ্য, জীবনস্মৃতি-র প্রথম খসড়ায় এইসব দারিদ্র-কীর্তনের চিহ্নমাত্র নেই। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালেও যথাসম্ভব অনাড়ম্বর জীবনযাপনে আগ্রহী ছিলেন, তার কারণ অর্থাভাব নয়। জীবনস্মৃতি-কে প্রকাশযোগ্য রূপ দেওয়ার সময়ে ধনীর পুত্র বা জমিদার প্রভৃতি অভিধাগুলির বিপরীত ধারণা তৈরি করতে তিনি সচেতনভাবেই ক্রিয়াশীল ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও তথ্য এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে।

? ২৮ বৈশাখ শনিবার 9 May 1868 শরৎকুমারী দেবী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা সুশীলা দেবীর জন্ম হয়।*

আশ্বিন মাসের শেষে [Oct 1868] সত্যেন্দ্রনাথের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে ও অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়।*১ এর কয়েক মাস পরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ৩০ পৌষ [মঙ্গল 12 Jan 1869] তারিখে স্টীমারে বোম্বাই যাত্রা করেন। সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও জানকীনাথ ঘোষাল তাঁর সহযাত্রী ছিলেন।

? ২১ অগ্র [শনি 5 Dec] স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের প্রথমা কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর জন্ম হয়। *২ আমরা আগেই বলেছি, জানকীনাথের বিবাহে তাঁর পিতা জয়চন্দ্র ঘোষালের সম্মতি ছিল না, সেইজন্য বিবাহে তিনি উপস্থিত হননি। কিন্তু পুত্রবধূর সন্তানসম্ভাবনার সংবাদে তাঁর বিরূপতা অন্তর্হিত হয়। ২ কার্তিকের একটি হিসাবে দেখা যায়: 'দ° জানকীবাবুর পীতা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারিকে দেখিতে আসেন উক্ত শ্রীমতী তাঁহাকে প্রণামী দেন' অর্থাৎ এই সময় থেকে পিতা-পুত্রের মিলন্‌ ঘটে।

অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে July 1868 [আষাঢ়-শ্রাবণ] মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতেন্দ্রনাথের এবং ফাল্গুন [Feb 1869] মাসে শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা দেবীর অন্নপ্রাশন হয়।

ঠাকুর পরিবারে এই বৎসরের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের বায়ু-পীড়ার সূত্রপাত। আহমদনগর থেকে 19 July [রবি ৫ শ্রাবণ] তারিখে লিখিত একটি পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লেখেন: 'বীরেন্দ্রের বিষয় আমাদের যাহা ভয় ছিল, তাহাই কি ঘটিল—বড় আক্ষেপের বিষয়। তাহাকে কোথাও বেড়াইতে লইয়া গেলে হয়ত ভাল হয়।'[২৪] এই চিঠি থেকে বোঝা যায় এই পীড়ার লক্ষণ অনেক আগে থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। বস্তুত তাঁর স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবীর একটি উক্তি থেকে এই অনুমান করা যায় যে, বিবাহের পূর্বেই হয়তো কতকগুলি চিহ্ন তাঁর আচরণে ফুটে উঠেছিল: 'দিদির বিবাহের পর আমি প্রায়ই মায়ের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ি আসা যাওয়া করিতাম, সেই সময় আমাকে দেখিয়া আমার ননদ স্বর্ণকুমারী ও শরৎকুমারীর পছন্দ হওয়াতে আমার স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে থাকেন। আমার স্বামী সেই কথায় তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কলাবৌকে বিবাহ করিবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে খুব একটা হাসাহাসির রোল পড়িয়া যায়।'[২৫] বর্তমান প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: 'চার বৎসর বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। বিবাহের চার বৎসর পরে আমার স্বামী মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর ওই ভাবে কষ্টে কাটান। আমার বিবাহের পরই তিনি এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।*৩ এই রোগের পূর্বে তাঁহার যথেষ্ট মেধাশক্তি ছিল বলিয়া আমার শ্বশুর সমস্ত সংসারের তহবিলের আয় ব্যয় দেখিবার ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন।*৪ ইহার পূর্বে আমার মামাশ্বশুর [ব্রজেন্দ্রনাথ রায়] হিসাবপত্র দেখিতেন, কিন্তু তাঁরও মাথার দোষ থাকায় শ্বশুর তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার যখন এইরূপ অবস্থা হইল এবং দিন দিনই রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল...আমার স্বামী স্নান আহার পর্যন্ত সব ছাড়িয়া দিলেন, ও সকলের উপর একটা তাঁর সন্দেহের ভাব বাড়িতে লাগিল। এই সন্দেহ বাতিকের জন্য প্রায়ই আমাকে নানারকম ভুগিতে হইত।...আমার স্বামী খাওয়াদাওয়া একরকম ছাড়িয়াই দিলেন। তার উপর তাঁর কাসি ও হাঁপানী অল্প অল্প দেখা দিল, এই সব কারণে তাঁকে লইয়া আমি আমার বড় জা, নতুন বৌ, আমার দিদি সকলে মিলিয়া বোলপুরে যাই। সেখানে গিয়াও খাওয়ার কোন পরিবর্তন হইল না। চায়ের চামচের এক চামচ ভাত বা কোনও দিন একটি পটল পোড়া খাইয়া থাকিতেন। এমনি-ভাবে সেখানে তিনদিন কাটিল, খাওয়ার বা শরীরের কোনই

বদল না হওয়াতে, তিনদিন পর আবার আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।’[২৬] ডাঃ পেন সাহেব বীরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করেন। সম্ভবত তাঁরই নির্দেশে বীরেন্দ্রনাথের জন্য ড্রয়িং শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, এমন-কি ভবানীচরণ সেন নামক একজন ড্রয়িং শিক্ষককেও নিয়োগ করা হয়। বর্তমান বৎসরে অবশ্য তাঁর অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি।

এছাড়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মনে কোনো কারণে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল যার জন্যে তিনি বাড়িতে ফিরতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ফলে জ্ঞানদানন্দিনীর অন্য কোনো বাড়িতে থাকার কথাও চিন্তা করা হচ্ছিল ইত্যাদি এক অনির্দেশ্য পারিবারিক অশান্তির ইঙ্গিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।[২৭] দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য জ্ঞানদানন্দিনীর বোম্বাই যাত্রার পূর্বেই বাড়িতে ফিরে আসেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে ‘বাহিরে যাত্রা’ অধ্যায়ে যে পেনেটির বাগানের কথা উল্লেখ করেছেন, বর্তমান বৎসরেই সেই বাগানটির সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগের সূচনা হয়। পৌষ মাসে হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সারদাপ্রসাদ, যদুনাথ প্রভৃতি পানিহাটির ওই বাগানে বাস করেন। সত্যেন্দ্রনাথের পত্র থেকে জানা যায়, বোম্বাই-যাত্রার পূর্বে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও কিছুদিন ওই বাগানে গিয়ে থাকেন। মাঘ মাসে সৌদামিনী দেবী ও স্বর্ণকুমারী দেবীও সেখানে ছিলেন, ক্যাশবহি থেকে এইসব খবর পাওয়া যায়। প্রসঙ্গটি আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

১৫ ভাদ্র রবিবার 30 Aug ৬৭ বৎসর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মৃত্যু হয় [জন্ম 21 Dec 1801]। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের সময় ইনি দেবেন্দ্রনাথকে অনেক সুপরামর্শ দিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

১১ মাঘ [শনি 23 Jan 1869] আদি ব্রাহ্মসমাজের ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসরের উৎসবের বিবরণ দেখলে মনে হয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কিছুটা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়েই এবারের অনুষ্ঠানসূচি রচিত হয়েছিল, কারণ এতটা সমারোহ আগের কোনো অনুষ্ঠানেই লক্ষিত হয়নি। এবারের উৎসবের সূচনা হয় ১ মাঘ থেকে, বুধবারের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন ছাড়া ১ থেকে ১০ মাঘ পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যার আয়োজন করা হয়। ১১ মাঘ প্রাতে ব্রাহ্মসমাজগৃহে দেবেন্দ্রনাথ উদ্বোধন করেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ভাষণ দেন। এই অধিবেশনে সাতটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়:

শঙ্করা—আড়াঠেকা। আজি আমারদের মহোৎসব [সত্যেন্দ্রনাথ]

ভৈরব—চৌতাল। সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা [”]

দেবগিরি—একতালা। নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরাম

আসা—ঠুংরি। বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর [সত্যেন্দ্রনাথ]

টোড়ী—চৌতাল। তুমি তো জীবনের আধার

টোড়ী—চৌতাল। দীননাথ! প্রেম-সুধা দেও [গণেন্দ্রনাথ]

গৌড়শারঙ্গ—আড়াঠেকা। আঁখি-অঞ্জন! ডাকি হে তোমারে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

মধ্যাহ্নে দেবেন্দ্রভবনে আহারাদির পর ব্রহ্মসংগীত হয়: লুম ঝিজিট—যৎ। উথলিল প্রেম-সুধা, আজ, অহো সাধু!

দেবেন্দ্রভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় গণেন্দ্রনাথ, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী বক্তৃতা করেন। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে গীত সত্যেন্দ্রনাথের 'আজি আমাদের মহোৎসব' গানটি ছাড়াও আরও সাতটি ব্রহ্মসংগীত এখানে পরিবেশিত হয়:

ইমনকল্যাণ—চৌতাল। তুমি জ্ঞান, প্রাণ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর [সত্যেন্দ্রনাথ]

জয়জয়ন্তী—চৌতাল। প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব [গণেন্দ্রনাথ]

বাহার—একতালা। দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে ["]

কেদারা—চৌতাল। বহিছে কৃপা-পবন তোমার [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

শাহানা—আড়াঠেকা। কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু ["]

খাম্বাজ—ধামার। সেই প্রেম-ছবি সুধার ধার

ঝিঁজিট—ঠুংরি। গাওরে জগপতি জগবন্দন [সত্যেন্দ্রনাথ]

[দ্র *তত্ত্ববোধিনী,* ফাল্গুন ১৭৯০ শক]

উপরের বিবরণ থেকে বোঝা যায় তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাকবি হচ্ছেন প্রধানত সত্যেন্দ্রনাথ এবং কিছুটা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ। সুদূর আহমদনগরের কর্মস্থল থেকেও সত্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনা করে পাঠিয়েছেন, সে খবরও পাওয়া যায় গণেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে। 24 Jan 1869 [রবি ১২ মাঘ] গণেন্দ্রনাথকে তিনি একটি পত্রে 'ইচ্ছা হয় সর্ব্ব ভুলে', 'মঙ্গলনিদান, বিঘ্নের কৃপাণ, মুক্তির সোপান', 'হে করুণাকর, দীনসখা তুমি', 'দীন-দয়াময় ভুলো না অনাথে' 'কৃপাসাগর হে অখিল জগৎপাতা' এই পাঁচটি গান পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীকে দিয়ে সেগুলিতে উপযুক্ত সুর বসাবার জন্য। পরের দিন পিতার কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি পূর্বোক্ত 'দীন-দয়াময় ভুলো না অনাথে' গানটি ছাড়াও তাঁর বিখ্যাত ব্রহ্মসংগীত 'তুমি বিনা কে প্রভু শঙ্কট নিবারে' গানটি প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, গানগুলি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে নানা উপলক্ষেই এগুলি গাওয়া হয়েছে। বাংলায় স্বরলিপি-রচনার পরীক্ষায় এর মধ্যে কয়েকটি গানকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছিলেন, সেদিক থেকে এদের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়েছিল। গত বৎসর মাঘোৎসবের পর কেশবচন্দ্র সদলে বাংলায় শান্তিপুর ও ভারতের অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ ও প্রচার আরম্ভ করেন। ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, বম্বে প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়ে কেশবচন্দ্র পুনরায় Apr 1868-এর শুরুতে মুঙ্গেরে আসেন। 19 Apr [রবি ৮ বৈশাখ] সেখানে সারাদিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন হয়। এর ফলে সেখানে যে ভক্তির আতিশয্য উপস্থিত হয়, তা শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র ও তাঁর সমাজের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেশবচন্দ্রের জীবনীকার গৌরগোবিন্দ রায় লিখেছেন:

একজন বন্ধু কেশবচন্দ্রকে এই সময়ে বলেন, মুঙ্গেরে বর্ত্তমানে যে প্রকার ভাব সমুপস্থিত, ইহাতে কুসংস্কারের আগমনের সম্ভাবনা। ইহাতে তিনি উত্তর দেন, "হইতে দাও।" এ কথার ভাব এই যে, শুষ্ক নীরস কঠোরভাব হইতে কুসংস্কারও ভাল।...সুতরাং কোন বাধা না পাইয়া ক্রমেই ভক্তির আতিশয্য দেখা ছিল, পরস্পরের চরণে অবলুণ্ঠন করিয়া তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হইল না, পরিশেষে চরণ ধৌত করিয়া দিয়া পত্নীর সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ দ্বারা আর্দ্রপদ শুষ্ক করিয়া দেওয়া পর্যন্ত চলিল।...ভক্তগণের চরণধারণ, ভক্তগণের ভোজনাবশিষ্ট গলবস্ত্র হইয়া যাজ্ঞাপূর্বক গ্রহণ, এ সকল প্রায় নিত্যকৃত্য হইয়া উঠিল। এত দূর পর্যন্ত হইয়াই নিবৃত্ত রহিল না, বিবেকের প্রতিরোধশ্রবণস্থলে স্পষ্ট কেশবচন্দ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতিষেধ করিতেছেন, ব্যক্তিবিশেষ এরূপও প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।[২৮]

উক্ত জীবনীকার এর পর দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যার থেকে বোঝ যায় কেশবচন্দ্র এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেন।

কেশবচন্দ্র কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে 5 Jul 1868 [রবি ২৩ আষাঢ়], তারিখে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করবার জন্য গবর্মেন্টের কাছে আবেদন করা বিধেয় কিনা তদ্বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য যে সভা হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় গবর্মেন্টের কাছে এ বিষয়ে আবেদন করার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। এই আবেদন উপলেক্ষ করে 10 Sep [২৬ ভাদ্র] মিঃ মেইন [Mr. Henry Summer Maine] ব্যবস্থাপক সভায় 'দেশীয়গণের বিবাহবিধি' [A Bill to legalize marriages between persons not professing the Christian Religion and objecting to marry according to the orthodox rites of any of the existing religions of India'] নামে আইনের খসড়া বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ এই বিলের প্রতিবাদ করে একটি স্মারকপত্র প্রেরণ করে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নোটবুকে পরিবারের সকলের জন্মতারিখ ও রাশিচক্র সংকলন করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। যে-কোনো কারণেই হোক তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণ হয়নি। নোটবইটি এখন শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে, পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান-সংখ্যা ৩৬৪। এটি থেকে কাদম্বরী দেবীর জন্ম-তারিখ ও রাশিচক্রটি কৌতূহলী পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

জন্ম—১৭৮১। ২। ২১। ১৬। ৫০ শক [২২ আষাঢ় ১২৬৬ মঙ্গল 5 Jul 1859]
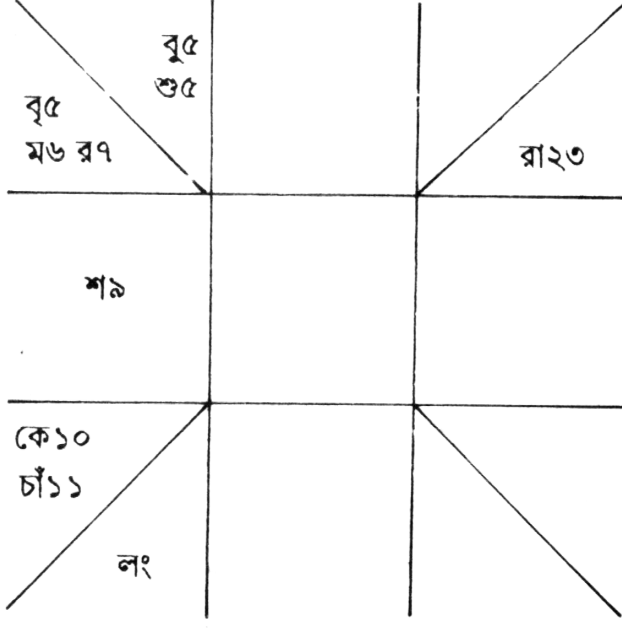
মঙ্গলবার শুক্ল ষষ্ঠী
পূর্ব্বফাল্গুনী সিংহরাশি
মঙ্গলের দশা ভোগ্য ৪ । ৬ । ১৩ । ৮

রবীন্দ্রভবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফাইলে রক্ষিত একটি ঠিকুজি-কোষ্ঠী থেকে জানা যায়, কাদম্বরী দেবীর রাশিনাম ছিল মাতঙ্গিনী দেবী—পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র, নরগণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

‘সিঙ্গিমামা কাটুম’ ছড়াটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা’। প্রবোধচন্দ্র সেন ‘রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ’ [*দেশ*, ২১ বৈশাখ ১৩৫৮] প্রবন্ধের ১১ পৃষ্ঠায় এই ঋণের উৎস সন্ধান করেছেন:

কথাগুলো কোথা থেকে ধার করলেন, স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে হয়। ১৩০১-০২ সালে রবীন্দ্রনাথ যে ছেলে-ভুলানো ছড়া সঙ্কলন করেছিলেন তার থেকে কয়েকটি অংশ তুলছি। একটি হচ্ছে—

তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী।

আরেকটি এই—

উলুকুট ধুলুকুট নলের বাঁশি।
নল ভেঙেছে একাদশী।

আরেকটা ছড়ার শেষাংশ এরকম—

নকা বেটা বর।
ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজে চড়কডাঙার ঘর॥

বোঝা যাচ্ছে কোন চিরন্তন শিশুশাস্ত্র থেকে এই শিশু-পুরোহিত তার পুজোর মন্তর উদ্ধার করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৫

দেশ, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮-তে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতগুরু' প্রবন্ধের পাদটীকায় [পৃ ১০৬-০৭] ছড়াটি সম্পর্কে লিখেছেন:

এই ছড়াটির প্রথম দু'লাইনের আর একটি পাঠ পাওয়া যায়। সম্প্রতি স্বর্গতা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ছড়াটির সেই পাঠ লেখককে জানিয়েছিলেন। মৃত্যুর চারদিন আগে এ বিষয়ে তিনি লেখককে প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ যে চিঠি লিখেছিলেন, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হ'ল:—

ওঁ

শান্তিনিকেতন, ৮-৮-৬০

কল্যাণবরেষু,

আমার বৃদ্ধ বয়স ও দুর্বল শরীর সত্ত্বেও যিনি যা প্রশ্ন করেন তার সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করি, যদি জানা থাকে।...

আমি শুধু এইটুকু জানি, অর্থাৎ শুনেছি যে, ছেলেবেলায় তিনি (বিষ্ণুচন্দ্র) কবিগুরুকে গান শোনাতেন, এবং ছোট ছেলের উপযোগী গান—যথাঃ—

বাঘ পালালো বেড়াল এল
  শিকার করতে হাতী,
মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল
  ফার্সী পড়ে তাঁতি।"—

শুনে তাঁর উপর একটু ভক্তি হয়েছিল।......শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

উক্ত প্রবন্ধে শ্রীমুখোপাধ্যায় বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর জীবনকথা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 1819-এ রানাঘাট অঞ্চলে 'আন্দুলে কায়েতপাড়া' গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী শাস্ত্রচর্চায় জীবিকানির্বাহ করতেন ও নদীয়ার রাজসভায় তাঁর যাতায়াত ছিল। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ, দয়ানাথ ও বিষ্ণুচন্দ্র রাজা শ্রীশচন্দ্রের সভাগায়ক হস্‌নু খাঁ, তাঁর ভাই দেল্‌ওয়ার খাঁ ও বিখ্যাত কাওয়াল মিয়া মীরণ প্রভৃতির কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখেছিলেন। দয়ানাথের অকালমৃত্যুর পর কৃষ্ণ ও বিষ্ণু 1830-তে ব্রাহ্মসমাজের গায়ক নিযুক্ত হন, তখন বিষ্ণুর বয়স এগারো বছর।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৬

৩০ চৈত্র [রবি 11 Apr 1869] চৈত্র মেলা বা জাতীয় মেলার তৃতীয় অধিবেশন আগের বছরের মতো আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে ['ডনক্যাস্টরের বাগান'] অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। মোট ১১টি জাতীয় সংগীত গীত হয়—তার মধ্যে পূর্ব অধিবেশনে গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান', 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে' ইত্যাদি পাঁচটি গান ছাড়াও নূতন ছ'টি গান রয়েছে। বোঝা যায়, এই মেলাকে উপলক্ষ করে জাতীয় সংগীতের একটি নূতন স্রোত ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র রজনীকান্ত গুপ্তের পুরস্কারপ্রাপ্ত গদ্যরচনা 'রামায়ণের মর্ম ও তদন্তর্গত নীতি', জানকীনাথ দত্তের 'মহাভারতের মর্ম ও তদন্তর্গত নীতি' ইত্যাদি অনেকগুলি প্রবন্ধ সভায় পঠিত হয়। মনোমোহন বসু 'হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় মেলার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে বলেন, 'জন্মদিনে কেবল কতিপয় বান্ধব ও প্রতিবেশীমাত্র উৎসাহী ছিলেন, অর্থাৎ নিজবাটীর লোক ও নিজ কুটুম্ব বই নয়, কিন্তু দ্বিতীয় উৎসবে গ্রামস্থ এবং অদ্য এই তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে চাকলাস্থ লোক আকর্ষিত হইয়াছেন'। আয়ের পরিমাণেও উন্নতির চিত্রটি

প্রতিফলিত হয়েছে—দ্বিতীয় অধিবেশনের মোট আয় যেখানে ১৪৩৩ টাকা, তৃতীয় অধিবেশনের আয় সেখানে ২২৬০ টাকা ৫ পয়সা। ঠাকুরপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ প্রত্যেকে ১০০ টাকা করে দান করেন। প্রদর্শনীটি এ বৎসর আরও সুন্দর করার চেষ্টা হয়। 'স্ত্রী-শিল্পজাত'' সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য যে-কজন মহিলাকে এ-বৎসর হিন্দুমেলার নামাঙ্কিত রৌপ্যপদক প্রদান করা হয়, তাঁদের মধ্যে 'শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়—ইনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবী। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় *সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা*-র ৬৭ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় [পৃ ২০৪-৯২] এই অধিবেশনের কার্যবিবরণটি সম্পূর্ণ সংকলন করেছেন।

এই বৎসর পৌষ মাস থেকে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী *অবোধ-বন্ধু* পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী হন এবং এই সংখ্যা থেকেই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-অনূদিত 'পৌল ভর্জ্জীনী' প্রকাশিত হতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে পত্রিকাটির ও বিশেষ করে উক্ত অনুবাদ-রচনাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে, যথা সময়ে আমরা সে-সম্পর্কে আলোচনা করব।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে গণেন্দ্রনাথ-অনূদিত 'বিক্রমোর্ব্বশী' [1 Jan 1869] ও দ্বিজেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববিদ্যা (৪র্থ)—সাধন প্রকরণ' [10 Apr 1869] প্রকাশিত হয়।

উল্লেখপঞ্জি

১ তত্ত্ব, শ্রাবণ। ৭৮-৭৯

২ পুরাতনী। ৭৪, পত্র ২০

৩ ঐ। ১০৬, পত্র ৪৭

৪ ঐ। ১২৬, পত্র ৬৪ [16 Aug 1868 রবি ১ ভাদ্র ১২৭৫]

৫ ঐ। ৩৪-৩৫

৬ ছেলেবেলা ২৬ | ৬১৪

৭ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

৮ ছেলেবেলা ২৬। ৫৯৪

৯ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৮৬

১০ ছেলেবেলা ২৬। ৫৯০

১১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩২৪-২৫

১২ ছেলেবেলা ২৬।৬০৮

১৩ জীবনস্মৃতি ১৭।২৮৩

১৪ ছেলেবেলা ২৬।৬১৯

১৫ জীবনস্মৃতি ১৭।২৮৩

১৬ ঐ ১৭।২৮৪

১৭ ছেলেবেলা ২৬।৬১৯-২০

১৮ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

১৯ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]।১৭৯

২০ ছেলেবেলা ২৬।৬০৩

২১ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৫

২২ ছেলেবেলা ২৬।৬০৪

২৩ জীবনস্মৃতি ১৭।২৬৮

২৪ পুরাতনী। ১১০, পত্র ৫০

২৫ 'আমাদের কথা': বলেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। ১৭-১৮

২৬ ঐ। ২০-২১

২৭ দ্র পুরাতনী। ৯০, পত্র ৩১

২৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১। ৪৫০-৫১

---

* 'প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ/ জ্যোতির বিবাহে যাহা কিছু আমার হৃদ্য ও কল্যাণকর কার্য্য হইয়াছে, তাহা তোমার প্রযত্নেই হইয়াছে। ইহা হইতে প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন হইয়া তোমার হৃদয়কে আনন্দে সিক্ত রাখুক এই আমার আশীর্বাদ।' দ্র বি. ভা, প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫। ২৫৫, পত্র ১৯

* জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় [1855-1919], গণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কাদম্বিনী দেবী ও যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র।

* ১২৭৫ বঙ্গাব্দের যে-কটি হিসাবের খাতা শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে ['এস্টেটের কেসবহি' ও 'নিজ হিসাবের কেস বই'], সেগুলির কাগজ ও আকার রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত খাতারই অনুরূপ। এইরকম কাগজের খাতা ইতিপূর্বে ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তায় দেখা যায় না, ১২৮৩ বঙ্গাব্দের খাতা ছাড়া পরেও নেই। কাগজের জলছাপ দেখে মনে হয় তা বিদেশে প্রস্তুত। এই বছরেই কোনো এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে 'কবিতা-রচনারম্ভ' হয়, এটিকে তার পরোক্ষ প্রমাণ রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

* ছেলেবেলা ২৬। ৫৯৪ : ছেলেবেলা-র অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে আছে, তার মধ্যে একটিতে ছড়াটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'আদি' শব্দটি এবং শেষ পঙ্‌ক্তিটি নেই।

* সূত্র: ক্যাশবহি-তে ৩১ বৈশাখের হিসাবে আছে: '(২৮ বৈশাখের খরচ) শ্রীমতী স্বরৎকুমারী দেবির কন্যা হওয়ায় নাড়িকাটা দাইএর বিদায় ৮৲'

*[১] সূত্র: "১১ অক্টোবরে জানকীর পত্রে দেখিলাম তোমার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে—আজ তোমার তেরই-এর পত্রে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম।' পুরাতনী। ১৫৫, পত্র ৯৫ [20 Oct 1868]

*[২] সূত্র: ক্যাশবহি-তে এই দিনের হিসাবে আছে: 'ব° Miss Murphy দ° শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী প্রসব করাইবার ঐ বিবির ফি...৫।০'

*[৩] 'বীরেন্দ্রনাথ ১৮৬৬ সনে বেঙ্গল একাডেমি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।' সা-সা-চ ৫। ৬০। ৭ |

*[৪] এই বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সংসারের মাসকাবারি খরচের টাকা বীরেন্দ্রনাথের হাতে দেওয়া হয়েছে ক্যাশবহি-তে এই তথ্যের সাক্ষাৎ মেলে।

ন ব ম   অ ধ্যা য়

১২৭৬ [1869-70] ১৭৯১ শক।। রবীন্দ্রজীবনের নবম বৎসর

1869-এর শুরু থেকে [পৌষ ১২৭৫] রবীন্দ্রনাথের নর্মাল স্কুলের চতুর্থ বৎসরের সূচনা। স্কুলের বেতনও বেড়েছে—বারো আনার জায়গায় হয়েছে মাসিক এক টাকা, সহাধ্যায়ী দ্বিপেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অবশ্য পুরোনো হারই বহাল থেকেছে [কিন্তু আশ্চর্য লাগে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে জানুয়ারি মাস থেকে নয়, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে]। মার্চ মাস থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র অরুণেন্দ্রনাথও একই স্কুলে যাতায়াত শুরু করেন।

গৃহশিক্ষক হিসেবে নীলকমল ঘোষাল ও ইংরেজি পড়ানোর জন্যে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় যথারীতি ১২৭৬ বঙ্গাব্দেও নিযুক্ত থেকেছেন—নীলকমল ঘোষালের বেতন মাসিক বারো টাকা [বৈশাখ ১২৭৫ থেকে বেতন বৃদ্ধি পায়, তার আগে পেতেন মাসিক দশ টাকা] ও অঘোরনাথের বেতন মাসিক দশ টাকা।

আমরা গত বৎসরের বিবরণেই দেখেছি, অঘোরনাথ ২৩ ফাল্গুন থেকে বালকদের ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন, তার আগে এই কাজ করতেন রাখালদাস দত্ত। প্যারীচরণ সরকারের *First Book of Reading* দিয়ে ইংরেজি পড়া শুরু হয়েছিল কিনা সে-সম্বন্ধে আমরা আমাদের সংশয় ব্যক্ত করেছি। এই সংশয়কে আরও দৃঢ় করে বর্তমান বৎসরে ২৩ শ্রাবণ [শুক্র 6 Aug] তারিখের একটি হিসাব: 'সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবুর ফাষ্ট বুক অফ রিডিং ক্রয় ও বাঁধাই', ব্যয় সাড়ে আট আনা। সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানে যদি সত্যপ্রসাদের নামও যুক্ত থাকত, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যেত এই সময় থেকেই 'ফার্স্ট বুক' পড়া আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তা না থাকাতে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব নয়। ১৪ কার্তিক [শুক্র 29 Oct]-এর আর একটি হিসাব 'ছেলে বাবুদিগের কপি বহি ক্রয় ও শ্রীরামপুরে কাগজের বহি তৈয়ারি' ইংরেজি শিক্ষার আর একটি ধাপকে চিহ্নিত করে দেয়।

অঘোরবাবু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এই মেডিকেল কলেজের ছাত্রমহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনাসত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই।'* এমন-কি বর্ষার সন্ধ্যায় মুষলধারে বৃষ্টিতে রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়িয়েছে, মাস্টারমশায়ের আসবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করে গেছে, 'বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত' হয়ে উঠেছে, রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি নিয়ে গলির মোড়ের দিকে ছাত্রের দল করুণদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। 'এমনসময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। ...ভবভূতির সমানধর্ম বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।'[১] বালক বয়সের এই মনোভাব সত্ত্বেও পরিণত বয়সের বিচারবুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করে

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'অঘোরবাবু নিতান্তই যে কঠোর মাস্টারমশাই-জাতের মানুষ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ভুজবলে আমাদের শাসন করিতেন না। মুখেও যেটুকু তর্জন করিতেন তাহার মধ্যে গর্জনের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু তিনি যত ভালোমানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি।'[১] সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে জ্বলন্ত রেড়ির তেলের বাতি, পড়ার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ। কেরোসিন তেলের আলো এর অনেক আগেই[†] কলকাতায় এসে গেলেও ঘরে ঘরে তার বহুল প্রচলন তখনও শুরু হয়নি। তাই রেড়ির তেলের মিটমিটে আলোয় সারাদিনের দুঃখদহনের পর স্বয়ং বিষ্ণুদূতও যদি বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াবার ভার নিতেন, ছাত্রদের পক্ষে তাঁকে যমদূত মনে করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না।

ছোটোদের লেখাপড়ার খবরদারির দায়িত্ব ছিল সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের উপর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি বা স্বর্ণকুমারী দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মকথাতেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে হেমেন্দ্রনাথের বিশেষ মনোযোগ সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়। প্রধানত তাঁরই শিক্ষাদর্শের জন্য সেকালের প্রথানুযায়ী ছেলেদের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি না করে বাংলা শিক্ষার বনিয়াদ পাকা করার জন্য বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির মধ্যেই শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। 'আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত।'[২] এরই সূত্র ধরে 'নানা বিদ্যার আয়োজন'-এর সূচনা। অবশ্য জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষার ভার স্তূপীকৃতভাবে তাঁদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ভার বাড়তে বাড়তে একসময়ে অবস্থা সেই পর্যায়ে পৌঁছলেও তার সূত্রপাত হয়েছিল ধীরে ধীরে। সেই দিক থেকে বর্তমান বৎসরে যে নূতন বিদ্যার আয়োজন করা হয়েছে, সেটি হল জিম্‌নাস্টিক শিক্ষা। হিন্দুমেলা-য় জিম্‌নাস্টিক-চর্চার একটি বিশেষ স্থান ছিল। তাছাড়া ন্যাশানাল পেপারে বা অন্যত্র ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নবগোপাল মিত্রের প্রচুর উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। হেমেন্দ্রনাথেরও কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়ামে বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেই সব কারণেই বালকদের উপযুক্ত শরীর গঠনের জন্য এই শিক্ষার সূচনা করা হয়। ৯ আশ্বিন [শুক্র 24 Sep] তারিখের হিসাবে দেখা যায় 'ছেলেবাবুদিগের জিমনেসটীক শিক্ষার কাষ্ঠ তৈয়ারির ব্যয়' বাবদ তিন টাকা দু'আনা দু'পয়সা খরচ করা হয়েছে। আবার ১২ অগ্রহায়ণ [শুক্র 26 Nov] তারিখে হিসাব লেখা হয়েছে—'ব° বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়/দ° বালকদিগের জিমনেসটীক শিক্ষার জন্য মাষ্টারের বেতন আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাসের শোধ দিবার জন্য দেওয়া হইল গুঃ নবিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রোক—১২্' অর্থাৎ নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী [সেরেস্তার একজন কর্মচারী] মারফৎ নগদ বারো টাকা বেতন হিসেবে গণেন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি নীলকমল মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া হয়েছে জিম্‌নাস্টিক শিক্ষককে দেবার জন্য। এই দুটি হিসাব থেকে বোঝা যায় আশ্বিন ১২৭৬ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যেরা বাড়িতে জিম্‌নাস্টিক শেখা শুরু করেন। উপরের হিসাবে শিক্ষাগুরুর নামটি না থাকলেও মনে হয় তাঁর নাম শ্যামাচরণ ঘোষ*। কারণ ১৯ ভাদ্র ১২৭৭ [3 Sep 1870] তারিখের হিসাবে আছে: 'ব° শ্যামাচরণ ঘোষ/দ° বালকদিগের জিমনেসটিক/শিক্ষার জন্য উহার বেতন/ই° ১২৭৬ সালের অগ্রহায়ণ না° ১২৭৭ সালের শ্রাবণ ৯ মাহার শোধ...৫৪্, —মাসিক ৬ টাকা বেতনের পরিমাণটিও লক্ষণীয়।

এর পরেও তিনি ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায়নি। জিম্‌নাস্টিক শিক্ষার জন্য সময় নির্ধারিত ছিল বিকেল বেলা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে। জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলটপালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আঁকার মাস্টার।'[৩] জীবনস্মৃতি-তেও রবীন্দ্রনাথ ড্রয়িং-শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ক্যাশবহি-তে আমরা এই সময়ে কোনো ড্রয়িং শিক্ষককে শনাক্ত করতে পারিনি।

কুস্তি ও জিম্‌নাস্টিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জন্য লাঠিখেলা শেখারও আয়োজন ছিল। শেখানোর জন্য যাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, সে জাতে ছিল মুচি। সাধারণ নিয়ম, শিষ্য গুরুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে—কিন্তু এক্ষেত্রে গুরু জাতে মুচি ও শিষ্য ব্রাহ্মণ। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে যথারীতি প্রণাম করারই নির্দেশ দেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে শোনা এই ঘটনা Leonard K. Elmhirst [1893-1974] 25 May 1970 বিশ্বভারতীর শারীর-শিক্ষক সুবোধনারায়ণ চৌধুরীকে লিখে পাঠান: "Maharshi Devendranath appointed a low caste Hindu, a Muchi or leather worker (cobbler is all right) who was an expert lathi player, to teach the act of lathi-play to Rabindranath when he was a boy. Rabindranath not knowing how properly to greet such a low caste Hindu as a teacher, went to his father, Maharshi Devendranath, for advice. Maharshi told him to welcome him by taking the dust of his feet just in the same traditional manner of a disciple doing 'pronam' to his guru."[৩ক]

এরই মধ্যে নবীন কবির কাব্যরচনা-চর্চা অব্যাহত গতিতে চলেছে। সেরেস্তার কর্মচারীর অনুগ্রহে প্রাপ্ত সেই নীল ফুল্‌স্‌ক্যাপের খাতাটি 'ক্রমেই বাঁকা-বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো' ভরে উঠতে লাগল। তাঁর কবিত্বের খ্যাতি ইতিমধ্যে পারিবারিক সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর জগতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক 'প্রাণিবৃত্তান্ত' গ্রন্থের লেখক সাতকড়ি দত্ত এই সুকুমার-দর্শন ছাত্রটিকে ভালোবাসতেন। তিনি বালকের কাব্যরচনা-প্রয়াসকে উৎসাহিত করবার জন্য মাঝে মাঝে দুই-এক পদ কবিতা দিয়ে তা পূরণ করে আনতে বলতেন। এই রকম একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে উদ্ধৃত করেছেন। সাতকড়ি দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত—

'রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।'

—কবিতার পাদপূরণ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন এইভাবে:

'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।' [১৭।২৯২]

এই সময়ে রচিত একটি 'ব্যক্তিগত বর্ণনা'—

'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—

হাপুস হুপুস শব্দ,   চারিদিক নিস্তব্ধ,

পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' [ঐ]

স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট 'ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ' গোবিন্দবাবু [গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] ছাত্রদের কাছে ভীতিজনক ছিলেন। একবার পাঁচ-ছয়টি বড়ো ছেলের উৎপীড়নে পীড়িত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই সময় থেকে গোবিন্দবাবু তাঁকে 'করুণার চক্ষে' দেখতেন! একদিন ছুটির সময় তাঁর ঘরে বালকের ডাক পড়ল এবং 'মনে নাই কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।'[৪] [জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে আছে—'সম্ভবতঃ আমার সেই পদ্যরচনার বিষয় ছিল, সদ্ভাব']। কবিতা লিখে পরদিন তাঁকে দেখাতেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে কবিতাটি পড়তে বললেন। 'ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসে ইহার নৈতিক ফল যাহা দেখা গেল তাহা আশাপ্রদ নহে। অন্তত, এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কবির প্রতি কিছুমাত্র সদ্‌ভাবসঞ্চার হয় নাই।'[৪]

প্রসঙ্গক্রমে নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের দিকে একবার তাকানো যাক। এখানে অবস্থানের স্মৃতি তাঁর কাছে কিছুমাত্র মধুর নয়। তিনি লিখেছেন: 'ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম, তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনোমতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম।'[৫] সুযোগ-সুবিধা পেলে অন্যান্য ছেলেদের উৎপীড়ন কত তীব্র হয়ে উঠত তা গোবিন্দবাবুর কাছে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনাটিতেই প্রতিপন্ন হয়। একেবারে মরিয়া না হয়ে উঠলে সকল ছাত্রের কাছে ভীতিপ্রদ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে প্রবেশ করা যে সম্ভব নয়, তা সহজবুদ্ধিতেই বোঝা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ 'বাঙ্গলা ইস্কুল দুর্নীতি শিক্ষার একটি প্রধান স্থান—কুসঙ্গ যত দূর হতে পারে তা সেইখানে হয়। ...ইংরাজি ইস্কুলে মারামারি ঘুসাঘুসির প্রাদুর্ভাব থাক্‌তে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা ইস্কুলের ছাত্রদের মত ওরূপ অভদ্র আচরণ খৃষ্টীয় বালকদিগের মধ্যে দেখা যায় না। ...আমাদের মধ্যে বর্ণভেদ থাকায়, প্রত্যেক বর্ণের পুরুষপরম্পরাগত সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষাদীক্ষাভেদে—আমাদের মধ্যে নীতিগত অনেকটা বৈষম্য হয়ে পড়েছে, সভ্যতারও যেন বিভিন্ন স্তর পড়ে গেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য গরীব হলেও তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ভদ্রতা ও সভ্যতার ভাব দেখা যায়—কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর বালকেরা ধনীর সন্তান হলেও তারা সভ্যতার যেন একটা নিম্ন স্তরে আছে বলে' মনে হয়। তাদের মুখে সর্ব্বদাই অশ্লীল কথা শোনা যেত।' পাদটীকায় তিনি লিখেছেন, 'অবশ্য তখনও নিম্নবর্ণের ছেলের মধ্যে সুশীল সজ্জন না দেখিয়াছি এমন নয়। তবে সাধারণ ভাবটা ঐরূপ ছিল।'[৬] এর উপরে ছিল শিক্ষকদের আচরণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না।'* তাঁর নাম হরনাথ পণ্ডিত। যখন পড়া চলত সেই অবকাশে ক্লাসে সমস্ত ছাত্রের পিছনে বসে রবীন্দ্রনাথ 'পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা' করতেন। শিক্ষকটি ছাত্রদের অদ্ভুত নামকরণ করে তাদের লজ্জিত ও বিব্রত করতেন। এঁর কাছে পড়ার এক বৎসর পূর্ণ হলে নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক [প্রধান পণ্ডিত] মধুসূদন বাচস্পতির কাছে তাঁদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হল। রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ নম্বর পেলে হরনাথ পণ্ডিত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলেন পরীক্ষকের

পক্ষপাতিত্বের। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা হল। স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি নিয়ে বসলেন। এবারও রবীন্দ্রনাথ উচ্চস্থান লাভ করলেন। অবশ্য ক্লাসের শিক্ষকের কোনো দোষ ছিল না; যে ছাত্র সারা বৎসর সকলের শেষে চুপ করে বসে থাকে, কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না, তার প্রথম হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক। তার সঙ্গেই লক্ষণীয়, বাড়িতে বাংলা ভাষাচর্চার বিষয়ে যে আগ্রহ দেখানো হত, এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা কার্যকরী ফল প্রসব করতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে, নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথের একজন সহপাঠীর পরিচয় দেওয়া যায়, পরবর্তী জীবনেও যাঁর সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল। এঁর নাম অক্ষয়কুমার মিত্র [1858-1938]। তাঁর পৌত্রী উষা দত্ত লিখেছেন: 'অক্ষয়কুমার নর্মাল স্কুলের সেরা ছাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পড়াশোনায় অক্ষয়কুমারের সমকক্ষ না-হইলেও দুইজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ...ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জলপাণি পাইয়া অক্ষয়কুমার হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান হইতেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররূপে বি. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন।' রবীন্দ্রভবনে উভয়ের কয়েকটি পত্র সংরক্ষিত আছে, যেগুলি রবীন্দ্রবীক্ষা ১২ [পৌষ ১৩৯১]। ১১-১৮-তে সংকলিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার 8 May 1931 রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'তোমার সহিত বাল্যকালে নর্ম্মাল স্কুলে প্রায় দুই বৎসর একত্র অধ্যয়নকালে উভয়ে খুবই প্রণয় হয়। সেই অবধি তোমার সহিত পত্র দ্বারা কুশলাদি পাইতাম ও বাল্যকালে কতবার তোমাদের বাটী যাইতাম বেশ মনে আছে।' রবীন্দ্রনাথ ১৬ মাঘ রবিবার [? ১৩২২: 30 Jan 1916] একটি চিঠিতে নর্মাল স্কুলের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন:

> তোমার পত্র পাইলেই সেই ইস্কুলের ছেলেবেলাকার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। যদিও নর্ম্যাল স্কুলের সমুখ দিয়া যাইবার সময় অসচ্চরিত্র বালকদের কথা মনে করিয়া এখনো সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি তথাপি যখন তোমাদের মনে করি তখনি মনে করি সেইদিন আসুক, সেই আড়ি ভাব আর একদিন করি, সেই উঠা নামা আর একদিন করি। ...একদিন যদি আমার কাছে আইস তবে দেখিবে, অন্যের নিকট রবি যতই গম্ভীর হউক না কেন তোমার নিকট সেই নবম বর্ষীয় বালক; অভিমান করিয়া এখনও সে আড়ি করিতে পারে, মিটমাট করিয়া পুনরায় ভাব করিতে পারে। ...সেই রবি, যে, ইতিহাস, অঙ্ক বা ভূগোলের সময় শ্রেণীর সর্ব্বশেষে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত, সে আজ দু'এক ছত্র কবিতা' লিখিতে পারিয়াছে বলিয়া কি তোমার নিকট গর্ব্ব করিতে পারে। তুমি আমার বাল্যকালের অজ্ঞতা দেখিয়া কত হাসিয়াছ,—তোমার কাছে বিজ্ঞতা গাম্ভীর্য্য দেখাইতে লজ্জা বোধ হইবে না?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, নর্মাল স্কুলে অক্ষয়কুমারের মতো সহপাঠী তিনি অধিক সংখ্যায় পাননি!

আমরা পূর্বেই বলেছি, ১৪ ফাল্গুন ১২৭৫ তারিখ থেকে ঈশ্বর দাস সত্যপ্রসাদের ভৃত্য রূপে বহাল হয়। বর্তমান বৎসরে বৈশাখ মাসের বেতন-গ্রহীতার তালিকায় ঈশ্বর দাসের নূতন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে —'সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবুদিগের চাকর'-রূপে। মাঝে মাঝে বদলি হিসেবে অন্যান্য চাকরের আবির্ভাব ঘটলেও ঈশ্বর দাস দীর্ঘকাল তাঁদের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত থেকেছে। এর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা-য় [ছেলেবেলা-য় তার নাম 'ব্রজেশ্বর'] বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচাপাকা, মুখের উপর টানপড়া শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে, চিবিয়ে কথা।'[৭] সে আগে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করত। তার ভাষাতে এই বৃত্তির ছাপ ছিল, বাবুরা 'বসে আছেন' না বলে সে বলত 'অপেক্ষা করছেন', জনশ্রুতি ছিল যে সে বরানগরকে বরাহনগর বলে। অত্যন্ত শুচিবায়ুতার জন্য স্নানের সময় দুহাত দিয়ে অনেকক্ষণ পুকুরের উপরের জল সরিয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে ডুব দিয়ে নিত, চলবার সময় এমন ভঙ্গীতে সে হাত বাঁকিয়ে চলত, যেন সে তার শরীরের কাপড়চোপড়গুলোকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই 'পরমপ্রাজ্ঞ

রক্ষকটি'র একটি বিষয়ে দুর্বলতা ছিল। সে আফিম খেত, ফলে তার পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বালকদের জন্য বরাদ্দ দুগ্ধ পান করতে তাঁরা বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলে সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করত না। আহারের সময় আগে থাকতে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে সে জিজ্ঞাসা করত আর দেবে কিনা। রবীন্দ্রনাথ জানতেন কোন্ উত্তরটি তার মনঃপূত হবে। সে-ও এ নিয়ে কোনো পীড়াপীড়ি করত না। বিকেলের জলখাবার সম্বন্ধে মুড়ি প্রভৃতি লঘু পথ্য কিংবা ছোলা-সিদ্ধ বা বাদামভাজা জাতীয় সস্তা অপথ্য ফরমাশ করলে সে আপত্তি করত না। 'দেখিতাম, শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।'[৮] এতে তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং কম খাওয়াটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, ফলে অসুস্থতার কারণে মাস্টারমশায়ের কাছে অথবা স্কুলে ছুটি পাওয়াটাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণটা'।[৯] জীবনস্মৃতি-তেও অনুরূপ উক্তি আছে। কিন্তু এখানে একটু সংশয়ের অবকাশ আছে। আমরা আগেই দেখেছি, সন্ধ্যাবেলাটি ছিল ইংরেজি শিক্ষার জন্য অঘোর মাস্টারের বরাদ্দ এবং সেখানে মাস্টারমশায়ের নীরোগ স্বাস্থ্যের জন্য ছুটি পাওয়ার সুযোগ ছিল না। সুতরাং সন্ধ্যাবেলা বালকদের সংযত রাখার জন্য রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের ক্ষীণ আলোয় রামায়ণ-মহাভারত-পাঠের আসর বসাবার সুযোগ কী করে পাওয়া যেত বা তার প্রয়োজনই বা কী ছিল—এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক। অবশ্য রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিনেই শুধু এই আসর বসে থাকলে বলার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের ধারণা, এই আসরের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের আরো ছোটোবেলার ঘটনা। ১২৭১ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহি-তে আমরা 'তোষাখানার চাকর' একজন ঈশ্বর দাসের সাক্ষাৎ পাই। [এই দুই ঈশ্বর দাস এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভব নয়, কারণ তোষাখানার চাকর ঈশ্বরের বেতন ছিল পাঁচ টাকা—বর্তমান ঈশ্বর দাসের বেতন যেখানে সাড়ে তিন টাকা মাত্র। জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে 'ঘর ও ইস্কুল' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন: 'এই সময়ে ঈশ্বর নামে একটি নূতন চাকর আমাদের কাজে নিযুক্ত হইল, সে ব্যক্তি গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত', তাও আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। সম্ভবত তোষাখানার চাকর ঈশ্বর দাস বা আর কেউ রামায়ণপাঠের আসর বসাত, রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিবিভ্রম-বশত তা বর্তমান ঈশ্বর দাসের উপর আরোপ করেছেন। [এই আসর সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।]

এই সংশয় আরও ঘনীভূত হয় শ্যাম নামক ভৃত্যটির প্রসঙ্গে। জীবনস্মৃতি-তে তিনি এর সম্পর্কে লিখেছেন: 'শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি [ছেলেবেলা-র বর্ণনা 'বাড়ি যশোরে']। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত।'[১০] এই শ্যাম বা শ্যামদাসের সাক্ষাৎ আমরা হিসাব খাতায় প্রথম পাই বর্তমান বৎসরে ১৩ শ্রাবণ [27 Jul] তারিখে যেদিন 'দ্বিপেন্দ্র ও অরুণেন্দ্রবাবুর চাকর শ্যাম দাস'কে 'জ্যৈষ্ঠ মাহার বেতন শোধ' করা হয়েছে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে। এর পরেও তাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে কখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখি না, মাঝে মাঝে স্কুলের বেতন তার মারফৎ পাঠানো ছাড়া। [অবশ্য ১২৯০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের খরচের হিসাবে 'শ্যাম দাস চাকর'কে 'রেপারের মূল্য' আট টাকা দেওয়া হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়।] ছেলেবেলা-য় গণ্ডিবন্ধন-প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না, আর ন'বছরের ছেলেকে সীতার পরিণতির ভয় দেখিয়ে

গণ্ডিতে আবদ্ধ করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমাদের সন্দেহ, এখানেও শৈশবে অন্য কোনো ভৃত্যের কৃত আচরণ শ্যামের উপর আরোপিত হয়েছে। বরং শ্যাম সম্পর্কে ছেলেবেলা-র বর্ণনা অনেক বেশি সংগতিপূর্ণ। ছেলেদের কাছে সে ডাকাতের গল্প বলত, শোনাত রঘুডাকাত বিশুডাকাতের কথা। একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডাকাতের খেলা দেখানো হয়েছিল। তারপর 'ডাকাতি খেলার এই ছবি শ্যামের মুখের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সন্ধে কাটিয়েছি দু হাতে পাঁজর চেপে ধরে।'[১১] দ্বারকানাথের আমলের একখানা পুরোনো পালকি পড়ে থাকত খাতাঞ্চিখানার বারান্দার এক কোণে। একালের নামকাটা আসবাবটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল মনের টান, রবিবারের ছুটির ফাঁকে সেই পালকির সওয়ার হয়ে শ্যামের কাছে শোনা রঘুডাকাতের গল্পের জালে জড়ানো মন কল্পনায় ভয়ের আস্বাদ গ্রহণ করত। পরবর্তীকালে 'বীরপুরুষ' কবিতায়[১২] এই স্মৃতিই কাব্যরূপ লাভ করেছে। [বাস্তবে পালকি চড়ার অভিজ্ঞতাও অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল। স্কুলে যাতায়াতের জন্য 'ইস্কুল গাড়ি'র বন্দোবস্ত থাকলেও মাঝে মাঝেই কখনো ঘোড়ার অসুস্থতার জন্য, কখনো কোচম্যানের অনুপস্থিতিতে পালকি করে তাঁদের স্কুলে যেতে হত। 'সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবুর ছাতা মেরামত'এর হিসাবও পাওয়া যায়, ছাতা মাথায় পায়ে হেঁটে স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজনও কী দেখা দিত?]

কল্পনাপ্রবণ এই বালকটির মন এইভাবে নিজেকে নাড়াচাড়া করে বিচিত্র রস আকর্ষণের চেষ্টা করত। বাড়ির উত্তরাংশে গোলাবাড়ি নামের নিভৃত পোড়ো জায়গাটি সকলের অনাদৃত বলেই 'বালকের মন আপন ইচ্ছামতো কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পারিতাম সেদিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।'[১৩] এরই মাঝখানে বাল্যকালের সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী ইরু বা ইরাবতী (বড়ো দিদি সৌদামিনী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা) যখন রাজবাড়ির রহস্যের অবতারণা করতেন, বালকের বিস্ময় ও কৌতূহলের আর সীমা থাকত না।

জোড়াসাঁকো বাড়ির ভিতরে বাগান তার শ্রীহীন দারিদ্র সত্ত্বেও বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বর্গোদ্যানের তুল্য ছিল। 'বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পুবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।'[১৪] শীতের দিনের সকালে যখন আর সবাই লেপের কোমল আরামের কোলে নিদ্রামগ্ন, সেই সময়েও এই বালক বুকের কাছে দুই হাত চেপে ধরে শীতকে উপেক্ষা করে বাগানে ছুটে যেতেন পাছে এই আনন্দভোজে একটি পদও বাদ পড়ে যায়।

আবার কোনো কোনো দিন মধ্যাহ্নে বালক রবীন্দ্রনাথ হাজির হতেন বাড়ির ভিতরের ছাদে। ছাদের প্রাচীর তাঁর মাথা ছাড়িয়ে উঠত, কিন্তু প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ত কাছের ও দূরের কলকাতার নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী। 'সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে।'[১৫] মধ্যাহ্নের খরদীপ্ত আকাশের দূর প্রান্ত থেকে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক ও সিঙ্গির বাগানের দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলির সম্মুখ দিয়ে পসারীর সুর করে 'চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁক বালকের সমস্ত মনটাকে উদাস করে দিত। কোনো দিন-বা স্কুল থেকে ফিরে এসে গাড়ি থেকে নেমে

পুবের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়েছে তেতলার ছাদের উপরকার আকাশে নিবিড় হয়ে এসেছে ঘননীল মেঘের পুঞ্জ, ‘মুহূর্তমাত্রে সেই মেঘপুঞ্জের চেয়ে ঘনতর বিস্ময় আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।’[১৬]

এইসব বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: ‘ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত।’[১৭] এই রহস্যের আকর্ষণেই দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে ধুলোর মধ্যে আতার বিচি পুঁতে তার পরিচর্যা, গুণেন্দ্রনাথের বাগানের ক্রীড়াশৈল থেকে চুরি-করা পাথরে তৈরি নকল পাহাড়ের প্রতি বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দবোধ। পৃথিবীর উপরতলাটাই মাত্র দেখা যায়, মাঘোৎসবে কাঠের খুঁটি পোঁতার জন্য যে গর্ত করা হত তা আর একটু গভীর করে খুঁড়লেই তার ভিতরতলার রহস্যটির নাগাল পাওয়া যেতে পারত, এই ক্ষোভ কিছুতেই তাঁর মন থেকে যেত না! আকাশের নীলিমার পশ্চাতেই তার সমস্ত রহস্য, বোধোদয় পড়াবার উপলক্ষে নীলকমল পণ্ডিত যখন এই ধারণাকেই আঘাত করে বললেন যে ঐ নীল গোলকটি কোনো বাধাই নয়—সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগিয়ে উঠে গেলেও কোথাও মাথা ঠেকবে না, তখন রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে মাস্টারমশায় সিঁড়ি সম্বন্ধে অনাবশ্যক কার্পণ্য করছেন।

এই দৃষ্টান্তগুলির তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ব্যক্ত করা যেতে পারে: ‘বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক্, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে; সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায়, আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর।’[১৮] অনাদরে বড়ো হওয়া শিশুটি অনাদৃত তুচ্ছ জিনিসকে অবলম্বন করেই মনের সৃজনীশক্তিকে নানাদিক থেকে কিভাবে-বিকশিত করে তোলার চেষ্টা করছে, এইটাই এখানে লক্ষণীয়।

এ তো গেল রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের একটা দিক—বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের রহস্যময় রোমাঞ্চ। কিন্তু একই ধরনের রহস্য তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করত মানব-সংস্পর্শ লাভের আকাঙক্ষায়। জোড়াসাঁকো বাড়ির বনেদিয়ানার নিয়মে নিতান্ত শৈশবেই তিনি অন্তঃপুরের স্নেহচ্ছায়া থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন ভৃত্যদের শাসনদগ্ধ বাহির বাড়ির মরুপ্রান্তরে। অন্তঃপুরের গতায়াত যে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে যেন অতিথির মতো, সংসারের মাঝখানে নিজস্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকার মতো সাবলীল নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: ‘বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনই। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত।’[১৯] রাত ন’টার পর পড়া শেষ করে বাড়ির ভিতর শুতে যাবার সময় খড়খড়ি-দেওয়া লম্বা বারান্দা পার হয়ে গোটাচারপাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নেমে উঠোন ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় চোখে পড়ত জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় বাড়ির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলে বসে উরুর উপর প্রদীপের সলতে পাকাতে পাকাতে মৃদুস্বরে নিজেদের দেশের গল্প করছে—সমস্তটাই যেন একটা ছবি। তারপর রাত্রের আহার শেষ করে যখন বিছানায় শুতেন তখন শংকরী কিংবা প্যারী কিংবা তিনকড়ি দাসী এসে রূপকথার গল্প বলত—রবীন্দ্রনাথ ক্ষীণালোকে দেয়ালের চুন-খসা রেখার মধ্যে মনে মনে নানা অদ্ভুত ছবি উদ্ভাবন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন। অর্ধরাত্রে আধো-ঘুমে কোনো দিন

কানে আসত বৃদ্ধ স্বরূপ সর্দারের হাঁক—এগুলি সেই ছবিরই অঙ্গ, যা অন্তঃপুরকে আধো-চেনার অস্পষ্টতায় ঘিরে রাখত।

এরই মধ্যে নূতন বধূর বেশে যখন কাদম্বরী দেবী এলেন, 'তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।'[১৯] কিন্তু কোনো সুযোগে কাছে গেলে ছোড়দিদি বর্ণকুমারী দেবীর তাড়ায় নৈরাশ্য ও অপমান বহন করে ফিরে আসতে হত। তাছাড়া তাঁর আলমারিতে কাঁচের ও চীনামাটির কত দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী 'অন্তঃপুরের দুর্লভতাকে আরও কেমন করিয়া রঙিন করিয়া তুলিত।'

এইভাবে অন্তর ও বাহির দুদিক থেকেই প্রতিহত হয়ে বালক রবীন্দ্রনাথের মন নিজেরই রচিত এক অবাস্তব কল্পনার জগতে বিচরণ করত, যা তাঁর কবিপ্রকৃতিকে কেমনভাবে প্রভাবিত করেছে, তা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে এ-বৎসরের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা—৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ [রবি 16 May 1869] দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেন্দ্রনাথ কলেরা রোগে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।[২০] তিনি নানা শিল্পকলায় অনুরাগী ও পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তাঁর কালিদাসের নাটকের গদ্য-পদ্য অনুবাদ 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' [1 Jan 1869] ও 'উনচত্বারিংশ সমাজে বিতরণের জন্য' [১১ মাঘ ১৭৯০ শক, ১২৭৫] 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য' পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তিনি কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধও রচনা করেন, তারই একটি 'আর্যজাতির আদি নিবাস' তাঁর মৃত্যুর পর *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র চৈত্র [১৭৯১ শক] সংখ্যার ২৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। ইতিহাস-চেতনা তাঁর চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক দলিলপত্র ও বিভিন্ন জনের লেখা পত্রাদি যে-যত্নে তিনি রক্ষা করেছেন—ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস-রচনার পক্ষে যা অমূল্য উপাদান রূপে গণ্য হতে পারে—এই যত্ন ও সচেতনতা পরিবারের আর কারোর মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসংগীতও রচনা করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'চৈত্র মেলা', আমৃত্যু তিনি ছিলেন এই মেলার সম্পাদক। এই মেলা উপলক্ষেই তিনি বিখ্যাত জাতীয়সংগীত 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে' রচনা করেন। গানটি ১২৭৪ বঙ্গাব্দে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'যুবাবয়সেই গণদাদার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। কিন্তু তাঁহার সেই সৌম্য-গম্ভীর উন্নত গৌরকান্ত দেহ একবার দেখিলে আর ভুলিবার জো থাকে না। তাঁহার ভারি একটা প্রভাব ছিল। সে-প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব। তিনি আপনার চারিদিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন—তাঁহার আকর্ষণের জোরে সংসারের কিছুই যেন ভাঙিয়াচুরিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে পারিত না।'[২১] তাঁকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলি, যা তিনি সযত্নে-রক্ষা করেছিলেন, তা থেকেই বুঝতে পারা যায়, দুটি পরিবারের মধ্যে রোপিত বিরোধের কাঁটাটুকু প্রধানত গণেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই অনেকটা উৎপাটিত হতে পেরেছিল। জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চের 'কমিটি অফ্ ফাইভ'-এর একজন না হয়েও

প্রধানত তাঁরই উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে 'নব-নাটক' অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন: 'ইহারাই যদি এমন দেশে জন্মিতেন যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাণিজ্যব্যবসায়ে ও নানাবিধ সর্বজনীন কর্মে সর্বদাই বড়ো বড়ো দল বাঁধা চলিতেছে তবে ইহারা স্বভাবতই গণনায়ক হইয়া উঠিতে পারিতেন।'[২২] অপরিণত অবস্থায় একটি সন্তানের জন্মের পর তাঁর স্ত্রী স্বর্ণকুমারী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন; এর পর তাঁদের আর কোনো সন্তান হয়নি।

দেবেন্দ্রনাথের কাছে এই ভ্রাতুষ্পুত্র অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। বিশেষ করে জমিদারি ও অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি নিজের ছেলেদের চেয়েও গণেন্দ্রনাথের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করতেন। সুতরাং তাঁর এই অকাল-বিয়োগ দেবেন্দ্রনাথকে যে যথেষ্ট বিচলিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। হয়তো এই মৃত্যুর অভিঘাতেই ২৭ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল ৪ Jun] তারিখে তিনি একটি উইল করেন। এই উইলে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথকে একজিকিউটর নিযুক্ত করেন। উইলের শেষে লেখা হয়—'ঈশ্বর না করুন যদি আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তব্যবহার হইবার পূর্ব্বে উক্ত একজীকিউটরদিগের মৃত্যু হয় তবে তাঁহারা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যাইবেন তাঁহারা আমার এক্‌জিকিউটর গণ্য হইবেন।' উল্লেখ্য, এই উইল দেবেন্দ্রনাথ 28 Jun 1889 [শুক্র ১৫ আষাঢ় ১২৯৬] তারিখে 'Cancelled/amd/Revoked' মন্তব্য-সহ স্বাক্ষর করে বাতিল করেন।

৩০ আষাঢ় [মঙ্গল 13 Jul] তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথের পঞ্চম সন্তান ও চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

৯ আশ্বিন [শুক্র 24 Sep] তারিখে হেমেন্দ্রনাথের তৃতীয় সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

১৬ কার্তিক [রবি 31 Oct] স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর নামকরণ ও অন্নপ্রাশন ব্রাহ্মধর্মানুসারে সম্পন্ন হয়।

১৯ কার্তিক [বুধ 3 Nov] দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে গোস্বামী-দুর্গাপুর নিবাসী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'শুভবিবাহ ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের সময় সতীশচন্দ্র কলকাতা মেডিকেল কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র। নভেম্বর মাস থেকেই এঁর কলেজের বেতন ঠাকুর পরিবারের তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছে। পরে স্কটল্যাণ্ডের এবারডিনে তাঁর উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভারও দেবেন্দ্রনাথ বহন করেছেন। এঁর সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী তাঁর স্মৃতিকথা 'জীবনকথা'-তে লিখেছেন, 'আমার ছোটপিসেমশায় সতীশ মুখুয্যে ছ'ফুটের উপর লম্বা ছিলেন,...তিনি বেশ ভাল ঘরের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, ও বোধহয় সেই দলের একজন যাকে বাপের কাছ থেকে শাপমুন্যি খেতে হয়েছিল।...তাঁর দৈর্ঘ্য মনে ক'রেই জ্যাঠামশায় তাঁর পারিবারিক ব্যঙ্গ কবিতায় লিখেছিলেন—

উঠানে দাঁড়াইয়া থাকি

তেতলার ঘুলঘুলি অবলীলায় খুলি

ভিতর পানে দেন আঁখি!'[২৩]

পারিবারিক অন্যান্য সংবাদের মধ্যে দেখা যায়, বৎসরের প্রথম থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারি দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন এবং নীলের ব্যবসা শুরু করেছেন। তাছাড়া বীরেন্দ্রনাথের বায়ুপীড়ার এমনই বৃদ্ধি ঘটে যে চিকিৎসকদের পরামর্শে আশ্বিন [Sep] মাস থেকে তাঁকে আলিপুরের Dhulendah Lunatic Asylum-এ স্থানান্তরিত করা হয়।

আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পাওয়া যায় ক্যাশবহি-র ১৫ ফাল্গুন [শুক্র 25 Feb 1870] তারিখের হিসাবে: 'দ° বাটীর বালকদিগের টীকা দেওয়ায় টিকেদারের আসিবার গাড়িভাড়া ১০।১১।১২।১৩। ১৪ পাঁচ রোজের গাড়ি ভাড়া ২ হিঃ ৫ ...টিকের বীজ লইয়া যে বালক আইসে তাহাকে দেওয়া যায় ২'। নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে বালকদের টিকা দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সম্ভবত এইটিই তাঁর প্রথম টিকা।

অনুরূপ আর একটি হিসাব পাওয়া যায় ৯ মাঘ [শুক্র 21 Jan 1870] তারিখে: 'বড়বাবু মহাশয় ছেলেবাবুদিগের ঘোড়ার নাচ দেখিতে লইয়া যান তাহারদিগের টিকিটের জন্য ২৮ টাকা।' পরবর্তী এক বৎসরের ঘোড়ার নাচের বিবরণ উদ্ধৃত করছি *The Friend of India* [15 Jan 1874] পত্রিকা থেকে:

On Monday, the 12th instant, the Governor General, accompanied by the Hon'ble Miss Baring, opened the Horse show at the Remount Depot, Castle Rainey, Ballygunge. ...

The total number of horses entered for competition is 50, of which 5 are English, 22 Australian, 5 Country-Breds, and 18 Arabs. ...His Excellency then declared the show open. The horses were then brought out, and paraded.

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

১১ মাঘ [রবি 23 Jan 1870] আদি ব্রাহ্মসমাজের চত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ঈশানচন্দ্র বসু, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং সায়াহ্নে দেবেন্দ্র-ভবনে ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী বক্তৃতা করেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে হিমালয়ের পথে কাশীতে অবস্থান করছেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র কার্তিক সংখ্যার ক্রোড়পত্র-রূপে 'সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী' [য] এবং 'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে', 'হে করুণাকর দীন-সখা তুমি', 'দরশন দেও_হে কাতরে', 'কত যে করুণা তোমার ভুলিব না এ জীবনে' ও 'কর তাঁর নাম গান'—এই পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে শেষ গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা, বাকি চারটি সত্যেন্দ্রনাথ-লিখিত। সুর সম্ভবত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর দেওয়া, কারণ গত বৎসর আমেদনগর থেকে 24 Jan 1869 [রবি ১২ মাঘ ১২৭৫] তারিখে ও সমসাময়িক অন্য কয়েকটি পত্রের মধ্যে প্রথম দুটি ও আরও সাতটি গান গণেন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বিষ্ণুকে দিয়ে সুর বসিয়ে নেওয়ার কথা লিখেছিলেন [দ্র *'Tagore Family Correspondences'*]। স্বরলিপিগুলি দ্বিজেন্দ্রনাথ-কৃত। এ-বিষয়ে তিনি পথিকৃতের সম্মান লাভের

অধিকারী। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম গানটি পিতাকে গেয়ে শোনাবার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে উল্লেখ করেছেন [দ্র ১৭।৩১৭]। গানগুলি সম্ভবত এই বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল এবং সুকণ্ঠের অধিকারী বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গায়কদলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ব্রাহ্মসমাজের দিক থেকে এই বৎসরের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ৭ ভাদ্র [রবি 22 Aug 1869] কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনাকার্য আরম্ভ হয়। অবশ্য এর আগেই ১১ মাঘ ১৭৯০ শক [23 Jan 1869] ঊনচত্বারিংশ মাঘোৎসবের দিন এই মন্দিরের গৃহপ্রতিষ্ঠাকার্য নিষ্পন্ন হয়েছিল। ৭ ভাদ্রের উৎসবে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ ভট্টাচার্য [শাস্ত্রী] প্রভৃতি ২১ জন যুবক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন একটি নূতন পথ অবলম্বন করল। এই যুবকদলের নিঃস্বার্থ সেবা, আত্মত্যাগ, সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্ষেত্রকে বহুবিস্তৃত করে তোলে। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস এই যে, যে ব্যক্তিপ্রাধান্য ও সংস্কারবিমুখতাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল, সেই একই কারণে মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তা ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এই যুবকদলের অনেকেই তাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বস্তুত উক্ত বিচ্ছেদের বীজ এই সময়েই রোপিত হয়ে গিয়েছিল। কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণবসুলভ ভক্তিপ্রবণতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছিল এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্র যেভাবে সব-কিছুতেই ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ করতে থাকেন, তা স্বভাবতই যুক্তিবাদী নব্যসম্প্রদায়ের মনঃপূত হবার কথা নয়। বৎসরকাল আগে [Oct 1868] মুঙ্গেরে কেশবচন্দ্রকে প্রায় অবতার-জ্ঞানে যে ভক্তি-অর্ঘ্য দান করা হয়েছিল এবং তিনি বিনা প্রতিবাদে, প্রায় প্রশ্রয়ের সঙ্গে, যেভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁর অন্যতম ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্তী কলকাতার পত্রপত্রিকায় 'নরপূজা'র বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকায় বেশ-কয়েকটি চিঠি এ-সম্বন্ধে প্রকাশিত হবার পর 'বাবু কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার অনুচর ও পত্রপ্রেরকগণ' নামে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় [১৫ পৌষ 28 Dec, পৃ ১০১-০৩] প্রকাশিত হয়। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-তেও ঐ মাসে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম, গুরু ও প্রচারক' [পৃ ১৬৪-৬৮] এবং জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ সংখ্যায় 'মনুষ্য পূজা' [পৃ ২৫-২৯] প্রবন্ধে এই বিপজ্জনক প্রবণতার সমালোচনা করা হয়। অন্য দিক থেকেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—'ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র প্রতিষ্ঠা তার প্রমাণ। তবুও কেশবচন্দ্রের অসাধারণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে ও কিছুটা নূতনত্বের আকর্ষণে এবং সমাজসংস্কারের প্রবণতায় একটি উচ্চশিক্ষিত যুবকগোষ্ঠী প্রবল উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্রাহ্মধর্মপ্রচার, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সমকালীন ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বর্তমান প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস কেশবচন্দ্রের খ্রিস্টানুরক্তি। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও আচরণে এই অনুরক্তি এমন তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, যাতে একদিকে তাঁর পুরোনো বন্ধু আদি ব্রাহ্মসমাজীরা যেমন দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি খ্রিস্টান মিশনারিরা এবং ইংরেজ শাসককুল অত্যন্ত উল্লসিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের ধারণা হয়েছিল কেশবচন্দ্র অত্যল্পকালের মধ্যেই খ্রিস্টান হয়ে যাবেন—যা ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই ইংরেজ-স্বার্থের অনুকূল। এই অবস্থায় ৫ ফাল্গুন [মঙ্গল 15 Feb 1870] কেশবচন্দ্র কলকাতা থেকে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর পাঁচজন বাঙালি সঙ্গীর

অন্যতম হচ্ছেন আনন্দমোহন বসু ও [শ্রীঅরবিন্দের পিতা] কৃষ্ণধন ঘোষ। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে পৌঁছন ৯ চৈত্র [সোম 21 Mar] এবং সাদরে গৃহীত হন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

জাতীয় মেলা বা হিন্দু মেলার চতুর্থ অধিবেশন ২ ও ৩ ফাল্গুন [শনি-রবি 12-13 Feb 1870] আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। গত বৎসরের অধিবেশনের পরেই চৈত্র-সংক্রান্তির পরিবর্তে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কোনো সময়ে এই মেলা অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব ওঠে [দ্র *The National Paper*, Vol. V, No. 16. 21 Apr 1869] এবং সেই অনুযায়ী স্থির হয়, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রথম শনি ও রবিবার জাতীয় মেলার অধিবেশন বসবে [দ্র ঐ; No. 34, Aug 25]। গণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্র মল্লিক যুগ্ম-সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহ-সম্পাদক হন। 'চৈত্র মেলা' নামটিও এই বৎসর থেকে পরিত্যক্ত হয়। ন্যাশানাল পেপার বর্তমান বৎসরের মেলার একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে 23 Feb 1870 সংখ্যার ক্রোড়পত্রে। এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে শনিবার গবর্মেন্ট সমস্ত সরকারী স্কুল ও কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করেন। বিকেল সাড়ে চারটেয় সভাপতি রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর একটি বাংলা ভাষণ দ্বারা মেলার উদ্বোধন করেন। এরপর সহ-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র জাতীয় সভার বার্ষিক কার্যবিবরণী উপস্থিত করেন ও মেলার লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেন। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষণের পর কথকতা, রাজকৃষ্ণ মিত্রের বৈদ্যুতিক পরীক্ষা প্রদর্শন ও পাইকদের তরবারি খেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় তিন হাজার লোক মেলায় উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে বাঙালি ও য়ুরোপীয় প্রায় কুড়ি হাজার দর্শকের সমাগম হয়েছিল। নানা ধরনের কৃষিজাতীয় দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, শিল্পকার্যের নমুনা ইত্যাদি প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রবন্ধ 'ভীষ্মদেবের জীবনচরিত' পাঠ করেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। কথকতা, মহেন্দ্রলাল ভট্টাচার্যের রাসায়নিক পরীক্ষাদি, ভোজবাজি, বালকদের জিমনাস্টিক্‌স্‌, ঘোড়দৌড়, সাঁতার, নৌকাচালনা প্রভৃতি দর্শকদের মনোরঞ্জন করে।*

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ ৪

বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের মধ্যে যাঁরা এই বৎসর জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা হলেনঃ দীনেন্দ্রকুমার রায় [১১ ভাদ্র বৃহ 26 Aug 1869], মোহনদাস করমচাঁদ [মহাত্মা] গান্ধী [১৭ আশ্বিন শনি 2 Oct], সখারাম গণেশ দেউস্কর [৩ পৌষ শুক্র 17 Dec], সুরেশচন্দ্র সমাজপতি [১৮ চৈত্র বুধ 30 Mar 1870].

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' [10 Nov 1869] এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গসুন্দরী' [1 Jan 1870] ও 'নিসর্গসন্দর্শন' [10 Mar 1870] এই বৎসর প্রকাশিত হয়।

উল্লেখপঞ্জি

১ জীবনস্মৃতি ১৭।২৮৭

২ ঐ ১৭।২৮৫

৩ ছেলেবেলা ২৬।৬০৮-০৯

৩ক দ্র সুধীর চক্রবর্তী: ‘ঠাকুরবাড়িতে সেকালে শরীর চর্চার দিকে খুব নজর ছিল’, *খেলার আসর,* শারদীয়া ১৩৮৭।২৮-২৯

৪ জীবনস্মৃতি ১৭।২৯৩

৫ ঐ ১৭।২৮১-৮২

৬ ‘ভুক্তভোগীর পত্র: *ভারতী,* শ্রাবণ ১৩২০।৪৫০-৫১

৭ ছেলেবেলা ২৬।৫৯৫

৮ জীবনস্মৃতি ১৭।২৮০

৯ ছেলেবেলা ২৬।৫৯৭

১০ জীবনস্মৃতি ১৭।২৬৯

১১ ছেলেবেলা ২৬।৬০২

১২ দ্র শিশু ৯। ৩৬-৩৮ [শ্রাবণ ১৩১০/আলমোড়া]

১৩ জীবনস্মৃতি ১৭।২৭৪

১৪ ঐ ১৭।২৭৩

১৫ ঐ ১৭।২৭১-৭২

১৬ আত্মপরিচয় ২৭।২৪৪

১৭ জীবনস্মৃতি ১৭।২৭৪

১৮ ঐ ১৭।২৭২

১৯ ঐ ১৭।৩২৫

২০ দ্র *The National Paper* (Vol. V, No. 20), May 19

২১ জীবনস্মৃতি ১৭।৩৩৪

২২ ঐ ১৭।৩৩৫

২৩ ‘জীবনকথা’: *এক্ষণ,* শারদীয়া ১৩৯৯।২৭

---

* জীবনস্মৃতি ১৭। ২৮৬; এই মাস্টারমশাইটিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যেও অমর করে রেখে গেছেন, দ্র ‘অসম্ভব কথা’: গল্পগুচ্ছ ১৮। ২৭১-৭২।

† ৬ মাঘ ১২৭০ [সোম 18 Jan 1864]-এর *সোমপ্রকাশ*-এ ‘অপূর্ব উজজ্বলতর কিরোসিন তৈল’ ও ‘কিরোসিন ল্যাম্প সেজ অর্থাৎ দীপ’-এর বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

* শ্যামাচরণ ঘোষ সেই সময়কার একজন বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ছিলেন। ‘[হিন্দু মেলার আরম্ভ অবধি শ্যামাচরণ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি কুস্তি-কসরৎ আদির জন্য প্রতি বারই পদক পুরস্কার পান। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট সর উইলিয়ম গ্রে শরীর-চর্চ্চায় উৎকর্ষের জন্য মেলার পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি পদক প্রদান করিয়াছিলেন।’ —হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত [১৩৭৫]। ২৬; শুধু তাই নয়, ছোটোলাট ক্যাম্পবেলের প্রতিষ্ঠিত দেশীয় সিভিল সার্ভিসে তিনি হুগলীর ব্যায়ামশিক্ষকের পদ লাভ করেন। দ্র ঐ। ৭৩

* জীবনস্মৃতি ১৭।২৮২; এঁর রূপের একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮] বইতে—‘তাঁর চোয়ালদুটো কেমন অদ্ভুত চওড়া, আর শক্ত রকমের। কথা যখন বলেন চোয়ালদুটো ওঠে পড়ে, মনে হয় যেন চিবোচ্ছেন কিছু।’ [পৃ ১৪] ‘হিতবাদী’তে প্রকাশিত ‘গিন্নি’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ এঁকে অমর করে রেখেছে। এ গল্পগুচ্ছ ১৫।৪১৭-২১

* চতুর্থ অধিবেশনের কার্যবিবরণ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। দ্র শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়-সংকলিত ‘হিন্দু মেলার বিবরণ’: *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৬৭ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, পৃ ২৯৪-৯৮। কার্যবিবরণীটিকে ন্যাশানাল পেপারের ক্রোড়পত্রটির বঙ্গানুবাদ বলা যেতে পারে। অবশ্য এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিত থাকার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

দশম অধ্যায়

১২৭৭ [1870-71] ১৭৯২ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের দশম বৎসর

পৌষ ১২৭৬ [Jan 1870] থেকে রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। পাঠ্যপুস্তকের বোঝা যে বেড়েছে ক্যাশবহি-তে তার কিছু উল্লেখ দেখা যায়। ৩ পৌষ [শুক্র 17 Dec 1869] 'পদার্থবিদ্যা ৩ খানা ও ওয়ানস্ এরিথমেটীক এক সেট' কেনা হয়েছে। 'পদার্থবিদ্যা'*[১]অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা রচিত। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'পদার্থবিদ্যা পড়িয়াছিলাম কিন্তু পদার্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেবল পুঁথির পড়া—বিদ্যাও তদনুরূপ হইয়াছিল। সে-সময়টা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। আমার তো মনে হয়, নষ্ট হওয়ার চেয়ে বেশি; কারণ, কিছু না করিয়া যে-সময় নষ্ট হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে-সময়টা নষ্ট করা যায়।'[১] এই মন্তব্য থেকে মনে হয়, গ্রন্থটি নিয়মিত পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, 'নানা বিদ্যার আয়োজন'-এর অন্তর্গত হয়ে এটি পঠিত হয়। এইভাবে আরও একটি বই পঠিত হয়েছিল—মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'*[২]। এই কাব্যটি পাঠের স্মৃতিও খুব সুখকর নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'মেঘনাদবধকাব্যটিও আমাদের পক্ষে আরামের জিনিস ছিল না। যে-জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে তরবারি দিয়া ক্ষৌরি করাইবার মতো হয়—তরবারির তো অমর্যাদা হয়ই, গণ্ডদেশেরও বড়ো দুর্গতি ঘটে। কাব্য-জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনোই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।'[২] উদ্ধৃতিটি থেকেই বোঝা যায় নীলকমল ঘোষাল কোন্ পদ্ধতিতে তাঁর ছাত্রদের মেঘনাদবধ পড়িয়েছিলেন। ছেলেবেলা-য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সাহিত্যে 'সীতার বনবাস'[৩] থেকে তাঁদের একেবারে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মেঘনাদবধ-এ। আরম্ভ এই সময়ে হলেও বইটি অনেক দিন ধরেই পড়া হয়েছিল, জীবনস্মৃতি-র বর্ণনা থেকে মনে হয় নর্মাল স্কুলের ছাত্র থাকার সময়েই [মাঘ ১২৭৮-এর পূর্বে] মেঘনাদবধ পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, কারণ পিতার আদেশে যেদিন 'বাংলাশিক্ষার অবসান' ঘটল, সেদিন 'মেঘনাদবধ কাব্যখানা বোধ করি পুনরাবৃত্তির সংকল্প চলিতেছে।' অনেকে মনে করেছেন, এই করুণ অভিজ্ঞতার পরিণতি ঘটেছিল ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষে প্রকাশিত 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' প্রবন্ধে বিরূপ সমালোচনার আকারে।

'পদার্থবিদ্যা' ও 'মেঘনাদবধ ছাড়াও ২৫ পৌষ ১২৭৬ [শনি 8 Jan 1870] সাড়ে আট টাকা দিয়ে 'সোম, রবী, সত্যপ্রসাদবাবু দিগের পুস্তক ক্রয়' করা হয়েছে এবং ১৯ মাঘ [সোম 31 Jan] 'বালকদিগের গ্রামার তিনখানা ও নিতীবোধ তিনখানা ও বর্ণশিক্ষা' কেনা হয়েছে—'বর্ণশিক্ষা' নিশ্চয়ই অরুণেন্দ্রনাথের জন্য এবং

গ্রামার ও 'নীতিবোধ'*[৩] তিনখানার উল্লেখই বুঝিয়ে দেয় এগুলি রবীন্দ্রনাথদের জন্য ও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই কেনা হয়েছে, অবশ্য গ্রামার অঘোরবাবুর কাছে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনেও ক্রীত হয়ে থাকতে পারে।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজি শিক্ষায় এ বৎসর অবশ্যই কিছু অগ্রগতি হয়েছিল। সম্ভবত প্যারীচরণ সরকারের *First Book of Reading* শেষ করে *Second Book* পর্যন্ত পাঠ এগিয়ে গিয়েছিল। ইংরেজি গ্রামারের সঙ্গে পরিচয়ের পালাও শুরু হয়েছে তা আমরা একটু আগেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বালকদের আত্মীয়তা রচনা করে দেওয়া তাঁর পক্ষে দুরূহ ছিল। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য নানারকম চেষ্টাও তিনি করেছেন। ইংরেজি ভাষাটা যে নীরস নয় ছাত্রদের কাছে তার প্রমাণ দেবার জন্য খানিকটা ইংরেজি রচনা তিনি মুগ্ধভাবে আবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু সমস্তটাই বালকদের কাছে এত অদ্ভুত মনে হয়েছিল যে তাঁদের সমবেত প্রবল হাস্যে অঘোরবাবুকে সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হতে হয়েছিল। তখন তিনি ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের প্রয়াস ত্যাগ করে নিজেকেই ছাত্রদের আত্মীয় করে তুলতে চাইলেন। তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। একদিন তিনি কাগজের মোড়ক থেকে মানুষের একটি কণ্ঠনালী বার করে বিধাতার সেই আশ্চর্য সৃষ্টির কৌশল ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সমস্ত মানুষটাই কথা কয়, সেই মানুষটিকে বাদ দিয়ে কেবল কথা-কওয়া ব্যাপারটাকে এমন টুকরো করে দেখাতে 'মনটা কেমন একটু ম্লান হইল; মাস্টারমশায়ের উৎসাহের সঙ্গে ভিতর হইতে যোগ দিতে পারিলাম না।'[৪] আর একদিন তিনি ছাত্রদের মেডিকেল কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শোয়ানো ছিল, সেটি দেখে রবীন্দ্রনাথের মন তেমন চঞ্চল হয়নি; কিন্তু মেজের উপর একখণ্ড কাটা পা পড়ে থাকতে দেখে তাঁর সমস্ত মন একেবারে চমকে উঠেছিল। 'মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর, এমন অসংগত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।'[৪] বোঝাই যায় ছাত্রের মনোরঞ্জনের প্রয়াসে অঘোরবাবু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু ঘটনা-দুটির মধ্য দিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথের যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, পরবর্তীকালের কবিমানসকে বোঝার পক্ষে তা একটি অমূল্য সূত্রের সন্ধান দেয়।

'নানা বিদ্যার আয়োজন' পর্বে আর একটি শিক্ষার শুরু সম্ভবত এই বৎসরেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।'[৫] জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা উভয় গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকের নামটি ভুল লিখেছেন। তাঁর নাম সীতানাথ দত্ত নয়—সীতানাথ ঘোষ। সীতানাথ দত্ত বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, *তত্ত্ববোধিনী* বা *ভারতী*-তে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল—কিন্তু প্রাকৃতবিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে 'ব্রাহ্মধর্মপ্রচার খাতে' সীতানাথ ঘোষকে প্রতি মাসে ঠাকুরবাড়ির সরকারী তহবিল থেকে দীর্ঘকাল মাসোহারা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বস্ত্রবয়নযন্ত্রের আবিষ্কর্তা হিসেবে তিনি হিন্দুমেলা ও তৎসংশ্লিষ্ট জাতীয় সভার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ২৫ বৈশাখ ১২৭৮ [রবি 7 May 1871] তারিখে ও পরে আরও কয়েক দিন তিনি জাতীয় সভায় 'বিদ্যুৎ' সম্পর্কে আকর্ষণীয় বক্তৃতা করেন এবং পরবর্তীকালে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার সাহায্যে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ইনি যন্ত্রপাতি

সহযোগে বিজ্ঞানের যে পরীক্ষাগুলি প্রদর্শন করতেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে সেগুলি বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। উত্তাপ দিলে পাত্রের নীচের জল হালকা হয়ে উপরে ওঠে ও উপরের ভারী জল নীচে নামতে থাকে, এইটি যেদিন তিনি কাঁচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে আগুনে চড়িয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিলেন, সেদিনকার বিস্ময় রবীন্দ্রনাথ জীবনে ভোলেননি। দুধের মধ্যে জল একটি আলাদা জিনিস, উত্তাপে সেই জল বাষ্পীভূত হয় বলে দুধ গাঢ় হয়, এই কথাটা যেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলেন সেদিনও যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলেন। এই আনন্দও কোনো স্বতন্ত্র বস্তু নয়, প্রকৃতির রহস্য নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করার যে আনন্দ তিনি সন্ধান করে বেড়াতেন তার সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে তাঁর মনটিকে ঠিকভাবে দেখা সম্ভব। আর এইজন্যই 'যে-রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।'[৫]

জিম্‌নাস্টিক শিক্ষা এ বৎসরেও অব্যাহত ছিল। জিম্‌নাস্টিক শিক্ষক শ্যামাচরণ ঘোষকে অন্তত এ বৎসর শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়েছে, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এর পরেও ২৮ মাঘ [বৃহ 9 Feb 1871] উক্ত শ্যামাচরণ ঘোষকে 'ছেলেবাবুদিগের জিমনেসটিক শিক্ষার জন্য যে সমস্ত কাষ্ঠের থাম প্রভৃতি তৈয়ার হইয়াছিল তাহার ব্যয়ের অর্দ্ধেকাংশ শোধ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে বা অন্য কাউকে বেতন বাবদ কোনো অর্থ দেওয়া হয়েছে, এমন উল্লেখ আর দেখা যায় না।

এই বৎসরের ক্যাশবহি-র একটি হিসাব আমাদের কাছে কিছুটা কৌতুককর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো-এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেন্টের চিরন্তন জুজু রাসিয়ান কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। ..এইজন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল।'[৬] বাড়ির পরিণতবয়স্কেরা তাঁর এই উৎকণ্ঠা সমর্থন না করায় সারদা দেবী শেষে কনিষ্ঠপুত্রকেই আশ্রয় করে তাঁকে বললেন রাশিয়ানদের খবর দিয়ে পিতাকে একখানা চিঠি লিখতে। 'মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুনশির [মুখোপাধ্যায়]* শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল।'[৬] দেবেন্দ্রনাথ চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন; লিখেছিলেন তিনিই রাশিয়ানদের তাড়িয়ে দেবেন, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। এই আশ্বাসে মায়ের ভীতি কতটা দূর হয়েছিল বলা যায় না, কিন্তু পিতা সম্বন্ধে পুত্রের সাহস এত বেড়ে উঠল যে, তাঁকে পত্র লেখবার জন্যে তিনি রোজই মহানন্দের দফতরে হাজির হতে লাগলেন। বালকের উপদ্রবে অস্থির হয়ে মহানন্দ কয়েকদিন খসড়া করে দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বয়স অনেক বেশি ছিল, সুতরাং চিঠিগুলি হিমালয়শিখরে পৌঁছয়নি। প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন, 'সম্ভবত ১৮৭১ সালে যখন বাদাকসানের অধিকার নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে রাশিয়ানদের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়।'[৭] সেই সময়ে এই পত্র লেখা হয়েছিল। জীবনস্মৃতি-র তথ্যপঞ্জীতে বলা হয়েছে, 'ইং ১৮৬৮ মে হইতে ১৮৭০ ডিসেম্বরের মধ্যে কোন এক সময় পত্রটি লিখিত হয়।'[৮] সময়নির্দেশটি অনাবশ্যক দীর্ঘ ও অস্পষ্ট করে ফেলা হয়েছে; হিমালয়-অঞ্চলে দেবেন্দ্রনাথের অবস্থান-কাল হিসেব করে এটিকে আরও সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব—May-Oct 1868 ও Mar-

Nov 1870; আর প্রবোধচন্দ্র সেনের অনুমান গ্রহণীয় হলে May-Nov 1871-র মধ্যে কোনো এক সময়ে পত্রটি লেখা হয়েছিল। কিন্তু এই তিনটি পর্বের কোন্‌টিতে পত্রটি লিখিত হয় তা নির্ধারণ করা খুবই মুশকিল। কারণ উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি ইংরেজদের মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। 1863-তে ইংরেজ-মিত্র আফগানিস্থানের শাসক দোস্ত্ মহম্মদের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে সেখানে যে গৃহযুদ্ধের সূচনা দেখা দিল, তাতে এই আশঙ্কা আবার ঘনীভূত হয়ে ওঠে। একদিকে এই গৃহযুদ্ধে ইংরেজ সরকারের নিরপেক্ষতা, অন্যদিকে রুশ সেনাবাহিনীর বোখারা সমরখন্দ প্রভৃতি জয় এই সময়কার সংবাদপত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। 1865-66 থেকে আমরা যে-সব বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র দেখেছি, তাতে এ-বিষয়ে বহু সংবাদ ও সম্পাদকীয় রচনা আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু অন্তত সংবাদপত্রের সাক্ষ্য থেকে একথা বলা চলে না যে, ব্রিটিশ ভারতের উপর রুশ আক্রমণের আশঙ্কা কখনও গুজবের আকার ধারণ করেছিল। তাই আমাদের ধারণা, 'হিতৈষিণী আত্মীয়া'টি (সম্ভবত ইনি কোনো আত্মীয়া নন, জনৈক 'ব্রজ আচার্যির বোন'—যাঁর কথা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন] কোনো বিক্ষিপ্ত সংবাদ থেকে গুজবের সৃষ্টি নিজেই করেছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর আশঙ্কার কারণ সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল। ৩১ শ্রাবণ [15 Aug] সংখ্যার *সোমপ্রকাশ*-এ একটি সংবাদ বেরোয়: 'বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নিকটস্থ ধর্মশালায় জীবন যাপন করিবার মানস করিয়াছেন।' পত্রিকাটির কাছে এই সংবাদের সূত্র কী ছিল আমরা জানি না, কিন্তু অনুমান করতে পারি সারদা দেবীর মনে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টির পক্ষে সংবাদটি যথেষ্ট ছিল। [বাড়িতে অন্য কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে *সোমপ্রকাশ*-ও নিয়মিত নেওয়া হত।] কিন্তু এই উদ্বেগ পরিণতবয়স্ক পুত্রদের কাছে প্রকাশ করতে তাঁর পক্ষে সংকোচ অনুভব করা স্বাভাবিক, আর সেই কারণেই রাশিয়ান ভীতির ছদ্মবেশে কনিষ্ঠ পুত্রকে দিয়ে স্বামীকে পত্র লেখানোর চেষ্টা! এর কয়েকদিনের মধ্যেই ৮ ভাদ্র [মঙ্গল 23 Aug] তারিখের হিসাবে দেখা যায়: 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট ইংলিসমেনু, সোমেন্দ্রবাবুর এক পত্র...পাঠাইবার টিকিট ব্যয়' বাবদ দশ পয়সা খরচ করা হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ যেখানেই থাকুন-না-কেন, তাঁকে নিয়মিত বিভিন্ন পত্রিকা, জরুরী কাগজপত্র ও চিঠি জমিদারি-সেরেস্তা থেকে প্রেরিত হত, তার ডাকমাশুলের ব্যয় 'বাজে খরচ খাতে' বিবরণ-সহ লিখিত হত। [হিসাবগুলি মূল্যবান—এর থেকে আমরা দেবেন্দ্রনাথের অবস্থান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাদি পেতে পারি।] যাই হোক, হিসাবটিতে আমরা সোমেন্দ্রনাথের নাম পাই, রবীন্দ্রনাথের নয়। এইটিকেই আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদের সূচনায় 'কৌতুককর সমস্যা' বলে, অভিহিত করেছি। পত্রটি যদি শুধু রবীন্দ্রনাথের নামে প্রেরিত হত, তাহলে হিসাব-খাতায় তাঁর নাম লিখিত হওয়াই স্বাভাবিক ও সংগত হত। তাই মনে হয়, মহানন্দ মুনশির দরবারে সোমেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছিলেন, এবং পরিণত-বুদ্ধি মহানন্দ দশ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথের চিঠি কর্তাবাবুমহাশয়ের কাছে পাঠানোর হিসাব লেখার চাইতে বারো বছরের কিশোর সোমেন্দ্রনাথের নাম ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। কিংবা এও হতে পারে পত্রটি সোমেন্দ্রনাথেরই লেখা, কিন্তু পিতাকে চিঠি লেখার মতো রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক কাজে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি এমনই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করে নিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ চিঠিটিকে নিজের লেখা বলে সহজেই ভেবে নিতে পেরেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতন হয়ে পৌষের প্রথম সপ্তাহেই জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে সংকলিত হল।

Sep 1869-এ বীরেন্দ্রনাথের চিকিৎসার জন্য তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। ছ-মাস সেখানে থেকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে Feb 1870 নাগাদ তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। এর কয়েক মাস পরে তাঁর একমাত্র সন্তান বলেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২১ কার্তিক [রবি 6 Nov 1870]। বলেন্দ্রনাথ তাঁর রাশিচক্রের খাতায় জন্মসময়টিকে উদ্ধৃত করেছেন: '১৭৯২।৬।২০।২৭|৩৭/ইং বেলা ৫।৩০'। তাঁর মা প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছেন: 'সে ভূমিষ্ঠ হইবার পর একেবারেই কোনও কান্নার শব্দ পাওয়া যায় নাই। নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহার পর ডাক্তারেরা নানা উপায়ে তাহাকে কাঁদাইতে সক্ষম হন। আমারও সেই সময় খুবই অসুখ। নাড়ী ছাড়িয়া কয়েকদিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। আমার নানারকম মনের অশান্তির মধ্যে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারও শরীরটা তেমন সুস্থ ছিল না, দুটি পাও একটু বাঁকা মতন হইয়াছিল। তাহার দরুন অনেকদিন পর্যন্ত পা ঘসিয়া ঘসিয়া চলিত।'[৯] এই দুর্ভাগিনী বধূটির প্রতি সারদা দেবীর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। সুতরাং তাঁর পুত্রলাভ সারদা দেবীর যথেষ্ট আনন্দের কারণ হয়েছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ১৪ অগ্র [সোম 28 Nov] তারিখের হিসাবে: 'ব° শ্রীমতীকত্রিমাতাঠাকুরাণী/দ° নবাবু মহাশয়ের প্রথম পুত্র হওয়ায়/২১ দিনের দিন বাটীর চাকরাণীদিগকে/বাটী বিতরণ করার জন্য বাটীর মূল্য ধরিয়া/দেওয়া যায়—১৫্'। প্রফুল্লময়ী দেবীও অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রীতিভাজন হয়েছিলেন।

১৩ অগ্র [রবি 27 Nov] হেমেন্দ্রনাথের চতুর্থ সন্তান ও তৃতীয় পুত্র ঋতেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

২৬ পৌষ [সোম 9 Jan 1871] 'শ্রীমতী স্বরৎকুমারী দেবীর দ্বিতীয়া কন্যার অন্নপ্রাসন খাতে খরচ'-এর হিসাব দেখে মনে হয়, সম্ভবত এই বৎসরেরই প্রথম দিকে [1870] সুপ্রভা দেবীর জন্ম হয়।

এছাড়া অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে আষাঢ় মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের ও অগ্রহায়ণ মাসে হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়।

ফাল্গুন মাসে [? ১৬ ফাল্গুন সোম 27 Feb 1871] দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা কাদম্বিনী দেবী ও যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু জ্যোতিঃপ্রকাশের বিবাহ হয়।

জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসন বাড়ির কিছু কিছু পরিবর্তন এ-বৎসর সংঘটিত হয়। বাড়ির মধ্যে অর্থাৎ অন্দরমহলে তেতালার ঘর প্রস্তুত হয়* এবং বাহির বাড়ির দোতালায় সাম্বক তোষাখানার [জীবনস্মৃতি-র বর্ণনানুযায়ী যেখানে শৈশবে রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ সময় কাটত চাকরদের তত্ত্বাবধানে] তিনটি ঘর বৈঠকখানায় পরিণত হয় [৬ কার্তিক শনি 22 Oct তারিখের হিসাব]। এগুলি বড়ো সংযোজন ও পরিবর্তন বলে এখানে উল্লেখ করা হল, কিন্তু পাঠকদের জানা দরকার যে নানা ধরনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ছোটোখাটো সংস্কার এই বাড়িতে প্রায় প্রতি বৎসরেই লেগে থাকত। ফলে আজকের দিনের মহর্ষিভবন দেখে সেই যুগের বাড়ির সঠিক রূপটি কিছুতেই মনে আনা যায় না।

বর্তমান বৎসরে আরও একটি সংযোজন এই বাড়িতে ঘটেছে কলের জলের আয়োজনের দ্বারা। Jan 1867-এ কলকাতা থেকে ১৬ মাইল উত্তরে পলতায় হুগলী নদীর জল পরিস্রুত করে পাইপের সাহায্যে সেই জল কলকাতায় পাঠানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। 1870-র শুরুতেই কাজটি সম্পন্ন হয় এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কয়েকটি উপনিয়ম প্রবর্তন করে বিভিন্ন বাড়িতে পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহ করতে আরম্ভ করেন। ৬ মাঘ ১২৭৬ [মঙ্গল 18 Jan 1870] তারিখের হিসাবে দেখছি, 'পুষ্করিণীতে জল আনাইবার জন্য মিউনিসিপল কমিসনর আপিসে' যাতায়াতের জন্য নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে; জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ওয়াটার ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে একশো সাড়ে বারো টাকা ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ [শুক্র 20 May 1870] তারিখে। এর আগের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ: 'তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম।'[১০] কলের জল প্রবর্তিত হওয়ায় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। অন্দরমহলে স্নানের জন্য আগে জল-বওয়া ভারী পুকুর থেকে জল নিয়ে গিয়ে স্নানের ঘরের চৌবাচ্চা পূর্ণ করে দিয়ে আসত। পানীয় জলের জন্য অন্য ব্যবস্থা ছিল: 'বেহারা বাঁখে ক'রে কলসি ভ'রে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল।'[১১] এই নিয়মেরও পরিবর্তনের সূচনা বর্তমান বৎসরে, ২০ পৌষ [মঙ্গল 3 Jan 1871] তারিখের হিসাবে দেখা যায় জনৈক কর্মচারীকে 'বাটীতে কলের জলের পাইপ আনাইবার জন্য উহার মেকিটস বরণ কো° [Mackintosh Burn & Co.] আপীসে জাতাতের গাড়িভাড়া' দেওয়া হয়েছে।

গুরুজনদের সঙ্গে বাড়ির বালকদের দূরত্বেব কথা রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে লিখেছেন: 'আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহারবিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না।'[১২] আমাদের আলোচ্য সময়ে এ অবস্থারও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গত বৎসরের বিবরণেই আমরা দেখেছি দ্বিজেন্দ্রনাথ বালকদের ঘোড়ার নাচ দেখাতে নিয়ে গিয়েছেন—ঐ বৎসরেই 'রবী সোম, সত্যপ্রসাদ দ্বিপু অরুণ ও বড় বাবুর কন্যা সরজা দিগকে কর্ত্তামহাশয় দেন ৫।।০' ১৪ কার্তিক শুক্র 5 Nov 1869 তারিখে। বাড়ির ছোটোরা যে বড়োদের চোখে পড়ছে—তাদের একটু বেড়াতে নিয়ে যাওয়া কিংবা নিজস্ব কিছু কেনা-কাটার জন্য নগদ অর্থ উপহার দেওয়া—এই তথ্যটুকুও কম মূল্যবান নয়। বর্তমান বৎসরেও এই ধরনের তথ্য নজরে আসে; ২৩ পৌষ শুক্র 6 Jan 1871 তারিখের হিসাব: 'ছেলেবাবুদিগের ফেনসিফেয়ার/দেখিতে যাইবার টিকিট ও খেলানা ক্রয়' কিংবা ২১ ফাল্গুন শনি 4 Mar তারিখে 'ছেলেবাবুদিগের ইস্কুলে বাজি দেখিবার টিকিট ৬ জনার' [ষষ্ঠ জন হচ্ছেন হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতেন্দ্রনাথ, যিনি Feb 1871-এ নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন, তাঁর দিদি প্রতিভা এপ্রিল মাস থেকে বেথুন স্কুলে যাতায়াত শুরু করেন]—বালকদের বহির্জগতের আমোদপ্রমোদের আস্বাদ দেওয়ার জন্য বড়োদের মনোযোগের প্রমাণ।

হয়তো এই মনোযোগের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে প্রথম যাত্রাভিনয় দেখার সুযোগ পান। ঠাকুরপরিবারে যাত্রাভিনয়ের ঐতিহ্য অনেক পুরোনো; গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই ছিলেন এক শৌখিন যাত্রাদলের পৃষ্ঠপোষক, 'বাবুবিলাস' নামে একটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুজো নিয়ে বিরোধে জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবার যখন বিভক্ত হয়ে গেল, তখন গিরীন্দ্রনাথের পরিবারে দোল-দুর্গোৎসব অব্যাহত থেকেছে—এইসব উপলক্ষে কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি দেশীয় আনন্দ-উপকরণকেও সেখানে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এইভাবেই এবার গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার জন্ম। সেই নাট্যশালা দীর্ঘায়ু হয়নি, কিন্তু প্রতি বৎসর যাত্রাদল ভাড়া করে এনে অভিনয় করানোর রীতি অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করেননি—তার স্মৃতিচারণ করেছেন ছেলেবেলা [দ্র ২৬|৫৯৯-৬০১]-তে: 'আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়যন্তর।' আত্মীয়-স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী সকলেরই অবারিত অধিকার ছিল সেখানে, ছিল না শুধু রবীন্দ্রনাথদের মতো বালকদের। রাত্রি ন'টা বাজলেই শ্যামের শক্ত হাতের মুঠি টেনে নিয়ে যেত শোবার ঘরে। 'কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের [অভিভাবকদের] মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরল, ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নলদময়ন্তীর পালা।' সেবারে বড়োদের সঙ্গে বসে তিনি যাত্রা দেখা শুরু করেছিলেন, রুমালে-বাঁধা বকশিসও ছুঁড়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু তার শেষ দেখা হয়নি, 'মাঝখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারিনি।' সুতরাং এই যাত্রা-দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর প্রথমজীবনের নাট্যচর্চায় ছাপ ফেলতে পারেনি, তাঁর নাটক বাংলা ও য়ুরোপীয় থিয়েটারের আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু পরে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় ও হয়তো অন্যত্রও তিনি সচেতনভাবেই যাত্রার দর্শক হয়েছেন, আর ধীরে ধীরে যাত্রার আঙ্গিক তাঁর নাট্যচিন্তায় প্রবিষ্ট হয়েছে—যার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর পরবর্তী জীবনে রচিত নাটকগুলিতে।

প্রসঙ্গক্রমে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রোগের চিকিৎসার আয়োজনটি কি রকম ছিল একটু দেখে নেওয়া যাক। পারিবারিক হিসাব-খাতা থেকে আমরা দেখতে পাই একজন ইংরেজ ডাক্তার ও একজন বাঙালি ডাক্তার বাৎসরিক চুক্তিতে নিযুক্ত হতেন। ইংরেজ ডাক্তারের বার্ষিক ফী ছিল ৫০০ টাকা ও বাঙালি ডাক্তারের ফী ছিল ৩০০ টাকা। দুজনেরই ফী-এর অর্ধেক দিতেন দেবেন্দ্রনাথ এবং অর্ধেক দিতেন গণেন্দ্রনাথ-গুণেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব থেকে ডাঃ এইচ বেলি এম. ডি. [Dr. H. Baillie M.D.] ও ডাঃ দ্বারকানাথ গুপ্ত ['ডি. গুপ্ত' নামে অধিক পরিচিত] ছিলেন ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক। দ্বারকানাথ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'জ্বর হ'লেই ডাক্তার দ্বারি গুপ্ত আমাদের দেখতে আসতেন, কে জানে তাঁকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যেত। তাঁর ব্যবস্থা ছিল—প্রথম দিন তেল (Castor Oil) ও তেলের চেয়েও বিস্বাদ জলের সাগু; দ্বিতীয় দিন এলাচদানার মত সামান্য কিছু পথ্য; তৃতীয় দিন ফুলকো রুটি; চতুর্থ দিন ভাত—সেই জ্বরের এই ক্রম ছিল।'[১৩] ডাঃ বেলি সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন: 'ডাক্তার বেলি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। ...বেলিসাহেব বালক রবীন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন, দেখা হইলেই রবিকে "Robin, Robin" করিয়া আদর করিতেন।'[১৪] দ্বারকানাথ গুপ্তের পরে বাঙালি ডাক্তার হিসেবে আসেন নীলমাধব হালদার 1866-এ। তিনি দীর্ঘদিন পারিবারিক চিকিৎসক রূপে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্পর্কে লিখেছেন: 'দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে; তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার,

থার্মোমিটার তখন চক্ষেও দেখি নি। ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোস। জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জল। তার সঙ্গে এলাচদানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপপাসের পরে ছিল অমৃত।'[১৫] বোঝা যাচ্ছে, চিকিৎসার পদ্ধতিতে দ্বারকানাথ গুপ্ত ও নীলমাধব হালদারে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না! ডাঃ বেলি বর্তমান বৎসরে Aug 1870 পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর পর সাহেব ডাক্তার হিসেবে সেপ্টেম্বর মাস থেকে নিযুক্ত হন ডাঃ ই. চার্লস্ এম. ডি. [Dr. E. Charles M.D.]। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এম. ডি. [1833-1904] চিকিৎসা করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়। কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত ছিল। বউবাজারের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ রাজেন্দ্র দত্ত সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর বাতব্যাধির চিকিৎসা তিনিই করেছিলেন, অন্যরাও তাঁর দ্বারা চিকিৎসিত হতেন এমন উল্লেখও পাওয়া যায়।

মেয়েদের প্রসব ও অন্যান্য ব্যাধির ক্ষেত্রে 'কলেজের দাই' অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের শিক্ষিতা নার্স ও জনৈকা Miss Murphyকে প্রায়শই আহ্বান জানানো হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তারের দ্বারা মেয়েরা চিকিৎসিত হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই!

ওষুধের জন্য বিখ্যাত Bathgate & Company-র সঙ্গে বার্ষিক বন্দোবস্ত ছিল। প্রতি ইংরেজি বৎসরের শুরুতে একটি মোটা টাকার বিল মেটানোর উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান বৎসরের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার কোনো উল্লেখ ক্যাশবহি-তে দেখা যায় না। এই বছর ১১ আশ্বিন [সোম 26 sep] এ-সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ দেখা যায়: 'সোম রবী সত্যপ্রসাদ বাবু ও শ্রীমতী বর্ণর পীড়া হওয়ায় পামরুটী' বরাদ্দ হয়েছে—বোঝাই যায় অসুস্থতাটি উদর-সংক্রান্ত এবং এই পাইকারী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল দলবদ্ধভাবে কোনো দুষ্পাচ্য আহার গ্রহণের ফলে!

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

১১ মাঘ [সোম 23 Jan 1871] একচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উদ্বোধনের পর বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন ও দেবেন্দ্রনাথ উপদেশ দেন। সায়ংকালে দেবেন্দ্র-ভবনে উদ্বোধনের পর শম্ভুনাথ গড়গড়ি বক্তৃতা করেন ও প্রার্থনা করেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। [*তত্ত্ববোধিনী*-তে প্রকাশিত বিবরণে সংগীতের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না।]

কেশবচন্দ্র গত বৎসর ৫ ফাল্গুন [মঙ্গল 14 Feb 1870] কলকাতা থেকে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করে ৯ চৈত্র [সোম 21 Mar] লণ্ডনে পৌঁছন। ছ'মাস ইংলণ্ডে অবস্থান করে তিনি বহু বক্তৃতা করেন এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া, ম্যাক্সমুলার, জন স্টুয়ার্ট মিল, গ্ল্যাডস্টোন প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতবর্ষ বিষয়ে অনেক কথাবার্তা বলেন। ২ আশ্বিন ১২৭৭ [শনি 17 Sep 1870] সাউদাম্পটন থেকে যাত্রা করে তিনি ৩০ আশ্বিন [শনি 15 Oct] বোম্বাই পৌঁছন এবং ট্রেনে ৪ কার্তিক [বৃহ 20 Oct] কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিলেত

থেকে তিনি যেন নূতন প্রাণশক্তি বহন করে আনলেন। পক্ষকালের মধ্যেই তাঁর সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসংস্কারক সভা স্থাপিত হল এবং ২২ কার্তিক [সোম 7 Nov] সভার প্রথম অধিবেশনে স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন, সাধারণ ও ব্যবসায়-সম্পর্কীয় জ্ঞানশিক্ষা, সুলভ-সাহিত্য-প্রকাশ, সুরাপান-নিবারণ ও দাতব্য এই পাঁচটি বিভাগ সৃষ্টি করে এক বহুমুখী কার্যধারার সূত্রপাত ঘটল। এর প্রথম ফল ১ অগ্রহায়ণ [মঙ্গল 15 Nov] থেকে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক *সুলভ সমাচার*-এর প্রকাশ। পত্রিকাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর কিছুদিন পরে ১৮ পৌষ [রবি 1 Jan 1871] থেকে সাপ্তাহিক *Indian Mirror* নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় দৈনিকে পরিণত হয়। বাঙালি পরিচালিত ও সম্পাদিত এইটিই প্রথম ইংরেজি দৈনিক। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনে ২০ মাঘ [বুধ 1 Feb] 'স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়' [Native Ladies Normal Adult Institution নাম পরিবর্তন করে পরে Victoria Institution রাখা হয়] প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে বিচিত্র কর্মধারার মধ্য দিয়ে, ধর্মকে বাদ দিয়েও, কেশবচন্দ্র সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেন।

পৌষ মাসের প্রথম দিকে দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলে কেশবচন্দ্র কয়েকটি উপহার নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। এর পরেই ১১ পৌষ [রবি 25 Dec] তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনায় যোগ দেন। তার পরে তিনি কেশবচন্দ্রকে দু'বার নিজের বাড়িতে আহ্বান করেন এবং বলেন: 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী, সংকীর্ত্তন ও ভক্তির ব্যাপারের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় আর অশ্রদ্ধা নাই, বরং তাহাতে অনুমোদন আছে। কেবল তাঁহার এই আপত্তি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টের প্রতি অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে সেই খ্রীষ্টই সকল বিবাদের মূল। ...এই সকল কথাবার্ত্তার পর প্রস্তাব হইল যে, এমন কোন একটি সন্ধিপত্র লিখিয়া সাধারণ্যে প্রচার করা হউক, যাহাতে ব্রাহ্মগণের মনে সদ্ভাবের সঞ্চার হইতে পারিবে।'[১৬] কেশবচন্দ্র এই সন্ধিপত্র রচনা করেন, যার পাঁচটি সূত্র হল:

১। ব্রাহ্মেরা ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না, এবং কোন মনুষ্যকে উপাস্য দেবতা অথবা পরিত্রাণের একমাত্র সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না।

২। ব্রহ্মেরই অব্যবহিত সহবাসলাভ ব্রহ্মোপাসনার প্রাণ, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করা ইহার বিরুদ্ধ।

৩। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস ও ঐক্যস্থল, অতএব এইটী অবলম্বন করিয়া উভয় পক্ষের যোগ রাখা কর্ত্তব্য।

৪। সমাজসংস্কারসম্বন্ধে পৌত্তলিকতা ও অপবিত্রতা পরিহার ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতা আছে।

৫। আদি ব্রাহ্মসমাজ যথাসাধ্য হিন্দুজাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন; প্রত্যেকে আপন স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত যোগ দিবেন।'[১৭]

১ মাঘের [শুক্র 13 Jan] এই সন্ধিপত্রের উত্তরে ২ মাঘ 'পরস্পরের সহিত আন্তরিক প্রণয় সঞ্চার' করার জন্য সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনার প্রস্তাব করে দেবেন্দ্রনাথ লিখলেন, ১১ মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে এবং ১০ বা ১২ মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সাংবৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হোক। কেশবচন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত না হলেও ১০ মাঘ [রবি 22 Jan] ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে তাঁকে উপাসনার জন্য আহ্বান জানালেন। তদনুযায়ী দেবেন্দ্রনাথ প্রাতঃকালে 'প্রেম' সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দেন। কিন্তু উপদেশের শেষাংশে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে খ্রিস্টের ভাব আনতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, 'খ্রীষ্টের নামে ইউরোপ শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, দুর্ব্বল ভারতবর্ষে একবার আসিলে, তাহার অস্থিচর্ম্ম চূর্ণ হইবে। স্বাধীনতার বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই খ্রীষ্টধর্ম্ম।'[১৮] দেবেন্দ্রনাথের এই খ্রিস্ট-সমালোচনা অপরপক্ষের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং দুই সমাজের মিলনের আশা আপাতত বিফল হয়ে যায়।

বৎসরের শেষ ভাগে আদি ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে 'ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পাদক হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্র।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার পঞ্চম অধিবেশন হয় এই বৎসর ৩০ মাঘ, ১ ও ২ ফাল্গুন [শনি-সোম 11-13 Feb 1871] কলকাতা থেকে তিন ক্রোশ দূরে নৈনানে হীরালাল শীলের বাগানে। এই অনুষ্ঠানের বিবরণ ন্যাশানাল পেপার-এর যে-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তা না পাওয়াতে অন্যান্য পত্রিকার বিক্ষিপ্ত বর্ণনার সাহায্য ছাড়া এই অধিবেশনের কার্যধারার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এর থেকে আমরা জানতে পারি প্রদর্শনীর অংশটি খুবই সমৃদ্ধ ছিল। মেয়েদের তৈরি কার্পেটের অনেকগুলি নমুনা, নানাধরনের বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র, শস্য ও ফল-ফুলের গাছ ও তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'কুমারসম্ভব' অবলম্বনে অঙ্কিত দুটি চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাছাড়া 'ডাকাতে বাজী, ভোজবাজী, ব্যায়াম প্রদর্শন, ঘোড় দৌড়, বোট কৌতুক, কথকতা, রাসায়নিক ক্রিয়া' প্রভৃতিও প্রদর্শিত হয়। কিন্তু বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান—যা মেলার প্রধান দিবসের কার্যসূচির অংশ, সে-সম্পর্কে কোনো বিবরণ পত্রিকাগুলিতে পাওয়া যায় না।

এই বৎসর জাতীয় মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'জাতীয় সভা'-র ['National Meeting'] অনেকগুলি অধিবেশন হয়। ন্যাশানাল পেপার থেকে 1 Dec 1870 পর্যন্ত আমরা আটটি অধিবেশনের কথা জানতে পারি। অধিবেশনগুলি সাধারণত বসত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিদ্যালয় ১৩নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ 'ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি' ভবনে। হিন্দুমেলার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের পর জাতীয় সভার কার্য আরম্ভ হয়। প্রথম বক্তৃতা দেন চৈত্র ১২৭৬-এ [Mar 1870] সীতানাথ ঘোষ যন্ত্র বিষয়ে, এখানে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত এয়ার পাম্প ও একটি যন্ত্রচালিত তাঁত প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ভারতীয় বাণিজ্য' বিষয়ে ১২ বৈশাখ ১২৭৭ [রবি 24 Apr 1870] তারিখে। উল্লেখ্য যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর পূর্ব থেকেই পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছেন। এই অনুষ্ঠানেও সীতানাথ ঘোষ গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত একটি বয়নযন্ত্র প্রদর্শন ও তার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন। ৯ জ্যৈষ্ঠ [রবি 22 May] শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'ভারতীয় সঙ্গীত' বিষয়ে প্রবন্ধ

পাঠ করেন। ২০ আষাঢ় [রবি 3 Jul] যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ে চতুর্থ বক্তৃতা দেন। রাজকৃষ্ণ মিত্র ২৩ শ্রাবণ [রবি 7 Aug] তারিখে 'জীবন ও বহির্জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ' বিষয়ে পরীক্ষা-সহযোগে আলোচনার সূচনা করেন। ১০ আশ্বিন [রবি 25 Sep] তারিখের ষষ্ঠ অধিবেশনে তিনি এই বিষয়েই আলোচনা করেন। সীতানাথ ঘোষ তাঁর আবিষ্কৃত বয়নযন্ত্র প্রদর্শন করেন এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত সহযোগে 'ছয় রাগ' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ২৯ পৌষ [বৃহ 12 Jan 1871] পাইকপাড়া নার্সারীর অধ্যক্ষ নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কৃষিকার্যের উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন ও হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়ে আলোচনা করেন। অধিবেশনটি প্রায় একটি কৃষিমেলার আকার ধারণ করে, কারণ ফল, ফুল, তরিতরকারীর প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা এই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ ছিল। বর্তমান বৎসরে নিশ্চয় আরও কয়েকটি অধিবেশন হয়, কিন্তু আমরা তার বিবরণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হইনি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য শিরোনামে ব্যবহৃত উপরোক্ত তথ্যগুলি পাঠকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে, যেখানে রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে ঘটনাগুলির কোনো দিক থেকেই প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু পাঠককে একটি জিনিস লক্ষ্য করতে বলি যে, এইসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অনেক ব্যক্তির সান্নিধ্যই নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছেন এবং তাঁদের এইসব বিচিত্র উদ্যম প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবেও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা সীতানাথ ঘোষের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই অধ্যায়েই আমরা দেখেছি তাঁর নানাধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বালক রবীন্দ্রনাথকে কী তীব্রভাবে আকর্ষণ করত। হিন্দুমেলা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপের মধ্যে যে আত্মনির্ভরতার আদর্শ অনুস্যূত ছিল, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতসমূহের তা অন্যতম ভিত্তি বলে আমাদের ধারণা। প্রধানত এই কারণেই আমরা উপরোক্ত ধরনের তথ্যগুলির বিস্তৃত উপস্থাপনাকে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

কিশোরীচাঁদ মিত্র [1822-73]-রচিত *Memoir of Dwarakanath Tagore* [1870] গ্রন্থটি ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে যাওয়ায় বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। কিভাবে এই বইটির সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের নর্মাল স্কুলে বাংলা শিক্ষার অবসান ঘটে, তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। এই গ্রন্থ রচনার সূচনায় আছে কিশোরীচাঁদ-প্রদত্ত দুটি বক্তৃতা। তার প্রথমটি প্রদত্ত হয় ১৫ বৈশাখ ১২৭৭ বুধবার 27 Apr 1870 তারিখে হাওড়ার সেন্ট টমাস স্কুলে। বক্তৃতাটি সম্পর্কে সোমপ্রকাশ [১২ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ২০ বৈশাখ] পত্রিকায় এই সংবাদটি বেরোয়: 'বুধবার বাবু কিশোরিচাঁদ মিত্র হাবড়ার ইনস্টিটিউটে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়ে এক উপদেশ দিয়াছেন। যদিও গ্রীষ্মাতিশয্য তথাপি বিস্তর লোক উপদেশ শ্রবণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। আমরা অবগত হইলাম, ইহা উত্তমও হইয়াছিল।' দ্বিতীয় বক্তৃতাটি হেয়ার অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে ১৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার 1 June তারিখে টাউন হলে প্রদত্ত হয়। ন্যাশানাল পেপার বক্তৃতাটির গুণাগুণ সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো বলে মন্তব্য করলেও ['...of the merits of the lecture, the less we say the better'—Vol. VI, No. 22, Jun 8] ঠাকুরপরিবার বক্তৃতাটি সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেন।

১৫ শ্রাবণ [শনি 30 Jul] বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ‘স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয়ের লাইফ লেখার জন্য কিশোরীচাঁদ মিত্রের নিকট’ যান, ক্যাশবহি-তে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থাকারে বক্তৃতাটি প্রকাশের ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য দেবার বিষয়ে হয়তো কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলে সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক ঠাকুরবাড়িতে প্রেরিত হলে সেগুলি প্রেসে ফেরৎ পাঠানো হয়। অনেক দিন পরে ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ [সোম 13 May 1872] তারিখে এই সংকটের সমাধান হয়েছে দেখা যায়: ‘বঃ কিশোরীচাঁদ মিত্র/দঃ স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয়ের/জীবন চরিত ছাপাইবার জন্য/উক্ত মিত্রের সমুদায় দাবি/শোধ/৮০০ টাকার চেকের মধ্যে/নিজাংশ/অর্দ্ধেক শোধ—৪০০’। সম্ভবত অপর অর্ধাংশ শোধ করেন গুণেন্দ্রনাথ।

উল্লেখপঞ্জি

১ জীবনস্মৃতি ১৭।২৯৬-৯৭

২ ঐ ১৭।২৯৭

৩ প্রথম প্রকাশ: Apr 1860

৪ জীবনস্মৃতি ১৭।২৮৮

৫ ঐ ১৭।২৮৫

৬ ঐ ১৭।৩০৫

৭ প্রবোধচন্দ্র সেনঃ ‘রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা’, বি.ভা.প., বৈশাখ ১৩৫০।৬৪৯

৮ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২৪৩, টীকা ৩৯ ।।১

৯ ‘আমাদের কথা’: বলেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। ২১-২২

১০ ছেলেবেলা ২৬।৫৯১

১১ ঐ ২৬।৫৯০

১২ জীবনস্মৃতি ১৭।২৬৮

১৩ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ৫৫

১৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ৫৮

১৫ ছেলেবেলা ২৬।৫৯৬

১৬ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ২।৮৫২

১৭ ঐ ২।৮৫৩

১৮ ঐ ২।৮৫৭

*[১] প্রথম প্রকাশ: শ্রবণ ১৭৭৮ শক [1856]। 'পদার্থ বিদ্যা নানা ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত হইয়াছে এ কথা বলা বাহুল্য। উহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।'—বিজ্ঞাপন। দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১।১২।৩৬

*[২] প্রথম প্রকাশ: ১ম খণ্ড [Jan 186l], ২য় খণ্ড [? Apr 1861]। জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমরা যখন মেঘনাদবধ পড়িতাম তখন আমার বয়স বোধ করি নয় বছর হইবে।'

*[৩] রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, প্রথম প্রকাশ: 1851, 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ—৪ শ্রাবণ ১৯০৮ সংবৎ [১২৫৮]। ইংরেজি *Moral Class Book* অবলম্বনে বিদ্যাসাগর বইটি লিখতে শুরু করেন, কিন্তু সময়াভাববশত রাজকৃষ্ণবাবুকে গ্রন্থটির স্বত্ব ও অবশিষ্ট অংশ লেখার ভার প্রদান করেন।

* এঁকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি ছড়ার কথা উল্লেখ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ:

'মহনন্দ নামে এ কাছারিধামে।
আছেন এক কর্মচারী,
ধরিয়া লেখনী লেখেন পত্রখানি
সদা ঘাড় হেঁট করি।...
হস্তেতে ব্যজনী ন্যস্ত,
মশা মাছি ব্যতিব্যস্ত—
তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস—' —ঘরোয়া।১৭

* 'ব° বাবু জানকীনাথ ঘোসাল/দ° বাটীর মধ্যের তেতালার ঘর তৈয়ারির ব্যয় শোঁধ/বিঃ এক বাউচর/গুঃ ছোটবাবু মহাশয়/৩৭৪ ন° বাঙ্গাল বেঙ্কের এক চেক/৯৬০৲'—২৯ ভাদ্র মঙ্গল 13 Sep তারিখের হিসাব।

একাদশ অধ্যায়

১২৭৮ [1871-72] ১৭৯৩ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের একাদশ বৎসর

১২৭৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস [Jan 1871] থেকে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়জীবনে নর্মাল স্কুল পর্বের ষষ্ঠ বৎসরের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন: 'ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা ছন্দোমালা[১] বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো-একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়া ছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, "গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে।" তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রাইজ পাও নাই?" আমি কহিলাম, "না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।" ইহাতে গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন।'[২] এটি কোন্ বৎসরের ঘটনা রবীন্দ্রনাথ তা উল্লেখ করেননি। অবশ্যই 1868-এর পরের ঘটনা, কারণ উক্ত 'ছন্দোমালা' ঐ বৎসরই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। যাই হোক, বর্তমান শ্রেণীতে পড়ার জন্য আরও অনেক নূতন বই কেনার হিসাব ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো পুস্তকের নাম না করে কেবল 'পুস্তক খরিদ' অভিধায় খরচ দেখানো হয়েছে বলে পাঠ্যসূচি সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা মুশকিল।

নূতন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়, মাঘ ১২৭৭ [Jan-Feb 1871] থেকে ইংরেজি-শিক্ষক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বেতন-বৃদ্ধি—এর আগে তিনি বেতন পেতেন মাসিক দশ টাকা, উক্ত মাস থেকে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় মাসিক পনেরো টাকা [অবশ্য নীলকমল ঘোষালের বেতন বাড়েনি]—এর কারণ হয়তো ছাত্রশ্রেণীতে দ্বিপেন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি। সম্ভবত এই সময়কার ইংরেজি-পাঠ সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন: 'কিন্তু প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুক সেকেণ্ড বুকের পরেই আমাদিগকে অতিব্যগ্রতাবশত এমন শক্ত ইংরাজি বই পড়ানো আরম্ভ হইল যে আমরা কোনোমতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতাম না।' মুদ্রিত গ্রন্থে বিষয়টি আরো স্পষ্ট: 'প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্স্ কোর্স অফ রীডিং* শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না,...প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাঁধা সিলেবল্-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্সেণ্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙিন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না।'[৩] সুতরাং যেমনি পড়া শুরু করতেন অমনি নিদ্রাকর্ষণের

বেগে মাথা ঢুলে পড়ত। চোখে জল দিয়ে, বারান্দায় দৌড় করিয়ে কোনো স্থায়ী ফল পাওয়া যেত না। ‘এমনসময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্তকাল বিলম্ব হইত না।’[৪]

‘নানা বিদ্যার আয়োজন’-এর অন্তর্গত একটি শিক্ষার সূচনা বর্তমান বৎসরে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: ‘ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো-এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।’[৫] ছেলেবেলা-য় বিষয়টি তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন: ‘কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্যে। দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কঙ্কাল। রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত, হাওয়ায় নাড়া খেলে হাড়গুলো উঠত খট খট করে। তাদের নাড়াচাড়া করে করে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জানা হয়েছিল, তাতেই ভয় গিয়েছিল ভেঙে।’[৬] এই কঙ্কালের স্মৃতি পরবর্তীকালে লিখিত ‘কঙ্কাল’ গল্পের [দ্র *সাধনা,* ফাল্গুন ১২৯৮।২৮৭-৯৮; গল্পগুচ্ছ ১৬। ৩২১-২৮] পটভূমিকা রচনা করেছে। আমাদের আলোচনার প্রয়োজনে ঐ গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করছি: ‘আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম, তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম।’[৭] ১২৭৮ সালের ক্যাশবহি-তে ১৬ পৌষ [শনি 30 Dec 1871] তারিখের হিসাবে দেখা যায় ‘ছেলেবাবুদিগের ডাক্তারি শিখিবার জন্য/হাড় খরিদ’ বাবদ ছ'টাকা দু'আনা ব্যয় হয়েছে। সুতরাং বোঝা যায় অস্থিবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারটি এই সময়কার; যদিও বেতন-গ্রহীতার তালিকা থেকে শিক্ষকটিকে শনাক্ত করা যায়নি। তাছাড়া উপরে যে তিনটি উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি, তাতে কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য ও অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। জীবনস্মৃতি ও ‘কঙ্কাল’ গল্পের বর্ণনায় শিক্ষকটি ‘ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল’-এর ছাত্র এবং ছেলেবেলা-র বর্ণনায় তিনি ‘মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র’। আমাদের মতে, এ ক্ষেত্রে ছেলেবেলা-র বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য, কারণ ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয় 1873-র সেপ্টেম্বর মাসে। তার আগে মেডিকেল কলেজে ইংরেজি, বাংলা ও মিলিটারি [এই ক্লাসে শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু]—এই তিনটি বিভাগ ছিল। ৭ আশ্বিন ১২৮০ [22 Sep 1873] তারিখের *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় [১৫ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা] লিখিত হয়: ‘মেডিকাল কালেজের ছাত্র সংখ্যা ১৪০০ হওয়াতে লেপ্টনান্ট গবর্ণর বাঙ্গালা ক্লাসগুলি শিয়ালদহে স্থাপন করিয়াছেন।’ *The Bengalee* পত্রিকার 17 Jan 1874 সংখ্যায় [Vol. XIII, No. 3] *The Indian Daily News*-এর সংবাদ উদ্ধৃত করে লেখা হয়: ‘...The New Medical School attached to the Municipal Pauper Hospital at Sealdah has been named and will in future be known as "The Campbell Medical School", in compliment to our Lieutenant-Governor, Sir George Campbell, who established it.’ সুতরাং অস্থিবিদ্যা-শিক্ষক মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন—হয়তো বাংলা বিভাগে পড়তেন—বছর দেড়েক বাদে স্থানান্তরের ফলে তিনি যখন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে চলে যান তখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল, সেইজন্যেই তাঁকে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বলে অভিহিত করেছেন, এইরূপ

সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়ত কঙ্কালটিকে কোথায় রাখা হয়েছিল, তিনটি উদ্ধৃতিতে তার তিন রকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জীবনস্মৃতি-র বর্ণনাই—'আমাদের ইস্কুলঘরে'—গ্রহণযোগ্য মনে হয়। শোবার ঘর বা তার পাশের ঘরের অবস্থান ছিল অন্তঃপুরের মধ্যে—সেখানে কঙ্কাল ঝুলিয়ে রাখা সারদা দেবী বা অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের সমর্থন পাবে এমন আশা করা যায় না; আর প্রত্যহ স্কুলঘর থেকে শোবার ঘর বা তার পাশের ঘরে কঙ্কালটি নাড়াচাড়া করা হত—বালকদের ভয়-ভাঙানোর মহৎ উদ্দেশ্যে [?]—অবাস্তব বলে মনে হয়।

তৃতীয় যে সমস্যাটি দেখা দেয় তা ছেলেবেলা-য় বর্ণিত 'কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি' বাক্যাংশটিকে কেন্দ্র করে। এই বর্ণনা মেনে নিলে বলতে হয় ইতিমধ্যেই 'নানা বিদ্যার আয়োজন' সূত্রে কুস্তিশিক্ষার সূচনাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হিসাব-খাতায় বালকদের কুস্তির প্রসঙ্গটি আমরা পাই আরও পরে ১৩ ভাদ্র ১২৭৯ [বুধ 28 Aug 1872] তারিখে—'সোম রবীবাবুদিগের কুস্তি করার জন্য কা... [?] তৈয়ারির ব্যয়' সাত টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা। অবশ্য কুস্তি ঠাকুরবাড়িতে কিছু নতুন ব্যাপার নয়। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন অল্পবয়সে তিনি হীরা সিং নামে এক পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিক্ষা করে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন।[৮] হেমেন্দ্রনাথও কুস্তিতে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'আত্মকথা'য় তার সাক্ষ্য মেলে।[৯] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত। দালানঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। ...এই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুস্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে তাতে এক মোন সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাঁচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি করে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম।'[১০] রোজ সকালে এত মাটি মাখা মা সারদাদেবীর আবার ভালো লাগত না, তাঁর ভাবনা হত ছেলের রঙ ময়লা হয়ে যাবে। ফলে বাদাম-বাটা, দুধের সর, কমলালেবুর খোসা প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত মলম দিয়ে রবিবারে চলত দলন-মলন—বালকের মন অস্থির হয়ে উঠত ছুটির জন্যে।

এর থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার প্রাত্যহিক জীবনচর্যার একটি ছক তৈরি করতে পারি। ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে লংটি পরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি; মাটিমাখা শরীরের উপর জামা চাপিয়ে মেডিকেল কলেজের জনৈক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা-শিক্ষা; সাতটার সময় বই ও শ্লেট নিয়ে নীলকমল ঘোষালের কাছে গিয়ে ন'টা পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির পাঠগ্রহণ; এরপর স্নান-খাওয়া সেরে নিয়ে ঘোড়ায় টানা ইস্কুল-গাড়ি বা পালকি চেপে স্কুল; সাড়ে চারটেয় স্কুল থেকে ফিরে জিম্‌নাস্টিক ও ড্রয়িং শিক্ষা; সন্ধ্যার পর আসেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ইংরেজি পড়াতে; রাত্রি ন'টার পর ছুটি। রবিবার ছুটির দিন হলেও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে গান শিখতে হত, আর কোনো-কোনো দিন আসতেন সীতানাথ ঘোষ যন্ত্রসহযোগে প্রাকৃত-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ইহারই মাঝে এক সময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে শুরু করিয়া দিলেন।"[১১] তাঁর বর্ণনার সূত্র অনুসরণ করলে মনে হয় এটি অস্থিবিদ্যা-শিক্ষার সমসাময়িক, কিন্তু আমরা হেরম্ব তত্ত্বরত্নের অস্তিত্বের কোনো সাক্ষ্য

পাইনি। অবশ্য ১২৯০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের হিসাবে জনৈক হেরম্বনাথ তর্করত্নকে দক্ষিণা দেওয়ার কথা জানা যায়, কিন্তু এঁরা একই ব্যক্তি কি না বলা শক্ত।

এই বছর পৌষ মাসে [Dec 1871] নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ বৎসরের সমাপ্তি এবং সপ্তম বৎসরের সূচনা। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ এই স্কুলের পাঠ্যজীবন ও বাংলা শিক্ষার অবসান ঘটে। কারণটি খুবই কৌতুকজনক। আমরা ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বিবরণে 'প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪'-এ কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা *Memoir of Dwarakanath Tagore* গ্রন্থটির সম্পর্কে কিছু সংবাদ দিয়েছি। নর্মাল স্কুলের কোনো-একজন শিক্ষক বইটি পড়তে চেয়েছিলেন। মাঘ মাসের শেষে [Feb 1872] দেবেন্দ্রনাথ বক্রোটা পাহাড় থেকে নেমে অমৃতসর ও লাহোর হয়ে বাড়ি ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় ও সহপাঠী সত্যপ্রসাদ সাহস করে তাঁর কাছে বইটি চাইতে যান। সত্যপ্রসাদ মনে করেছিলেন সর্বসাধারণের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলা যায়, তাঁর কাছে সেভাবে বলা চলে না। 'সেইজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে, পিতা বুঝিলেন, আমাদের বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।'[১২] এরই ফলে পরদিন সকালে নীলকমলবাবুর কাছে পাঠারম্ভের সময়ে দেবেন্দ্রনাথের তেতালার ঘরে তিনজনের ডাক পড়ল ও তিনি বাংলা পড়া বন্ধ করার নির্দেশ জারি করলেন। উৎফুল্ল রবীন্দ্রনাথের কাছে যে-মেঘনাদবধের প্রত্যেকটি অক্ষরই অমিত্র বলে মনে হত, এই মুক্তির মুহূর্তে তাকেও মিত্র বলে মনে করা অসম্ভব ছিল না। নীলকমল পণ্ডিত বিদায় নেবার সময় বলে গেলেন কর্তব্যের অনুরোধে অনেক সময় রূঢ় ব্যবহার করলেও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার মূল্য ভবিষ্যতে বোধগম্য হবে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা-জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। ...বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে...বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়।'[১৩] এই কারণেই ইংরেজি শিক্ষার বিপুল আগ্রহের যুগে যিনি সাহস করে তাঁদের বাংলা শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন সেই সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথ গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমান বৎসরের ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে [Feb 1872]। আগেই বলেছি, দেবেন্দ্রনাথ মাঘের শেষে হিমালয় থেকে ফিরে আসেন—২৯ মাঘ [শনি 10 Feb] 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের শুভ আগমন উপলক্ষে' কতকগুলি জিনিস কেনার হিসাব পাওয়া যায়। সুতরাং Feb 1872-তেই রবীন্দ্রনাথের নর্মাল স্কুল-পর্বের সমাপ্তি। ক্যাশবহি-র সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। ২৭ মাঘ [বৃহ ৪ Feb] তারিখের হিসাব: 'ছেলেবাবুদিগের বিদ্যালয়ের ফেবরূয়ারি মাহার/ফি শোধ/গুঃ শ্যামদাস/বিঃ ৫বিল/রবীবাবুর—১/সোমবাবুর ১/সত্যপ্রসাদবাবুর ১/দ্বিপেন্দ্রবাবুর ১/অরুণেন্দ্রবাবুর ০ /৪ ০; কিন্তু ৩০ ফাল্গুন (মঙ্গল 12 Mar]-এর হিসাবে দেখি: 'দ্বিপেন্দ্র অরুণেন্দ্রবাবুদিগের/বিদ্যালয়ের মার্চ্চ মাহার ফি শোধ/১ ০' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ তিনজনের নাম বাদ পড়েছে। এখানে একটি তথ্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। যদিও নর্মাল স্কুল-পর্বের সমাপ্তি ঘটল আকস্মিকভাবে হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে, কিন্তু বহু পূর্বেই স্কুল-পরিবর্তনের ভাবনা

অভিভাবকদের মনে এসেছিল তার প্রমাণ ৮ বৈশাখ [বৃহ 20 Apr 1871] তারিখের একটি হিসাব: 'সেন্ট জেবিয়ার্স কলেজ হইতে সেজ বাবুর আদেশ মতে ছেলেবাবুদিগের পুস্তক আনিতে যদুনাথ চট্টোর গাড়িভাড়া'। পুস্তক বলতে এখানে নিশ্চয় পাঠ্যপুস্তকের তালিকা বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এই হিসাবটিই বুঝিয়ে দেয় যে অভিভাবকেরা, বিশেষ করে হেমেন্দ্রনাথ, বালকদের সেই সময়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করে দেবার কথা ভেবেছিলেন; হয়তো মনে করেছিলেন বাংলা-শিক্ষার ভিত্তি যথেষ্ট সুদৃঢ় করেই গড়া হয়েছে, এবারে কালোপযোগী ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া দরকার। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক এই ভাবনা তখন কার্যকরী রূপ লাভ করেনি।

নর্মাল স্কুল ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথরা কিন্তু সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন না, হলেন বউবাজার অঞ্চলে অবস্থিত বেঙ্গল অ্যাকাডেমি নামের এক ফিরিঙ্গি স্কুলে। এই স্কুল থেকেই রীরেন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেছিলেন 1866-এ এবং শরৎকুমারী দেবীর স্বামী যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিন এখানকার ছাত্র ছিলেন। বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে রবীন্দ্রনাথেরা ভর্তি হলেন Mar 1872-তে। ক্যাশবহি-তে এই ভর্তির হিসাবটি অবশ্য উঠেছে পরবর্তী বৎসরে ২ বৈশাখ ১২৭৯ [শনি 13 Apr 1872] তারিখে—

> 'বিদ্যাভ্যাস খাতে/খরচ—১৫্
> ব° Bengal Academy
> দ° সোম রবী ও সত্যপ্রসাদ
> বাবুদিগের মার্চ মাহার ফি শোধ
> বিঃ ৩ বিল—৫্ হিঃ
> গুঃ ঈশ্বরদাস—১৫্

একই দিনে আরও একটি হিসাব আছে: 'ব° ডিকরূজ সাহেব Bengal Academy/দ° উহার জন্মতিথি উপলক্ষে/ছোটবাবু মহাশয়ের অনুমতিক্রমে/সবস্কৃপসন, দেওয়া যায়/গুঃ ঈশ্বর দাস-৬্'। এই খরচটি পরবর্তী বৎসরেও দেখা যায়।

যাই হোক, বিদ্যাভ্যাসখাতে খরচটি বৈশাখ ১২৭৯-তে লিখিত হলেও সম্ভবত চৈত্র মাস থেকেই রবীন্দ্রনাথেরা বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। ২৮ চৈত্র [মঙ্গল 9 Apr] যেমন 'সোম, রবী ও সত্যপ্রসাদ বাবুর পুস্তক ক্রয়' করা হয়েছে ১৭ টাকার, তেমনি ফিরিঙ্গি স্কুলের উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ১০ চৈত্র [শুক্র 22 Mar] 'সোম, রবী ও সত্যপ্রসাদবাবুদিগের/তিন জনার পেনটুলেন আলপাকার চাপকান/জোব্বা তৈয়ারির ব্যয়' পড়েছে ৪৭ টাকা ১০ আনা; এমন-কি 'সোম ও রবীবাবু দিগরের কাপড় রাখিবার জন্য ছোট পাঁচ ফুটে আলমারি'ও একটা ১৫ টাকায় কেনা হয়েছে এবং সোম ও রবি দুই ভাইয়ের জন্য দু-জোড়া করে চার জোড়া জুতো কেনার হিসাবও পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন: 'নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া বেঙ্গল একাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্তি হইলাম। ইহাতে আমাদের গৌরব কিছু বাড়িল'[১৪]—ইজের ও কামিজ থেকে 'পেনটুলেন', চাপকান ও জোব্বায় উত্তরণ এই গৌরব-বৃদ্ধির একটি অন্যতম বহিরঙ্গ কারণ বলে আমরা মনে করতে পারি!

বর্তমান বর্ষের একেবারে শেষে তাঁরা বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয়েছিলেন, সুতরাং এ-সম্পর্কে আলোচনা আমরা পরবর্তী বর্ষের জন্য স্থগিত রাখছি।

রবীন্দ্রনাথের গুণাবলি যে ধীরে ধীরে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল, তার কয়েকটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিবরণ বিভিন্ন সূত্রে লাভ করা যায়। ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতা বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে ১৭ পৌষ ১৭৯৩ শক [রবি 31 Dec 1971] তারিখে অমৃতসর থেকে একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'রবীন্দ্র প্রভৃতি বালকেরা বেহালাতে পারায়ণে যে যোগ দিয়াছিল তাহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তাহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম কি প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহা আমি কিছু শুনি নাই।...'[১৫]

এই পত্র থেকে জানা যায় ৩০ কার্তিক [বুধ 15 Nov] তারিখে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাংবৎসরিকে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন, সম্ভবত গায়ক হিসেবেই। ক্যাশবহি-তেই সংবাদটি পাওয়া যায় ৩ অগ্র [শনি 18 Nov] তারিখের হিসাবে: 'দ° বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভায় বড়বাবু মহাশয় ও ছেলেবাবুরা জাতাতের দুই খানা গাড়ি ভাড়া শোধ'। এই অনুষ্ঠানের কোনো বিবরণ চোখে পড়েনি, কিন্তু অনুমান করা যায়, বড়োবাবু অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ উপাসনা বা বক্তৃতা করেছিলেন এবং ছেলেবাবুরা হচ্ছেন সম্ভবত সত্যপ্রসাদ, সোমন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ ও হিতেন্দ্রনাথ—আর রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন-ই। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র কার্তিক সংখ্যার 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায়, এই উৎসবে বিকেল ৩টের পরে ব্রাহ্মধর্মের পারায়ণ ['ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকে শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা] ও ৭টায় ব্রহ্মোপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। পত্রটি থেকে আরও অনুমান করা যায়, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের জন্য ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষারও বিশেষ আয়োজন ছিল, অন্তত দেবেন্দ্রনাথের সেইরকমই নির্দেশ ছিল।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার 24 Jan 1872 তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় ঈশানচন্দ্র বসু, রাজনারায়ণ বসু ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। দেবেন্দ্র-ভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় সত্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাষণ প্রদান করেন। এই উৎসবের বিবরণ দিতে গিয়ে ন্যাশানাল পেপার-এ লিখিত হয়, 'The evening service commenced at 8 P.M. with the chanting of a beautiful hymn by little children' [Vol. VIII, No. 5, Jan 31, p. 54]. এই 'little children'-এর একজন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, একথা মনে করা কষ্টকল্পনা নয়। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র ফাল্গুন সংখ্যায় [পৃ ১৮০] তিনটি ব্রহ্মসংগীত প্রকাশিত হয়—

বেহাগ—ঝাঁপতাল। মঙ্গল নিদান, বিঘ্নের কৃপাণ, মুক্তির সোপান, অন্য কেবা [সত্যেন্দ্রনাথ]

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল। ইচ্ছা হয় সর্ব্ব ভুলে ছাড়ি মোহ কোলাহলে [ঐ]

ভৈরব—চৌতাল। মোর দুখ-নিশা প্রভাত কর।

—এই তিনটি গানেরই একটি বালকদের দ্বারা গীত হয়েছিল, এমন অনুমান করা চলে।

৩০ মাঘ [রবি 11 Feb] রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কাশীপুরের বাগানবাড়িতে 'হিন্দু মেলা'র ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়ে ২ ফাল্গুন [মঙ্গল 13 Feb] পর্যন্ত চলে। অবশ্য শেষ দিনে আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে লর্ড মেয়োর নিহত হবার সংবাদ ঘোষিত হলে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শোকপ্রস্তাবের মাধ্যমে অধিবেশনের অকাল-সমাপ্তি ঘটে। এই অধিবেশনের বিবরণ দিতে গিয়ে ন্যাশনাল পেপার-এ এক জায়গায় লিখিত হয়েছে, '...A young lad also rose and chanted extempore verses dwelling upon the great

virtues of Rama. Then rose also many other young lads and read little excellent pieces of poems' [Vol. VIII, No. 8, Feb 21, pp. 91-92]. এর বেশি কিছু লেখা নেই এবং অন্য কোনো পত্রিকার সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যের অভাবে নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই যে ঐ বিশেষ 'young lad'-টিই রবীন্দ্রনাথ, কিংবা অন্তত 'other young lads'-এর মধ্যেও তিনি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই পরিচিত মহলে তাঁর কবিখ্যাতি যেরূপ বিস্তৃত হয়েছিল তাতে এইরূপ পরিবার-সম্পৃক্ত অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন, এটা আশা করা যায় না। ৪ ফাল্গুন [বৃহ 15 Feb] ক্যাশবহি-তে একটি হিসাব দেখা যায়, 'হিন্দুমেলায় ছেলেবাবুদিগের খেলানা ক্রয় করিয়া দিবার জন্য এক বৌচর'-এ দুটাকা সাড়ে চোদ্দ আনা খরচ করা হয়েছে—এর থেকে অনুমান করা যায়, পরিবারস্থ বালকেরা—রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তার মধ্যে ছিলেন—হিন্দুমেলায় গিয়েছিলেন। এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে এই বৎসরই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিন্দুমেলার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হল।

রবীন্দ্রনাথের গুণাবলির পরিচয় প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা বলে নেওয়া যাক, এটিও হয়তো সমসাময়িক কালেরই ব্যাপার। গুণেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের একটি বিবরণ আমর এই অধ্যায়ের শুরুতেই দিয়েছি। মধ্যাহ্নে আহারের পর গুণেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির একতলায় জমিদারি কাজকর্মের জন্য আসতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এই সময়ে একই কাজের ভারপ্রাপ্ত। এই দুই প্রায়-সমবয়সী ভ্রাতা [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দু-বছরের ছোটো] বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠ ছিলেন, 'নব-নাটক' অভিনয়-প্রসঙ্গে তা আমরা দেখেছি। সুতরাং 'কাছারি তাঁহাদের একটা ক্লাবের মতোই ছিল—কাজের সঙ্গে হাস্যালাপের বড়োবেশি বিচ্ছেদ ছিল না'[১৬]—রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনা খুবই বাস্তবানুগ। গুণেন্দ্রনাথ কাছারিতে এসে একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসলে ছুটি-ছাটার সুযোগে বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোলের কাছে এসে বসতেন। গুণেন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প বলতেন। ভারতে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইভ দেশে ফিরে গলায় ক্ষুর দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন, গুণেন্দ্রনাথের কাছে এই কাহিনী শুনে 'বাহিরে যখন এমন সফলতা অন্তরে তখন এত নিষ্ফলতা' কেমন করে থাকে, মানব-হৃদয়ের অন্ধকারে বেদনার এই প্রচ্ছন্ন রহস্য নিয়ে সেদিন তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করেছিলেন। এক-একদিন নবীন কবির ভাবগতিক দেখে গুণেন্দ্রনাথ অনুমান করতে পারতেন যে তাঁর পকেটে একটা খাতা লুকোনো আছে। সামান্য প্রশ্রয়েই খাতাটি আত্মপ্রকাশ করত। গুণেন্দ্রনাথ সমালোচক-হিসেবে আদৌ কঠোর ছিলেন না, এমন-কি তাঁর অভিমত বিজ্ঞাপনেও ব্যবহারযোগ্য ছিল। কিন্তু কোনো-কোনোদিন কবিত্বের মধ্যে ছেলেমানুষির মাত্রা এত বেশি থাকত যে তাঁর পক্ষেও হাস্যসংযম অসম্ভব হত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ভারতমাতা সম্বন্ধে কী-একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার কোনো একটি ছত্রের প্রান্তে কথাটি ছিল 'নিকটে', ওই শব্দটাকে দূরে পাঠাইবার সামর্থ্য ছিল না অথচ কোনোমতেই তাহার সংগত মিল খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পরের ছত্রে 'শকটে' শব্দটা যোজনা করিয়াছিলাম। সে-জায়গায় সহজে শকট আসিবার একেবারেই রাস্তা ছিল না—কিন্তু মিলের দাবি কোনো কৈফিয়তেই কর্ণপাত করে না; কাজেই বিনা কারণেই সে জায়গায় আমাকে শকট উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। গুণদাদার প্রবল হাস্যে, ঘোড়াসুদ্ধ শকট যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান করিল এ-পর্যন্ত তাহার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।"[১৭] গুণেন্দ্রনাথের হাস্যের তোড়ে কবিতাটি উড়ে গেলেও, এই হাস্য ঘটনাটিকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে অঙ্কিত করে দিয়েছিল, সন্দেহ নেই। ফলে আমরা একটি অমূল্য তথ্য লাভ করি, যা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার ক্রমবিকাশের একটি সূত্র ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে। এর আগে আমরা তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর যে পরিচয় পেয়েছি তার প্রায় সবটাই জুড়ে ছিল পদ্মকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি-বর্ণনা। মাঝখানে সদ্ভাব বিষয়ে লিখিত ফরমায়েশি কবিতা এবং সাতকড়ি দত্ত-প্রদত্ত ছত্রের পাদপূরণ ও ফলারের ব্যক্তিগত বর্ণনা ছাড়া আর কোনো কবিতার খবর আমরা পাই না। কিন্তু এখানে যে কবিতাটির কথা বলা হয়েছে, তার বিষয় ছিল 'ভারতমাতা'। হিন্দুমেলার জাতীয়তার প্রেরণা বালক-কবির অন্তরে ইতিমধ্যেই কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে, সংবাদটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি।

এতদিন রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক পড়াশোনার যে চিত্রটি আমরা পেয়েছি, স্বীকার করতে বাধা নেই যে তা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু এরই সমান্তরাল আরও একটি জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, যা তাঁর লেখকজীবনের ভূমিকাস্বরূপ। এই জীবনে এই বালক-পাঠকের সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় তখনকার দিনে প্রচলিত প্রায় কোনো গ্রন্থই অপঠিত ছিল না। তিনি লিখেছেন: 'আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।'[১৮] অন্যত্র তিনি লিখেছেন: 'কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, একত্র বাঁধানো বিবিধার্থসংগ্রহ, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাংলা রবিনসন ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম।'[১৯]

*বিবিধার্থ সংগ্রহ** ছাড়াও আরও একটি মাসিক পত্র তাঁর মনোহরণ করেছিল, তার নাম *অবোধ-বন্ধু*†।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।'[২০]

বিবিধার্থ সংগ্রহ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ছ'টি পর্বে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত তার সব-কটি পর্ব রবীন্দ্রনাথ পড়েননি; তিনি যেটি পড়েছিলেন সেটি হল চতুর্থ পর্ব ৩৭ খণ্ড থেকে ৪৮ খণ্ড, ১৭৭৯ শক [১২৬৪ বঙ্গাব্দ: 1857-58] বৈশাখ থেকে চৈত্র সংখ্যাগুলি। এর মধ্যে যে তিনটি রচনার তিনি উল্লেখ করেছেন, তার প্রথমটি আশ্বিন সংখ্যায় [পৃ ১২১-২৩; নামটির উল্লেখে ভুল আছে, প্রকৃত নাম 'নর্বাল বা দীর্ঘদন্ত তিমি', ১২১ পৃষ্ঠায় এর একটি চিত্রও দেওয়া আছে], দ্বিতীয়টি ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ ১১৭; প্রকৃতপক্ষে ঐ নামে কোনো রচনাই এতে নেই—রচনাটির নাম 'রুশীয়দেশের রাজদণ্ড', তবে এতে যে ধরনের বিচার ও দণ্ডের বর্ণনা আছে তাকে কাজির বিচার বলে রবীন্দ্রনাথ কিছু ভুল করেননি], এবং তৃতীয়টি পৌষ সংখ্যায় [পৃ ২০৫-১৪; রচনাটির মূল নাম 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস', লেখক রবীন্দ্রনাথের মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] প্রকাশিত হয়েছিল।

অবোধ-বন্ধু প্রথমদিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের পত্রিকা ছিল। এর বিভিন্ন সংখ্যাগুলি কতক বাঁধানো কতক-বা খণ্ড আকারে দ্বিজেন্দ্রনাথের বইয়ের আলমারিতে আরও অনেক মূল্যবান গ্রন্থের সঙ্গে রক্ষিত ছিল। এই

কারণেই আলমারিতে চপলপ্রকৃতি বালকদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ‘অবোধবন্ধুর বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ’ বালক সেই নিষেধ লঙ্ঘন করতে দ্বিধা বোধ করেননি। তারপর ‘ইস্কুল ফাঁকি দিয়া একটি দক্ষিণদ্বারী ঘরে সুদীর্ঘ নির্জন মধ্যাহ্নে অবোধবন্ধু হইতে পৌল-বর্জিনীর* বাংলা অনুবাদ† পাঠ করিতে করিতে প্রবল বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তখন কলিকাতার বহির্বর্তী প্রকৃতি আমার নিকট অপরিচিত ছিল—এবং পৌল-বর্জিনীতে সমুদ্রতটের অরণ্যদৃশ্যবর্ণনা আমার নিকট অনির্বচনীয় সুখস্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত, এবং সেই তরঙ্গঘাতধ্বনিত বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ সমুদ্রবেলায় পৌল-বর্জিনীর মিলন এবং বিচ্ছেদবেদনা হৃদয়ের মধ্যে যেন মূর্ছনাসহকারে অপূর্ব সংগীতের মতো বাজিয়া উঠিত।’[২১] এর সঙ্গে যোগ করা যায় প্রথম খসড়ার এই পাঠটি: ‘সেই পৌল্‌বর্জ্জিনী পড়ার পর হইতে সমুদ্র ও সমুদ্রতীর আমার অন্তরের সামগ্রী হইয়াছিল। আরো বড় হইয়া যখন কপালকুণ্ডলা [প্রথম প্রকাশ: 1866] পড়িলাম তখন সমুদ্রতীরের সৈকটতটপ্রান্তবর্ত্তী অরণ্যচ্ছবি আমার মনে সেই জাদু করিয়াছিল।’ এই পত্রিকার মাধ্যমেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতার সঙ্গে[২২] তাঁর প্রথম পরিচয়। ‘তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই-সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।’[২৩]

যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সেই সময়েই দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন ‘জামাই বারিক’ প্রকাশিত হয় [20 Mar 1872]। রবীন্দ্রনাথের দূরসম্পর্কীয়া কোনো আত্মীয়া বইটি পড়ছিলেন। সে বই পড়ার বয়স তখনও তাঁর হয়নি বলে অনেক অনুনয় সত্ত্বেও বইটি আদায় করা সম্ভব হল না, বরং লুব্ধ বালককে প্রতিহত করার জন্য তিনি বইটি বাক্সে চাবিবন্ধ করে রাখেন। এই নিষেধ বালককে আরো উত্তেজিত করে তুলল, তিনিও শাসালেন যে এ বই তিনি পড়বেনই। মধ্যাহ্নে আত্মীয়াটি যখন তাস খেলছিলেন তখন তাঁর পৃষ্ঠে আলম্বিত আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা খুলে নেবার চেষ্টা করে বালক ধরা পড়ে গেলেন। আত্মীয়াটি মৃদু হেসে চাবির গোছা কোলে রেখে আবার খেলায় মন দিলেন। বাধ্য হয়ে বালককে আরও কুটিল পথের আশ্রয় নিতে হল। দোক্তার নেশা-গ্রস্তা মহিলাটির হাতের কাছে তিনি পানদোক্তার পাত্র সরবরাহ করলেন। পরিকল্পনা সফল হল। পিক ফেলতে গিয়ে চাবি-সমেত আঁচল কোল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিচে পড়ল এবং অভ্যাসবশত তিনি সেটি আবার পিঠে ফেললেন। ‘এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না; তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন—আমারও সেই দশা।’[২৪]

এইভাবেই বালক রবীন্দ্রনাথ পাঠ্য-অপাঠ্য বিবেচনা না করে হাতের কাছে যে বই[২৫] পেয়েছেন, তা-ই পড়েছেন। তাতে কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি মনে করেননি। তিনি লিখেছেন: ‘আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম—যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত।’[২৬] অবশ্য অন্য প্রতিক্রিয়াও যে হত না তা নয়; সেইজন্যই জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন: ‘এই সকল বই [জামাইবারিক] পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি;— প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাল্যরচনা ‘করুণা’ নামক গল্প তাহার নমুনা।’

যাই হোক, অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথের এইটিই বই পড়ার রীতি ছিল। বাংলা তো তিনি ভালোই জানতেন, সুতরাং বাংলা বইয়ের অনেকটাই তাঁর বোধগম্য হত, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংরেজি বই, যার প্রায় কিছুই তিনি বুঝতেন না, বালক-পাঠকের আগ্রাসী ক্ষুধা থেকে তারও নিস্তার ছিল না। তিনি লিখেছেন: ‘ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না তখন প্রচুর-ছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop[২৭] লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো-আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই—নিতান্ত আবছায়া-গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম’।[২৮] কেবলমাত্র বোঝার সীমানায় আবদ্ধ না থেকে, আপন মনের কল্পনাকে উদ্দীপিত করার এই প্রবণতা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মানসিকতাকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন, সেটি হয়তো এই সময়কার ঘটনা। তিনি লিখেছিলেন: ‘যখন আমার বয়স নিতান্তই অল্প ছিল এবং দূষিতবুদ্ধি আমার জ্ঞানকেও স্পর্শ করে নাই, এমনসময় একদিন বড়দাদা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও ব্রহ্মচর্যপালন সম্বন্ধে আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ আমার মনে এমনি গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, ব্রহ্মচর্য হইতে স্খলন আমার কাছে বিভীষিকাস্বরূপ হইয়াছিল। বোধ করি, এইজন্য বাল্যবয়সে অনেক সময়ে আমার জ্ঞান ও কল্পনা যখন বিপদের পথ দিয়া গেছে তখন আমার সংকোচপরায়ণ আচরণ নিজেকে ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।’[২৯] সংযমশুভ্র শুচিতা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, হয়তো দ্বিজেন্দ্রনাথের এই উপদেশ তার ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে বিবৃত করছি।

বর্ণকুমারী দেবী ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র সরোজনাথের জন্ম হয় সম্ভবত এই বৎসরের আশ্বিন মাসে। জন্মমাসটি নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই ক্যাশবহি-র হিসাবগুলি বিক্ষিপ্তভাবে লেখার জন্য। ৭ ভাদ্র [22 Aug] তারিখে ‘বর্ণকুমারীর আঁতুড়খরচ ৪’, ১ কার্তিক [17 Oct] ‘দ° সতীশবাবুর প্রথম পুত্র হওয়ায় নাড়ি কাটা দাই বিদায় ১৬’ এবং ১৭ অগ্র [2 Dec] ‘সতীশবাবুর পুত্রের জাতকর্ম্ম’ বাবদ ব্যয়ের হিসাব দেখা যায়, কিন্তু *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় প্রথানুযায়ী ‘শুভকর্মের দান’ শিরোনামায় এ-সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। ঠাকুরবাড়িতে অপৌত্তলিকভাবে হলেও সমস্ত স্ত্রী-আচার পালিত হত, তার প্রমাণ ১৬ আষাঢ় [29 Jun] তারিখের একটি হিসাব—‘বর্ণকুমারী দেবীর পঞ্চামৃত দেওন জন্য শ্রীখণ্ডি কাপড় একখানা ১ ০’, এই ধরনের হিসাব অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যেমন ৩০ চৈত্র [11 Apr 1872] তারিখের হিসাবে দেখি, ‘মেজ বধু ঠাকুরাণীর [জ্ঞানদানন্দিনী দেবী] নিকট সাধের সওগাদ আনে লোক বিদায়’ ও ‘সাঁতরাগাছির বাটী হইতে মেজ বধু ঠাকুরাণীর সাধ আনে’ অর্থাৎ এই ধরনের লৌকিকতাও ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক মাঘোৎসবের পূর্বেই কলকাতায় এসেছিলেন।

২৩ শ্রাবণ [সোম 7 Aug 1871] গুণেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার এই যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দশ বছর তিন মাসের ছোটো।

এই শ্রাবণ মাসেই বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র বলেন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন দেওয়া হয়। এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থায় বাড়িতেই ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই আশ্বিন মাসের গোড়ায় তাঁকে আবার ল্যুনাটিক অ্যাসাইলামে পাঠিয়ে দিতে হয়।

ফাল্গুন মাসে হেমেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ঋতেন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে লক্ষণীয় যে, এ ক্ষেত্রে হিন্দুরীতি-অনুযায়ী জাতক-জাতিকার বয়সের হিসাব সম্ভবত গণনা করা হত না, সুবিধামত অনুষ্ঠানটি করা হত। দেবেন্দ্রনাথ যে 'একেশ্বরবাদসম্মত অনুষ্ঠান পদ্ধতি' প্রচার করেছিলেন, তাতে 'অন্নপ্রাশন' নামে কোনো অনুষ্ঠান ছিল না, তার পরিবর্তে ছিল 'নামকরণ' এবং 'ছয় মাস হইতে এক বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত নামকরণের কাল' বলে নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু ক্যাশবহি-তে এ-সংক্রান্ত হিসাবগুলিতে 'অন্নপ্রাশন' কথাটিই পাওয়া যায়।

জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসন বাড়িতে কিছু কিছু সংযোজনের খবরও এই বছরের ক্যাশবহি থেকে পাওয়া যায়। ১২ বৈশাখ [24 Apr 1871] তারিখের হিসাবে দেখি, 'দ° তেতালায় কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের স্নানের ঘর তৈয়ারির চিক ও জাফরির এক বিল ৩০ ৬ মধ্যে গত ১৬ পৌষ এড্‌বানস্ ১১্ বাদে বাকী ১৯ ৬ মধ্যে নিজ রোজ শোধ/গুঃ উমর চিকওয়ালা ১৮ ৬' অর্থাৎ বহিবাটীর তিনতলায় দেবেন্দ্রনাথের কক্ষের সংলগ্ন স্নানঘরের জন্য এই খরচ করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, পৌষ ১২৭৬ [Jan 1870] থেকে পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস্ চালু হয় এবং ১২৭৭ বঙ্গাব্দের শুরু থেকেই বাড়িতে বাড়িতে জলের পাইপ সংযোগ করা আরম্ভ হয়ে যায়। Jan 1871-এ বাড়িতে জলের পাইপ আনার জন্য ম্যাকিনটস্ বার্ন্ অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়। সেই অনুযায়ী বর্তমান বৎসরের মধ্যেই এই কাজ সমাধা হয়ে যায়, সেটি বোঝা যায় ২১ পৌষ [4 Jan 1872] তারিখের হিসাব থেকে: 'ব° Messr. Mackintosh Burn & Co/দ° বাটীতে কলের জলের পাইপ আনিবার/ব্যয়ের একবিল ১২৪৬ ০ মধ্যে/নিজ রোজ দেওয়া যায়...২০০্'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদার্যে বাঙালিপাড়াতেও তাহার কার্পণ্য শুরু হয় নাই। শহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত।'[৩০] এই জল একসময়ে রবীন্দ্রনাথ মনের আনন্দে অকাল স্নানের কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু সে আরও কিছুকাল পরের ঘটনা।

তেতালার এই ঘর ও তার সম্মুখস্থ বিরাট ছাদের কিছু সৌন্দর্যবৃদ্ধির চেষ্টাও লক্ষিত হয়; ২৫ চৈত্র [6 Apr 1872]-এর হিসাবে দেখি: 'তেতালার ছাদে ফুলের টব দেওয়ায় টবের মূল্য ও টব আনিবার গাড়ি ভাড়া...৮।ল°'। এই সূচনা পরে এই ছাদটিকে বাগান করে তুলেছিল; কিন্তু সে অনেক পরের কথা, তখন দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবাস ত্যাগ করেছেন ও তাঁর শূন্যস্থানে এসেছেন কাদম্বরী দেবী-সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এ বছর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সীমানাও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ৪ চৈত্র [শনি 16 Mar 1872] তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খাতে/খরচ ১৫০০্/ব° মহেন্দ্রনাথ সেন/দ° বাটীর সম্মুখের

জায়গা ক্রয়ের জন্য শোধ...১৫০০্’।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার আয়োজনের দিকে তাকালে দেখা যায়, হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র হিতেন্দ্রনাথ Feb 1871-এ নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, আর Apr 1871-এ বেথুন স্কুলে ভর্তি হন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবী—২৯ চৈত্র ১২৭৭-এর [11 Apr 1871] হিসাবে দেখি ‘ব° Supdt. Bethune School/ শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবীর/বেথুন ইস্কুলের এপ্রিল মাহার ফি ১্/ও এনট্রান্স ফি ১্ একুনে শোধ/বিঃ একবিল-২্’। দীর্ঘকাল পরে প্রতিভা দেবীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর ভাই ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: ‘হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত করিবার জন্য যে বিপুল আয়াস পাইতেন, তাহা সংসারে, বিশেষত সে কালে ভারতবাসীগণের মধ্যে নিতান্ত বিরল ছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বালিকাগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিভা দেবীকে বেথুন স্কুলে প্রেরণ করেন।’[৩১] উক্তিটি যথার্থ নয়, কারণ অন্যেরা তো বটেই—এমন-কি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে বেথুন স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই শিক্ষা খুব অল্পদিনই তিনি পেয়েছিলেন, সেদিক থেকে প্রতিভা দেবী ঠাকুর পরিবারে একটি নূতন যুগের সূচনা করেন। তাঁর চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো ইরাবতী দেবীর জন্যও এ-ধরনের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়নি। প্রতিভা দেবীর আদর্শে কয়েকমাস পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজা Aug 1871-এ এবং ওই বছরেরই Nov মাসে সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতী [এঁর নাম প্রথমে দিদি ইরাবতীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছিল ইন্দ্রাবতী] বেথুন স্কুলে ভর্তি হন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিকের কিছু বিবরণ আমরা এই অধ্যায়েরই অন্যত্র দিয়েছি, সুতরাং এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই বৎসর আদি ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের যে ঝড় উঠেছিল, তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনও নানাভাবে যুক্ত, এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রাহ্মদের জন্য যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি দেবেন্দ্রনাথ রচনা করেন, সেখানে বিবাহানুষ্ঠানে হিন্দুরীতির অধিকাংশই গৃহীত হলেও পৌত্তলিকতা-দুষ্ট বলে শালগ্রামশিলা আনয়ন ও হোমাদি অগ্নি-সংস্কার বর্জিত হয়। 1861-এ দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কালের ব্রাহ্মবিবাহসমূহ এই রীতি অনুসারেই নিষ্পন্ন হচ্ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পদ্ধতিটির আরও সংস্কার করে নান্দীশ্রাদ্ধ, সপ্তপদীগমন, কুশণ্ডিকা প্রভৃতি অঙ্গও বাদ দেয় এবং পদ্ধতিটি আইনসম্মত কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে 20 Oct 1867-এর একটি সভায় আলোচনা করে এবং পরবর্তী 5 Jul 1868-এর সভায় গবর্মেন্টের কাছে এ-বিষয়ে আবেদন করার সিদ্ধান্ত করে, আমরা যথাস্থানে এ-প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। কেশবচন্দ্র-প্রমুখকে প্রশ্নটি বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল, কারণ তাঁরা প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরোধী অসবর্ণ-বিবাহের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, অথচ এই ধরনের বিবাহের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ারও দরকার ছিল।

10 Sep 1868 তারিখে গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার আইন-সদস্য মিঃ হেনরি সাম্‌নার মেইন [Mr. Henry Sumner Maine] যে বিবাহ-বিধির খসড়া ['A Bill to legalize marriages between persons not professing the Christian Religion and objecting to marry according to the orthodox rites of any of the existing religions of India.'] সভার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে তা আইনে পরিণত না হয়ে সংশোধনের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। ইতিমধ্যে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে চলে যাওয়ায় ব্যাপারটি তখনকার মতো চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে তিনি সম্পূর্ণ গোপনে এ-বিষয়ে আবার উৎসাহ দেখাতে থাকেন। ফলে খসড়াটি সংশোধিত হয়ে, নিয়মানুযায়ী গেজেটে প্রকাশিত না হয়েই, কেবলমাত্র ব্রাহ্মদের বিবাহ আইন-সিদ্ধ করবার জন্য নূতন নামে ['A Bill to legalize mariages between the members of the sect called the Brahma Samaj'] 3 Mar 1871 [শুক্র ১৮ চৈত্র ১২৭৭] তারিখে বিধিবদ্ধ হবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে যায়। আকস্মিকভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানতে পারেন এবং নবগোপাল মিত্র ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় গবর্নর হাউসে গিয়ে প্রতিবাদপত্র জমা দিয়ে আসেন, ফলে বিলটি বিধিবদ্ধ করা স্থগিত রাখা হয়।

এর পর দুই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এবং সংবাদপত্রগুলিতে তুমুল বিতর্কের ঝড় শুরু হয়। অবশ্য এ-ব্যাপারে আদি সমাজ যে সংযম দেখিয়েছিলেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে তা দেখানো সম্ভব হয়নি, *ধর্মতত্ত্ব* পত্রিকার এই সময়কার বিভিন্ন সংখ্যায় কটূক্তির মাত্রা কখনও কখনও শালীনতার সীমাও অতিক্রম করে গেছে। ঠিক হয়েছিল July 1871-এ সিমলায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে 'ব্রাহ্মবিবাহ বিল' বিধিবদ্ধ হবে। ঐ মাসেই নবগোপাল মিত্র ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সিমলায় গিয়ে প্রায় দু-হাজার লোকের স্বাক্ষর-সহ একটি আবেদনপত্র তৎকালীন আইন-সদস্য মিঃ স্টিফেনের হস্তে প্রদান করেন। আবেদনপত্রটি 'Memorial against the Brahmo Marriage Bill to the Viceroy' নামে *The National Paper*-এর 19 Jul 1871 [Vol. VII, No. 28] সংখ্যায় ৪ পৃষ্ঠার একটি ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয় [*দ্র তত্ত্ববোধিনী*, জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক (১২৭৯)।৪০-৪২]। এঁদের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এইরকম: (১) বিলে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি সকল ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অথচ অধিকাংশ ব্রাহ্মই এইরূপ বিধির জন্য আবেদন করেননি; ব্রাহ্মসমাজে বিজাতীয় মতাদি প্রচলন করার চেষ্টার ফলে মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নন। (২) এই বিল আইনে পরিণত হলে ব্রাহ্মেরা মূল হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, অথচ তাঁদের উদ্দেশ্য হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকে তার সংস্কারসাধন—আইনটি তাঁদের সেই চেষ্টার প্রতিবন্ধক। (৩) হিন্দুদের মধ্যে বহুপূর্ব থেকেই সামাজিক প্রথাসমূহ সমাজ-প্রধানদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে জনসাধারণের সম্মতিতে গৃহীত হয়েছে, এর জন্য কোনো আইন করার দরকার হয়নি। তাছাড়া হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাদের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক কৃত্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে, সেগুলির আইনগত বৈধতা নিয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। ব্রাহ্মেরা যে বিবাহপ্রণালী অনুসরণ করেন, পৌত্তলিকতা-দুষ্ট অঙ্গগুলি বর্জন ছাড়া শাস্ত্রসম্মত বিবাহপ্রণালীর সঙ্গে তার কোনো গুরুতর প্রভেদ নেই। সুতরাং ব্রাহ্মবিবাহকে বৈধ করার জন্য আইন-প্রণয়ন অনাবশ্যক। (৪) বিলটিতে বিবাহের রেজিস্ট্রিকরণের যে ধারা সংযুক্ত হয়েছে, তাতে বিবাহ একটি চুক্তিমাত্রে পর্যবসিত হবে, কোনোরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা না থাকায় বিবাহের পবিত্র ধর্মীয় চরিত্রটি এর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে। (৫) বিবাহের বয়স সম্পর্কে যে ধারা বিলটিতে

রয়েছে, তা দেশীয় প্রথার বিরোধী। ভারতে বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়স চোদ্দ বছরের কম বলেই মনে করা হয়। (৬) দুই বা ততোধিক বিবাহ আইনের সাহায্যে বন্ধ করার চেষ্টা অযৌক্তিক, কারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাপ্রসার ও জনমতের চাপে বহুবিবাহ এমনিতেই বিলুপ্ত হওয়ার মুখে। (৭) 'ব্রাহ্ম' শব্দটির সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক—বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজ, ইংলণ্ড ও আমেরিকার একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় প্রভৃতিও এই ব্যাপক অর্থে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়গুলি সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন নিজ দেশীয় প্রথারই অনুসারী, বাংলার ব্রাহ্মেরাও তেমনি সামান্য সংস্কার-সহ দেশীয় বিবাহপদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে—তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা প্রচলিত হিন্দুবিবাহপদ্ধতির যে অংশগুলি বাদ দিয়েছেন সেগুলি ঐ বিবাহের বৈধতার পরিপন্থী নয়। (৮) এই বিল আইনে পরিণত হলে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সমস্যা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের এই আবেদনের ফলে বিলটির সম্পর্কে বিবেচনা Dec 1871-এ কলকাতায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে পত্রপত্রিকায় বিতর্ক চলতে থাকে। ভারতবর্ষীয় সমাজ অভিযোগ করে, আদি সমাজ 'যাহারা ব্রাহ্ম নহে তাহাদিগের নিকট এক খানা সাদা কাগজ লইয়া গিয়া এই রূপ প্রকাশ করেন যে, পথ ঘাট ভাল করিবার জন্য কৌলীন্য প্রথা রক্ষা করিবার জন্য দেশের মঙ্গলের জন্য আবেদন করা হইবে। ইহা শুনিয়া অনেক পৌত্তলিক তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা সেইগুলি ব্রাহ্মদের স্বাক্ষর বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিয়াছেন' [*ধর্মতত্ত্ব*, ৪।১৩, ১ শ্রাবণ ১৭৯৩ শক।৪২৬]; বিদ্যালয়ের পৌত্তলিক ছাত্রদের কাছ থেকেও স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে, ইণ্ডিয়ান মিরর-এ এ-সম্পর্কে কতকগুলি পত্রও প্রকাশিত হয়। মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধেও খ্যাতনামা চিকিৎসকদের মতামত গ্রহণ করা হয়। সর্বাধিক বিতর্ক ও পারস্পরিক দোষারোপ উপস্থিত হয় হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ কিনা এই প্রশ্নে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতামতকে কেন্দ্র করে। উভয় পক্ষই এই বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত গ্রহণ করেন এবং সেগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিতর্ক করতে থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা —যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করতেন না—হিন্দু-বিবাহের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে এতটা মাথা না ঘামালেই পারতেন, যখন 30 Sep টাউন হলের বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র স্পষ্টই বলেন যে, এই বিবাহবিধির জন্য যদি ব্রাহ্মদের হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। বিধবাবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত—এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর যেমন সদর্থক আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন, অসবর্ণ বিবাহকে সেইরূপ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করার চেষ্টা করলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুদের মধ্যে একটি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তার বদলে ব্রাহ্মবিবাহকে অহিন্দু প্রমাণিত করার চেষ্টা করে ও নিজেদের অহিন্দু ঘোষণা করে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা নিজেদের একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ও শেষপর্যন্ত বিনষ্টির সূত্রপাত করেন।

যাই হোক, কলকাতায় 29 Nov-এর [বুধ ১৪ অগ্র] অধিবেশনে মিঃ স্টিফেন কেশবচন্দ্রের অহিন্দু ঘোষণার সুযোগ নিয়ে 'ব্রাহ্মবিবাহ' নামের পরিবর্তে 'সাধারণ বিবাহ বিধি' [Civil Marriage Act] নামে বিলটি আইনে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে 21 Dec 1871 [৭ই পৌষ] সিলেক্ট কমিটি 'সিভিল ম্যারেজ বিল'টি সভায় উপস্থাপিত করেন ও গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই বিবাহবিধি যাঁরা খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন নন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়ায় আদি ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু বা অন্যান্য সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করেননি। কিন্তু 16 Jan 1872 [৪ মাঘ] বিলটি আইনে পরিণত হবে স্থির হলেও মিঃ ইংলিশ [Mr. Inglis]-এর প্রতিরোধে তা হতে পারেনি। এর পর 4 Feb [২৬ মাঘ] তারিখে

আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে জনৈক শের আলির ছুরিকাঘাতে গবর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োর মৃত্যু ঘটায় এক্ষেত্রে আরও বিলম্ব ঘটে। শেষে ৭ চৈত্র ১২৭৮ মঙ্গলবার 19 Mar 1872 তারিখে প্রায় চারঘন্টা বিতর্কের পর বিলটি আইনে পরিণত হয় এবং Civil Marriage Act বা Act III of 1872, i.c. কিংবা সাধারণভাবে 'তিন-আইনের বিবাহ' নামে প্রচলিত হয়। আইনের বিধানগুলি মোটামুটি এইরকম: (১) দেশীয় বা বিদেশি, যাঁরা খ্রিস্টানাদি প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত নন, তাঁরা এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে পারবেন; (২) বরের বয়স আঠারো এবং কন্যার বয়স চোদ্দ বছর হওয়া চাই। বর-কন্যা একুশ বছরের কমবয়স্ক হলে অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন, বিধবা সম্পর্কে এই সম্মতির দরকার নেই; (৩) সগোত্রে বিবাহে বাধা না থাকলেও অবিবাহ্য নিকটসম্বন্ধগুলি মানতে হবে। মাতৃ- বা পিতৃ-পক্ষে বিবাহ হতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে চার পুরুষের অধস্তন হওয়া আবশ্যক; (৪) ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হলে পিতৃপক্ষ যে বিধানের অধীন, সন্তানেরাও সেই বিধানের অধীন হবে; (৫) গবর্মেন্ট-নিযুক্ত রেজিস্ট্রারের কাছে নোটিশ দেওয়ার চোদ্দ দিনের মধ্যে প্রতিরোধের কারণ উপস্থিত না হলে বিবাহ হতে পারে; (৬) রেজিস্ট্রার ও তিন জন সাক্ষীর সামনে বিবাহ নিষ্পন্ন হবে—বর ও কন্যা নিজেদের ইচ্ছামত পদ্ধতিতে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু পদ্ধতিতে 'আমি অমুক তোমায় বৈধ পত্নীত্বে (বা বৈধ স্বামিত্বে) গ্রহণ করলাম' এই কথার উল্লেখ থাকা চাই; (৭) রেজিস্ট্রারের অফিসে বা অন্যত্র বিবাহ হতে পারবে, তবে অন্যত্র বিবাহ হলে অধিক ফী লাগবে; (৮) এই আইনে যাঁরা বিয়ে করবেন, তাঁরা স্বামী বা পত্নীর জীবৎকালে অপর বিবাহ করলে অথবা এই বিবাহের আগে এক বা তদধিক স্বামী বা পত্নী থাকলে, দণ্ডবিধির ব্যবস্থামত দণ্ডিত হবেন, কোনো একজন ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও এ নিয়মের বহির্ভূত গণ্য হবেন না; (৯) এই আইনমতে বিবাহে ভারতবর্ষীয় ত্যাগবিধির [divorce] বিধান প্রযুক্ত হবে; (১০) যে সব বিবাহ পূর্বেই নিষ্পন্ন হয়েছে, 1 Jan 1873-র পূর্বে সেগুলিকে এই আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করা যাবে।

এই আইন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আকাঙিক্ষত রূপে বিধিবদ্ধ না হলেও, দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হওয়াতে তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু সেই আনন্দ অবিমিশ্র ছিল না; ১৬ চৈত্রের *ধর্মতত্ত্ব* [৫।৬]-তেই লিখিত হয়: 'এই বিধির কোন কোন নিয়ম আপাততঃ ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। পাত্র পাত্রীর ২১ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে তাঁহাদিগকে অভিভাবকের মত লইয়া বিবাহ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের যেরূপ অবস্থা তাহাতে অনেক স্থলেই পিতা মাতার অমতে ব্রাহ্মদিগকে বিবাহ করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এ নিয়মে বড় কঠিন ব্যবহার হইবে। ২১ বৎসর বয়সে উপনীত না হইলে আর তাঁহারা স্বাধীন ভাবে বিবাহে অধিকার পাইবেন না।' মাত্র ছ'বছর পরে কেশচন্দ্রের কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহারের রাজার বিবাহে এই বিধির বিধান ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে আরও কঠোরতর লেগেছিল, যখন বর-কন্যার নিম্নতম বয়সের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ঐ সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালেও 'হিন্দু নই' এই ঘোষণা করা অনেক ব্রাহ্মের পক্ষেই কত বেদনাদায়ক হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী তার দীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন [দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪২৬-২৮], কিন্তু তখন অনেক চেষ্টাতেও আইনের এই ধারাটি সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। আবার 29 Jul 1881-এ কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলা দেবীর বিবাহে কিংবা স্বর্ণকুমারী দেবীর একমাত্র পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের সঙ্গে কুচবিহারের রাজকুমারীর বিবাহে [1899] আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত আত্মীয়েরা যোগদান করতে

পারেননি, এমন বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটতে পেরেছিল এই বিবাহবিধি-সংক্রান্ত মতভেদকে কেন্দ্র করে, রবীন্দ্রনাথও সেই বেদনার অংশীদার হয়েছিলেন।

এই বৎসর কেশবচন্দ্র ২৩ মাঘ ১২৭৮ [সোম 5 Feb 1872] তারিখে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগানে 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে ইংরেজদের জীবনযাত্রা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: 'তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া, কিছুদিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা, এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া, শৃঙ্খলামতো কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্ম পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইয়া তিনি ভারত আশ্রম স্থাপন করিলেন।'[৩২] তাঁর সংকল্প মহৎ ছিল, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতা বোঝার অক্ষমতায় কিছুদিনের মধ্যে এই আশ্রমের জন্যই তাঁকে বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার বাইরে যে পুস্তকগুলি পাঠ করেছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটির কথা তিনি নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এই বইগুলির সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহল থাকতে পারে, সেইজন্য কতকগুলি পুস্তকের মোটামুটি পরিচয় এখানে দেওয়া হল। এর মধ্যে বেশির ভাগ বই বাড়ির মেয়েদের দ্বারা সংগৃহীত। এ-সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন: 'মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ...বড় হইয়া সে-কালের বইগুলি যথেষ্ট নাড়াচাড়া করিয়াছি,—মানভঞ্জন, প্রভাস-মিলন, দূতী-সংবাদ, কোকিলদূত, রুক্মিণীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদচরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, চাহার-দরবেশ, হাতেমতাই, গোলেবকায়লী, লয়লামজনু, বাসবদত্তা, কামিনীকুমার ইত্যাদি।'[৩৩] মনে হয়, এর সবগুলি না হলেও, বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথও পাঠ করেছিলেন। আমরা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত বইগুলি সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

বেতালপঞ্চবিংশতি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কর্তৃক 'বৈতালপচীসীনামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন' করে লিখিত। প্রথম প্রকাশ: 1847, পৃ ১৬৩। 'বেতালপঞ্চবিংশতি। কালেজ্ আফ্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর জি. টি: মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত শ্রীযুত পি. এস. ডি. রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত সংবৎ ১৯০৩।'[৩৪]

রবিনসন ক্রুসো—Daniel Defoe [1660-1731]রচিত *Robinson Crusoe* [1719]-র জন রবিনসন-কৃত অনুবাদ। জেমস্ লঙ-এর *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* [1855]এ প্রদত্ত গ্রন্থটির বিবরণ: '63. (E.T.) ROBINSON CRUSOE—1st part, Robinson Krushu, pp. 261. 8as., Roz. & Co. This "master-piece of fiction" was translated into plain Bengali by the Rev. J. Robinson, for the Vernacular Literature Committee—a second edition is now in the press...It is illustrated

by 18 wood cuts.' উক্ত কমিটির দ্বারা প্রকাশিত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'কুৎসিত হংসশাবক ও খর্ব্বকায়ার বিবরণ' [1858] গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকায় কিন্তু বিবরণের সামান্য পার্থক্য দেখা যায়—'রবিন্সন ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত,/বারখানি চিত্রযুক্ত...[পৃ] ৩২৬ [মূল্য] ।ল০'—এটি হয়তো দ্বিতীয় সংস্করণের বইটির বিবরণ। 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সঙ্গহ' সিরিজের এইটিই প্রথম বই। বইটির একটি বিশেষত্ব এই যে, এতে চরিত্র ও দেশের নামগুলি এবং আনুষঙ্গিক বর্ণনার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল।

আরব্য উপন্যাস—নীলমণি বসাক [? 1808-64) কর্তৃক অনূদিত। লঙ-এর ক্যাটালগে গ্রন্থটির বিবরণ —'327. (E.T.) ARABIAN NIGHTS, tr. by N.M. Baisak, 1st ed. 1850, 2nd ed., S.P. [Sanskrit Press], 1854, pp. 576. Tales 52 in number written in a simple style, giving much innocent amusement in the perusal, besides making the Hindus better acquainted with Moslem manners, and modes of thought.' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১২৫৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ১২৫৭ সালে প্রকাশিত হয়; 1854-এর প্রথম ভাগে তিনটি খণ্ড 'পুনঃ সংশোধিত এবং তাহাতে আর আর কয়েক উৎকৃষ্ট গল্প সংযোজিত করিয়া' একত্রে প্রকাশিত হয়।[৩৫] বইটি জনপ্রিয় হয়েছিল, ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় Aug 1870-তে, ৫০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির দাম ছিল দু-টাকা। ১২৫৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রটি এইরূপ: 'আরব্য উপন্যাস।/প্রথম খণ্ড/ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে/বাঙ্গলা ভাষায়/শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক কর্তৃক/অনুবাবাত [য] হইয়া/কলিকাতার কলুটোলায় হিন্দুস্থান যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।/১২৫৬'। পৃ ৪+১৬৬+২। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'সিন্ধবাদের নাবিকের কথা' [পৃ ১২১-৬৬]-র উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন।

পারস্য উপন্যাস—নীলমণি বসাক 1834-এ 'পারস্য ইতিহাস' নামে গ্রন্থটি পদ্যানুবাদে প্রকাশ করেন; 1856-এ 'গদ্যের অধিক গৌরব'-হেতু পুনরায় এটিকে গদ্যে অনুবাদ করেন। 1867-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৯৩ ও দাম দেড় টাকা।[৩৬]

সুশীলার উপাখ্যান—মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তিন খণ্ডে রচিত সুশীলা নামের একটি মেয়ের উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ কন্যা, পত্নী ও মাতা হয়ে ওঠার কাহিনী। গ্রন্থটির প্রথম ভাগের আখ্যাপত্র: BENGAL FAMILY LIBRARY/গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গহ। সুশীলার উপাখ্যান।/প্রথম ভাগ। /বঙ্গদেশীয় গৃহস্থবালিকাদিগের ব্যবহারার্থ/শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়/কর্ত্তৃক/প্রণীত।/CALCUTTA/BAHIR MIRZAPORE/PRINTED FOR THE VERNACULAR LITER-/ATURE COMMITTEE* AT THE/VIDYARATNA PRESS/By Girisha Chandra Sarma./1859/Price 3 annas.—মূল্যঁ০ তিন আনা।' বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৪। গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগ [মূল্য চার আনা, পৃ ১০৮] Dec 1859-এ এবং তৃতীয় ভাগ [মূল্য পাঁচ আনা, পৃ ১৩৪] Sep 1860-তে প্রকাশিত হয়। এটি সেযুগের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ, প্রায় প্রত্যেক বালিকা-বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মৎস্যনারীর কথা—এটিও 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ' সিরিজের অন্তর্গত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত একটি রূপকথার কাহিনী [1857]। বইটির মূল নাম অবশ্য সামান্য পৃথক। এর আখ্যাপত্রটি—এইরূপ—'মরমেত/অর্থাৎ/মৎস্যনারীর উপাখ্যান/শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়/কর্তৃক/ইংরাজি ভাষা হইতে/অনুবাদিত।/CALCUTTA/PRINTED FOR THE VERNACULAR

LITERATURE/COMMITTEE/BY Annund Chunder Vedantuvagees./AT THE TUTTOBODHINEE PRESS./1857./Price 9 Pice. মূল্য ল ৫ নয় পয়সা।' ৭৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে একটি কাঠখোদাই ছবি আছে—'মৎস্য নারীর সাহায্যেতে/এই রাজ কুমার রক্ষা পাইয়া ছিলেন/শ্রীরামধন দাস স্বর্ণকারের খোদিত সাং সিমুল্যা'। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন [1805-75]-এর বিখ্যাত 'Mermaid' গল্পটি এই গ্রন্থে অনূদিত হয়েছে। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এই সিরিজে অ্যাণ্ডারসনের আরও তিনটি গল্প 'চীন দেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিবরণ' [1857] ও 'কুৎসিত হংসশাবক ও খর্ব্বকায়ার বিবরণ' [1858] গ্রন্থে অনুবাদ করেছিলেন। এই দুটি বইও হয়তো রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন।

গোলেবকাওলি—উমাচরণ মিত্র কর্তৃক অনূদিত। লঙ-এর ক্যাটালগে গ্রন্থটির এইরূপ বিবরণ দেওয়া হয়েছে: '331. (P.T.) Gole Bakaoli, by Umachurn Mittre, Bi. B.P. 1855, pp. 113, 2 as. A very popular work, a fairy tale: adventure of a blind Persian King, in search of a rose, said to have the property of restoring the sight.' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে বইটির পরবর্তী কোনো সংস্করণের একটি খণ্ডিত কপি আছে; তার আখ্যাপত্রটি এইরূপ: 'গোলেবকাঅলি।/অর্থাৎ।/পারস্ব বকাঅলি গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায়/পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে/শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র। ও/শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্র। /দ্বারা অনুবাদিত। ইদানীং/ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোসের সুধানিধি যন্ত্রে মুদ্রিত হইল/কলিকাতা।/চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৪-১ নং বাটি।/সন ১২৬৭ সাল তারিখ ১৬ আশাড়। শকাব্দাঃ ১৭৮২।'

বিজয়-বসন্ত—হরিনাথ মজুমদার ['কাঙাল হরিনাথ', 1833-96] প্রণীত সংস্কৃত 'কথা'-জাতীয় উপাখ্যান [প্রথম প্রকাশ: ১৭৮১ শক, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ]। 'প্রথম বারের বিজ্ঞাপন'-এ হরিনাথ লিখেছিলেন, '...এক্ষণে কামিনীকুমার, রসিকরঞ্জন, চাহারদরবেশ, বাহারদানেশ প্রভৃতি যে সমুদয় রূপক ইতিহাস প্রচারিত আছে, সে সমুদয়ই অশ্লীল ভাব ও রসে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে উপকার না হইয়া বরং সর্ব্বতোভাবে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় অবলোকনে বালকদিগের রূপক-পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি বিজয়-বসন্ত নামক এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। ইহা কোন পুস্তক হইতে অনুবাদিত নহে, সমুদয় বিষয়ই মনঃকল্পিত। ইহার আদ্যন্ত কেবল করুণরসাশ্রিত ও নীতিগর্ভ বিষয়ে পরিপূর্ণ।' কোনো-কোনো বিদ্যালয়ে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া ছাড়াও বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—১৭৮৪, ১৭৮৭ ও ১৭৯১ শকে আরও তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া তারই প্রমাণ। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বসুমতী প্রতিষ্ঠান থেকে জলধর সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী'তে 'বিজয়-বসন্ত' অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবন-চরিত—হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার-রচিত গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' [1853]। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক রামরাম বসুর এই নামেরই বইটি [1801] বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। বর্তমান গ্রন্থটি বিষয়ের দিক থেকে রামরাম বসুর বইটির কাছে ঋণী হলেও ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রে উন্নততর। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ—'BENGALI FAMILY LIBRARY./গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তকসংগ্রহ।/THE HISTORY OF/RÁJÁ PRATAPADITYA/ "THE LAST KING OF SAUGUR ISLAND"/BY/HARISH CHANDRA TARKALANKAR/EX-STUDENT OF THE SANSKRIT COLLEGE./ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। /CALCUTTA:/PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE SOCIETY,/AND SOLD

BY MESSRS. D'ROZARIO & CO.; AND AT/THE TATTWABODHINI PRESS./1853.' ৪+৬৩ পৃষ্ঠার এই বইটির দাম ছিল দু'আনা। জীবনস্মৃতি-র 'গ্রন্থপরিচয়'-এ [১৭।৪৬৮] বইটি প্রসঙ্গে সংশয়-চিহ্ন-যোগে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' দু'খণ্ডে প্রকাশিত [1868, 1884] প্রতাপচন্দ্র ঘোষের লেখা সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস; রবীন্দ্রনাথ এটি পড়েছিলেন এবং নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে পড়ে শোনাতেন সেকথা লিখেছেন ছেলেবেলা-য় [২৬|৬১০], কিন্তু বাল্যকালে পড়া গ্রন্থের যে-তালিকা তিনি দিয়েছেন সেটি 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-পঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তকের বিবরণও আমরা সংকলন করতে পারি। আমরা পূর্বেই বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় [1855], মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা [1849] ও শুভঙ্কর দাস পণ্ডিতের শিশুবোধক ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় উদ্ধার করেছি। এখানে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উল্লিখিত কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

বোধোদয়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: Apr 1851, 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ—২৫ চৈত্র, ১২৫৭ [6 Apr 1851]। বইটি 'শিশুশিক্ষা—চতুর্থ ভাগ'-রূপে বিভিন্ন ইংরেজি পুস্তক অবলম্বনে সংকলিত হয়। পারিপার্শ্বিক জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিশুমনের কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সীতার বনবাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: Apr 1860, 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ—১৯১৭ সংবৎ [১২৬৭] ১ বৈশাখ। ভবভূতির উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে লিখিত।

চারুপাঠ—অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: ১ম ভাগ—৪ শ্রাবণ ১৭৭৫ শক [1853], ২য় ভাগ—শ্রাবণ ১৭৭৬ শক [1854] ও ৩য় ভাগ—২২ আষাঢ় ১৭৮১ শক [1859]। ১ম ভাগের 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখিত হয়: 'এ গ্রন্থ যে নানা ইঙ্গরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত, ইহা বলা বাহুল্য। যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এবং একটী প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত হয়, অবশিষ্ট কয়েকটি বিষয় নূতন রচিত হইয়াছে।' Rev. J. Long তাঁর বিখ্যাত *Catalogue*-এ প্রথম ভাগটির এইরূপ বিবরণ দিয়েছেন—'184. Charu pat, pt. 1, by Akhaykumar Dut, T.P., 1853, pp. 104, 8 as. Roz. & Co., with miscellaneous information on knowledge, and its pleasures, on philanthropy, the passions, treats of the following subjects: volcanoes, the walrus, beaver, Russian mica, polypus, laws of vegetation, attraction, atoms, fire-flies of South America, ourang outang, cataract, boiling springs with wo cuts of Vesuvius, the river horse, beaver, flowers, fire-fly, ourang-outang.' ২য় ভাগের বিবরণ: '185. Charu Pat, pt. 2, T.P., pp. 102, 8 as. 1853. Besides Literature and Ethics, treats of Corals, Icebergs, Balloons, the Compass, the Moon, Solar System, Thermo-meter, Comets.'

'চারুপাঠ—২য় ভাগ'-এর 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখিত হয়েছিল—'...বিশ্বান্তর্গত বহুপ্রকার প্রাকৃত বিষয়ের বৃত্তান্ত, জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক কতিপয় শিল্প-যন্ত্রের বিবরণ, নানাপ্রকার প্রয়োজনোপযোগী নীতিগর্ভ প্রস্তাব ইত্যাদি হিতকর বিষয়-সমুদায় ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে।...' গ্রন্থের সূচিপত্রটিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়:

প্রথম পরিচ্ছেদ। নীতি-চতুষ্টয়; বল্মীক; সন্তোষ ও পরিশ্রম, হিম-শিলা; মুদ্রা-যন্ত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ব্যোম-যান; মাতাপিতার প্রতি ব্যবহার; দিগদর্শন; অসাধারণ অধ্যবসায়; প্রবাল; অসাধারণ স্মারকতা-শক্তির উদাহরণ; পরিশ্রম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। চন্দ্র; জান্ ফ্রেড্‌রিক্ ওবর্লিন; আলেয়া; প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার; আত্মসংযম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। সৌর জগৎ; গ্রহ ও উপগ্রহ; ধূমকেতু; সৎকথন ও সদাচার; তাপমান; জন্ম-ভূমি;

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। মানস-সরোবর; আলোকচিত্র; মেরু-জ্যোতিঃ; দিব্য-বিহঙ্গ; আত্মোন্নতিবিধান; সিংহ; ব্যাঘ্র; ভল্লুক; হস্তী; গণ্ডার; গরিলা; কাশ্মীর; ভূমিকম্প; তাড়িত-বল; পূর্ত্ত-বৈজ্ঞানিক-ব্রনেল্-কীর্ত্তি; রাজভক্তি।

পদার্থ বিদ্যা—অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৭৭৮ শক [1856]। পরবর্তী একটি সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ: 'ELEMENTS/OF/NATURAL PHILOSOPHY/IN BENGALI/MATTER AND MOTION/BY UKKHOYCOOMAR DUTT./.../ পদার্থ বিদ্যা।/জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম। /শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।/...' বিষয়সূচিটিও কৌতূহলোদ্দীপক: জড় ও জড়ের গুণ; পরমাণু; বিস্তৃতি; আকৃতি; স্থিতি-বিরোধ; বিভাজ্যতা; অনশ্বরত্ব; জড়ত্ব; আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ; বিষমযোগাকর্ষণ; কৈশিক আকর্ষণ; অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ; রাসায়ণিক আকর্ষণ; চৌম্বকার্ষণ; তাড়িতাকর্ষণ; তেজ; পরিচালকতা; বিকিরণ; শোষকতা; বিয়োজন; সঞ্চারণ; আপেক্ষিক তেজ; নৈমিত্তিক গুণ; ঘনত্ব; কাঠিন্য; স্থিতিস্থাপকতা; ভঙ্গপ্রবণতা; ঘাতসহত্ব; তান্তবতা; ভিদাবরোধকতা; ভাসুরতাপাদন; সান্তরতা; বিস্তার্য্যতা; সঙ্কোচ্যতা; গতির নিয়ম; শক্তি; বেগ; সমগতি; সরলগতি; বিবৃদ্ধগতি; হ্রসমান গতি; অনপেক্ষ গতি ও আপেক্ষিক গতি; সাধারণ গতি; বক্র গতি; চক্রাবর্ত্ত; ঘাত ও প্রতিঘাত; পরাবর্ত্তিত গতি; মিশ্র গতি; ভার কেন্দ্র; জড় ও জড়ের গুণ; পরিদোলক। বইটি সচিত্র।

বস্তুবিচার—রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: পৌষ, সংবৎ ১৯১৫ [1859]। হুগলী নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক-রূপে কাজ করার সময় বইটি লিখিত হয়। 'বিজ্ঞাপন'-এ আছে: 'এতদ্দেশীয় সাহায্যকৃত বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহে বস্তুবিদ্যার অনুশীলন অতিশয় আবশ্যিক হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় ঐ বিষয়ের একখানিও পুস্তক নাই। এই বিবেচনা করিয়া কয়েকখানি ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক সচরাচরপ্রচলিত ও শুশ্রূষাজনক-গুণ-সম্পন্ন কতিপয় বস্তুর আকার প্রকার প্রয়োজন ও উৎপত্তির বিবরণ প্রভৃতি কিঞ্চিৎ লিখিয়া এই গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিলাম।'

প্রাণিবৃত্তান্ত—সাতকড়ি দত্ত প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: 1859 [১২৬৬]। বইটি আমরা দেখিনি, কিন্তু 1875-এ প্রকাশিত *Catalogue of Bengali Books* থেকে জানা যায় 1874-এ হিতৈষী প্রেস থেকে বইটির দশম সংস্করণের ২০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছে, ১৩৪ পৃষ্ঠার বইটির দাম ছিল আট আনা।

ছন্দোমালা—মধুসূদন বাচস্পতি প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: ১২৭৫ [1868], 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ —'কলিকাতা নর্ম্ম্যাল্ বিদ্যালয়/৩১শে বৈশাখ ১২৭৫ সাল'। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র: 'ছন্দোমালা।/প্রথম ভাগ।/ শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি প্রণীত।/কলিকাতা;/বারাণসী ঘোষের স্ট্রীটের ৪৫।২ নং বাটীতে/হিতৈষী যন্ত্রে/ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।/সন ১২৭৫।' ১০৪ পৃষ্ঠার এই বইটি পদ্য ও গদ্যে লেখা, স্বরচিত কিছু উদাহরণও আছে। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, 'সচ্চরিত্রের পুরস্কার' হিসেবে তিনি স্কুল থেকে একবার এই বইটি প্রাইজ পেয়েছিলেন।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ—লোহারাম শিরোরত্ন প্রণীত; প্রথম প্রকাশ: সংবৎ ১৯১৭ [1860], 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ—'কৃষ্ণনগর, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৭'। এই বিখ্যাত ব্যাকরণ-গ্রন্থে প্রথমে ছন্দ ও অলংকার অংশ ছিল না, দশম সংস্করণে ['বহরমপুর ট্রেনিং স্কুল, ২০শে শ্রাবণ সংবৎ ১৯২৪' (1867)] এই অংশটি যুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বইটির নাম না করলেও এটি যে তিনি স্কুলে পড়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। 'ছন্দের বিবরণ' অধ্যায়ে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের 'অক্ষরসংখ্যানুক্রমে তাহাদিগের স্থূল স্থূল বিবরণ' দিতে গিয়ে গ্রন্থকার লিখেছেন:

যাহার	তাহার নাম	যথা ;
আদ্যন্তে চৌপদীর শেষ এক পদ, মধ্যে চৌপদীর এক চরণ, এই রূপ যে হীনপদা চৌপদী	জগন্মোহন বা হীনপদা চৌপদী	"ওরে আমার মাচি ? আহা কি নম্রতা ধর, এসে হাত যোড় কর, কিন্তু কেন বারি কর, তীক্ষ্ণ শুঁড় গাছি। ওরে আমার মাচি ?"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমাদের পাঠ্য ব্যাকরণে কাব্যালংকার অংশে যে-সকল কবিতা উদাহৃত ছিল তাহাই মুখস্থ করিয়া মাকে বিস্মিত করিতাম। তাহার একটা আজও মনে আছে।' [জীবনস্মৃতি ১৭।৩২৬]—বলে তিনি উপরোক্ত উদাহরণটি উদ্ধৃত করেছেন।

বহুদিন পরে 21 Nov 1933 কবি কালিদাস রায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বইটিকে স্মরণ করেছিলেন: 'এককালে সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণ আমাদের পড়তে হয়েছে সেটাতে সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা হয়েছিল।'[৩৭]

উল্লেখপঞ্জি

১ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

২ জীবনস্মৃতি ১৭।৩৩৬

৩ ঐ ১৭|২৮৮

৪ ঐ ১৭।২৮৯

৫ ঐ ১৭। ২৮৫-৮৬

৬ ছেলেবেলা ২৬।৬০৭

৭ গল্পগুচ্ছ ১৬।৩২১

৮ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ৪৬

৯ দ্র পুরাতনী। ২৮

১০ ছেলেবেলা ২৬।৬০৬-০৭

১১ জীবনস্মৃতি ১৭।২৮৬

১২ ঐ ১৭।২৯৭

১৩ ঐ ১৭।২৯৮

১৪ ঐ ১৭।২৯৮

১৫ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী': *প্রবাসী,* আশ্বিন ১৩৩৪।৮১১-১২, পত্র ৮

১৬ জীবনস্মৃতি ১৭।৩৩৬

১৭ ঐ ১৭।৩৩৭

১৮ ঐ ১৭।৩৩০

১৯ 'বঙ্কিমচন্দ্র': *সাধনা,* বৈশাখ ১৩০১।৫৪০; গ্রন্থপরিচয় ৯।৫৫০; অপিচ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

২০ জীবনস্মৃতি ১৭।৩৩২

২১ 'বিহারীলাল':আধুনিক সাহিত্য ৯।৪১১

২২ 'প্রেম প্রবাহিণী কাব্য', 'বন্ধুবিয়োগ কাব্য', 'সুরবালা কাব্য', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন' প্রভৃতি।

২৩ জীবনস্মৃতি ১৭।৩৩২

২৪ ঐ ১৭।৩৩১-৩২

২৫ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

২৬ জীবনস্মৃতি ১৭।৩৩১

২৭ Charles Dickens [1812-70]-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস [1840-41]।

২৮ জীবনস্মৃতি ১৭।৩০৭

২৯ গ্রন্থপরিচয় ১৭।৪৬৯

৩০ জীবনস্মৃতি ১৭।২৭২

৩১ তত্ত্ব, মাঘ ১৮৪০ শক [১৩২৮]। ২৬৩

৩২ রাজনারায়ণ বসু: আত্মচরিত [সাক্ষরতা প্রকাশন সং, ১৩৮৩]। ৮৩

৩৩ 'সেকেলে কথা': স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী ৪

৩৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', সা-সা-চ ১৮ [১৩৭৭]।১১৩

৩৫ দ্র 'নীলমণি বসাক' সা-সা-চ ২৭ [১৩৬১]।৯

৩৬ *দ্র Catalogue of Bengali Books for Schools, Vernacular Medical Classes, Normal Schools, & C.* [1875]

৩৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

---

* *M'Culloch's Course of Reading* সেই সময়ে কলকাতার 'Day and Company' এই সিরিজের অনেক বই আমদানি করত।

* ‘বিবিধার্থ-সঙ্গহ,/ অর্থাৎ/ পুরাবৃত্তোতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যা-/ দি-দ্যোতক মাসিক পত্র।/.../ বাপ্তিস্ত-মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত।/ কলিকাতা/...’। প্রথম প্রকাশ: কার্তিক ১৭৭৩ শক [Nov 1851]। বঙ্গভাষানুবাদক সমিতির আনুকূল্যে প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

† যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১২৭০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে *অবোধবন্ধু* প্রকাশ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ফাল্গুন ১২৭৩ থেকে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে। ১২৭৫ সালের পৌষ-সংখ্যা থেকে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এটির স্বত্বাধিকারী হন। কিন্তু ১২৭৬ চৈত্র সংখ্যার পর পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হয়নি।

* Jacques Henri Ber nardin de Saint-Pierr [1737-1824] রচিত *Paul et Virginie* [1787]. এখানে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য, বিলেত থেকে বালিকা স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত বহু পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে ‘বর্জিনি’ বলে সম্বোধন করেছেন।

† ‘পৌল ভর্জ্জীনী’, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য [1840-1932] মূল ফরাসি ভাষা থেকে অনুবাদ করেন; *অবোধবন্ধু*-র পৌষ-চৈত্র ১২৭৫ এবং পৌষ-চৈত্র ১২৭৬—এই আটটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এমন একটি সুন্দর বই কোনোদিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থটির প্রথম বাংলা অনুবাদ Bengal Family Library বা ‘গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গহ’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সুচারু প্রেস থেকে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কর্তৃক অনূদিত ‘পাল এবং বর্জিনিয়ার জীবন বৃত্তান্ত’ নামে 1856-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

* Vernacular Literature Committee বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ 1851-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, হজসন্ প্র্যাট্, সীটনকার, রেভারেণ্ড লঙ, জন্ রবিনসন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ছিলেন সমাজের সহ-সম্পাদক। কমিটির উদ্দেশ্য ছিল: ‘to publish translations of such woks as are not included in the design of the Tract of Christian Knowledge Societies on the one hand, or of the School Book and Asiatic Societies on the other, and likewise to provide a sound and useful Vernacular Domestic Literature for Bengal.’ এই সমাজের আর্থিক সাহায্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত *বিবিধার্থসংগ্রহ* মাসিক পত্রিকা কার্তিক ১২৫৮ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করা সমাজের ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও মৌলিক রচনার জন্য তাঁরা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ‘সুশীলার উপাখ্যান’ এইভাবে পুরস্কৃত হয়। দ্র ‘রাজেন্দ্রলাল মিত্র’, সা-সা-চ ৪০ [১৩৬৮]।১২-১৩

দ্বাদশ অধ্যায়

১২৭৯ [1872-73] ১৭৯৪ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের দ্বাদশ বৎসর

১২৭৯ বঙ্গাব্দ তথা 1872 খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশের পক্ষে এক উল্লেখযোগ্য বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় *বঙ্গদর্শন* মাসিক পত্রিকার প্রকাশ এবং জাতীয় নাট্যশালা বা ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল, যা পরবর্তীকালে নানাভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনের ক্ষেত্রেও বৎসরটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

আমরা পূর্ব বৎসরের বিবরণেই দেখেছি কিভাবে রবীন্দ্রনাথের নর্মাল স্কুলে 'বাংলা শিক্ষার অবসান' হয়ে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি-পর্বের সূচনা হল। Mar 1872-তে তিনি, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ এই স্কুলে ভর্তি হন। ডিক্রূজ [DeCruz] সাহেব ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ। মাসে মাসে বেতন মিটিয়ে দেবার সদ্গুণ থাকায় তিনি এই ছাত্রদের পাঠচর্চার গুরুতর ত্রুটিকেও ক্ষমার্হ মনে করতেন। নর্মাল স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে এখানকার স্কুলের সহপাঠীদের পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়েছেন: 'এখানকার ছেলেরা ছিল দুর্বৃত্ত কিন্তু ঘৃণ্য ছিল না, সেইটে অনুভব করিয়া খুব আরাম পাইয়াছিলাম।'[১] এরাও নানারকম উৎপীড়ন করত, কিন্তু 'এ-সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে, মনে ছাপ দেয় না—এ সমস্তই উৎপাতমাত্র, অপমান নহে। তাই আমার মনে হইল, এ যেন পাঁকের থেকে উঠিয়া পাথরে পা দিলাম—তাহাতে পা কাটিয়া যায় সেও ভালো, কিন্তু মলিনতা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল।'[১]

ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্তি হওয়ার দরুন পোশাক-পরিচ্ছদ বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। এই সব কারণে তাঁর মনে হয়েছে, তাঁরা যেন অনেকখানি বড় হয়েছেন, অন্তত স্বাধীনতার প্রথম তলাটাতে উঠেছেন। কিন্তু এই স্কুলে যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে, সে ঐ স্বাধীনতালাভের দিকেই। 'সেখানে কী-যে পড়িতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম না, পড়াশুনা করিবার কোনো চেষ্টাই করিতাম না,—না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ্য করিত না।'[১] 'ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলুম বোবা আর কালা, সকলরকম এক্‌সেসাইজের খাতাই ছিল বিধবার থান কাপড়ের মতো আগাগোড়াই সাদা।'[২] ফলে এই স্কুলে পড়ার সময়টা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে।

অবশ্য বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে অবস্থানের কালটা নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপে প্রথমবার পড়াশুনোয় ছেদ পড়ে, দ্বিতীয়বার উপনয়নের পর হিমালয় যাত্রার ফলে।

ডেঙ্গুজ্বর এই বৎসর কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিভীষিকার মতো দেখা দিয়েছিল। ন্যাশানাল পেপার এ-সম্পর্কে লিখেছে: 'The Dengu is now in violent rage in Calcutta, sparing neither age, sex, nor rank. The fever is rife in European quarter too. In the Native quarter there is not one

single householder we believe within whose threshold the Dengu has not made its appearance and made one or more of the inmates thereof victims of the disease. The disease is terrible indeed.' [Vol. VIII, No. 19, May 8, 1872] প্রচণ্ড জ্বর, গায়ে ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ-যুক্ত এই ব্যাধি মাত্র তিন-চার দিনে রোগীকে এমন দুর্বল করে দেয় যে তার পরেও বেশ কিছুদিন তাকে প্রায় পঙ্গুজীবন যাপন করতে হয়, সমসাময়িক পত্রিকার বিবরণে রোগটিকে এইভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার কর্মচারীরা ডেঙ্গুজ্বরে পীড়িত হওয়ায় কয়েকটি সংখ্যা হ্রস্ব-আকারে প্রকাশিত হয়। ন্যাশানাল পেপার লেখে, এই ব্যাধির প্রকোপে বহু স্কুল-কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতি এত কমে যায় যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করে দিতে হয়।

1872-73-র *Bengal Administration Report*-এ লেখা হয়েছে: 'The very peculiar fever or disease known as dengu commenced to attract notice in Calcutta towards the end of 1871 and was rife in 1872. It prevailed during the cold weather and increased rapidly as the hot weather advanced. It continued to rage epidemically during the hot weather and rains, and few escaped its attack. ...The epidemic subsided towards the close of the rains.' (pp. 405-06] বস্তুত ন্যাশানাল পেপার-এ এই সম্পর্কে প্রথম সংবাদ দেখা যায় পূর্ববর্তী বৎসরের 19 Jul সংখ্যায়, যেখানে বলা হয়েছে প্রায় ৫০০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে, অর্থাৎ ১২৭৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ মাস থেকেই এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা গিয়েছে।

১২৭৯-র গ্রীষ্মে যখন এই রোগের সংক্রমণ সর্বব্যাপী হতে শুরু করেছে, তখন কলকাতার সম্পন্ন পরিবারগুলির অনেকেই কিছু দূরে গঙ্গাতীরবর্তী বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমার তাহার মধ্যে ছিলাম।'[৩] এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'বাহিরে যাত্রা'—বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের মানস-বিবর্তনে বহিঃপ্রকৃতি নানাভাবে ক্রিয়া করেছে। কিন্তু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাত্রায় প্রকৃতির দাক্ষিণ্য নানাভাবেই সংকুচিত ছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। ডেঙ্গুজ্বরের কল্যাণে সেই প্রকৃতি তার অবারিত সৌন্দর্য নিয়ে রবীন্দ্রজীবনে প্রথম আবির্ভূত হল, পেনেটি বা পানিহাটিতে অবস্থানের মূল্য এইজন্য সর্বাধিক।

গোড়াতেই কয়েকটি সমস্যার সমাধান করে নেওয়া দরকার। জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ যে বাগানকে 'ছাতুবাবুর [আশুতোষ দেব] বাগান' বলে উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীকালে এক প্রবন্ধে[৪] তাকেই অভিহিত করেছেন 'লালাবাবুদের বাগান' বলে। সরলা দেবী চৌধুরানী লিখেছেন, 'গঙ্গাধারের সে বাগানবাড়ি তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সম্পত্তি।'[৫]

দ্বিতীয় সমস্যা, ঠাকুর পরিবার কতদিন পেনেটির বাগানবাড়িতে বসবাস করেছিলেন। সরলা দেবী লিখেছেন: 'ছমাস বয়সে খুব ঘটা করে আমার অন্নপ্রাশন হল পেনেটির (পানিহাটির) বাগান বাড়িতে'[৫], তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয়, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরলা দেবীর জন্ম হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ২৫ ভাদ্র [সোম 9 Sep 1872] তারিখে। সুতরাং তাঁর হিসাব অনুযায়ী [ভারতীয় হিসাব-পদ্ধতিতে

জন্মমাসকেও এক মাস ধরা হয়] অন্নপ্রাশন হয় মাঘ মাসে। এই মাসেই রবীন্দ্রনাথদের উপনয়ন হয়। তার আয়োজন অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। তাছাড়া আগের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বর্ষার শেষাশেষি কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ অনেক কমে আসে। সুতরাং মাঘ মাস পর্যন্ত ঠাকুরপরিবার পেনেটিতে বসবাস করেছিলেন, এ সিদ্ধান্ত খুব যুক্তিসংগত নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ ছাত্রদের স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নটিও আছে।

এই সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় ক্যাশবহি-র হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে। ২১ আষাঢ় [বৃহ 4 Jul]-এর হিসাবে দেখা যায়—'বঃ শ্রীমতী উপেন্দ্র মোহিনী দাসী/দ° পাণিহাটী বাগানের গত জ্যৈষ্ঠ মাহার ভাড়া শোধ/ বিঃ এক বিল গুঃ প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক/৬০০ ন° বাঙ্গাল বেঙ্কের এক চেক—১২৫্'; আবার ২৬ আষাঢ় [মঙ্গল 9 Jul] উক্ত উপেন্দ্রমোহিনী দাসীকে 'পাণিহাটীর বাগানের/আষাঢ় মাহার ১৮ রোজের ভাড়া শোধ' করা হয়েছে ৭৫ টাকায়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু থেকে ১৮ আষাঢ় [সোম 1 Jul] পর্যন্ত পানিহাটির বাগানটি মাসিক ১২৫ টাকায় 'ভাড়া' নেওয়া হয়েছিল, সেটি 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পত্তি' ছিল না। কিন্তু বাগানটির মালিক তো দেখা যাচ্ছে জনৈকা উপেন্দ্রমোহিনী দাসী, তাকে 'ছাতুবাবুর বাগান' বা 'লালাবাবুর বাগান' বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন কেন? এমন হতে পারে বাগানটি আগে আশুতোষ দেবেরই [ছাতুবাবু] সম্পত্তি ছিল [বস্তুত পানিহাটিতে আশুতোষ দেবের একটি বাগান ছিল, সেখানেই মাঘ ১২৬২-তে তাঁর মৃত্যু হয়], পরে তা হস্তান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু এই সম্ভাবনার তুলনায় 'লালাবাবুর বাগান' উল্লেখটির পিছনে আরও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আমরা সরবরাহ করতে পারি। ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে পানিহাটির এই বাগানের যোগ যে কেবল এখনই ঘটেছে তা নয়। ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ৭ মাঘ [মঙ্গল 19 Jan 1869]-এর হিসাবেই দেখা যায় —'ব° উপেন্দ্রমোহিনী দাসী/দ° সেজবাবু মহাশয় দিগরের/পাণিহাটী বাগানে বেড়াইতে/যাওয়ায় উক্ত বাগানের পৌষ মাহার ভাড়া শোধ/বিঃ এক বিল/গুঃ লালচাঁদ মল্লিক...১২৫্' —পৌষ মাসেই হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সারদাপ্রসাদ, যদুনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রভৃতি এই বাগানে গিয়ে থাকেন, এমন-কি ঐ মাসে হিমালয় থেকে ফিরে দেবেন্দ্রনাথও বোটে করে গিয়ে সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন। মাঘ মাসে সৌদামিনী দেবী ও স্বর্ণকুমারী দেবীও এখানে বেশ কিছুদিন কাটান। এই সময়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বাগানটি ভাড়া নেওয়া হয়। ক্যাশবহি-তে দেখা যায়, তিন মাসের ভাড়াই উক্ত 'লালচাঁদ মল্লিক' মারফৎ শোধ করা হয়েছে। আবার ২৯ চৈত্র ১২৭৮ [বুধ 10 Apr 1872] 'লালাবাবুর বাটী হইতে কর্ণ বেধ উপলক্ষে/সওগাদ' এলে এক টাকা বকশিশ দেওয়া হয়। এই লালচাঁদ মল্লিক-ই সম্ভবত 'লালাবাবু' বলে এখানে ও রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে উল্লিখিত হয়েছেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'লালাবাবু' বা পাইকপাড়া রাজবংশের কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের সঙ্গে বর্তমান লালাবাবুর কোনো যোগ নেই বলেই মনে হয়।

যাই হোক, উপরোক্ত হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই বছরের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ১৮ আষাঢ় পর্যন্ত পানিহাটির বাগানবাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল। ১ জ্যৈষ্ঠ [সোম 13 May] 'বাটীর মধ্যে ডেঙ্গু জ্বর হওয়ায় নগদ বরফ খরিদ' ও 'ঠাকুরী বেহারা/ বাবু মহাশয়রা পাণিহাটী বাগানে থাকা উপলক্ষে/ঠিকা বেহারা বাটীতে কাজ করে উহার বেতন ই° ২ জ্যৈষ্ঠ না° ২০ আষাঢ় শোধ' এবং '১৭ রোজ/বাবুমশায়রা ও ঠাকুরাণীরা/পাণিহাটী বাগান হইতে আসিবার জন্য/গাড়ি পাঠান যায়'—এই সব হিসাব বিশ্লেষণ করলে সিদ্ধান্ত করা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির 'বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ' ডেঙ্গু জ্বর থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ২ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 14 May] থেকে ১৭ আষাঢ় [রবি 30 Jun] পর্যন্ত পানিহাটি বা পেনেটির বাগানবাড়িতে কাটান। হিসাবের

খাতা থেকে আমরা জানতে পারি হেমেন্দ্রনাথ, শরৎকুমারী দেবী প্রভৃতিরা এই সময়টা রিষড়ার একটি বাগানে ছিলেন; সুতরাং দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বেই পরিবারের অপর অংশটি পানিহাটিতে অবস্থান করেন, স্বচ্ছন্দে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে। অবশ্য কোনো কোনো ভগ্নীপতিও সপরিবারে সেখানে ছিলেন এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।'[৬] নদীর প্রতি যে আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ব্যাপ্ত করে আছে, এখানেই তার সূত্রপাত। চাকরদের ঘরের সামনে গুটিকতক পেয়ারাগাছ, তারই ছায়ায় ঘেরা বারান্দায় বসে গঙ্গার ধারার দিকে চেয়ে তাঁর সমস্ত দিন কাটত। 'প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালিপাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।'[৬] পাছে সেই দৃষ্টিভোগের উৎসবে একটি পদ বাদ পড়ে যায় সেই আশঙ্কায় মুখ ধুয়েই বাইরে এসে চৌকি নিয়ে বসতেন। সেখান থেকে অতৃপ্ত নয়নে দেখতেন গঙ্গার জোয়ারভাঁটা, নানারকম নৌকার আসাযাওয়া, অপরপারে কোন্নগরে 'শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন'। কোনো-কোনো দিন সকাল থেকে মেঘ করে আসে, সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হয়ে যায়, বালকের মনের আনন্দ ভিজে হাওয়ারই মতো প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যা-খুশি তাই করে বেড়ায়। তিনি লিখেছেন: 'কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল।'[৭]

বাড়ির এক অংশে বড়ো বড়ো ফলগাছের ছায়ায় ঘেরা ঘাটবাঁধানো একটি খিড়কির পুকুরও তাঁর মনকে মুগ্ধ করত। সামনের গঙ্গার উদার প্রবাহের তুলনায় তাকে ঘরের বধূর মতো লজ্জাশীলা অন্তরালপ্রিয় মনে হত। তবু অনেক মধ্যাহ্নে পুকুরের ঘাটে জামরুলতলায় একলা বসে জলের গভীরে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

জন্মাবধি কলকাতার ইঁট-কাঠের বন্ধনে বাস করে এবং কিছুটা হয়তো গল্পে-উপন্যাসে গ্রামজীবনের সহজ-সরল জীবনযাত্রার কথা পড়ে বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করে দেখবার জন্যে তাঁর মনে ঔৎসুক্য জমা হয়েছিল। বাগানের পিছনেই সেই পাড়াগাঁ—কিন্তু সেখানে যাওয়া নিষেধ। একদিন কৌতূহলের তাড়নায় দুই অভিভাবকের পিছু পিছু তাঁদের অগোচরে কিছুদূর গিয়েছিলেন। 'গ্রামের গলিতে ঘনবনের ছায়ায় শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড় আনন্দে এই ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম।'[৮] কিন্তু অভিভাবকেরা তাঁর এই আগমন টের পেতেই অগ্রগমন স্তব্ধ হয়ে গেল। ভদ্র-আচ্ছাদনের অভাব তাঁদের চক্ষে পীড়াদায়ক ঠেকেছিল: 'পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য-কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই—ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাকপরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।'[৯] রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি অবশ্য আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাঁদের জন্য মোজা ও

অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদের কী ধরনের আয়োজন ছিল তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। সুতরাং মনে হয় ব্যাপারটি ছিল অন্যরকম। সম্ভবত অভিভাবকদের পল্লীর দিকে বেড়াতে যেতে দেখেই অতি আগ্রহ-বশত ঘরে-পরার সাধারণ যে পোশাক তাঁর গায়ে ছিল তাই পরেই বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন। অভিভাবকদের আভিজাত্যবোধ সেইজন্যই পীড়িত হয়েছিল এবং এই ত্রুটির ফলে আর-কোনোদিন বাইরে যাওয়ার সাহসই রবীন্দ্রনাথের হয়নি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ কলকাতার বাইরে গিয়েও তিনি লাভ করেননি, তাই লিখেছেন: 'কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল।'[১০] কিন্তু এই খোলা আকাশের স্বাধীনতা তিনি মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করে নিয়েছেন। পিছনে বাধা ছিল বটে, কিন্তু সম্মুখের গঙ্গা সমস্ত বন্ধন হরণ করে নিয়েছিল। পালতোলা নৌকোয় তাঁর মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হয়ে এমন সব দেশে যাত্রা করত, ভূগোলে যার পরিচয় পাওয়া যায় না।

ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ কমলে তাঁরা আবার জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।'[১১] কিন্তু আমরা জানি, হাঁ-করা মুখবিবরটি বেঙ্গল অ্যাকাডেমির, নর্মাল স্কুল-পর্ব এর অনেক আগেই তিনি সমাপ্ত করে এসেছেন।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ আর-একবার পেনেটির বাগানে এসেছিলেন, তার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের অপ্রকাশিত একটি রচনায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন 22 May 1919 [৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬] তারিখে, ভ্রমণটি হয় তারই কয়েকদিন পরে। প্রশান্তচন্দ্র লিখেছেন:

> ...একটা বড়ো চেয়ারে হেলান দিয়ে মাঝে মাঝে ছেলেবেলার কথা বলেন। পেনেটির বাগানের গল্প। গঙ্গার ধারে সেই বাড়ি। পুকুর ঘাট। বল্‌লেন আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো? সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকি। আমি খোঁজ করে জানলুম, যে, সে বাগান-বাড়ি বনোয়ারি [লাল চৌধুরী] বাবুর এক সরিকদের হাতে। বনোয়ারিবাবু উৎসাহ করে ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। বাড়ির মালিকরা বলে পাঠালেন, কবির যতোদিন ইচ্ছা ওখানে গিয়ে যেন থাকেন। একদিন গিয়ে দেখে আসবেন। যদি ভালো লাগে বেশিদিন থাকবার মতো ব্যবস্থা করা হবে।
>
> ...দু একদিনের মধ্যে বিকালে কবিকে পেনেটির বাগানে নিয়ে গেলুম। কবির সঙ্গে শুধু আমি একা। বাড়ির মালিকদের বলে দেওয়া হয়েছিল, যে, কবি একা যেতে চান। মালিদের খবর দেওয়া হয়েছিল। তারা দরজা খুলে দিলে। দোতলা বাড়ি। এখন বাগান বেশি কিছু নেই। কতকগুলি পুরানো গাছ। কবি একবার চারদিক দেখলেন। গঙ্গার ধারে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন। সেখান থেকে পুকুরের দিকটা গেলেন—এখনো একটা পুরানো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে দোতলায়। এঘর ওঘর একটু দেখলেন। ...নীচে নেমে এসে আরেকবার পুকুরের দিকটা দেখলেন। তার পরে আমাকে বললেন এবার চলো। কিছু নেই। সেই পেনেটির বাগানে আর ফেরা যায় না। যোড়াসাঁকোয় ফিরে এলুম।

পানিহাটির বাগানে যাওয়ার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের 'বাহিরে যাত্রা' বিশেষ কারণে শুরু হলেও, সেখানেই শেষ হয়নি। আমরা আগেই বলেছি, ঠাকুর পরিবারের আর-একটি অংশ ডেঙ্গুজ্বরের আশঙ্কায় রিষড়ার বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ না করলেও, ক্যাশবহি আমাদের জানিয়ে দেয় এই বাগানের সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগও তিনি লাভ করেছিলেন। ৪ ভাদ্র [19 Aug]-এর হিসাবে জমা খাতে দেখা যায়: 'ছেলেবাবুদিগের রিসড়া গমন জন্য/দশ টাকা ছোট বাবু [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] লইয়া যান/তাহা ফেরত'; আর ঐদিনের খরচ খাতে 'সোমেন্দ্রবাবু ও রবীন্দ্রবাবুদিগরের/রিসড়ার বাগানে জাতাতের ব্যয়' আট টাকা দশ আনা লেখা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় শ্রাবণের শেষে কিংবা ভাদ্রের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে রিষড়ার বাগান দেখাতে নিয়ে যান। এখানে তাঁদের অবস্থান-কাল দীর্ঘ ছিল না, সেই কারণে স্মৃতিকথায় এই ভ্রমণের কথা স্থান পায়নি।

বেঙ্গল অ্যাকাডেমি-তে ভর্তি হওয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, 'ইহাতে আমাদের গৌরব কিছু বাড়িল। মনে হইল, আমরা অনেকখানি বড়ো হইয়াছি,' তা যে-কারণেই তিনি লিখুন-না কেন, বাস্তব অর্থে তা অত্যন্ত সত্য। তিনি গত বৎসর বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাংবৎসরিকে যোগদান করেছিলেন, এ বৎসরও ৩০ কার্তিক [বৃহ 14 Nov] উক্ত সমাজের ঊনবিংশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এই মাসে স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ, বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র সরোজনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর অন্নপ্রাশন হয়। এই উপলক্ষে ১৮ কার্তিক [শনি 2 Nov] 'সোম রবী সত্যপ্রসাদবাবু দিগের/ধুতি তিনখানা ও উড়ানী তিনখানা/(দালানে অন্নপ্রাসন সময় পরিয়া যান) ৬ খানার মূল্য শোধ' করা হয় অর্থাৎ এই তিন জনের মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরাই পালন করেন। ৮ পৌষ [শনি 21 Dec] 'সোম রবী সত্যপ্রসাদ বাবু দিগের/বড় দিনে খাবার জন্য উইলসন হোটেলের [বর্তমান গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল] মিঠাই' ক্রয় করা হয়। এই রীতিটি এ বৎসরই প্রবর্তিত হয়, পরবর্তী বৎসরগুলিতেও তা অব্যাহত থাকে। ২১ পৌষ [শুক্র 3 Jan 1873] 'ফেনসি ফেয়ার' দেখতে যান; এই সময়ে তাঁরা থিয়েটার দেখতেও যান—২৬ পৌষ [বুধ 8 Jan] 'ছেলেবাবুরা থিএটর দেখিতে জান.../উহার দিগের টিকিটের মূল্য/ ছোটবাবু মহাশয়ের আদেশমতে নবিনবাবুকে [নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী—সেরেস্তার একজন কর্মচারী] দেওয়া যায়'। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আর কোনো অভিযোগ করার সুযোগই রাখা হয়নি—আষাঢ় মাসের '১৪ রোজের [বৃহ 27 Jun] খরচ/দ° সোমেন্দ্র রবীন্দ্র ও সত্যপ্রসাদবাবু দিগের/চাপকান তৈয়ারি ১৪টা হিঃ ৪২টা তৈয়ারির ব্যয়...৫৩ °', ২৮ অগ্র [বৃহ 12 Dec] 'রবীন্দ্রবাবুর তুলো ভরা বনাতের চাপকান একটী/ তৈয়ারির ব্যয়...১৩।লড'; ৩ পৌষ 'সোম রবী বাবু দিগের চাপকান পেনটুলেন/চোগা তৈয়ারীর জন্য বনাত ক্রয়' ও এই কারণেই 'চামরূ দরজি'কে ৬ পৌষ ও ২ মাঘ 'কার কেলিকো ঘুন্টি প্রভৃতি সরঞ্জম ক্রয়' ও মজুরি হিসেবে ব্যয় শোধ করা হয়; বিনামা বা জুতো কেনার কথা তোলাই বাহুল্য, এত জুতো যে কোন্ কাজে লাগত তা ভেবেই পাওয়া যায় না।

পানিহাটির 'বাহিরে যাত্রা' পর্ব শেষ করে এলে বেঙ্গল অ্যাকাডেমির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আসল পরিচয়। তার আগে মার্চ থেকে মে এই তিন মাস মাত্র তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, আবার জুলাই মাস থেকে বিদ্যালয় পর্ব শুরু হয় [আশ্চর্য লাগে, ফিরে আসবার পর 'এপ্রিল মে দুই মাসের ফি শোধ' করা হয়েছে, কিন্তু জুন মাসের বেতন—পরে হিমালয়-প্রবাসের তিন মাসের বেতনও—দেওয়া হয়নি। স্কুলেও কি তখন ঠিকা প্রথা চালু ছিল, ছাত্রেরা স্কুলে গেলে বেতন দেওয়া হবে—নতুবা নয়?]। স্কুলে তাঁকে ল্যাটিন পড়তে হত, একথা আমরা তাঁর লেখা থেকেই জেনেছি; কিন্তু আর কী ছিল পাঠ্যতালিকায় সে-কথা রবীন্দ্রনাথও বলেননি, আমরাও জানতে পারিনি। অবশ্য যা-ই পড়ানো হোক-না কেন, বালকেরা যে তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন। নীলকমল ঘোষালের কাছে বাংলা শিক্ষার অবসান হওয়ার পর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-ই তখন তাঁদের একমাত্র গৃহশিক্ষক—সুতরাং না-পড়ার স্বাধীনতা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষার আয়োজন অবশ্য পুরো মাত্রাতেই ছিল—'সোম ও রবীবাবুদিগের ইস্কুলে পুস্তক লইয়া যাইবার জন্য টীনের বাক্স' ক্রয় করা হয়েছে, 'সোম রবী সত্যপ্রসাদ

বাবুদিগর ইস্কুলে একটি গরিবকে’ তিন টাকা দান করেন, এমন-কি বিদ্যালয়ের নভেম্বর মাসের বেতনের সঙ্গে ‘গান শিখিবার দরুণ বেশী ২ হিঃ ৩’ টাকাও খরচ করা হয়—কিন্তু আসল কাজ খুব একটা এগোয়নি। কারণ, যদিও এই স্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু ‘ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারওয়ালার মতো—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ...সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত’[১২]। তাই নর্মাল স্কুলের তুলনায় এখানে স্বাধীনতার মাত্রা অনেক বেশি হলেও স্কুল-পালানোর অদম্য আকাঙক্ষা তাঁকে প্রায়ই চঞ্চল করে তুলত। এ-ব্যাপারে সাহায্য করার লোকের অভাবও ছিল না। তাঁর দাদারা একজনের কাছে ফারসি শিখতেন—সবাই তাঁকে মুনশি বলে ডাকত।* অস্থিচর্মসার এই মানুষটির ধারণা ছিল লাঠিখেলায় ও সংগীতবিদ্যায় তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা। উঠানে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাঠি খেলতেন—নিজের ছায়াই ছিল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। আর তাঁর ‘নাকী বেসুরের গান প্রেতলোকের রাগিণীর মতো’ শোনাত, যা শুনে গায়ক বিষ্ণু তাঁর রুজি বন্ধ হবার আশঙ্কা প্রকাশ করতেন। এই মুনশিই ছুটির প্রয়োজন জানিয়ে স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে ইংরেজিতে চিঠি লিখে দিতেন, অধ্যক্ষও তার সত্যতা নিয়ে কোনো বিচারবিতর্ক করতেন না।

এই স্কুলের দুটি সহপাঠীর কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে লিখে গেছেন। জাত বাঁচাবার জন্য বাঙালি ছাত্রদের জন্য যে স্বতন্ত্র জলখাবারের ঘর ছিল, সেখানে তাঁদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো দুই-একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ‘তাহাদের মধ্যে একজন কাফি রাগিণীটা খুব ভালোবাসিত এবং তাহার চেয়ে ভালোবাসিত শ্বশুরবাড়ির কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তিকে—সেই জন্য সে ওই রাগিণীটা প্রায়ই আলাপ করিত এবং তাহার অন্য আলাপটারও বিরাম ছিল না।’[১৩]

অপর ছাত্রটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর নাম হরিশ্চন্দ্র হালদার (হ. চ. হ,)—এঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল ও বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। ছাত্রটি ম্যাজিক সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করে নিজেকে প্রোফেসর উপাধি দিয়ে প্রচার করেছিলেন। এই কারণেই বালক রবীন্দ্রনাথের তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। এই বন্ধুটিকে তাঁরা রোজই গাড়িতে করে স্কুলে নিয়ে যেতেন ও সেই উপলক্ষে সর্বদাই ঠাকুরবাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা শুরু হয়েছিল। নাটক-অভিনয়েও তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তাঁর সাহায্যে কুস্তির আখড়ায় বাখারি পুঁতে তাতে কাগজ মেরে নানা রঙের ছবি এঁকে স্টেজ বানিয়ে অভিনয়ের আয়োজনও হয়েছিল। অবশ্য গুরুজনদের হস্তক্ষেপে সে অভিনয় হতে পারেনি।*

এই সময়ে বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-শিক্ষাও অব্যাহত আছে। বাঁধা-ধরা শিক্ষার ব্যাপারে অসহিষ্ণু হলেও সুকণ্ঠের অধিকারী এই বালক তাঁর সংগীতে এমনকি পিতা দেবেন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিলেন এবং সেজন্য তিনি সংগীতগুরু বিষ্ণুকে পুরস্কৃতও করেন। এই তথ্যটি আমরা পাই ক্যাশবহি-র ১৮ আশ্বিন [বৃহ 3 Oct] তারিখের একটি হিসাব থেকে—‘ব° বিষ্ণুচরণ [চন্দ্র] চক্রবর্তী/দ° কর্ত্তামহাশয় রবীবাবুর গান শ্রবণে/উক্ত গাহককে পারিতোষিক দেন বিঃ ১ বৌ°/গুঃ—৫’।

এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের উপনয়ন। আমরা আগেই দেখেছি, দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের পৌত্তলিক অংশের তীব্র বিরোধী হলেও তার মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তনে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক পৈতা ও উপনয়ন-সংস্কার নিয়ে তাঁর মন বরাবরই

দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ৮ মাঘ ১৭৭৫ শক [১২৬০: Jan 1854] রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে তিনি লেখেন, 'আমার মতে ব্রাহ্মদিগের উপনয়ন স্বধর্ম্মসম্মত নহে। অতএব অবশ্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।'[১৪] 1861-এ কেশবচন্দ্র-প্রণীত 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' গ্রন্থ পাঠ করে তিনি উপবীত পরিত্যাগ করেন। তিনি ব্রাহ্মদের জন্য যে 'অনুষ্ঠান-পদ্ধতি' প্রণয়ন করেন [১৭৮৬ শক: 1865], তাতে 'উপনয়ন' বলে একটি ক্রিয়া থাকলেও, 'তাহা কেবল কোনো উপদেষ্টার কাছে কোনো বালককে আনিয়া তাঁহার উপর তাহার ধর্মশিক্ষার ভার দেওয়া'।[১৫] কিন্তু বর্তমানে তিনি বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্রাহ্মণসন্তানের উপযোগী অপৌত্তলিক উপনয়ন-পদ্ধতি রচনায় উদ্যোগী হলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী এর পিছনে রাজনারায়ণ বসু-প্রদত্ত বক্তৃতা 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'-র [৩১ ভাদ্র রবি 15 Sep 1872 তারিখে জাতীয় সভায় দেওয়া এই ভাষণে দেবেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেছিলেন] কিছু প্রভাব থাকতে পারে এমন ইঙ্গিত করেছেন।[১৫] আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহায়তায় বৈদিক মন্ত্র নির্বাচন করে উপনয়ন-পদ্ধতি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং রচনা করলেন।[†] বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যহ বালকেরা উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারবার আবৃত্তি করে আয়ত্ত করতে লাগলেন। এইভাবেই উপনয়নের আয়োজন চলতে লাগল।

এরই মধ্যে ১১ মাঘ [বৃহ 23 Jan 1873] আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এবার প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন উভয় অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথ সংগীত-কার্যে যোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের বিবরণে দেখি:

> অর্চ্চনান্তে আচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলে পর বালক বালিকারা সঙ্গীত মঞ্চে উপবেশন করিয়া মনোহর তানলয় সমন্বিত সুমধুর স্বরে এই নূতন ব্রহ্মসঙ্গীতটি গান করিলেন।
>
> রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি। /জগৎ পিতা তুমি বিশ্ববিধাতা। [বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়-রচিত][১৬]

এই অনুষ্ঠানে শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

সায়ংকালীন অধিবেশনের বিবরণে দেখা যায়:

> সায়ংকাল উপস্থিত হইলে নারিকেল ও দেবদারু পত্রে ও কদলী বৃক্ষে সুসজ্জিত, স্তম্ভাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ভবনময় দীপালোকে আলোকিত হইল এবং পুষ্পমালায় সুসজ্জিত উপাসনার স্থল সাধকগণের মন হরণ করিতে লাগিল। এত লোকের সমাগম হইল যে উর্দ্ধাধঃ কোন স্থানে আর প্রবেশ করিবার পথ থাকিল না। রাত্রি সাত ঘটিকার সময় প্রথমত ঘণ্টা পরে শংখ বাদ্য হইল। তৎপরে সঙ্গীত মঞ্চ হইতে হৃদয় প্রফুল্লকর সমবেত বাদ্য বাজিবা মাত্র জনতা পূর্ণ প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ হইল এবং সুধাবর্ষী বালক বালিকারা মধুর স্বরে যে দুইটী সঙ্গীত গান করিলেন,—
>
> রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি। শঙ্কর শিব সঙ্কট হারি। [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]
>
> রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল। জয় জগজীবন জগত পাতা হে। [বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়][১৭]

এই অনুষ্ঠানে রাজনারায়ণ বসু বক্তৃতা করেন।

মাঘোৎসবের পক্ষকাল পরে ২৫ মাঘ বৃহস্পতিবার 6 Feb 1873 তারিখে সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের উপনয়ন-সংস্কার হয়।[*১]আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ আচার্যের কার্য করেন। যজ্ঞোপবীত ধারণ ও গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিল্বদণ্ড ধারণ করে যথাক্রমে মাতা, মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণ, পিতা ও অন্যদের নিকট ভিক্ষা করে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আচার্যকে দান করেন। 'পরে ব্রহ্মচারী সন্ধ্যা পর্যন্ত বাগ্‌যত হইয়া অবস্থান করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করিয়া পরে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলেন।'

এর পরে নির্জনবাসের তিন দিন অবশ্য গুরুগৃহে উপনীত ঋষিবালকদের মতো কঠোর সংযমে কাটেনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

'মাথা মুড়াইয়া, বীরবৌলি *[২]পরিয়া, আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারী মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়াছিল—বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নিচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ্ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম—তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়া অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত।'[১৮]

ছেলেবেলা-য় এই কদিনের সম্পর্কে আর একটু খবর পাওয়া যায়: 'মনে পড়ে পইতের সময় বৌঠাকরুণ [কাদম্বরী দেবী] আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিনদিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।'*[৩]

২৮ মাঘ রবি 9 Feb 1873*[৪]সমাবর্তন অনুষ্ঠান হল। 'উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন করিয়া তৃতীয় দিবসে...আচার্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সমাবর্তিত করিলেন।' পরে বেদী থেকে প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথ উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশে তিনি গায়ত্রীমন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ও বলেন, 'গায়ত্রী দ্বারা চিরজীবন প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখ প্রক্ষালন করিয়া শুচি হইয়া ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁহার জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে—তবে কালে তোমারদের আত্মা প্রস্ফুটিত হইয়া তাহা হইতে যে সুগন্ধ প্রবাহিত হইবে, তাহা দেবতাদিগেরও স্পৃহনীয় হইবে।'[১৯] রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনায় গায়ত্রীর এই ব্যাখ্যা ও পিতার উপদেশ ধ্রুবতারা-স্বরূপ ছিল।

উপদেশের পর ব্রহ্মচারীগণ আচার্যকে অভিবাদন করেন। এই অভিবাদনের মধ্যে এমন কতকগুলি মন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীজীবনের ধর্মোপদেশসমূহে ও নানা রচনায় বহুল ব্যবহৃত হয়েছে;

(১) ওঁ পিতা নোহসি। পিতা নো বোধি। নমস্তেহস্তু। মা মা হিংসীঃ। [শুক্ল যজুর্বেদ]

(২) ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতুর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। [ঋগ্‌বেদ]

(৩) ওঁ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। [শুক্ল যজুর্বেদ]

(৪) ওঁ য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণানেকান্ নিহিতার্থ দধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।* [শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

উপনয়ন-পর্ব শেষ হলে 'নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম।'[২০] এই সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন: 'আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। ...আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।'[২১]

কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যাই ঘটুক-না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিল পৈতে উপলক্ষে মুড়োনো ন্যাড়া মাথা নিয়ে বেঙ্গল অ্যাকাডেমির ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সম্মুখীন হওয়া যাবে কি করে। এমন সময়ে তেতলায়

পিতার ঘরে ডাক পড়ল। তিনি জানতে চাইলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে হিমালয় যেতে চান কিনা। বালকের মনের ভাব সহজেই অনুমেয়—'"চাই" এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত।'[২২]

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, দেবেন্দ্রনাথ-ই বা কেন এই বালককে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। গঙ্গাবক্ষে নৌকা-ভ্রমণের সময় তিনি কখনো কখনো পুত্রদের বা বন্ধুস্থানীয়দের তাঁর সহচর করে নিয়েছেন, কিন্তু হিমালয়-ভ্রমণে তাঁর নির্জন বাসের সময় অনুচর কিশোরী চাটুজ্জে ও গুটিকয়েক ভৃত্য ছাড়া আর কাউকেই ইতিপূর্বে তিনি সঙ্গী করেননি। ন্যাড়া মাথায় বিদ্যালয়ে যাওয়ার সমস্যা বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে যতই গুরুতর হোক-না কেন, প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এই পথে সেই সমস্যা সমাধান করতে চাননি, যখন অনুরূপ সমস্যা সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের ক্ষেত্রেও দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। আসলে তিনি তাঁর এই বিদ্যালয়-বিমুখ আত্মমগ্ন ভাবুক কনিষ্ঠ পুত্রটির মধ্যে এমন কোনো বিশিষ্ট লক্ষণ দেখেছিলেন, যা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল—সাংগীতিক প্রতিভার সমাদর কিভাবে করেছিলেন সেকথা তো আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সংসারের বাইরে-বাইরে কাটালেও পারিবারিক খুঁটিনাটি ব্যাপার তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারত না। হয়তো বালকের গায়ত্রী-জপের আগ্রহও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সেইজন্যই নিজের ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে রেখে পুত্রের ব্যক্তিত্বের যথাযথ উন্মেষ ঘটানোর আকাঙক্ষাই তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণ হতে পারে। লক্ষণীয়, তিনি পুত্রের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে যেতে চান কিনা, কেবল যাওয়ার নির্দেশ ঘোষণা করেননি।

যাই হোক, এই ঘটনাটি ঘটেছিল ২৯ মাঘ [সোম 10 Feb] থেকে ২ ফাল্গুন [বুধ 12 Feb]—এই তিন দিনের মধ্যে। কারণ ২৮ মাঘ সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় ও ৩ ফাল্গুনেই রবীন্দ্রনাথের জন্য যাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ঐ-দিনের হিসাবে কয়েকবারই রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ দেখা যায়: 'রবীন্দ্রবাবুর জন্য পুস্তক ক্রয়/গুঃ বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়/২৫ ৶৬, গুঃ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়/পিটর পার্লি পুস্তক ২ খানা ক্রয়/৩ ॥০' এবং 'রবীন্দ্রবাবুর জন্য/পোর্ট মেন্ট একটা ক্রয়...১৪্'; আবার ৪ ফাল্গুনের হিসাবে দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'রবীবাবুর জন্য পুস্তক ক্রয় নিমিত্তে' ৪০ টাকা নিয়ে গিয়ে ১৯ ॥০ খরচ করে বাকি টাকা ফেরত দিয়েছেন। এই দিন তাঁর জন্য সাড়ে আট টাকা দিয়ে এক ডজন গরম মোজাও কেনা হয়েছে। বই তাঁর জন্য আরও কেনা হয়েছে: ৯ ফাল্গুন 'রবীবাবুর পুস্তক ইত্যাদি ক্রয় ২৫্', ১০ ফাল্গুন 'রবিন্দ্রবাবুর জন্য ছোট বাবু মহাশয় যে সমস্ত পুস্তক ক্রয় করিয়া আনা [আনেন তাহার] মূল্য সোধ...৩৬ ॥০' [হিসাবগুলি পরে লিখিত হলেও সম্ভবত বোলপুর-যাত্রার পূর্বেই ব্যয়িত হয়েছে]। পরেও হয়তো তাঁরই জন্য *Johnson's Pocket Dictionary* [১৫ চৈত্র], 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত' ও Lethbridge-এর লেখা *History of India* [২১ বৈশাখ ১২৮০] কিনে যথাক্রমে অমৃতসর ও বক্রোটায় প্রেরিত হয়েছে। এই সব হিসাব থেকে মনে হয় বিদ্যালয়বিমুখ পুত্রকে নিজস্ব পদ্ধতিতে পড়িয়ে পাঠানুরাগী করে তোলার সংকল্প দেবেন্দ্রনাথের মনে ছিল।

৪ ফাল্গুন [শুক্র 14 Feb] দুপুরের দিকে* তাঁরা কলকাতা ত্যাগ করেন। যাত্রার পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ যথারীতি বাড়ির সকলকে নিয়ে দালানে উপাসনা করেন। উপাসনার পর রবীন্দ্রনাথ গুরুজনদের প্রণাম করে পিতার সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন। [রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন।'[২৩] এই কথা যথার্থ ধরে নিলে

একটি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জন্য কোনো 'পোশাক' তৈরির হিসাব দেখা যায় না—'এক ডজন গরম মোজা' ও 'সালের গলাবন্দ একটা' কেনা ছাড়া। 'বনাতের মোগলাই চাপকান পেনটুলেন ও জোব্বা' তৈরির জন্য ৫৯ টাকা সওয়া দু'আনা সত্যই খরচ করা হয়েছে, কিন্তু ৩ পৌষ এই ব্যয়ের শুরু ও ২ মাঘ তার সমাপ্তি, অর্থাৎ হিমালয়-যাত্রার প্রায় দু'মাস আগে এই 'পোশাক' তৈরি করা আরম্ভ হয়েছে এবং তা করা হয়েছে সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনের জন্য। এরই কাপড় ও রঙ যদি দেবেন্দ্রনাথ পছন্দ করে থাকেন, তাহলে বলতে হয় পুত্র-সহ হিমালয়-যাত্রার পরিকল্পনা তিনি বহু পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন এবং দুটি পুত্রকেই তিনি সঙ্গী করতে চেয়েছিলেন।] মাথায় পরার জন্য একটি 'জরির-কাজ-করা গোল মখমলের টুপি' কেনা হয়েছিল। ন্যাড়া মাথায় টুপি পরা নিয়ে বালকের মনে মনে আপত্তি ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কাছে পরিচ্ছন্নতা ও ভব্যতার ব্যত্যয় হবার উপায় ছিল না, তাঁর নির্দেশে মাথায় টুপি পরতেই হল। মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে টুপি খুললেই পিতার সতর্ক দৃষ্টির শাসনে সেটিকে আবার যথাস্থানে তুলতে হত। 'তরুশ্রেণীর সবুজ নীল পাড়-দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি'কে ঝরনার বেগে ছুটিয়ে সন্ধ্যার সময় গাড়ি বোলপুর পৌঁছল। পালকিতে চড়ে বালক চোখ বন্ধ করে রইলেন। তাঁর ইচ্ছা সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় একসঙ্গে তাঁর জাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাক—সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে যদি তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, তবে পরদিনের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হবে। ৪ ফাল্গুন ১২৭৯ তারিখটি স্মরণযোগ্য—রবীন্দ্রজীবনের শেষ চল্লিশ বছর যে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, সেখানে এইদিনে তাঁর প্রথম পদার্পণ।

মাঠে ধান কি রকম দেখতে হয়, শহরের ছেলে রবীন্দ্রনাথের সে-সম্পর্কে কোনোরকম অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্য তা দেখার জন্য তাঁর কৌতূহল ছিল। ভোরে উঠে বাইরে এসে দেখলেন চারদিকেই মাঠ, কোথাও ধানের চিহ্ন নেই। কিন্তু 'যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না—যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। ...প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধসঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।'[২৪] সেকালের বোলপুর-শান্তিনিকেতনকে তিনি কোন্ রূপে দেখেছিলেন তার চিত্র এঁকেছেন অনেক পরে লেখা একটি প্রবন্ধে: 'বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠেনি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর তার দুর্গন্ধ সমল করে নি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোকচলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠেসা করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারায় আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ।'[২৫] রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দুপুরবেলা এই খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করে এনে পিতাকে দেখাতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে নিরুৎসাহিত না করে একটি পুকুর খোঁড়বার ব্যর্থ চেষ্টার[২৬] ফলে যে মাটির ঢিবি তৈরি হয়েছিল, এই পাথর দিয়ে সেটিকে সাজিয়ে দিতে বলেন। তিনি রোজ প্রভাতে পূর্বাস্য হয়ে এখানেই চৌকি নিয়ে উপাসনায় বসতেন।

খোয়াইয়ের এক জায়গায় মাটি চুঁইয়ে একটি গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হত। তার মধ্যে খুব ছোটো ছোটো মাছ ঘুরে বেড়াত। জামাকাপড় খুলে তার মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান করা বালকের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক

ছিল। তিনি পিতাকে গিয়ে বললেন, এইখান থেকে স্নান ও পানের জল আনলে ভালো হয়। ক্ষুদ্র আবিষ্কর্তাকে পুরস্কৃত করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সেখান থেকেই জল আনার বন্দোবস্ত করলেন।

দায়িত্বজ্ঞান-সৃষ্টির জন্য পুত্রকে তিনি তাঁর দামি সোনার ঘড়িটিতে দম দেবার ভার দিয়েছিলেন এবং দু-চার আনা পয়সা দিয়ে হিসাব মেলানোর শর্তে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষুক দেখলে তাকে পয়সা দিতে বলতেন। দায়িত্বজ্ঞানের বাহুল্য-হেতু ঘড়িটি শীঘ্রই সারাবার জন্য কলকাতায় পাঠাতে হল এবং পয়সার জমাখরচ কিছুতেই মিলত না!

অবশ্য অন্য গুরুতর দায়িত্বও তিনি পুত্রকে দিয়েছিলেন। একখানি ভগবদ্‌গীতায় তাঁর পছন্দসই কতকগুলি শ্লোক চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ-সমেত কপি করার ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। এইভাবেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবহেলিত যে বালকটি একধরনের হীনমন্যতায় ভুগতেন, দেবেন্দ্রনাথ এইসব দায়িত্ব দিয়ে সেই ভাব কাটিয়ে উঠতে পুত্রকে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন।

সকালবেলা কিছুক্ষণ পিতার কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়ার পর সারাদিন অবাধ ছুটি। এখানেও জোড়াসাঁকো বাড়ির সঙ্গে অনেক পার্থক্য। সেখানে সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল থেকে নিস্তার পাবার কোনো উপায় ছিল না, ফলে নিষ্পেষিত বালকের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। এই বৎসরের শুরুতেই পেনেটির বাগানে তিনি এক ধরনের মুক্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু পায়ের শিকল কাটেনি। বোলপুরে এসে সেই মুক্তি সম্পূর্ণ হল। তিনি লিখেছেন:

'শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলাম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।'[২৭]

এই পরিবেশে তাঁর কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটল। "ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি* সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জত রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এইজন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেলগাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম।"[২৮] ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একটি পত্রে তিনি এ-সম্বন্ধে লিখেছেন: 'সেটা লিখতে দিন সাতেক লেগেছিল।...তার একটা লাইন্‌ও মনে নেই। কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন।'[২৯] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, 'এই কাহিনীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বোধ হয় রুদ্রচণ্ড নামক নাটকের মধ্যে শোনা যায়'।[৩০]

আমরা প্রসঙ্গটিকে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে চাই। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ পেলেন কোথা থেকে? কিছুদিন আগে James Todd-এর *Annals and Antiquities of Rajasthan* [1829-32] গ্রন্থটির নূতন সংস্করণ ফর্মায় ফর্মায় প্রকাশিত হতে শুরু করে ও কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত। মিবার' নামে গ্রন্থটি বিভিন্ন খণ্ডে অনুবাদ করতে থাকেন। আলোচ্য সময়ের আগেই গ্রন্থটির ১ম খণ্ড [26 Aug

1872], ২য় খণ্ড [30 Sep 1872] ও তৃতীয় খণ্ড [5 Feb 1873] প্রকাশিত হয়। মনে করা যেতে পারে, অন্তত প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের পড়া হয়ে গিয়েছিল। এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় [পৃ ৫৬-৭৮] থেকে তিনি এই কাব্যের কাহিনী সংগ্রহ করে থাকবেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় এবং হিন্দু মেলার হিন্দু জাতীয়তাবোধের আদর্শে পরিবর্ধিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের বীরত্ব উজ্জ্বলভাবে দেখা দেবে এবং তাঁর পরাজয়ে বেদনা অনুভব করবেন এটাই স্বাভাবিক। এ-প্রসঙ্গে আরো স্মরণীয়, তাঁর দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ'-এর [15 Dec 1876: ১ পৌষ ১২৮৩] কেন্দ্রীয় ঘটনাও মহম্মদ ঘোরীর হাতে পৃথ্বীরাজের পরাভব কাহিনী। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে লেখা হয়েছে, '১৮ বৎসর বয়সে ইঁহার প্রথম উপন্যাস দীপনির্ব্বাণ রচিত হইয়া দুই বৎসর পরে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়'[৩১] অর্থাৎ 1874-এর মধ্যে রচনাকার্য সমাপ্ত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। সুতরাং Mar 1873-এ লিখিত বালক রবীন্দ্রনাথের বীররসাত্মক কাব্য 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়' অগ্রজার উপন্যাস-রচনার অনুপ্রেরণা-রূপেও অন্তত কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল, এমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। আর রুদ্রচণ্ড যদি 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়' কাব্যের নাট্যরূপান্তর হয়, তাহলে সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ রুদ্রচণ্ড-এর চাঁদকবি দীপনির্বাণ-এর কবিচন্দ্র-রূপে উপন্যাসে গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কাব্যটির মূল্য পরিণত-বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের কাছেও কিছু কম ছিল না, তার পরিচয় পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পূর্বোক্ত পত্রে: 'সেই Letts' Diaryটা যদি খুঁজে পাই তা হলে আবার একবার ভোরের বেলায় সেই নারকেল-তলায় বসে সেই 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'টা পড়ে দেখতে ইচ্ছে করে।'[৩২] এই লেট্‌স ডায়ারি রবীন্দ্ররচনার দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি। হিমালয়-ভ্রমণকালে এবং তার পরেও কিছুদিন এইটিই তাঁর কাব্যরচনার বাহন ছিল। আমাদের ধারণা, 'মালতীপুঁথি' নামে বিখ্যাত পাণ্ডুলিপিটিতে রচনা আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত [হয়তো বা পরেও] এই বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি-তে তাঁর রচনা-কার্য সম্পন্ন হয়েছে—হয়তো 'অভিলাষ', 'হিন্দুমেলায় উপহার' প্রভৃতি কবিতার প্রাথমিক রূপটি এই পাণ্ডুলিপিতেই লিখিত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনের একজন অধিবাসী বালক রবীন্দ্রনাথের ভীতিমিশ্রিত কৌতূহলের বিষয় ছিল, সে হল বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার। এককালে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে দুটি ছাতিমগাছ ছাড়া এখানে আর কোনো গাছ ছিল না। আর ওই গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। অনেক ক্লান্ত পথিক এখানে বিশ্রাম নিতে এসে হয় ধন, নয় প্রাণ, নয় দুই-ই হারিয়েছে। 'এই সর্দার সেই ডাকাতি-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত।'[৩৩] অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যখন তাকে দেখেছেন, 'তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুল্য মাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের।'[৩৩] এই বৃদ্ধ দ্বারী সর্দারের ছেলে হরিশ তখন বাগানের মালি। এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদিন চীপ সাহেবের কুঠি দেখতে যান। সেখানে হরিশের শিকার করা খরগোসের রক্তাক্ত নির্জীব দেহ বালকের মনকে গভীরভাবে পীড়িত করেছিল।

বোলপুরে কিছুদিন থাকার পর সেখান থেকে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, আলিগড় [এই নামটি মুদ্রিত গ্রন্থে নেই, কিন্তু জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে আছে] প্রভৃতি জায়গায় মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে তাঁরা পৌঁছলেন অমৃতসরে। পথের একটি ঘটনা তাঁর কাছে স্মরণীয় হয়ে থেকেছে। একটি বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামতে একজন টিকিট পরীক্ষক এসে টিকিট পরীক্ষা করে বালককে ভালো করে দেখে একটু পরে আর

একজনকে ডেকে নিয়ে এল। তারা দরজার কাছে কিছুক্ষণ উসখুস করে এবার ডেকে নিয়ে এল বোধহয় স্বয়ং স্টেশন মাস্টারকে। তিনি বালকের হাফ টিকিট পরীক্ষা করে দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন বালকটির বয়স কি বারো বছরের বেশি নয়। দেবেন্দ্রনাথ নেতিবাচক উত্তর করলেন। বস্তুত তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো পূর্ণ হতে অন্তত দু'মাস বাকি ছিল। কিন্তু স্টেশনমাস্টার তাঁর জন্যে পুরো ভাড়া দাবি করলেন। 'আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে-টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।'[৩৪] টাকা বাঁচাবার জন্য তিনি মিথ্যা কথা বলছেন এমন সন্দেহের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পেরে স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে চলে গেলেন। পিতার সত্যপ্রিয়তা ও অন্তরের তেজ পুত্রকে মুগ্ধ করেছিল বলেই ঘটনাটি তাঁর স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে ছিল।

সম্ভবত ফাল্গুনের শেষে কিংবা চৈত্রের শুরুতে [Mar 1873] তাঁরা অমৃতসরে পৌঁছন। জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'সেখানে সহরের বাহিরে একটা বড় বাগানের মধ্যে আমাদের থাকিবার বাংলা স্থির হইয়াছিল। ...পড়ার অবকাশ পাইবামাত্র আমি প্রকাণ্ড সেই বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ইঁদারার ধারে একটি তুঁত গাছ ছিল তাহা হইতে তুঁতফল পাড়িয়া খাইতাম। আমাদের বাগানের গায়েই প্রতিবেশীর একটি গোলাপ ক্ষেত ছিল। সমস্ত দিন ইঁদারা হইতে চর্ম্মপাত্রে বলদের দ্বারা জল তোলাইয়া এই ক্ষেতের নালায় নালায় প্রবাহিত করা হইত। বাগানময় কলশব্দে সেই জলধারার সঞ্চার দেখা আমার একটি প্রধান আমোদ ছিল। দীর্ঘ মধ্যাহ্নে জল তুলিবার সেই আর্ত্তশব্দ ও জল-তোলা লোকটির মাঝে মাঝে সমুচ্চ করুণ সুরে গান এখনো স্বপ্নস্মৃতির মত আমার কানে লাগিয়া আছে।'

আমরা আগেই দেখেছি, বোলপুর যাত্রার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের জন্য অনেক বই কেনা হয়েছিল। বোলপুরে থাকার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ সকালে পুত্রকে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়াতেন। সেই শিক্ষাপর্ব অমৃতসরেও অব্যাহত থেকেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parley's Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন।* তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন।'[৩৫] লক্ষণীয়, পাদটীকায় যে-বইগুলির নাম দেওয়া হয়েছে, তার কোনোটিতেই ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনী নেই। কিন্তু গ্রন্থগুলির পিছনে এই পর্যায়ের পুস্তকের যে তালিকা দেওয়া আছে তাতে *Peter Parley's Tales about Lives of Washington and Franklin* নামে একটি বই আছে। আমাদের ধারণা, এই বইটিই দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে পড়িয়েছিলেন। আমরা পূর্বেই জানিয়েছি, ৩ ফাল্গুন [13 Feb] সাড়ে তিন টাকা দিয়ে 'পিটর পার্লি পুস্তক ২ খানা ক্রয়' করা হয়েছিল। একখানি বইয়ের নাম আমরা এখানে জানতে পারলাম, কিন্তু অপর বইটির সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল মেটানোর মতো কোনো ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দেননি। উপরে যে পুস্তক-তালিকার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে *Peter Parley'sTales about the Sun, Moon, Stars, and Comets* নামের একটি বই আছে। গ্রহতারকা বিষয়ে শিক্ষা দেবার সময় [বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব] দেবেন্দ্রনাথ এই বইটি ব্যবহার করেননি তো? যাই হোক, ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করার কারণ হয়তো এই ছিল যে, দেবেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন জীবনী অনেকটা গল্পের মতো আকর্ষণীয় লাগবে এবং তাতে পুত্রের উপকারও হবে। কিন্তু পড়াতে গিয়ে তাঁর

ভুল ভাঙল। ফ্র্যাঙ্কলিনের 'হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা' তাঁর চিত্তকে পীড়িত করত এবং পড়াতে পড়াতে কোনো কোনো জায়গায় প্রতিবাদ না করে থাকতে পারতেন না।

'নানা বিদ্যার আয়োজন' পর্বে রবীন্দ্রনাথকে হেরম্ব তত্ত্বরত্নের অধীনে মুগ্ধবোধের সূত্র আয়ত্ত করানোর চেষ্টা হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে বিদ্যাসাগর-প্রণীত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' [Nov 1851] থেকে শব্দরূপ মুখস্থ করতে দিলেন ও একেবারেই 'ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ' [Mar 1852] পড়াতে আরম্ভ করলেন। রবীন্দ্রনাথকে বাংলা এমন করে পড়তে হয়েছিল যে তাতেই সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ শুরু থেকেই পুত্রকে যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনা-কার্যে উৎসাহিত করতেন। 'আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলটপালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।'[৩৬]

দেবেন্দ্রনাথ নিজের পড়ার জন্যে যে বইগুলি সঙ্গে নিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল দশ-বারো খণ্ডে বাঁধানো Edward Gibbon-এর. [1737-94] *History of the Decline and Fall of the Roman Empire* [1776-88]। এছাড়াও ১৫ চৈত্র [বৃহ 27 Mar] তারিখের হিসাবে দেখি—'কর্ত্তামহাশয়ের নিকট অমৃতসরে নিম্নলিখিত পুস্তক...পাঠাইবার ব্যয়—হোয়ে হোয়েনস [?], ফিলজাফি ও হিস্টীরি ৫ ও জনসন্স পকেট ডিক্সনারী'। উপায়বিহীন বালক রবীন্দ্রনাথকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কিছু পড়তে হত, কিন্তু পিতা স্বেচ্ছায় কেন এই নীরস গ্রন্থপাঠের দুঃখ বরণ করে নিতেন সেটা তাঁর বোধগম্য হত না।

অনেকদিন সকালবেলা রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে পদব্রজে সরোবরের মাঝখানে অবস্থিত অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে যেতেন। সেখানে সর্বদাই ধর্ম-সংগীত গাওয়া ও গ্রন্থসাহেব পাঠ ইত্যাদি চলে। দেবেন্দ্রনাথ সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসে হঠাৎ একসময় সুর করে তাঁদের ভজনায় যোগ দিতেন—বিদেশীর মুখে তাঁদের এই বন্দনাগান শুনে তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাঁকে সমাদর জানাতেন।

একবার তিনি গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাড়িতে এনে তার মুখে ভজনাগান শুনে তার পক্ষে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দান করেছিলেন। ফলে বাড়িতে গায়কদের পথরোধের জন্য বিশেষ বন্দোবস্তের দরকার হল। সকালবেলা দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। গায়কের দল পথেই আক্রমণ শুরু করল। কিন্তু 'যে-পাখির কাছে শিকারি অপরিচিত নহে সে যেমন কাহারও ঘাড়ের উপর বন্দুকের চোঙ দেখিলেই চমকিয়া উঠে, রাস্তার সুদূর কোনো-একটা কোণে তানপুরা-যন্ত্রের ডগাটা দেখিলেই আমাদের সেই দশা হইত।'[৩৭]

সন্ধ্যায় দেবেন্দ্রনাথ বাগানের সম্মুখে বারান্দায় এসে বসতেন, তখন তাঁকে ব্রহ্মসংগীত শোনাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়ত। 'চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

> তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
> কে সহায় ভব-অন্ধকারে—

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন,—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।'[৩৮]

অমৃতসরে মাসখানেক থেকে চৈত্রমাসের শেষে [Apr 1873] ড্যালহৌসি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে তাঁরা যাত্রা করলেন। অমৃতসরে মাস আর যেন কাটছিল না। হিমালয়ের আহ্বান বালককে একেবারে অস্থির করে তুলেছিল। অমৃতসর থেকে ডাকগাড়ি চেপে প্রথমে পাঠানকোটে যাওয়া হয়।* সেখান থেকে ঝাঁপানে করে পাহাড়ে ওঠার শুরু। রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে: 'আমরা প্রাতঃকালেই দুধরুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্নে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্তদিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না—পাছে কিছু-একটা এড়াইয়া যায়, এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া, শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া, ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্‌কুল্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ-সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন। এইখানেই থাকিলেই তো হয়।'[৩৯]

দেবেন্দ্রনাথ পথখরচের টাকা-ভর্তি ক্যাশবাক্সটি রাখবার ভার পুত্রের উপর দিয়েছিলেন তাঁর কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য। সেইজন্য একদিন ডাকবাংলায় পৌঁছে বাক্সটি পিতার হাতে না দিয়ে টেবিলের উপর, রেখেছিলেন বলে র্ভৎ সিত হয়েছিলেন।

এইভাবে চলতে চলতে তাঁরা বৈশাখের প্রথম দিকে বক্রোটা শিখরে গিয়ে পৌঁছন। সে-প্রসঙ্গ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করব।

এখানে সমকালীন সংবাদপত্র থেকে দুটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি। *সোমপ্রকাশ*-এর ২৬ চৈত্র [7 Apr] সংখ্যায় 'মূলতানস্থ সংবাদদাতা'র প্রেরিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়: 'উন্নত হিন্দুচূড়ামণি বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার নবোপনীত পুত্র সমভিব্যাহারে অমৃতসর আসিবেন। গ্রীষ্মকাল তিনি ধর্ম্মশালার [পর্বতশিখরে অব-]স্থিতি করিবেন [১৫।২১, পৃ ৩৩৪]।' উক্ত সংবাদদাতারই প্রেরিত দ্বিতীয় সংবাদটি ১০ বৈশাখ ১২৮০ [21 Apr] সংখ্যায় মুদ্রিত হয়: 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নবোপবীতধারী পুত্রের সহিত অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ব্বতন ঋষিদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম্মালোচনা যতদূর পারেন উদ্দীপন করিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডীয় সভ্যতা সম্পন্ন দেশীয় লোকদিগের নিকট এরূপ চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা তাঁহার পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে প্রকাশ পাইতেছে। "পুরাতন মদ্য কি নূতন বোতলে শোভা পায়।" [১৫।২৩, পৃ ৩৬৫]।' তারিখগুলির দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, সংবাদগুলি যথেষ্ট বাসি অবস্থায় পরিবেশিত হয়েছে এবং সংবাদদাতা যে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুকূল ছিলেন না তাঁর তির্যক বাগ্‌ভঙ্গিতেই তা প্রতীয়মান, কিন্তু এখানে যে তথ্যটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল রবীন্দ্রনাথের নাম ব্যবহৃত না হলেও তাঁর গতিবিধি এই প্রথম সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয়েছে—সেই দিক দিয়ে সংবাদ-দুটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে মনে করি।

প্রসঙ্গত এখানে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত পাঠকদের বিচারের জন্য উপস্থিত করছি। গুরু নানকের রচিত 'গগন মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে' ভজনটির [গানটির কতকগুলি পাঠান্তর আছে] প্রথমাংশের প্রায়

আক্ষরিক অনুবাদ ‘গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে’ গানটির রচয়িতা কে এ-নিয়ে নানা সংশয় আছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত ‘ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি’ দ্বিতীয় ভাগে গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’ গ্রন্থের সূচিপত্রেও গানটির রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [অবশ্য এই গ্রন্থের সম্পাদক ‘ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি’ গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যের উপরই নির্ভর করেছেন]। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই ‘রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী’তে [*শনিবারের চিঠি*, মাঘ ১৩৪৬।৫৯০] লিখিত হয়েছে: ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত ‘ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি’ (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এটি তাঁহার রচনা।’ আবার ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ‘রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম’ প্রবন্ধে [*বিশ্বভারতী পত্রিকা*, ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬।২০৪-০৫] এই গানটি সম্পর্কে লিখেছেন, ‘এই শিখ-ভজনেরই আর-একটি বহুকাল আগে আমাদের কাছে এসেছিল, কী সূত্রে তা জানি নে; এবং আশ্চর্যের বিষয়, সেটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একেবারে প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে অনুবাদ করেছেন। ...কেউ কেউ ভুল করে ভাবেন এটি রবীন্দ্রনাথের।’* সূত্রটি সম্পর্কে আমাদের যতটুকু জানা আছে তা হচ্ছে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বাংলা পাক্ষিক মুখপত্র *ধর্ম্মতত্ত্ব* পত্রিকার ১ ভাদ্র ১৭৯৪ শক [১২৭৯; 1872] সংখ্যার [৫।১৪] ৭৩৮ পৃষ্ঠায় নানকের ভজনটি সম্ভবত প্রথম বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হয়। এর পরই *তত্ত্ববোধিনী*-র ফাল্গুন সংখ্যার ১৯১-৯২ পৃষ্ঠায় ‘সংবাদ’ শিরোনামায় ২৪ ভাদ্র লাহোর সৎসভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক প্রসঙ্গে গদ্যানুবাদ-সহ গানটি মুদ্রিত হয়। পদ্যানুবাদটি সুর-সংযোজিত [‘রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল’] হয়ে ১১ মাঘ ১২৮১ [শনি 23 Jan 1875] তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিকে সায়ংকালীন উপাসনায় গীত হয় ও পরবর্তী ফাল্গুন সংখ্যার *তত্ত্ববোধিনী*-র ২০৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। ইন্দিরা দেবীর উপরোক্ত মন্তব্য সত্ত্বেও গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড-তে [আশ্বিন ১৩৫৭] গানটি রবীন্দ্র-রচনা হিসেবেই গৃহীত হয় [মনে রাখা দরকার, এই গ্রন্থ-সংকলনে ইন্দিরা দেবী অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন]। আমাদের অনুমান, পদ্যানুবাঁদটি রবীন্দ্রনাথেরই কৃত। ফাল্গুন সংখ্যায় অনুবাদ-সহ মূল রচনাটি প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে বোলপুর হয়ে অমৃতসরে আসেন। খুবই সম্ভব যে, তিনি *তত্ত্ববোধিনী* মারফত রচনাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। অমৃতসরে পিতার সঙ্গে যখন গুরু-দরবারে উপস্থিত থাকতেন তখন অন্যান্য শিখ-ভজনের সঙ্গে এই গানটিও তিনি শুনেছিলেন, এমন সম্ভাবনার কথা সহজেই ভাবা যেতে পারে। আর এই যোগাযোগের অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ ভজনটির বঙ্গানুবাদ করেন। *তত্ত্ববোধিনী*-তে প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে গদ্যানুবাদ দেওয়া ছিল এবং দেবেন্দ্রনাথও গানটি জানতেন, সুতরাং গুরুমুখী ভাষার অর্থ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। আমাদের এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত যদি বিদগ্ধজনের সমর্থনযোগ্য হয়, তবে এটি-ই রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম ব্রহ্মসংগীত বলে গণ্য হবে। অবশ্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী’ প্রথম খণ্ডে [1973] গানটিকে সূচির প্রথমেই স্থাপন করা হয়েছে। তবে আমাদের মত গ্রাহ্য হলে সেখানে বয়স ও সালটি সংশোধনের প্রয়োজন হবে, লিখতে হবে—‘বয়স ১১।১২৭৯।১৮৭৩’।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পারিবারিক ঘটনা ও তথ্য এখানে সংকলিত হল।

১২ শ্রাবণ শুক্রবার [26 Jul 1872] তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ পুনায় জন্মগ্রহণ করেন। বলেন্দ্রনাথের সংকলিত রাশিচক্রের খাতায় জন্মতারিখ ও সময়টি এইভাবে দেওয়া আছে—'১৭৯৪।৩।১১।৫।২৭।১১' অর্থাৎ সকালের দিকে তাঁর জন্ম হয়। লক্ষণীয়, মাতা জ্ঞানদানন্দিনীর জন্মতারিখও ১২ শ্রাবণ [১২৫৭]। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁদের প্রথম সন্তান নন; আমরা জানি আশ্বিন ১২৭৫ [Oct 1868]-এ তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মের দু-একদিনের মধ্যেই মারা যায়। জ্ঞানদানন্দিনীও লিখেছেন: 'প্রথম যখন আমি অন্তঃসত্ত্বা হলুম, তখন আমি কিছু বুঝতুম না বলে দৌড়াদৌড়ি করতুম, তাই দু-একবার সন্তান নষ্ট হয়।'[৪০] সুদূর পুনাতে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হলেও জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও আনন্দানুষ্ঠানের অভাব হয়নি, এ কথা জানা যায় ৯ ভাদ্র [শনি 24 Aug] তারিখের একটি হিসাব থেকে—'মেজবাবু মহাশয়ের পুত্র হওয়ায় বিতরণ জন্য বাটী তৈল ও মিঠাই ক্রয়...৬২ ০'। এইটাই বোধহয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রীতি ছিল, পুত্রসন্তানের জন্ম হলে দাসী ও ভৃত্যদের মধ্যে তেল-ভরা বাটি ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হত।

২৫ ভাদ্র সোমবার [9 Sep 1872] তারিখে স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের তৃতীয় সন্তান ও দ্বিতীয় কন্যা সরলার জন্ম হয়। সরলা দেবী নিজেই এই জন্মকথার বিবরণ দিয়েছেন এই ভাবে: 'একদিন ভাদ্রমাসে—ললিতা সপ্তমী তিথিতে মহর্ষির আর একটি দৌহিত্রীর আবির্ভাব হল বাড়ির সূতিকাগৃহে, বাড়ির ভিতরের তেতালার একটি রোদফাটা কাঠের ঘরে।'[৪১] এই ঘরটি অবশ্য 'বাড়ির সূতিকাগৃহ' ছিল না।

শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা ঊষাবতীর অন্নপ্রাশন হয়। কার্তিক মাসে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম পুত্র জ্যোৎস্নানাথ, বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র সরোজনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর অন্নপ্রাশন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ এই অনুষ্ঠানে শিশুদের মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। সরলা দেবীর বিবরণ অনুযায়ী, এই বৎসরের পৌষ-মাঘ মাসের কোনো দিনে পানিহাটিতে তাঁর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ-সম্পর্কে আমাদের হাতে কোনো তথ্য নেই, তা আগেই বলা হয়েছে। বিবরণটি যথার্থ না হওয়াই সম্ভব।

২০ আশ্বিন [শনি 5 Oct] তারিখের একটি হিসাবে দেখা যায়, 'শ্রীমতী ইরাবতী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যয়' বাবদ ৯৮ ৩ খরচ করা হয়েছে। সংবাদটি কিছুটা কৌতূহলজনক। ঋতুমতী হওয়ার পর কন্যাকে স্বামী-সকাশে প্রেরণের প্রথা হিন্দুসমাজে, বিশেষ করে যেখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, কিছু নতুন নয়; কিন্তু ঠাকুর পরিবারে ঘটনাটি একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ আনে। ইরাবতীর বিবাহ ব্যাপারটিও রহস্যাবৃত। তাঁর বিবাহ হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটার সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে। নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল কাশীতে। এই বিবাহ-সংক্রান্ত প্রথম হিসাবটি ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায় ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ [বুধ 31 May 1871] তারিখে: 'সারদাবাবুর কন্যা ইরাবতীর বিবাহের নিরঞ্জনবাবুর বাটী হইতে সওগাদ আনে লোকেরদিগের খাওয়াইবার ও বিদায় ব্যয়...১১৮ ল/৯'—ইরাবতীর বয়স তখন দশ বৎসর পূর্ণ হয়নি। এর পরেই ১৪ মাঘ [শুক্র 26 Jan 1872] তারিখের হিসাবে দেখা যায়: '[অযোধ্যানাথ] পাকড়াশী মহাশয়কে ঢাকায় ইরাবতীর বিবাহ স্থগিদ সম্বাদ টেলিগ্রাফ করার ব্যয়...১ৎ' অর্থাৎ মাঘ মাসেই [১২৭৮] বিবাহের আয়োজন হয়েছিল, কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে তা স্থগিত রাখতে হয়। এরপর বর্তমান বৎসরে ৬

বৈশাখ (বুধ 17 Apr 1872] তারিখে ‘ইরাবতী দেবীর বিবাহের মোট খরচ’-এর হিসাব পাওয়া যায় ৬০৪৫ ।৷৯ পাই, তার থেকে মনে হয় বৈশাখ ১২৭৯ [Apr 1872]-র প্রথম সপ্তাহেই ইরাবতীর বিবাহ হয়েছিল দশ বৎসর বয়সে। আষাঢ় মাসের *তত্ত্ববোধিনী*-তে আদি ব্রাহ্মসমাজের চৈত্র ও বৈশাখ মাসের আয়ব্যয়ের বিবরণেও দেখা যায় ‘শুভকর্ম্মের দান। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ২০,’ যা আমাদের ধারণা সমর্থন করে। এই বিবাহের ছ'মাসের মধ্যেই আশ্বিনে ‘ইরাবতী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ’ হয় অর্থাৎ তিনি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরগৃহে যাত্রা করেন। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মপরিবার থেকে ইরাবতী এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে উপস্থিত হন। সরলা দেবী লিখেছেন: ‘বড় মাসিমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ইরুদিদিও কাশীতে শ্বশুরগৃহে নিত্য শিবদুর্গার সেবাপরায়ণা ছিলেন; কারণ, তাঁর বিবাহ হয়েছিল সেই রকম ঘরে—...যাঁদের নিজ বাড়িতেই শিবমন্দির ছিল। ইরুদিদিকে তাঁরা ষোল-সতের বৎসর আর মায়ের কাছে মাতুলালয়ে পাঠাননি।’[৪২]

এই বৎসর জোড়াসাঁকো বাড়িতে একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে, তিনি হলেন রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহ—লর্ড ‘সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত’। রায়পুরের এই সিংহ পরিবারের কাছ থেকেই দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের কুড়ি বিঘা জমি লাভ করেছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন এবং সম্ভবত মাঘ মাসে জোড়াসাঁকোয় আগমন করেন। ২৬ মাঘ [শুক্র 7 Jan 1873] তারিখের হিসাবে দেখছি: ‘শ্রীকণ্ঠ বাবুর দাঁত বাঁধাইবার জন্য ব্যয়’ ১৭৫ টাকা সরকারী তহবিল থেকেই দেওয়া হয়েছে। আবার ৯ ফাল্গুন [বুধ 19 Feb] ‘শ্রীকণ্ঠবাবুর জন্য মশারি একটা ও বিছানার চাদর একখানা তৈয়ারি’ করানো হয়েছে অর্থাৎ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তিনি প্রায় স্থায়ী অতিথিতে পরিণত হয়েছেন। অবশ্য এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে বোলপুর ও হিমালয় ভ্রমণে রত, সেখান থেকে ফিরে আসার পরই তাঁর সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ সিংহের অসমবয়সী বন্ধুত্বের সূচনা। সুতরাং সে-প্রসঙ্গ পরের অধ্যায়ে আলোচনার জন্য রেখে দেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক নীলকমল ঘোষালের সঙ্গে আমরা যথেষ্ট পরিচিত। তিনি কার্তিক ১২৭৩ [Oct 1866]-এ এই কাজে নিযুক্ত হন। ফাল্গুন ১২৭৮ [Feb 1872]-এ রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা শিক্ষার অবসান’ ঘটলেও দ্বিপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গৃহশিক্ষক হিসেবে তিনি বহাল ছিলেন। কিন্তু বর্তমান বৎসরে ৪ ফাল্গুন [শুক্র 14 Feb] তাঁর কর্মাবসান ঘটে, এ তথ্য আমরা জানতে পারি ৭ ফাল্গুন [সোম 17 Feb]-এর হিসাব থেকে: ‘ব° নিলকমল ঘোসাল/দ° উহার বেতন মাঘ না° ৪ ফাল্গুণ...১৩।৶’। আবার এই ফাল্গুন মাস থেকেই মাসিক ১৫ টাকা বেতনে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ‘ছেলেবাবুদিগের ইংরাজি পড়াইবার শিক্ষক’ হিসেবে নিযুক্ত হন। এঁর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হিমালয় থেকে প্রত্যাগমনের পর, অতএব পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচ্য। কিন্তু এই নিয়োগের ফলে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বেতন কমে মাসিক দশ টাকায় দাঁড়ায় এবং তিনি প্রতিভা প্রভৃতি বালিকাদের শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

বেঙ্গল অ্যাকাডেমির সহপাঠী হরিশ্চন্দ্র হালদারের সম্বন্ধে অনেক কৌতুকপ্রদ বিবরণ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে দিয়েছেন, অবশ্য সেখানে তিনি এঁর নাম উল্লেখ না করে ‘গ্রন্থকার বন্ধু’ ‘প্রোফেসর’ ‘জাদুকর’ প্রভৃতি.

আখ্যায় তাঁকে ভূষিত করেছেন। শেষ বয়সে রচিত গল্পসল্প গ্রন্থের 'ম্যাজিশিয়ান' ও 'মুক্তকুন্তলা' গল্পেও তিনি এঁর প্রসঙ্গ এনেছেন, সেখানে তিনি স্বনামে প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর ব্যক্তিপরিচয়টি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়নি। জীবনস্মৃতি-র বর্ণনা থেকে মনে হয়, বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে পড়ার সময়ই তাঁদের চেয়ে 'বয়সে অনেক বড়' এই সহপাঠীর সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়, গল্পসল্প-তেও ইঙ্গিত আছে ইরাবতীর শ্বশুরবাড়ি যাত্রার পরে তাঁর আবিভাব। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রতিকৃতির তালিকায় 'শিল্পী হরিশচন্দ্র হালদার' চিত্রটিতে তারিখ দেওয়া আছে 1870[৪৩], লক্ষণীয় 'শিল্পী' আখ্যাটি এই সময়েই তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 1870-তে রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তখন থেকেই অন্তত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিমা দেবী লিখেছেন: 'শোনা যায় যখন কবি [রবীন্দ্রনাথ] এবং সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে পড়তেন সেই সময় হ. চ. হ. ছিলেন তাঁদের সহপাঠী। সোদ্দাই এই বহুগুণযুক্ত মানুষটিকে সংগ্রহ করে পরিবারের তরুণ মহলে পরিচিত করিয়ে দেন। ...তাঁর হ. চ. হ. নামকরণ সোদ্দাই করেছিলেন।'[৪৪] ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে রবীন্দ্রনাথরা পড়েননি, সুতরাং সে-প্রসঙ্গ বাহুল্য; কিন্তু যে-তথ্যটি এখানে উল্লেখযোগ্য সেটি হল বেঙ্গল অ্যাকাডেমি পর্বের আগেই হ. চ. হ. জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আর একটি মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন কমল সরকার তাঁর 'রবীন্দ্র-রচনার প্রথম চিত্রকর' প্রবন্ধে [দ্র *দেশ,* ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯।৪৬৫-৭১]। রবীন্দ্রনাথ হ. চ. হ. লিখিত এবং মুদ্রিত ম্যাজিক সম্বন্ধে চটি বই ও 'ঝুলঝুলে খাতায় লেখা' 'মুক্তকুন্তলা' নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি-যে অন্তত দুখানি মুদ্রিত নাট্যগ্রন্থের লেখকও ছিলেন সেই সংবাদ দিয়েছেন কমলবাবু। তাঁর নাটক দুটির নাম —'কালাপাহাড় বা ধৰ্ম্মদ্রোহী নাটক' [১৮০৩ শক: ১২৮৮] এবং 'বেদবতী বা পতি-প্রাণা নাটিকা' [১৮০৪ শক: ১২৮৯]। প্রথম গ্রন্থটির আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করছি: 'কালাপাহাড়।/বা ধৰ্ম্মদ্রোহী নাটক।/শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার প্রণীত।/ KALA PAHARA/BY/HARISH CHANDRA HALDARA/LATE STUDENT OF THE/CALCUTTA GOVERNMENT SCHOOL OF ART/কলিকাতা/বাল্মীকি যন্ত্রে/শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।/শকাব্দা ১৮০৩।' নাটকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, দৃশ্যকাব্যটি অন্যান্য পুস্তকালয়ের সঙ্গে 'জোড়াসাঁকো ঠাকুর ভবনে...এবং পাথুরিয়াঘাটা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ট্রীট ৩৩ নং ভবনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।' অপর গ্রন্থখানিও আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই বিবরণে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের যোগাযোগের সাক্ষ্য ছাড়াও তিনি যে কলকাতা গবর্মেন্ট স্কুল অব আর্টের ছাত্রও ছিলেন সে-খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমরা জানি Jan 1867-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুলে [1864 থেকে Government School of Art নামেই পরিচিত ছিল] ভর্তি হয়েছিলেন। এই সূত্রেই কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল? তাহলে রবীন্দ্রনাথদের চেয়ে তিনি কত বড়ো ছিলেন?

যাই হোক, এই ব্যক্তিটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার বর্ণনা জীবনস্মৃতি ও গল্পসল্প গ্রন্থে যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও পরবর্তীকালে আর কোনো যোগাযোগের কথা তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে বহু দিন অক্ষুণ্ণ ছিল, তার প্রমাণ 24 Apr 1903 [শুক্র ১১ বৈশাখ ১৩১০] তারিখে বালিগঞ্জে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত তাঁর প্রতিকৃতি। এর মধ্যেও ১২৯২ বঙ্গাব্দে *বালক* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের রচনা তিনি চিত্রিত ও লিথোগ্রাফ করে দিয়েছেন, গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পীরপাহাড়ে বেড়াতে

গেছেন [দ্র স্মৃতিচিত্র।৬৩] ও ছোটোদের অভিনয়ে মঞ্চসজ্জা করে দিয়েছেন। শেষোক্ত সংবাদটি আমরা পাই হিরন্ময়ী দেবীর রচনা থেকে: 'বাড়ীতে তখন হরিশবাবু নামে একটি পোষা চিত্রকর থাকিতেন। ...আমরা হরিশবাবুকে ধরিলাম যে আমাদের একটি ষ্টেজ আঁকিয়া দিতে হইবে। আমাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা বৃথা! রফা হইল যে ৫০্ টাকায় তিনি সে কাজটা করিয়া দিবেন। ...আমার মামা মহাশয় স্বর্গীয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ষ্টেজের ইতিহাস শুনিয়া হরিশবাবুর দেনা পরিশোধের ভার লইলেন। ..."ভারতী"র মলাটে তখন বীণাপাণির যে ছবি থাকিত, আমাদের ষ্টেজের শিরোভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল সেই ছবি। ড্রপসিনে—মধ্যে অঙ্কিত রবিমামার মুখ—আর তার চারদিকে একটি ফুলের মালা—কিন্তু সে ফুল, বাগানের ফুল নয়--নাট্যাভিনেতা ছেলে-মেয়েদের মুখগুলি।'[৪৫] এইভাবেই এই মানুষটি প্রায় ত্রিশ বছরের উপর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুটি শাখার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও পরবর্তীকালে তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ থাকার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

পূর্বেই বলা হয়েছে, কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের উপনয়ন দেবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সাহায্যে বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্রাহ্মণসন্তানের উপযোগী অপৌত্তলিক উপনয়ন-পদ্ধতি রচনা করেন। কিন্তু এই ঘটনাটি ঘরে বাইরে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসুও প্রথমে এই প্রথার বিরোধিতা করলেও পরে এই যুক্তিতে সমর্থন করেন: 'যদি অন্য দেশের অভিজাত ব্যক্তিরা সম্মুখের পা তোলা সিংহের প্রতিকৃতি ব্যবহার আভিজাত্যের চিহ্ন স্বরূপ জ্ঞান করেন, তবে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব ব্রাহ্মেরা প্রাচীন ঋষিদিগের সন্তান বলিয়া পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব না রাখিয়া উপবীত আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি কোন হানি দেখি না। ...প্রথমে আমি নূতন উপনয়ন প্রথার বিপক্ষ ছিলাম, কিন্তু এরূপ উপনয়ন ব্যতীত আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতি সর্বাবয়ব সম্পন্ন হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম।'[৪৬]

কিন্তু অনেকেই তা মেনে নিতে পারেননি। *ধর্মতত্ত্ব* পত্রিকার বক্তব্য যদি যথার্থ হয়, তাহলে বলতে হবে আদি ব্রাহ্মসমাজের এতদিনের একনিষ্ঠ সেবক অযোধ্যানাথ পাকড়াশীও এই প্রথা সমর্থন করতে পারেননি এবং এই মতানৈক্যের ফলেই তিনি উপাচার্য ও *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র সম্পাদক পদ থেকে অপসৃত হন। উক্ত পত্রিকা ১ চৈত্র [৬।৫] সংখ্যায় 'সম্বাদ' দেয়, 'অযোধ্যানাথ পাকড়াসী কলিকাতা সমাজ হইতে অবসর লইয়াছেন।' আবার ১৬ বৈশাখ ১২৮০ [৬।৮] সংখ্যায় লেখা হয়, 'কলিকাতা...সমাজের প্রচারক বাবু ঈশানচন্দ্র বসুও নিষ্কাশিত হইয়াছেন। শ্রুত হওয়া গেল ইনি ও পাকড়াশী মহাশয় দেবেন্দ্র বাবুর সন্তানের উপবীত অনুষ্ঠানে অসম্মত হওয়ায় দেবেন্দ্রবাবু তাহাদের প্রতি বিরক্ত হন।' এছাড়াও এই পত্রিকায় ১৬ মাঘ ও ১ ফাল্গুনের যুগ্মসংখ্যায় [৬|২-৩|৮৮১-৮৩] 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক দুর্ঘটনা', ১৬ চৈত্র সংখ্যায় [৬।৬।৯১৮-২০] *তত্ত্ববোধিনী*-তে প্রকাশিত উপনয়নের অনুষ্ঠান-প্রণালীর সমালোচনা করে 'শোচনীয় পতন' এবং ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সংখ্যায় [৬।৯।৯৫৪-৫৫] 'যজ্ঞোপবীত পৌত্তলিক চিহ্ন এবং পৌত্তলিকতা কিনা?'

প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; অনেকগুলি পত্রও মুদ্রিত হয়। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় 'মূলতানস্থ সংবাদদাতা'র প্রতিবেদনের যে অংশগুলি আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যেও সমালোচনাত্মক মনোভাব ছিল। কিন্তু ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় মত এই প্রথার অনুকূল ছিল বলেই মনে হয়: 'বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি তাঁহার দুই পুত্রের যজ্ঞোপবীত দেওয়াতে সাপ্তাহিক সংবাদ বিদ্রুপ করিয়া লিখিয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা আবার হিন্দু হইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ত হিন্দুই আছেন, নূতন হইলেন না। এক ঈশ্বরের উপাসনা হিন্দুধর্ম্মের সারভূত, সমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তাই একথা কহিয়াছেন। কৈশব সম্প্রদায় ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা বাস্তবিক ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহারা না হিন্দু না মুসলমান না খৃষ্টান।' [*সোমপ্রকাশ,* ১৪ ফাল্গুন, ১৫। ১৫।২৩৩]।

ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, উপনয়ন খাতে মোট খরচ হয়েছিল ১৪৬৯ ৬, যার মধ্যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যয়ের উল্লেখ আছে: 'রবীবাবুর দাইকে বিদায় কাপড়ের মূল্য ৪্'—জন্মের পর এই দাইয়ের স্তন্যেই রবীন্দ্রনাথ পালিত হয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

এই প্রসঙ্গে আমরা বোলপুর-শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আমরা জানি, ১৮ ফাল্গুন ১২৬৯ [রবি 1 Mar 1863] তারিখে লিখিত একটি মৌরসী পাট্টার দ্বারা রায়পুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতির কাছ থেকে বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় দেবেন্দ্রনাথ ভুবনডাঙা বাঁধের উত্তরাংশে 'সান্তীনিকেতন নামা গৃহের চতুপার্শ্বের মধ্যে' ২০ বিঘা জমির স্বত্ব লাভ করেন। শান্তিনিকেতন নামা উক্ত গৃহের উল্লেখ আমাদের মনে সংশয় সৃষ্টি করে যে, দলিল সম্পাদনের পূর্বেই সেখানে কোনো গৃহের অস্তিত্ব ছিল কিনা। অজিত চক্রবর্তী লিখেছেন: 'এই ছাতিমের ছায়াটিকে তাঁহার নির্জন সাধনার উপযুক্ত বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তার পর হইতে ঐ ছাতিম গাছের তলায় মাঝে মাঝে তাঁহার তাঁবু পড়িতে লাগিল।'[৪৭] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কালে দেবেন্দ্রনাথ তথায় একখানি ক্ষুদ্র একতল অট্টালিকা নির্মাণ করেন, উত্তরকালে উহা দ্বিতল ও শান্তিনিকেতন অতিথিশালায় পরিণত হয়। সময় সময় মহর্ষির পুত্রদের বা কন্যাজামাতাদের কেহ কেহ গিয়া কয়েকদিন করিয়া বাস করিয়া আসিতেন, শান্তিনিকেতন নাম তখনো হয় নাই।'[৪৮] উদ্ধৃতি দুটি থেকে মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে সেখানে তাঁবু স্থাপন করে বাস করতেন, পরে যখন সেখানে গৃহ নির্মিত হয় তখনো তার 'শান্তিনিকেতন' নামকরণ হয়নি। অজিত চক্রবর্তী হয়তো অনেক পূর্বের ঘটনা লিখেছেন, কিন্তু আমাদের ধারণা দলিল-সম্পাদনের পূর্বেই সিংহ-পরিবারের অনুমতিক্রমে দেবেন্দ্রনাথ সেখানে 'শান্তিনিকেতন' নাম দিয়ে একটি গৃহের পত্তন করেন। অন্তত ১২৭১ বঙ্গাব্দে ১ অগ্রহায়ণ [মঙ্গল 15 Nov 1864] তারিখে 'শান্তিনিকেতন খাতে খরচ' হিসাবে রফিমদ্দী মিস্ত্রীকে 'শান্তিনিকাতনের গাথনির হিসাব সোদ' বাবদ ১৬ টাকা ৫ আনা দেওয়া হয়েছে, এ-প্রসঙ্গ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ পূর্বাবধিই এই গৃহকে 'শান্তিনিকেতন' নামে অভিহিত করতেন, এমন সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত। ভাদ্র ১২৭২ [Sep 1865]-এর হিসাবে দেখা যায় শান্তিনিকেতনের জন্য ফুলের চারা কিনে পাঠানো

হচ্ছে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'এই অনুর্ব্বর প্রান্তরে উদ্যান প্রস্তুত করা বহু আয়াস ও অর্থ-সাধ্য ব্যাপার। ডাঙ্গার কঙ্করমিশ্রিত মাটী তুলিয়া ফেলিয়া অন্যত্র হইতে উৎকৃষ্ট মাটী আনিয়া ঐ সকল স্থান পূর্ণ করিতে হইয়াছিল।'[৪৮ক] রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে যান, তখন এখানকার গৃহ যথেষ্ট বাসযোগ্য হয়ে উঠলেও, নির্মাণ কার্য চলতেই থাকে। তিনি শান্তিনিকেতনের সাধারণ রূপটি তখন যা দেখেছিলেন তার বর্ণনা করে পরে লিখেছেন: 'সে জায়গার সঙ্গে এখানকার এ জায়গার অনেক তফাত—ধূধূ করছে প্রান্তর, শ্যামল বৃক্ষচ্ছায়ার অবকাশ নেই প্রায় কোথায়ও। সেই ঊষর রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে, আজকাল যেটা অতিথিশালা তারই একটা ছোটো ঘরে, আমি থাকতুম, অন্যটাতে তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] থাকতেন। তাঁরই রোপণ-করা শালবীথিকা তখন বড়ো হতে আরম্ভ করেছে।... নাট্যঘরের পাশে একটা নারিকেলগাছ ছিল, তারই তলায় বসে 'পৃথ্বীরাজবিজয়' নামে একটি কবিতা রচনা করে গর্ব অনুভব করেছিলুম।'[৪৯]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম শান্তিনিকেতন-বাসের অভিজ্ঞতায় যে অসমাপ্ত পুষ্করিণীর কথা লিখেছেন, এই চেষ্টায় ১২৭৪ বঙ্গাব্দে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হয়। ঐ বৎসরের ক্যাশবহি-তে এবিষয়ে প্রথম ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ২৩ ভাদ্র [শনি 7 Sep 1867] তারিখে—'ব° দিননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দ° শান্তিনিকেতনের পুষ্করিণীর-পাড়ের মাটী উঠাইবার খরচ...১০০্'; ৮ আশ্বিন [23 Sep] তাঁকে এই কাজের জন্য আবার ১০০ টাকা দেওয়া হয়। ১০ কার্তিক [26 Oct] ও ৪ অগ্র [19 Dec] তারিখে সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে 'পুষ্করিণী খনন হিসাবে' ২০০ টাকা করে দেওয়ার পর সম্ভবত প্রচেষ্টাটি পরিত্যক্ত হয়, কারণ এর পরে এই বাবদে আর কোনো খরচ দেখা যায় না। বর্তমানে আনন্দ পাঠশালার পাশে যে উঁচু মাটির ঢিবি দেখা যায়, সেটি এই পুকুর থেকে তোলা মাটি দিয়েই তৈরি—যার উপরে বসে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রাতঃকালীন উপাসনা সম্পন্ন করতেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৫

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় *বঙ্গদর্শন* মাসিক পত্রিকা প্রকাশ এই বৎসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই কথা বলে আমরা এই অধ্যায়ের সূচনা করেছিলাম। এইখানে প্রসঙ্গটির একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি বাংলা উপন্যাস—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী—রচনা করে সাহিত্য-জগতে যথেষ্ট মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন। এই অবস্থায় তিনি Dec 1869-এ বহরমপুরে বদলি হন। 'বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্য-চর্চ্চার যেন বান ডাকিয়াছিল। ভূদেব [মুখোপাধ্যায়], রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন উকীল),—এই সুধী এবং সাহিত্য-সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র যোগদান করিলেন।'[৫০] এই সাহিত্যিক পরিবেশই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের মনে একটি পত্রিকা প্রকাশের আকাঙক্ষার জন্ম দিয়েছিল। তারই ফলে বৈশাখ ১২৭৯ [Apr 1872] থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন।/মাসিক পত্র ও সমালোচন' নামে 'ভবানীপুরের ১নং পিপুলপটী লেনে সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত' হতে শুরু করে। 'পত্র সূচনা'য় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন:

সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।/আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। ...এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।'[৫১]

শুধু কৃতবিদ্য সম্প্রদায়কে আহ্বান করা নয়, প্রথম সংখ্যা থেকেই উপন্যাস তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, ব্যঙ্গকৌতুক, বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ, গ্রন্থ-সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লেখনী ধারণ করে নবযুগের সাহিত্যের আদর্শ সকলের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। *বঙ্গদর্শন*-এর মাধ্যমেই 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। ...বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির্।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। ...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।'[৫২]

বঙ্গদর্শন প্রথম পাঠের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে রোমন্থন করেছেন: 'অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর,* এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয় গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না।'[৫৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় *বঙ্গদর্শন* মাত্র চার বৎসর প্রকাশিত হয়ে চৈত্র ১২৮২-র পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে তাঁর মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে [৫মে খণ্ড—১২৮৪, ৬ষ্ঠ—১২৮৫, ৭ম—১২৮৭, ৮ম—বৈশাখ-আশ্বিন ১২৮৮ ও ৯ম—১২৮৯], শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদকত্বে কার্তিক-মাঘ ১২৯০ চারটি সংখ্যা বেরোবার পর *বঙ্গদর্শন*-এর বর্তমান পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন-নব পর্যায়' সম্পাদনা শুরু করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৬

বঙ্গদর্শন প্রকাশের মতো 'ন্যাশানাল থিয়েটার' বা 'জাতীয় নাট্যশালা' স্থাপন এই বৎসরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর পূর্বে নাটক অভিনয় হত ধনী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব নাট্যশালায়—কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া নাট্যশালা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো থিয়েটার প্রভৃতি সবই এই ধরনের রঙ্গমঞ্চ। এখানে যে-সব অভিনয় হত আমন্ত্রিত অতিথিরা ছাড়া সাধারণের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। অথচ পাশাপাশি

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় টিকিট কেটে নাট্যরস-সম্ভোগে কোনো বাধাই ছিল না। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি কয়েকজন শৌখিন অভিনেতা 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' [পরবর্তীকালে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' নাম দেওয়া হয়] নামে একটি নাটকের দল প্রতিষ্ঠিত করে 1868-এ দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ও পরে 11 May 1872 [শনি ৩০ বৈশাখ ১২৭৯] তাঁরই লেখা 'লীলাবতী' অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। তাতে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা টিকিট বিক্রি করে সর্বসাধারণের জন্য একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে শুরু করেন। অর্থ উপার্জন করা এঁদের লক্ষ্য ছিল না, নূতন নূতন নাটক অভিনয় করা এবং স্টেজ, দৃশ্যপট, সাজপোশাক, রূপসজ্জা ইত্যাদির পৌনঃপুনিক ব্যয় মেটানোর জন্যই টিকিট বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছিল। *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, *মধ্যস্থ*-সম্পাদক মনোমোহন বসু, ন্যাশানাল পেপার-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি এই প্রস্তাব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেন। এই রঙ্গমঞ্চের নাম 'ন্যাশানাল থিয়েটার' রাখার পিছনে নবগোপাল মিত্রের প্রেরণাও কার্যকরী ছিল বলে মনে হয়। 'ন্যাশানাল পেপার', 'ন্যাশানাল গ্যাদারিং' [জাতীয় মেলা], 'ন্যাশানাল সোসাইটি', 'ন্যাশানাল স্কুল' প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নামও 'ন্যাশানাল থিয়েটার' রাখতে চাইবেন সেটাই স্বাভাবিক। ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায় ১৬ পৌষ [রবি 29 Dec 1872] ঐ থিয়েটার গৃহে জাতীয় সভার অধিবেশনে নীলকমল মুখোপাধ্যায় 'জমিদার ও রায়ত' বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং এই বৎসরে জাতীয় মেলার সপ্তম অধিবেশনে ৬ ফাল্গুন [রবি 16 Feb 1873] ন্যাশানাল থিয়েটার 'ভারতমাতার বিলাপ' বা 'ভারতরাজলক্ষ্মী' নাটিকা ও 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি অন্যান্য নাটকের অংশবিশেষ অভিনয় করেন।[৫৪] এরই মধ্যে আর্থিক ব্যাপার নিয়ে অধ্যক্ষদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে 19 Jan 1873 যে সালিশী কমিটি নিযুক্ত হয় নবগোপাল মিত্র তার অন্যতম সদস্য ছিলেন।[৫৫] এইগুলি ন্যাশানাল থিয়েটারের সঙ্গে নবগোপাল মিত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ। যাই হোক, জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি'র বহির্বাটীর উঠানটি মাসিক ৪০৲ টাকায় ভাড়া নিয়ে ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৭৯ [শনি 7 Dec 1872] দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি অভিনয়ের মাধ্যমে ন্যাশানাল থিয়েটারের শুভ সূচনা হল। টিকিটের মূল্য ছিল প্রথম শ্রেণী এক টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণী আট আনা। আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথও এই পর্বে ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনয় দেখতে যান। ক্যাশবহি-তে ২৬ পৌষ [বুধ 8 Jan 1873] তারিখের হিসাবে দেখা যায় [এটি আমরা পূর্বেও উদ্ধৃত করেছি]: 'ছেলেবাবুরা থিএটর দেখিতে জান...। উহার দিগের টিকিটের মূল্য/ছোটবাবু মহাশয়ের আদেশমতে নবিনবাবুকে দেওয়া যায়—/১ দফা ৮৴/১ দফা ৮৴' [দ্বিপেন্দ্রনাথ প্রথমে দর্শনার্থীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় পিতামহী সারদা দেবী তাঁর টিকিটের দাম দিয়ে দেন]। এই হিসাব থেকে মনে হয়, এক দিন নয়, দু'দিন ছেলেবাবুরা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন, কোন্ কোন্ নাটকের অভিনয় তাঁরা দেখেছিলেন? এই সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র শনিবারে অভিনয় হত—বুধবারে অভিনয় প্রবর্তিত হয় 15 Jan [৩ মাঘ] থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ন্যাশানাল থিয়েটারে 28 Dec 1872 [১৫ পৌষ] 'সধবার একাদশী' এবং 4 Jan 1873 [২২ পৌষ] 'নবীন তপস্বিনী' অভিনীত হয়![৫৬] আমাদের ধারণা, অন্যান্য বালকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই দুটি নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন। 'সধবার একাদশী' অবশ্য ঠিক বালকদের

দেখার উপযুক্ত নাটক নয়, কিন্তু ‘ছোটবাবু’ অথাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে অভিভাবক-সুলভ মনোভাবের অস্তিত্ব ছিল না বলেই বালকদের পক্ষে এই নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ ঘটেছিল।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম নাট্যরচনা ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’-এর কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 20 Sep 1872 [শুক্র ৫ আশ্বিন]। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী কিছু পরিমাণে পুরাতনপন্থী ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। আমরা জানি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ২৩ মাঘ ১২৭৮ [সোম 5 Feb 1872] কেশবচন্দ্র জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থিত বাগানে ‘ভারত আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং উক্ত সমাজের উপাসনামন্দিরে খ্রিস্টীয় রীতিতে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত উপাসনা প্রবর্তিত করেন। এইগুলিকে ব্যঙ্গ করাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রহসনের লক্ষ্য ছিল। গ্রন্থে তাঁর নাম মুদ্রিত না হলেও তিনিই যে এর রচয়িতা এ তথ্য গোপন থাকেনি। তার ফলে *ধর্মতত্ত্ব* পত্রিকা [১৬ আশ্বিন, ৫।১৭।৭৭৩] এই গ্রন্থ ও তার রচয়িতার বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করে: ‘আমরা শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম যে “কিঞ্চিৎ জলযোগ” নামক একখানি নাটক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ভারতাশ্রম, ব্রহ্মমন্দির, প্রচারকগণকে বিলক্ষণ গালি দেওয়া হইয়াছে, ব্রাহ্মিকাদিগকেও ইহার মধ্যে আনিয়া গ্রন্থকর্ত্তা যথোচিত আপনার নীচতা ও বিকৃত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এ কথা শুনিয়া অবাক হইলাম যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্যের পুত্র।...’ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন*-এ [চৈত্র ১২৭৯। ৫৭১-৭৬] গ্রন্থটির যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ন্যাশানাল থিয়েটার সান্যাল-বাড়ির প্রাঙ্গণে 8 Mar 1873 [২৫ ফাল্গুন] এই পর্বের শেষ অভিনয় করলেও ১৫ বৈশাখ ১২৮০ শনি 26 Apr শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র সঙ্গে ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ও অভিনয় করে।[৫৭] এই নাটকের এইটিই প্রথম অভিনয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৭

এই বৎসর হিন্দু মেলার সপ্তম অধিবেশন হয় নৈনানে অবস্থিত হীরালাল শীলের বাগানে ৫ ফাল্গুন [শনি 15 Feb 1872] থেকে ৭ ফাল্গুন [সোম 17 Feb] পর্যন্ত। প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় মেলা এবং জাতীয় সভার উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতার উল্লেখ করেন এবং হিন্দুজাতির পূর্বগৌরব ও বর্তমান হীন অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করে সকলকে জাতীয় উন্নতিবিধান সম্বন্ধে অবহিত হতে অনুরোধ করেন। রবিবার মেলার প্রধান দিবসে বেলা এগারোটায় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে মনোমোহন বসু ‘হিন্দু আচার ব্যবহার—সামাজিক’* নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। দেশজ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল। ফুল, ফল ও শাকসব্জির প্রদর্শনীতে গুণেন্দ্রনাথ ও নীলকমল মুখোপাধ্যায় বিচারক ছিলেন। রমানাথ ঠাকুর শ্রেষ্ঠ মালীদের পুরস্কার প্রদান করেন। এবারে একটি পুস্তক-প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, এদিন ন্যাশানাল থিয়েটার কর্তৃক ‘ভারত-মাতার বিলাপ’ বা ‘ভারতরাজলক্ষ্মী’ নাটিকা ও ‘নীলদর্পণ’ প্রভৃতি অন্যান্য

নাটকের অংশবিশেষ অভিনীত হয়। তৃতীয় দিনে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে সীতানাথ ঘোষ 'বঙ্গের সংক্রামক জ্বরের কারণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বিষয়টি অবলম্বনে ২৮ জ্যৈষ্ঠ [9 Jun 1872] ভুবনমোহন সরকার জাতীয় সভায় একটি বক্তৃতা দেন। প্রদর্শনীতেও 'ডেঙ্গু জ্বরাক্রান্ত রোগী'র মৃৎমূর্তি রাখা হয়েছিল। ন্যাশানাল পেপার-এও এ বিষয়ে অনেক সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বোঝা যায় জনসাধারণের শক্তিক্ষয়কারী এই ব্যাধিটির সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা কর্তৃপক্ষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। ব্যায়াম-কসরতাদির পর জাতীয় সংগীত গীত হয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

বর্তমান বৎসরের মেলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল না, কারণ মেলা আরম্ভের আগের দিন তিনি পিতার সঙ্গে বোলপুর যাত্রা করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৮

এইখানে আমরা আর একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে নিতে চাই, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক ছিল না বলেই মনে হবে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা—যা পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠনে পরিণতি লাভ করেছে—সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা শুরু করার পিছনে প্রসঙ্গটির যথেষ্ট মূল্য আছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী জন বীম্‌স [1837-1902] বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে কাজ করার সময়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গভীর অনুশীলন করেন এবং *Outlines of Indian Philology* (1867), *A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India*, 3 Vols. [1872-79] ও *A Grammar of the Bengali Language, Literary and Colloquial* [1894] প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান বৎসরে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার কালেক্টর থাকার সময়ে তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করার জন্য একটি পরিষদ গঠনের প্রস্তাব-সংবলিত একখানি পুস্তিকা রচনা করেন [*Suggestions for the formation of an Academy of Literature in Bengali* by John Beams, B.C.S. Calcutta Wyman and Co., 1872]। পুস্তিকাটি প্রকাশের পূর্বেই বীম্‌স্ বাংলাভাষায় তাঁর বক্তব্য লিখে *বঙ্গদর্শন*-এ প্রেরণ করেন এবং সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য-সহ উক্ত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ [পৃ ১২২-৩০] সংখ্যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ।/ অনুষ্ঠান পত্র।' নামে মুদ্রিত হয়। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান ও স্প্যানিশ ভাষা-সমূহের কিরূপ উন্নতি হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বীম্‌স্ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায় স্থিরতা বিধান জন্য' একটি সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অত্যধিক সংস্কৃতানুসারী ও 'রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীল' শব্দ-বর্জিত একটি অভিধান সংকলন ও লেখকদের সেই অভিধান অনুসরণ করে চলার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। সভার কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি লেখেন: 'অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কর্ম্ম। অথচ ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাদি এবং তর্কবিতর্ক হইবার বাধা নাই। গ্রন্থকারেরা নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে সভাতে পাঠ করিবেন এবং পণ্ডিত সমূহের পরামর্শে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবেন।...সঙ্গীত আলোচনার দ্বারা সভার মনোরঞ্জনও হইতে পারে।' বীম্‌স্ শত-খানেক বাঙালি সভ্যের সঙ্গে হিতৈষী ও বিজ্ঞ কয়েকজন ইংরেজ সভ্য গ্রহণ করার জন্যও সুপারিশ করেন। তাঁর এই প্রস্তাব

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল। ন্যাশানাল পেপার [Vol. VII, No 31, Jul 31] ইংরেজি পুস্তিকাটির উপর একটি দীর্ঘ আলোচনা করে জানায়, 11 Aug 1872 [রবি ২৮ শ্রাবণ] তারিখে জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু এই বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। ঘোষিত সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুপস্থিতিতে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি গৃহে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। *মধ্যস্থ* [২ ভাদ্র] পত্রিকা লেখে: 'বঙ্গভাষার বিখ্যাত লেখক রাজনারায়ণ বসু বীম্‌স্ সাহেবের প্রস্তাবিত "বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা ও রীতি সংস্থাপনী সভা" এই প্রসঙ্গোপরি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এক সুদীর্ঘ মৌলিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষার উৎপত্তি, ইতিহাস, উন্নতি প্রভৃতি সুদীর্ঘরূপে বিবৃত করিয়া পরিশেষে প্রকৃত প্রস্তাব আরব্ধ করেন। ...পরে কিয়ৎক্ষণ তর্কবিতর্কের পর সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব করেন যে সভা কর্তৃক বীম্‌স্ সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হয় যে তাঁহার মতে সাহিত্য-রীতি সংস্থাপনী সভা না হইয়া একটি সমালোচনা সভা হইলে ভাল হয়। এই প্রস্তাব সভ্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাত্রি ৮৷৷ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।'[৫৮] এই বক্তৃতার প্রতিবেদন বিভিন্ন মন্তব্য-সহ ন্যাশানাল পেপার [No 33, 14 Aug, pp. 391-92]-এ ও *রহস্যসন্দর্ভ* [৭ পর্ব্ব ৭১ খণ্ড।৭৬-৮০] পত্রিকাতেও[৫৯] প্রকাশিত হয়। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' [১২৮০] গ্রন্থে[৫৯] বীম্‌সের প্রস্তাবের প্রতিকূল সমালোচনা করেন।

বাংলার বিদ্বন্মণ্ডলী বীম্‌সের প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও তাঁর আকাঙ্ক্ষা যে সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছিল, সে-কথা বলা যায় না। বীম্‌সের প্রস্তাবিত অভিধান প্রণয়নে ব্রতী না হলেও, সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদের একত্রিত করে আলোচনা, মতবিনিময়, সাহিত্যপাঠ, বক্তৃতা, সংগীত-পরিবেশন, অভিনয় ইত্যাদি আয়োজন করার কয়েকটি প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ৬ বৈশাখ ১২৮১ [18 Apr 1874] জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'ন্যূনাধিক ১০০ ব্যক্তি'র উপস্থিতিতে যে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, তাকে আমরা উক্ত লক্ষ্যের অভিমুখী মনে করতে পারি। এই বৎসর ১৮ পৌষ [1 Jan 1875] যে 'কলেজ রি-ইউনিয়ন' উৎসবের প্রবর্তন ঘটে, অন্য উদ্দেশ্য সত্ত্বেও তা আলোচ্য প্রয়োজনকে অনেকটা সিদ্ধ করেছিল। এরপর ১২৮২ বঙ্গাব্দে* যে 'বঙ্গ-ভাষা সমালোচনী-সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় [কয়েকটি অধিবেশনের বিবরণ ছাড়া সভাটির সংগঠন সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনি], তার নামেই প্রমাণ যে বীম্‌সের প্রস্তাব সংগঠকদের অন্যতম প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যে 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাকেও আমরা এইসব প্রচেষ্টার উত্তরসূরি বলতে পারি। শেষপর্যন্ত ৮ শ্রাবণ ১৩০০ [23 Jul 1893] তারিখে The Bengal Academy of Literature বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার ফলে বীম্‌সের মনোবাসনা চরিতার্থ হয়, যার সঙ্গে সূচনার অব্যবহিত পরবর্তী কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন নানা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

১ জীবনস্মৃতি ১৭।২৯৯

২ ছেলেবেলা ২৬|৬৩০

৩ জীবনস্মৃতি ১৭।২৮৯

৪ ‘আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা’: আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩৩২

৫ জীবনের ঝরাপাতা। ৩

৬ জীবনস্মৃতি ১৭।২৮৯

৭ ঐ ১৭।২৮৯-৯০

৮ ঐ ১৭।২৯০

৯ ঐ ১৭।২৯০-৯১

১০ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩৩৩

১১ জীবনস্মৃতি ১৭।২৯১

১২ ঐ ১৭।২৯৯-৩০০

১৩ ঐ ১৭।৩০১

১৪ পত্রাবলী। ৪৯, পত্র ৩৮

১৫ দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।৪৩১

১৬ তত্ত্ব, ফাল্গুন।১৭৭

১৭ ঐ।১৮১

১৮ জীবনস্মৃতি ১৭।৩০৬

১৯ ঐ [১৩৬৮]।১৬৭

২০ ঐ ১৭।৩০৭

২১ ঐ ১৭।৩০৯

২২ ঐ ১৭।৩১০

২৩ ঐ ১৭।৩১০

২৪ ঐ ১৭।৩১২

২৫ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩৩৩

২৬ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

২৭ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩৩৩

২৮ জীবনস্মৃতি ১৭।৩১৫

২৯ ছিন্নপত্রাবলী [১৩৬৭]।৩৬৩-৬৪, পত্র ১৬৬

৩০ রবীন্দ্রজীবনী ১[১৩৯২।৪০

৩১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘বঙ্গভাষার লেখক’ [১৩১১]।৭৯৮

৩২ ছিন্নপত্রাবলী।৩৬৪, পত্র ১৬৬

৩৩ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩৩৪

৩৪ জীবনস্মৃতি ১৭।৩১৬

৩৫ ঐ ১৭।৩১৭

৩৬ ঐ ১৭|৩১৮

৩৭ ঐ ১৭|৩১৬

৩৮ ঐ ১৭।৩১৬-১৭

৩৯ ঐ ১৭|৩১৯

৪০ পুরাতনী।৩৩

৪১ জীবনের ঝরাপাতা।১

৪২ ঐ।১৮

৪৩ দ্র সুশীল রায়: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [১৩৭০]।২৩৮

৪৪ প্রতিমা দেবী: স্মৃতিচিত্র [১৩৫৯]।৬২

৪৫ 'কৈফিয়ৎ': ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩।১৬

৪৬ আত্মচরিত [১৩৬৮]।১৫০

৪৭ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।৪৪২

৪৮ রবীন্দ্রজীবনী ১[১৩৯২]।৩৯-৪০

৪৮ক শান্তিনিকেতন আশ্রম।১৩-১৪

৪৯ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।৫৯-৬০

৫০ সা-সা-চ ২।২২।৪৯-৫০

৫১ বঙ্কিম রচনাবলী ২ [সাহিত্য সংসদ: ১৩৬১]।২৮৩

৫২ 'বঙ্কিমচন্দ্র': আধুনিক সাহিত্য ৯।৩৯৯-৪০০

৫৩ জীবনস্মৃতি ১৭।৩৩৩

৫৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় নাট্যশালা|[১৩৫১]।৬৬

৫৫ ঐ।৬৩-৬৪

৫৬ ঐ।৫৭

৫৭ দ্র *The Bengalee*, 26 Apr 1873

৫৮ সুনীল দাস-সম্পাদিত মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি [১৩৮৭]।১৮৭

৫৯ দ্র মদনমোহন কুমার: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস [১৩৮১]।১৮১-৮৯

* ক্যাশবহি-তে এই ব্যক্তির কোনো সন্ধান আমরা পাইনি। জীবনস্মৃতি-র প্রথম ও দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে এর প্রসঙ্গ নেই, তৃতীয় পাণ্ডুলিপি বা *প্রবাসী*-র প্রেসকপিতে মার্জিনে সংযোজন হিসেবে এই অংশটি দেখা যায়। শেষ বয়সে রচিত 'গল্পসল্প' গ্রন্থে 'মুনশি' গল্পে চরিত্রটি আবার আবির্ভূত হয়েছে [দ্র গল্পসল্প ২৬|৩২৫-২৮]। অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮ সং, পৃ ১৮] গ্রন্থে এক 'ফার্সি পড়াবার মুনশী'র কথা বলেছেন, মনে হয় এঁরা একই লোক।

* অবশ্য 'গল্পসল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মুক্তকুন্তলা' [২৬।৩৫৯-৬১] গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে মনে হয় অভিনয় হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র হালদার সম্পর্কে আরও সংবাদের জন্য দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২।

† প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, '১২৭৯ সালে শীতকালের প্রারম্ভে (১৮৭২ শেষভাগে) দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়-ভ্রমণান্তে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন—কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের উপনয়ন-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।'—রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]।৩৭। বস্তুত মাঘ ১২৭৮-এ হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর তিনি উত্তরবঙ্গের জমিদারি, কার্তিক মাসে বোলপুরে ও অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকায় যাওয়া ছাড়া কোনো দূরদেশ-ভ্রমণে যাননি। ৩১ ভাদ্র জাতীয় সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব, ১৩ কার্তিক [সোম 28 Oct] অন্নদাচরণ কাস্তগিরির কন্যার সঙ্গে সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তের বিবাহসভায় উপস্থিতি ও পৌষ মাসে কালনা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাংবৎসরিকে তাঁর যোগদান এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

*[১] এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র [৮ম কল্প ২য় ভাগ, ৩৫৫ সংখ্যা] চৈত্র ১৭৯৪ শক ২০৩-০৬ পৃষ্ঠায় 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।/ উপনয়ন।/ সমাবর্ত্তন।' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। জীবনস্মৃতি-র বিস্তৃত গ্রন্থ-পরিচয়-সমন্বিত স্বতন্ত্র সংস্করণে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। দ্র জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ১৬৫-৬৯

*[২] 'রবী সোম সত্যপ্রসাদ বাবু দিগের/ কর্ণ বেধ জন্য তিন জোড়া স্বর্ণ বীরবৌলি তৈয়ারির/ স্বর্ণ ক্রয় গিণী এক থান ক্রয়/ ১০ল°' —ক্যাশবহি, ২৩ মাঘ [মঙ্গল 4 Feb]

*[৩] ছেলেবেলা ২৬।৬২৪; অতিরিক্ত তথ্য: 'দ° ২৬ রোজের ব্রহ্মচারীদিগের খাবার তৈয়ারির জন্য/ বাটীর মধ্যে ছানা ক্রয় করিয়া দেওয়া যায় গুঃ কিনি দাসী।ল°' —ক্যাশবহি, ২৯ মাঘ [সোম 10 Feb]।

*[৪] এই তারিখটি আমাদের অনুমিত। অনুমানের ভিত্তি ২৯ মাঘ-এর একটি হিসাব—'গত রোজের সমাবর্ত্তনে বেদীতে দেওয়া যায়/৩০'

* এই মন্ত্রগুলি রবীন্দ্র-রচনায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোথায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার জন্য দ্র ড পম্পা মজুমদার, রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস [১৩৭৯]। উপনয়ন-সংক্রান্ত আরও সংবাদের জন্য দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩।

* রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম', দুপুরের দিকে যাত্রা শুরু করলে তবেই সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছনো সম্ভব। তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে ক্যাশবহি-র ঐ-তারিখের একটি হিসাব থেকে—'কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন জন্য ব্যয়/উক্ত মহাশয়ের ও রবীবাবুর ফাষ্ট ক্লাস টিকিট/ ১৫'। এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ট্রেন-ভ্রমণ।

* *Lett's Diary:* তখনকার দিনের বহুল-প্রচারিত ডায়ারি; বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে পাওয়া যেত। *The Friend of India* পত্রিকায় Thacker Spink & Co.; G.C. Hay & Co. R.C. Lepage & Co. প্রভৃতি বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতাদের প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে এর উল্লেখ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিবরণ অনুসারে মনে হয়, তাঁর ব্যবহৃত ডায়ারিটি 'Desk Edition' জাতীয়।

* বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে 'শান্তিনিকেতন/ আশ্রম/ বোলপুর' লিখিত রাবার স্ট্যাম্প দেওয়া Peer Parley's Tales পর্যায়ের সাতটি বই আছে(১) *Tales About England, Scotland, Ireland and Wales* (2) *Tales About Plants* [1839] (৩) *Tales about the United States of America* (1865) (8) *Universal History on the basis of Geography* (৫) *Tales about the Sea* (1863) (৬) *A Grammar of Modern Geography* (1855) (৭) *Tales about Christmas.* এর মধ্যে কোনো কোনো বইয়ের পাতা পর্যন্ত কাটা হয়নি।

* "অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম। ...সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়গুলো, 'কর, খল' 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—এর বেশি আর নয়। তার পরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠতে লাগলুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগল, হিমালয় যত বড়োই হোক-না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে।"—ভানুসিংহের পত্রাবলী [১৩৬৯]। ২৯-৩০, পত্র ১২

* প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে [১৩৬১] উদ্ধৃতিটির শেষাংশ বাদ দিয়ে পাদটীকায় 'কে রচয়িতা, এ বিষয়ে বিতর্ক আছে' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেবেন্দ্রনাথ Feb 1857-এ যখন প্রথম অমৃতসরে গিয়েছিলেন, তখনই স্বর্ণমন্দিরে গুরু নানকের এই ভজনটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, দ্র আত্মজীবনী। ১৮৪-৮৫

* 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি অবশ্য আমাদের আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত হয়নি; এটি শ্রাবণ ১২৮০ থেকে ভাদ্র ১২৮১ সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। 'বিষবৃক্ষ' সমাপ্ত হবার পর চৈত্র ১২৭৯ সংখ্যায় 'ইন্দিরা' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। 'বিষবৃক্ষ'-এর শেষ চারটি অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ হয়তো হিমালয়-যাত্রার আগে পড়ার সুযোগ পাননি, দীর্ঘ তিন মাসের প্রতীক্ষার পর প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করে তবেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটে।

* এই বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা তিনি ১৭ আশ্বিন [বুধ 2 Oct 1872] তারিখে জাতীয় সভার অধিবেশনে প্রদান করেন।

* সময়টি অনুমিত; ২২ মাঘ ১২৮৩ [3 Feb 1877] তারিখে এই সভার ২য় বৎসরের ৩০শ অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ 'বঙ্গদেশ ও বোম্বাই' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ত্র য়ো দ শ   অ ধ্যা য়

১২৮০ [1873-74] ১৭৯৫ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ত্রয়োদশ বৎসর

চৈত্র ১২৭৯-র শেষে অমৃতসর থেকে যাত্রা শুরু করে পাঠানকোট হয়ে সানুচর দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ড্যালহৌসি পাহাড়ে অবস্থিত বক্রোটা শিখরে পৌঁছন সম্ভবত বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়াতেই। ১৪ বৈশাখ [শুক্র ২৫ Apr 1873] 'বক্রোটা' থেকে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন: 'আমি অমৃতসর হইতে আবার সেই আমার বাক্রোটা শেখরে আসিয়া পহুঁছিয়াছি। এখানে তোমার ৭ই বৈশাখের পত্র পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। ... রবীন্দ্র এখানে ভাল আছে এবং আমার নিকট সংস্কৃত ও ইংরাজি অল্প অল্প পাঠ শিখিতেছে। ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মও পড়াইয়া থাকি।'[১]

বক্রোটায় তাঁদের বাসা ছিল একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। বৈশাখ মাস হলেও শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন-কি পথের যে-অংশে রোদ পড়ত না, সেখানে তখনও বরফ গলেনি। বাসার নিম্নবর্তী অধিত্যকায় যে বিস্তৃত পাইন গাছের অরণ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ একটি লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি নিয়ে সেখানে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। 'বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ! কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না! বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।'[২] রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতা কিছুদিনের মধ্যেই 'বনফুল' কাব্যের মধ্যে রূপ নিয়েছিল। কোনো কেনো দিন দুপুরে বালক লাঠি হাতে একলা এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে চলে যেতেন। দেবেন্দ্রনাথ কোনো দিনই বালকের এই স্বেচ্ছাভ্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ বা বাধা-নিষেধের নিগড়ে তাঁকে বাঁধবার চেষ্টা করেননি। হয়তো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই বালকের প্রতি যে অবিচার করা হচ্ছিল, এইভাবেই তিনি তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই হঠাৎ-পাওয়া স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের কোনো সুযোগ ত্যাগ করেননি। এই নিরঙ্কুশ বিচরণের মধ্যে তাঁর একটি মজা ছিল মনে মনে ভয় বানিয়ে তোলাতে। তিনি লিখেছেন: 'একদিন ওৎরাই পথে যেতে যেতে পা পড়েছিল গাছের তলায় রাশ-করা শুকনো পাতার উপর। পা একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে দিলুম। কিন্তু না ঠেকাতেও তো পারতুম। ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে অনেকদূর নীচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত। ... তা ছাড়া ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ভালুকের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারত,... ঘটবার মতো কিছুই ঘটে নি, কাজেই অঘটন সব জমিয়েছিলুম মনে।'[৩] কল্পনাপ্রবণ বালক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিংবা বিনা উপলক্ষেই কেমন করে নিজের মনের মধ্যেই

একটি কল্পজগত সৃষ্টি করে নিতেন, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আগে আমরা দেখেছি—পরেও তা দেখতে পাব। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কাব্য-ভাবনার এটি একটি বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। হিমালয় থেকে ফিরে মায়ের সান্ধ্যসভায় বা অন্যত্র সত্য ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে এই কাল্পনিক সম্ভাবনার গল্পও সমভাবে তিনি পরিবেশন করেছেন।

বক্রোটার বাসায় রবীন্দ্রনাথের শোবার ঘর ছিল একটি প্রান্তে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে জানলার ভিতর দিয়ে নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোয় 'পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি' দেখতে পেতেন। এক-একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতেন পিতা একটা লাল রঙের শালে সর্বাঙ্গ ঢেকে হাতে একটা মোমবাতির সেজ নিয়ে নিঃশব্দচরণে কাঁচ দিয়ে ঘেরা বাইরের বারান্দায় উপাসনায় চলেছেন। রাত্রির অন্ধকার থাকতেই তিনি পুত্রকে ডেকে তুলতেন, উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করার সেইটিই ছিল নির্দিষ্ট সময় 'শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্‌বোধন।' আমরণ এটি তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

সূর্যোদয়ের সময়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রভাতের উপাসনার শেষে এক বাটি দুগ্ধ পান করে পুত্রকে পাশে নিয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করে আর-একবার উপাসনা করতেন। তারপর তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ছাপ্পান্ন বৎসর, তবু তাঁর সঙ্গে দ্বাদশবর্ষীয় বালক তাল রাখতে পারতেন না, পথিমধ্যেই কোনো-একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়ে পায়ে-চলা পথ বেয়ে বাড়িতে ফিরে আসতেন।

ভ্রমণশেষে দেবেন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরে এসে পুত্রকে একঘণ্টা ইংরেজি পড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন, এখানে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের ইংরেজি জীবনী তাঁর পাঠ্য ছিল। তারপর দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডা জলে স্নান, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মেশাতে ভৃত্যদের সাহস হত না। পুত্রকে উৎসাহ দেবার জন্য গল্প করতেন, যৌবনে তিনি নিজে কেমন দুঃসহশীতল জলে স্নান করতেন। তিনি নিজে প্রচুর পরিমাণে দুধ খেতেন। কিন্তু অহিফেনসেবী ঈশ্বর ভৃত্যের দুগ্ধের চাহিদা মেটাতে গিয়ে দুধ-না-খাওয়াটাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং পিতার সঙ্গে প্রতিবার দুগ্ধপান করা তাঁর কাছে প্রীতিপ্রদ না হওয়াই স্বাভাবিক। বাধ্য হয়ে তাঁকে ভৃত্যদের শরণাপন্ন হতে হল, 'তাহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতাবশত বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশি করিয়া দিত।'

দুপুরে খাবার পর দেবেন্দ্রনাথ আর-একবার পুত্রকে পড়াতে বসতেন। কিন্তু প্রত্যুষের নষ্টঘুম তার অকালব্যাঘাতের শোধ নিত। তাঁকে ঘুমে ঢলে পড়তে দেখে পিতা ছুটি দিয়ে দিলে ঘুমও কোথায় ছুটে যেত। 'তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।'

অবসর সময়ে পিতাপুত্রে নানারকম গল্প হত। দেবেন্দ্রনাথ প্রবাসেই বেশিদিন কাটাতেন, সুতরাং পুত্রের কাছে সংসারের যে ছবিটি পেতেন সেটি অন্য কারোর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাড়ি থেকে কারোর চিঠি পেলে রবীন্দ্রনাথ সেটি পিতাকে দেখাতেন। তেমনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পুত্রেরা পিতাকে চিঠি লিখলে তিনি সেই চিঠি রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দিতেন। পিতাকে কিভাবে চিঠি লেখা উচিত, এইভাবেই সেই শিক্ষা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। এই সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করতেন।

একবার সত্যেন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে ছিল, 'কর্মক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্জু' হয়ে খেটে মরছেন—সেই জায়গায় কয়েকটি বাক্যের অর্থ দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পুত্র যে অর্থ করলেন, পিতার তা মনোনীত

হল না—তিনি অন্য অর্থ করলেন। কিন্তু বালক তাঁর ধৃষ্টতায় সেই অর্থ স্বীকার না করে বহুক্ষণ পিতার সঙ্গে তর্ক করেছিলেন। আর-কেউ হলে নিশ্চয় ধমক দিয়ে তাঁকে নিরস্ত করতেন,—কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত পরম ধৈর্যের সঙ্গে পুত্রকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আর-একটি বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন—যা আমরা পূর্বে উল্লেখ না করে একসঙ্গে আলোচনার জন্য রেখে দিয়েছি—সেটি হল জ্যোতির্বিদ্যা। জ্যোতির্বিদ্যা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীও পিতার নিকট জ্যোতির্বিদ্যা-শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন।[*১] 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি'তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও অনুরূপ কথা লিখেছেন।[*২] শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালেই দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল—'সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম।'[৪] অমৃতসরেও তিনি Richard A. Proctor-এর লিখিত 'সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।[*৩] বক্রোটা যাত্রার পথে 'ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।'[৫] অন্যত্র তিনি এ-সম্বন্ধে লিখেছেন: 'বয়স তখন হয়তো বারো হবে... পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে ক'রে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'[৬] বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' [১৩১১] গ্রন্থে সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের যে 'সংক্ষিপ্ত পরিচয়' লেখেন, সেখানে এ-বিষয়ে একটু অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়া যায়—'রবীন্দ্রনাথ প্রক্টরের রচিত সহজপাঠ্য ইংরাজী জ্যোতিষগ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতেন। ইহাই তাঁহার বাঙ্গলা গদ্যরচনার সূত্রপাত।' [পৃ ৯৮৫]

একই প্রসঙ্গে এতগুলি উদ্ধৃতি দিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার একটি বিশেষ কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ বক্রোটায় থাকার সময়েই *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় [পৃ ৩০-৩২] 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করে, এবং আষাঢ় [পৃ ৬৪-৬৭], আশ্বিন [পৃ ১২৫-২৮], কার্তিক [পৃ ১৪২-৪৮], পৌষ [পৃ ১৮৪-৮৮] ও মাঘ [পৃ ২০৪-০৭] সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' অবস্থাতেই বন্ধ হয়ে যায়। 12 Oct 1939 [বৃহ ২৫ আশ্বিন ১৩৪৬] তারিখে প্রখ্যাত গবেষক ও সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখলে, তিনি 15 Oct [রবি ২৮ আশ্বিন] উত্তরে লেখেন:

পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালে তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক [আনন্দচন্দ্র] বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোন অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না।[৭]

সজনীকান্ত এই চিঠি উদ্ধৃত করে লিখেছেন: 'আমাদের মনে হয়, ইহার পর আর কাহারও মনে এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।' কিন্তু সংশয় যে ছিল, সেই কারণেই তিনি পূর্বে লিখেছিলেন: 'এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি বলিয়া নমুনা দিলাম না।' বস্তুত নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া সম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাঁর পিতা প্রক্টরের গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁকে জ্যোতিষ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতীয় জ্যোতিষ সম্পর্কে কিছু বললেও 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের লক্ষ্য একান্তভাবেই শিরোনামের অনুসারী। তারই ভূমিকা-স্বরূপ প্রথম দুটি কিস্তিতে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করলেও লেখক তাঁর উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করেছেন আশ্বিন-কিস্তির শেষ অনুচ্ছেদে:

সর্ব্ব সাধারণ মধ্যে পূর্ব্ব কালীন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের জ্ঞান বিস্তার করণাভিপ্রায়ে আমরা সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ সূর্য্য-সিদ্ধান্তের বিশদ অনুবাদ প্রচার করিবার মানস করিয়াছি। কিন্তু সেই গ্রন্থোল্লিখিত সিদ্ধান্ত সকল এরূপ সঙেক্ষপে রচিত, যে শ্রীমৎ ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক পুস্তকের গোলাধ্যায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে তৎসমুদায় বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। এই হেতু আমরা প্রথমে উক্ত অধ্যায়ের অনুবাদ শেষ করিয়া তাহার পর সূর্য্য-সিদ্ধান্তের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইব। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ যাহাতে সর্ব্ব সাধারণের বোধ গম্য হইতে পারে তাহার নিমিত্ত আমরা আধুনিক জ্যোতির্ব্বিৎগণকৃত টীকা সমুদায়ের অনুবাদ করিতে ত্রুটি করিব না।

লেখক পাদটীকায় লেখেন, বারাণসী সংস্কৃত কলেজের গণিতধ্যাপক বাপুদের শাস্ত্রী সূর্য-সিদ্ধান্তের এবং তিনি ও ল্যান্সিনট্ উইল্‌কিন্‌সন একত্রে গোলাধ্যায়ের যে ইংরেজি অনুবাদ ও টীকা করেছেন সেইটিই তাঁর প্রধান অবলম্বন। এরপর তিনি দুটি কিস্তিতে 'ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থের গোলাধ্যায় স্থিত ভুবনকোষ পরিচ্ছেদ'-এর একাদিক্রমে অনুবাদ করেছেন। মাঘ-কিস্তিতে তিনি অনুবাদ করেন 'সূর্য্য সিদ্ধান্ত' প্রথম পরিচ্ছেদ—লক্ষ্য-পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যাটি হল:

আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থের গোলাধ্যায় প্রকাশ করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে হস্তার্পণ করিব, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে উক্ত গোলাধ্যারের অধিকাংশ স্থান এ রূপ দুর্ব্বোধ যে তাহার অবিকল অনুবাদ কখনই সাধারণ পাঠক মণ্ডলীর তৃপ্তিজনক হইবে না। উক্ত অধ্যায়াপেক্ষা সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনেকাংশে সরল; সুতরাং আমরা আপাতত তাহাই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সূর্য্য সিদ্ধান্তের যে সকল বিষয় সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার গোলাধ্যায়ে কোন নূতন কথা বলিয়াছেন আমরা তাহা টীকাকারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

এর পরে 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' লেখা থাকলেও রচনাটির আর-কোনো অংশ পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়নি।

এখন প্রশ্ন, এই জিনিসকে কি রবীন্দ্র-রচনা 'অন্য কোনো যোগ্য লেখক' দ্বারা 'প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ' করে দেওয়া বলা যেতে পারে? এখানে লেখকের লক্ষ্যটিই ভিন্নতর এবং তিনি সেই লক্ষ্যেও স্থির থাকতে পারেননি। পিতার কাছে লব্ধ শিক্ষা ও বর্তমান রচনাটি এতই আলাদা ধরনের যে, এই রচনা প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের মন তৃপ্ত হওয়ার কথা নয়। সজনীকান্ত কোথাও লেখেননি, প্রবন্ধটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন—আমাদের ধারণা, তিনি যদি দেখাতেন [এমন অনেক অ-নামা রচনা তিনি দেখিয়ে তাঁর মতামত সংগ্রহ করেছিলেন] রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবেই অস্বীকার করতেন।

তাহলে রবীন্দ্রনাথের মনে এরূপ বদ্ধমূল ধারণা কি করে জন্মাল যে তাঁর কাঁচা হাতের লেখা কোনো যোগ্য লেখক দ্বারা সংস্কৃত হয়ে *তত্ত্ববোধিনী*-তে প্রকাশিত হয়েছিল? অনেকে মনে করেছেন, *তত্ত্ববোধিনী*-র পৌষ ১৭৯৬ শক [১২৮১: Dec 1874] সংখ্যায় 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' [পৃ ১৬১-৬৩] 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' এই প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের রচিত সেই জ্যোতিষ-সম্পর্কিত রচনা। জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]-র তথ্যপঞ্জীতে সংশয়-চিহ্নিত ভাবে প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হয়েছে.[দ্র পৃ ২৪৪, টীকা ৫১॥২]। প্রবন্ধটির শেষে 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' লেখা থাকলেও পরবর্তী কোনো সংখ্যায় এই ক্রমানুসৃতি দেখা যায় না। সাম্প্রতিক আলোচনায় সুশান্তকুমার মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা' প্রবন্ধে[৮] এই রচনাটিই যে রবীন্দ্র-রচিত জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধ এই মত জোর দিয়ে সমর্থন করেছেন এবং সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব [১৩৮৫] গ্রন্থে[৯] তা নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছেন। শ্রীমিত্রের মতে, এই প্রবন্ধেই প্রক্টর-বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয় এবং তাঁর *Half-hours with the Telescope* [1868] ও *The Orb Around Us* [1872]* গ্রন্থ দুটির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি রচনাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'কবিকল্পনা' বা 'ঐশ্বরিক চিন্তা'র বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলেও এর কাঁচা ভাষার জন্যই *তত্ত্ববোধিনী*-তে ক্রমানুসৃত হয়নি বলে অনুমান করেছেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কবিকল্পনা বা ঐশ্বরিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নয়, দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধার করা, আর এর ভাষাকে খুব কাঁচাও বলা যাবে না। বরং এই প্রবন্ধের বহু ভাবনার পরিণত রূপ বিশ্বপরিচয় [১৩৪৪] গ্রন্থে পাওয়া যায়। ক্রমানুসৃতির অভাব সম্পর্কে তিনি অনুমান করেছেন, হয়তো যে-সব গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই সেগুলি জীবের আবাসভূমি কিনা, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা *তত্ত্ববোধিনী*-র পাঠক বা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা সমর্থন করেননি। কিন্তু আরও কিছু গ্রহণযোগ্য তথ্য না পাওয়া গেলে এটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কিনা এ-সম্পর্ক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন। তবে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র'র চেয়ে 'গ্রহগণ জীবের আবাস-ভূমি' প্রবন্ধের দাবি অনেক বেশি।

ইংরেজি, সংস্কৃত ও জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ হয়তো পুত্রকে ইতিহাসও পড়াতে চেয়েছিলেন। ২১ বৈশাখ [শুক্র 2. May] তারিখের হিসাবে দেখা যায় তাঁর কাছে দুখানা বই পাঠানো হয়েছে—'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত' ও Lethbridge-এর লেখা *History of India*। হয়তো আরও কিছু কিছু বিষয় পড়ানোর আয়োজনও ছিল, যে-পরিমাণ বই হিমালয়-যাত্রায় পূর্বাহ্নে রবীন্দ্রনাথের জন্য কেনা হয়েছিল, তাতে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে কোনো উল্লেখ না করায় নিশ্চিত করে কিছু বলবার উপায় নেই।

হিমালয় অবস্থান-কালে দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের অনুচর ও ভ্রমণসঙ্গী কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তিনি এককালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিলেন। 'সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত, "আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব।" শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত।'* এঁর কাছে দাশরথি রায়ের লেখা অনেকগুলি পাঁচালির গান রবীন্দ্রনাথ শিখে নিয়েছিলেন—"ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন', 'প্রাণ তো অন্ত হল আমার কমল-আঁখি', 'রাঙা জবায় কী শোভা পায় পায়', 'কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে', 'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে' ইত্যাদি। এই কিশোরী চট্টোপাধ্যায়ই তাঁর

শৈশবে ভৃত্যদের কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠের আসরে হঠাৎ এসে দাশরথি রায়ের পাঁচালির 'অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে' তাঁদের হতবুদ্ধি করে দিতেন।

আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে যে, রবীন্দ্রনাথ কিশোরীনাথের সঙ্গে আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে হিমালয় থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। এই বিভ্রান্তির কারণ 'হিমালয় বক্রোটাশেখর' থেকে ১৪ আষাঢ় [শুক্র 27 Jun] রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ: 'রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্র স্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি—তাহার প্রমুখাৎ এখানকার তাবৎ বৃত্তান্ত চুম্বকরূপে জানিতে পারিয়াছ,. . . ।'† কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১১ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 23 May] তারিখের পূর্বেই যে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তার প্রমাণ উক্ত তারিখে ক্যাশবহি-তে লিখিত একটি হিসাব: 'কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট নিজ হিসাবের বার্ষিক জমাখরচ/ মোট হিসাব এস্টেটের চেক রবীবাবু সেজবাবু [হেমেন্দ্রনাথ] কিশোরীনাথ চট্টো/প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের ১ পত্র ও সেজবাবুর দেওা কুশুমাঞ্জলি এক দফা/সমুদায় এক লেফেফায় রেজেষ্টারির ব্যয় ১।।'। লক্ষ্য করবার বিষয়, এখানে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে 'রবীবাবু' ও 'কিশোরীনাথ চট্টো'-র দুখানি চিঠিও পাঠানো হয়েছে। নিরাপদে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের সংবাদই চিঠি-দুটির বিষয়বস্তু ছিল, এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। রাশিয়ানদের সংবাদ দিয়ে মায়ের নির্দেশে পিতাকে চিঠি লেখার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বর্ণনা করেছেন: কিন্তু আমরা তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সেই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি, সে কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সেই হিসেবে বর্তমান চিঠিটির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট এবং আশা করা যায় পিতার কাছে শিক্ষালাভের পর যথাবিহিত পাঠ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই চিঠিটি লিখতে পেরেছিলেন, এর জন্য মহানন্দ মুনশি বা আর কারোর সহায়তার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। এখানেই শেষ নয়, কয়েকদিন পরে ২৮ জ্যৈষ্ঠ [সোম 9 Jun] রবীন্দ্রনাথের আরও একটি পত্র দেবেন্দ্রনাথের কাছে প্রেরিত হয়েছে। পত্র দুটি মহাকালের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি এটা আমাদের দুর্ভাগ্য—কিন্তু সন-তারিখযুক্ত পত্রদ্বয়ের সংবাদলাভ করাটাকে আমরা সৌভাগ্য জ্ঞান করতে পারি।

এইখানে একটি কৌতূহলজনক তথ্য উদ্ধার করা দরকার। *তত্ত্ববোধিনী*-র ভাদ্র ১৭৯৫ শক [১২৮০: Aug 1873] সংখ্যার ১১২ পৃষ্ঠায় আদি ব্রাহ্মসমাজের আষাঢ় মাসের 'আয় ব্যয়'-এর হিসাবে 'শুভকর্ম্মের দান' শিরোনামায় রাজারাম মুখোপাধ্যায় [রবীন্দ্রনাথের মেজদি সুকুমারী দেবীর শ্বশুর] ১০ টাকা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪ টাকা, তার সঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২ ́১৫' লেখা আছে। দানের অঙ্কটি কৌতুককর এবং কৌতূহলোদ্রেককারী। কী কারণে এই অঙ্কের টাকা রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে দান করেছিলেন, এ প্রশ্ন সহজেই মনে জাগতে পারে। এর উত্তরের ব্যাপারে পত্রিকাটি নীরব হলেও, ক্যাশবহি আমাদের সঠিক কারণটি জানিয়ে দেয়। ২৬ আষাঢ় [বুধ 9 Jul] তারিখের হিসাবে দেখা যায়: 'ব° বাবু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর/দঃ উহার ডেলহাউসী হইতে আগমন জন্য/পাথেয়র উদ্বর্ত্ত [উদ্বৃত্ত] ৮ ́৯ যাহা গত ১২ আষাঢ়/আমানত খাতায় জমা দেওয়া হইয়াছে/ তাহা নিজ রোজ কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের/লিখিত আদেশমতে রবিন্দ্রবাবুকে/ছয় টাকা ফেরত দেওয়া হয়/ ও উক্ত বাবুর নামে ব্রাহ্মসমাজে/২ ́ ৯ দান দেওয়া বাবদ/৮ ́ ৯'। হিসাবটি থেকে বোঝা যায় দানের পূণ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থলাভ তখন রবীন্দ্রনাথকে রীতিমত ধনী করে তুলেছিল, যেখানে সৌদামিনী দেবী প্রভৃতি দিদিদের মাসোহারা ছিল মাত্র দশ টাকা!

কিন্তু প্রসঙ্গটি উত্থাপনের অন্য তাৎপর্যও আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র এক জায়গায় লিখেছেন: 'বেশ মনে আছে, ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা অথবা আর-কোথাও হইতে একবার নিজের নামের দুই-একটা ছাপার অক্ষর পাইয়াছিলাম। তাহাতে কালি মাখাইয়া কাগজের উপর টিপিয়া ধরিতেই যখন ছাপ পড়িতে লাগিল, তখন সেটাকে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে হইল।'[১০] আর বর্তমান ক্ষেত্রে যখন মাসিক পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে তাঁর নাম প্রকাশিত হল, তা নিশ্চয়ই আরও রোমাঞ্চকর ব্যাপার, কিন্তু তখন তা দেখে বালক রবীন্দ্রনাথের মনে কী ধরনের অনুভূতি হয়েছিল, তা তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। উপনয়নের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যখন *তত্ত্ববোধিনী*-তে প্রকাশিত হয়, তাতে শুধু তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথের নাম মুদ্রিত হয়েছিল; *সোমপ্রকাশ*-এ তাঁর গতিবিধির যে সংবাদ বেরিয়েছিল, তাতেও নাম ছাপা হয়নি। সুতরাং পরবর্তীকালে যে-রবীন্দ্রনাথের নাম স্থানে-অস্থানে কোটি-কোটি বার মুদ্রিত হয়েছে, বর্তমান প্রসঙ্গে তা প্রথমতম, এইখানেই তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

এই সবই রবীন্দ্রজীবনে হিমালয়ভ্রমণের পরোক্ষ ফল, কিন্তু এই ভ্রমণ তাঁর প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রায় এক গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেছে। এতদিন শাসনের বেড়া তাঁকে সবার দৃষ্টির অন্তরালে রেখে দিয়েছিল, কিন্তু এখন তাঁর অধিকার অনেক প্রশস্ত হয়ে গেল, তিনি বাড়ির লোকের চোখে পড়লেন। পূর্বেই বলেছি, দেবেন্দ্রনাথ এর আগে অন্য কোনো পুত্রকে হিমালয়ে তাঁর নির্জন সাধনার সঙ্গী করেননি, সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যতিক্রম। দীর্ঘ তিনমাস পিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের এই দুর্লভ মর্যাদা লাভ করে তিনি সবার কাছেই আদরের সামগ্রী হয়ে উঠলেন।

ফেরবার সময় রেলের পথেই তাঁর ভাগ্যে আদরের সূত্রপাত। সঙ্গে কেবল একটি ভৃত্য নিয়ে মাথায় জরির টুপি পরে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে পরিপুষ্ট একা বালক ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন—'পথে যেখানে যত সাহেবমেম গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না।'[১১]

বাড়িতে পরিবর্তনটা আরও স্পষ্ট—'বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে-নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আর আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ [কাদম্বরী দেবী] ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।'[১১]

এই পরিবর্তনের মানসিক প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তাঁর পরিণত মনের ছাপ থাকলেও, বালকের মনস্তত্ত্ব বোঝার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। শিশুরা শৈশবে মেয়েদের স্নেহযত্ন অযাচিত ভাবে পেয়ে থাকে, আলো হাওয়ার মতো স্বাভাবিকভাবেই তা তাদের প্রতি বর্ষিত হয়, এই পাওয়া সম্পর্কে তাদের সচেতনতার কোনো কারণ ঘটে না, বরং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই আদরের জাল কেটে বেরিয়ে পড়াই তাদের লক্ষ্য হয়ে পড়ে। 'কিন্তু, যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়। আমার সেই দশা ঘটিল। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের ঘরে মানুষ হইতে হইতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েদের অপর্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া সে জিনিসটাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না।'[১১] যা

প্রতিদিন একটু একটু করে পেলে সহজ হয়ে যেত, তা হঠাৎ একদিনে সুদে-আসলে পরিশোধ হয়ে যাওয়ায় সেই বিপুল ঐশ্বর্যের ভার বহন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল!

পাহাড় থেকে ফিরে আসার পর প্রথম কিছুদিন গেল ঘরে ঘরে ভ্রমণের গল্প করে। কিন্তু বহুকথনের মাধ্যমে ভ্রমণের কাহিনী যতই বৈচিত্র্য হারাচ্ছিল, ততই কল্পনার দ্বারা তাকে পূরণ করতে গিয়ে মূল বৃত্তান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাবও প্রকট হয়ে উঠছিল।

কিন্তু তাতে মায়ের সায়ংকালীন বায়ুসেবনসভায় প্রধান বক্তা হয়ে ওঠার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। পূর্বেও নর্মাল স্কুলে পড়ার সময় সূর্য যে পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ গুণ বড়ো এই সংবাদ মায়ের কাছে পরিবেশন করেছেন বা ব্যাকরণের কাব্যালংকার অংশে উদাহৃত কবিতা আবৃত্তি করে তাঁকে বিস্মিত করেছেন। আর এখন তো সে তুলনায় জ্ঞানসম্পদে তিনি অনেক ধনী। সুতরাং প্রক্টরের গ্রন্থ থেকে আহৃত গ্রহতারা বিষয়ক জ্ঞান সেই 'দক্ষিণাবায়ুবীজিত সান্ধ্যসমিতি'র মধ্যে বিবৃত হতে লাগল। অবশ্য কিশোরী চাটুজ্যের কাছে শেখা পাঁচালির গানে আসর যেমন জমে উঠত, সূর্যের অগ্নি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় তেমন হত না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু মাকে তিনি যে সংবাদে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করতে পেরেছিলেন সেটি হল, যেখানে 'পৃথিবীসুদ্ধ'লোক কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়ে জীবন কাটায় সেখানে তিনি পিতার কাছে 'স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত' অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়ে এসেছেন! সুতরাং পুত্রগর্বে গরবিনী মাতা পুত্রের কণ্ঠে বাল্মীকির রামায়ণ শুনতে উৎসুক হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হায়, একে ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগে উদ্ধৃত কৈকেয়ীদশরথসংবাদের সামান্য পঠিত অংশ, তাও তার অনেকটাই আবার বিস্মৃতিবশত অস্পষ্ট হয়ে এসেছে —মায়ের কাছে আত্মগৌরব রক্ষার্থে সেটুকু পড়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তরও ছিল না; কিন্তু বাল্মীকির রচনা ও বালকের ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকটা অসামঞ্জস্য থেকে গেল। এর উপর যখন বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকেও এই পাঠ ও ব্যাখ্যা শোনাবার প্রস্তাব করলেন রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই প্রচুর আপত্তি জানালেন। কিন্তু সারদা দেবী তা শুনবেন কেন, এ তো কেবল পাঠে অমনোযোগের জন্য সবার কাছে ধিক্কৃত কনিষ্ঠ পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতির পরিচয়মাত্র নয়, স্বামী দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষার গুণেই এই উন্নতি—এমন অভিমানও তাঁর মনে দেখা দিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য ভালো—'দয়ালু মধুসূদন তাঁহার দর্পহারিত্বের একটু আভাসমাত্র দিয়া আমাকে এ-যাত্রা ছাড়িয়া দিলেন। বড়দাদা বোধহয় কোনো-একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন—বাংলা ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই 'বেশ হইয়াছে' বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।'[১২]

কিন্তু হিমালয়-ভ্রমণ ঘরে বাইরে অনেক বেড়া ভেঙে দিলেও আছে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি, আছে তার নিষ্প্রাণ শিক্ষাপদ্ধতি। গরমের ছুটির পর আবার সেখানেই ফিরে যেতে হল। Feb 1873-র পর মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে কেবল সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের বেতন-ই দেওয়া হয়, ৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 15 Jul] তারিখের হিসাবে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: 'সোমেন্দ্র ও রবিন্দ্র ও সত্যপ্রসাদ/বাবুর ইস্কুলের জুন মাহার ফি শোদ/গুঃ ঈশ্বর দাষ/ বিঃ ৩ বিল—১৮্' [বেতন-হারের এই বৈচিত্র্য একটু কৌতূহল উদ্রেক করে। বেঙ্গল অ্যাকাডেমির বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাকা—সেই হিসেবে তিন জনের বেতন পনেরো টাকা করেই সাধারণত পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু গত বৎসর Nov 1872 ও বর্তমান মাসে অর্থাৎ Jun 1873-তে বেতন দেওয়া

হয়েছে আঠারো টাকা করে। Nov 1872-র ক্ষেত্রে উল্লেখ করাই ছিল, 'গান শিখিবার দরুণ বেশী ২ হিঃ ৩'; বর্তমান ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করা যেতে পারে, একই কারণে তিন টাকা বেশি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ এক মাস করে কী গান তাঁরা শিখতেন, এই কৌতূহল মেটাবার কোনো উপায় নেই।] শ্রাবণ [Jul] মাসে বেতনের হিসাব লিখিত হলেও আষাঢ় মাসের [Jun 1873] শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ আবার স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করেছেন, এমন অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু পিতার সান্নিধ্যে তিন মাস যেভাবে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন তার সঙ্গে বেঙ্গল অ্যাকাডেমির পার্থক্য সুদুস্তর। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্কুলে যাওয়া আগের চেয়েও কঠিন হয়ে উঠল। নানা ছলনায় তিনি আবার স্কুল থেকে পালাতে শুরু করলেন। আগেই বলা হয়েছে, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ফাল্গুন মাস থেকে তাঁদের ইংরেজি পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য হিমালয় ভ্রমণের পর তাঁর ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তিনিও অন্তত বর্তমান বৎসরে কিছু অবস্থান্তর ঘটাতে পেরেছিলেন, এমন মনে হয় না।

এই সময়কার দুই-একটি কৌতুকজনক ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে উল্লেখ করেছেন। ম্যাজিশিয়ান প্রোফেসর হরিশ্চন্দ্র হালদারের সঙ্গে আমাদের পূর্বেই পরিচয় হয়েছে। তিনি দ্রব্যগুণ সম্পর্কে আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলতেন, কিন্তু দ্রব্যগুলির দুর্লভতার জন্য সেগুলি পরীক্ষা করে দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। একবার প্রোফেসর অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য একটি পদ্ধতির উল্লেখ করে ফেললেন। মনসাসিজের আঠা একুশবার বীজের গায়ে মাখিয়ে শুকিয়ে নিলে সে-বীজ থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছ জন্মে ফল ধরতে পারে, তাঁর মুখে একথা শুনে মালীর সাহায্যে আঠা সংগ্রহ করে এক রবিবার ছুটির দিনে তেতলার ছাদে তার পরীক্ষা চলল। তারপর থেকেই প্রোফেসর রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। অবশ্য তার কারণ তখনই তাঁর বোধগম্য হয়নি, কিছুদিন সময় লেগেছিল।

একদিন মধ্যাহ্নে তাঁদের পড়বার ঘরে প্রোফেসর প্রস্তাব করলেন বেঞ্চের উপর থেকে লাফিয়ে দেখা যাক কার কি রকম লাফাবার প্রণালী। সবাইয়ের মতো রবীন্দ্রনাথও লাফালেন। প্রোফেসর একটি 'অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ' বলে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, অনেক অনুনয়েও এর চেয়ে 'স্ফুটতর কোনো বাণী' তাঁর কাছ থেকে বার করা গেল না।

একদিন তিনি বললেন কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। অভিভাবকেরা আপত্তি না করায় সেখানে যেতেই কৌতূহলীরা তাঁদের ঘিরে ধরে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চাইল। তিনি দু-একটা গান শুনিয়ে কণ্ঠের মিষ্টত্বের প্রশংসাও পেলেন। তার পরে আহারের সময় সকলে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আহারপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করতে লাগল—'যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেদিন সকলে নিমন্ত্রিত বালকের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহা যদি স্থায়ী এবং ব্যাপক হইত, 'তাহা হইলে বাংলাদেশে প্রাণিবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইতে পারিত।'[১৩]

প্রকৃতপক্ষে, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ তাঁর অঘটনঘটনপটিয়সী প্রতিভার তাড়নায় আমের আঁটিতে জাদু প্রয়োগের সময় প্রোফেসরকে বুঝিয়েছিলেন যে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধের জন্যই অভিভাবকেরা বালকবেশে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটি তাঁর ছদ্মবেশমাত্র। আর সেই কারণেই যে লাফাবার প্রণালী

পরীক্ষা ও এত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ঘটা তা কিছুদিন পরে জাদুকরের কাছ থেকে দু-একটি অদ্ভুত পত্র পেয়ে তবেই রবীন্দ্রনাথের বোধগম্য হল।

এ-সব যাই হোক, বেঙ্গল অ্যাকাডেমির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিছুতেই সহজ হল না। নানা ছুতোয়, কখনো-বা মুনশির সহায়তায়, সেখান থেকে পালানো অব্যাহত রইল। এই চুরি-করে-পাওয়া ছুটির সদ্‌ব্যবহার তিনি কী করে করতেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন জীবনস্মৃতি-তে। দেবেন্দ্রনাথ কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে হিমালয় অঞ্চলেই বাস করছিলেন, সেখান থেকে দীর্ঘদিন পরে জোড়াসাঁকোয় ফেরেন পৌষ ১২৮১ [Dec 1874]-র প্রথম সপ্তাহে। সুতরাং বাহির-বাড়ির তেতলায় তাঁর বসবাসের ঘর বন্ধই থাকত। স্কুল-পালানো বালক সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে খড়খড়ির ফাঁকে হাত গলিয়ে ছিটকিনি টেনে দরজা খুলতেন এবং ঘরের দক্ষিণপ্রান্তে একটি সোফার উপরে চুপ করে বসে মধ্যাহ্ন কাটাতেন। 'একে তো অনেক দিনের বন্ধ-করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে-ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত।'[১৪] ছেলেবেলা থেকেই মধ্যাহ্নের এই রূপটি তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছে—'ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগি হয়ে যাবার সময়।'[১৫] এ ছাড়া অন্য আকর্ষণও ছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই শোবার ঘরের সংলগ্ন ছিল একটি স্নানের ঘর—তৈরি হয়েছিল 1871-এর প্রথম দিকে এবং ঐ বছরেরই শেষের দিকে বা 1872-এর প্রথমে পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসের পাঠানো জলের পাইপ থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং 'সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে-স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। একদিকে মুক্তি, আর-একদিকে বন্ধনের আশঙ্কা, এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত।'[১৪] রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটির কোনো সময় নির্দেশ করেননি, কিন্তু আমাদের ধারণা এটি বর্তমান বৎসরেরই ঘটনা।

বাহির-বাড়ির তেতালার ছাদ যেমন তাঁর মধ্যাহ্ন-অবকাশযাপনের জায়গা ছিল, ভিতর-বাড়ির ছাদও কখনো-কখনো তেমন কাজে ব্যবহৃত হত। এটি ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে—বড়ি দেওয়া, আমসি শুকোনো, ইঁচড়ের আচার ও আমসত্ত তৈরির জায়গা। 'শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর, বউদিদির [কাদম্বরী দেবী] আমসত্ত পাহারা, তা ছাড়া আরও পাঁচরকম খুচরা কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়।'* কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুন মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সুপুরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে।'[১৬]

এই সময়ের একটি কাব্যরসসম্ভোগের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সেটি হল বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনা। তিনি তখন দোতালায় দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পেতে সামনে একটি ডেস্ক নিয়ে এই কাব্যরচনায় ব্যাপৃত। তাঁর কবিকল্পনার প্রচুর প্রাণশক্তিতে তিনি যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে লিখতেন

অনেক বেশি। ফলে এত লেখা তিনি ফেলে দিতেন, যেগুলি কুড়িয়ে রাখলে বঙ্গসাহিত্যের একটা সাজি ভরে তোলা যেত। সেই কাব্যরসের ভোজে রবীন্দ্রনাথের মতো বালকেরাও বঞ্চিত হতেন না। এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলেন বলে তার সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীতে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই কাব্যের প্রভাবের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখেছিলেন: 'বড়দাদার আশ্চর্য্য ভাষা, তাঁহার বিচিত্র ছন্দ, তাঁহার ছবিতে ভরা পাকা হাতের রচনা আমার মত বালকের অনুকরণ চেষ্টারও অতীত ছিল। আশ্চর্য্য এই যে স্বপ্নপ্রয়াণ বারম্বার শুনিয়া তাহার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং উহা যে একটি অত্যাশ্চর্য্য কাব্য তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না—তথাপি আমার লেখায় তাঁহার নকল ওঠে নাই।'[১৭]

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, হিমালয়-প্রত্যাগত বালক রবীন্দ্রনাথ যে অকস্মাৎ সকলের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠেছিলেন, স্কুলের পড়াশুনোর নমুনা সেই মূল্য বেশিদিন রক্ষা করতে দিল না। যদিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'পাস-করা ভদ্রলোকের ছাঁচে ছেলেদের ঢালাই করতেই হবে, এ কথাটা তখনকার দিনের মুরুব্বিরা তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেন নি। সেকালে কলেজি বিদ্যার একই বেড়াজালে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল না। আমাদরে বংশে তখন ধন ছিল না কিন্তু নাম ছিল, তাই রীতিটা টিকে গিয়েছিল। লেখাপড়ার গরজটা ছিল ঢিলে'[১৮]—তবু অভিভাবকদের পক্ষে একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। 'একদিন বড়দিদি কহিলেন, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল"।'[১৯] তাই নিতান্ত অকালে দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে Dec 1873-তে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি-র পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এর পর তাঁদের সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি করে দেওগা হল। সজনীকান্ত দাস সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের খাতাপত্র অনুসন্ধান করে লিখেছেন: '১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের খাতাপত্র কলেজ হইতে খোয়া গিয়াছে, তবে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের খাতায় নূতন ভর্তি হওয়ার সংবাদ না থাকাতে মনে হয়, তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই ভর্তি হইয়াছিলেন।[২০] কিন্তু অনুমানটি যথার্থ নয়। ক্যাশবহি-তে ১৬ মাঘ [বুধ 28 Jan 1874] তারিখের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে:

> 'সোম রবি সত্ত্যপ্রসাদবাবু—
> দিগের বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে—
> ভোরতি হওয়ায় ফি—
> গুঃ সত্তপ্রসাদবাবু ও সোবারাম সীং—
> বিঃ ৩ বিল-------৯্
> ডিবজিট----------৯্
> ---------------
> ------------১৮্

—সংবাদটি আমাদের বিস্মিত করে। বেঙ্গল অ্যাকাডেমি ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ পর্বের মধ্যে 'বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে' অর্থাৎ মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হবার কথা রবীন্দ্র-রচনায় কোথাও উল্লিখিত হয়নি বা

অন্য কোনো সূত্রেও আমাদের জানা ছিল না। এই স্কুলের শিক্ষক রামসর্বস্ব পণ্ডিত [ভট্টাচার্য, বিদ্যাভূষণ] এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গে ম্যাকবেথের অনুবাদ শোনাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়েছিলেন কিংবা পরবর্তীকালে স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রজনাথ দে বালকদের গৃহ-শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এসব সংবাদ আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরা কোনোদিন সেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, এই তথ্যটি একেবারেই অজানা ছিল।

শুধু ভর্তি হওয়াই নয়, বেশ-কিছু বই কেনার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে পরের দিন অর্থাৎ ১৭ মাঘ [বৃহ 29 Jan] তারিখে: 'সোম রবি সত্ত্যপ্রসাদবাবুর/পুস্তক ক্রয়—/ডগলস সিরিজ *[Progressive English Reading Senes]* ৪ খান পইটিকেল/সিলেকসন ৪ খান হাইলিষ [Hiley's?] গ্রামার /৩ খান উইলসেন ইটিমলোজি *[Wilson's Etymology]* ৩ খান/আউট লাইসন অব মডরেন জিওগ্রাফি *[Outlines of Modern Geography]* /পাটমালা ৪ খান/ গুঃ রবিন্দ্রনাথবাবু/বিঃ ১ বৌচর ১৭ ল°। এই বইগুলি নিশ্চয়ই মেট্রোপলিটান স্কুলের পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী কেনা হয়েছিল [তিনজন ছাত্রের জন্য কোনো-কোনো বই চারখানা করে কেনা হয়েছে, একটি সম্ভবত গৃহশিক্ষকের ব্যবহারের জন্য]। এর আগের মাসেও বই কেনার হিসাব পাওয়া যায় ৩ পৌষ [বুধ 17 Dec] তারিখে: 'সোম রবিবাবুর টড হণ্ডার মেটিরি *[Todhunter's Geometry?]* ৩ খান ৫।০/সত্ত্যপ্রসাদবাবুর আলজাপরা বিগীন *[Beginner's Algebra?]* ১ খান ১।০'—এগুলি কি বেঙ্গল অ্যাকাডেমির জন্যে?

কিন্তু নতুন স্কুলে ভর্তি হলেও কোনোদিন তাঁরা স্কুলে গিয়েছিলেন, এমন সংবাদ অন্তত ক্যাশবহি থেকে পাওয়া যায় না। [অন্যান্য স্কুলের বেলায় ঘরের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই গাড়ি ভাড়া, পালকি ভাড়া ইত্যাদির জন্য খরচ দেখা যায়, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় না।] বরং তাঁরা স্কুলে না গিয়ে বাড়িতেই পড়াশুনো করতেন এমন ধারণা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের ২৫ মাঘ [শুক্র 6 Feb] তারিখের একটি পত্র থেকে: 'জ্যোতি/স্কুলে বালকেরা টেঁকিতে পারিল না। আমি দুই প্রহর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত এবং পণ্ডিত সকাল বেলায় তাহাদিগকে পড়াইতেছি—ছেন। তাহাদের স্কুল অপেক্ষা ভাল পড়া হইতেছে/শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ'[২১] [এই সময়ে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহদের গৃহশিক্ষক, 'পণ্ডিত' বলতে কি তাঁকেই বোঝানো হয়েছে? জীবনস্মৃতি-র 'তথ্যপঞ্জী'তে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দিয়ে 'রামসর্বস্ব' পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে[২২] কিন্তু সেটি ঠিক নয়, কারণ তাঁকে ২৪ কার্তিক ১২৮১ থেকে নিয়োগ করা হয়]। গুণেন্দ্রনাথকে লিখিত [তারিখহীন] একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, '... বালকদিগকে আমি যে প্রণালীতে পড়াইতেছি তাহাতে যদি জমিদারী কাছারির কার্য্যে মনোযোগ দিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হয়, তথাপি সেই অল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমি প্রত্যহ তাহাদিগকে রীতিমত পড়াইতেছি। ...শ্রীযুক্ত কর্ত্তা মহাশয়কেও লিখিয়াছি তিনি কি আদেশ করেন তাহারও প্রতীক্ষা করিতেছি। সে দিন বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্কুল বিষয়ে কথোপকথন করাতে তিনি আমার শিক্ষা প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।...'[২৩] বালকদের শিক্ষাদান-ব্যাপারে তিনি কতটা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন তার একটি প্রমাণ, স্কুলের পূর্বোক্ত পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত বইগুলি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি; ২৪ মাঘ 'রবীবাবু ও সোমবাবুদিগের পুস্তক ক্রয় জন্য বড়বাবু মহাশয় নিজে নিউমেন কো° বাটী [এসপ্লানেডে অবস্থিত এক সময়ের বিখ্যাত বিদেশী পুস্তক-বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান] গমন

করেন’। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালীতে বালকদের কত দিন পড়িয়েছিলেন এবং তার ফল কী দাঁড়িয়েছিল, সে-সম্পর্কে আমরা আর কিছুই জানতে পারিনি। তবে পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১২৮১ বঙ্গাব্দের শুরু থেকেই তাঁদের শিক্ষার জন্য অন্য ধরনের বন্দোবস্ত হয়েছিল, সে-প্রসঙ্গ আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহের আবির্ভাবের উল্লেখ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করেছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত পরিচয়ের সূত্রপাত বর্তমান বৎসরে। শ্রীকণ্ঠ সিংহ গত বৎসর মাঘ মাসে যখন জোড়াসাঁকো বাড়িতে বাস করতে আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথ উপনয়ন ও তৎপরবর্তী হিমালয়যাত্রার আয়োজনে উত্তেজিত, সুতরাং এই বৃদ্ধের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ তাঁর ছিল না। হিমালয় থেকে ফিরে এসেও শ্রীকণ্ঠ সিংহকে তিনি সম্ভবত বাড়িতে পাননি, কারণ এই সময়ের হিসাবপত্রে তাঁর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁর সাক্ষাৎ আমরা আবার পাই ৮ ফাল্গুন [বৃহ 18 Feb 1874] তারিখের হিসাবে: ‘ছেলেবাবুদিগের ও শ্রীকণ্ঠবাবুর বালীগঞ্জে বেড়াইতে জাতাতের গাড়িভাড়া.... ২’ ও পুনশ্চ ১২ চৈত্র [মঙ্গল 24 Mar] ‘শ্রীকণ্ঠবাবু ও রবীবাবুদিগরের হেদুয়ার নিকট বেড়াইতে জাতাতের গাড়ি ভাড়া...১।।[/০]’। এর থেকেই বোঝা যায়, বালকদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি তাঁদের সঙ্গী হয়ে কলকাতার কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ এঁর একটি অপূর্ব ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন, যা থেকে তাঁর অন্তর ও বাহিরের রূপটি আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়: ‘বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ব বোম্বাই আমটির মতো—অম্লরসের আভাসমাত্রবর্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না [শ্রীকণ্ঠবাবুর দাঁত বাঁধাবার জন্য ১৭৫ টাকা ব্যয়ের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি], বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত।... তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।’[২৪]

জীবনস্মৃতি-র ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’ সংস্করণে [১৭শ খণ্ড] “শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও ‘আমরা তিনটি বালক’ ” চিত্র-পরিচয় সমন্বিত ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত একটি আলোকচিত্রে উপবিষ্ট শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদকে দেখা যায়। চিত্রটিতে সংশয়চিহ্ন-সহযোগে ‘১৮৭৩’ সালটি নির্দেশ করা হলেও, আমাদের ধারণা চিত্রটি বর্তমান সময়ে অর্থাৎ 1874-এর কোনো সময়ে তোলা। এই ছবি-তোলার ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ একদিন তাঁর তিনজন বালকসঙ্গীকে নিয়ে এক ইংরেজ ফোটোগ্রাফারের দোকানে ছবি তোলাতে গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যয় খুব কম ছিল না। কিন্তু শ্রীকণ্ঠ সিংহ সাহেবের সঙ্গে হিন্দি ও বাংলাতে আলাপ জমিয়ে অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মতো জবরদস্তি করে তাঁকে দিয়ে সস্তায় ছবি তুলিয়ে নিলেন। ‘কড়া ইংরেজের দোকানে তাঁহার মুখে এমনতরো অসংগত অনুরোধ যে কিছুমাত্র অশোভন শোনাইল না, তাহার কারণ সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল—তিনি কাহারও সম্বন্ধেই সংকোচ রাখিতেন না, কেননা তাঁহার মধ্যে সংকোচের কারণই ছিল না।’[২৫]

ছবিটি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য একটি তথ্য উদ্ধার করেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল আলোকচিত্রটি [RFr. 238, F48] দেখে তিনি লিখেছেন:

ফোটোগ্রাফটি যে ৩ নং ওয়াটার্লু স্ট্রিটে তোলা হয়েছিল, এটি সম্ভবত তার একমাত্র সাক্ষী।

মাউন্ট বোর্ডে সাঁটা ফোটোগ্রাফটির তলায় লেখা আছে 'ক্যাবিনেট পোর্ট্রেট'। ৪ ইঞ্চি x ৫ ১/২ ইঞ্চি মাপের শক্ত বোর্ডে সাঁটা ফোটোগ্রাফকে তখন এই নামেই অভিহিত করা হতো। মাউন্ট বোর্ডের উল্টো পিঠে ছাপা রয়েছে স্টুডিওর পরিচয়—

Artists in Photography

WESTFIELD & COY.

3, Waterloo Street.

Calcutta.[২৬]

গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্রীকণ্ঠ সিংহের প্রিয়শিষ্য ছিলেন। তাঁর একটি প্রিয় গান 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী' রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সকলকে শোনাবার জন্য তিনি তাঁকে ঘরে ঘরে টেনে নিয়ে বেড়াতেন। বালক গান ধরতেন, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং গানের প্রধান ঝোঁক 'ময় ছোড়োঁ'তে এসে পৌঁছলে তিনি নিজেও যোগ দিতেন ও 'অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালোলাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।'[২৫] 16 Jul 1920 [মঙ্গল ৪ শ্রাবণ ১৩২৭] দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে এই দৃশ্য স্মরণ করেছেন, '... তোমাকে যখন আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর ক্রোড়ে "ছোড় ব্রজকী বাঁশরী" কপচাইতে দেখিয়াছিলাম..."[২৭]—এই বর্ণনা যদি আক্ষরিকভাবে যথাযথ হয়, তাহলে প্রসঙ্গটিকে বর্তমান কাল-সীমা থেকে একটু পিছিয়ে নিয়ে যাবার দরকার হবে। কারণ ১ আশ্বিন ১৭৯২ শক [১২৭৭ শুক্র 16 Sep 1870] দেবেন্দ্রনাথ ধর্মশালা থেকে শ্রীকণ্ঠ সিংহকে একটি পত্রে লেখেন: 'মধ্যে আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাটীতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।'[২৮] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হয়েছে। ওই সময়ে যদি এই সুকণ্ঠ বালকটিকে তিনি প্রিয়শিষ্য করে নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস আরো পুরোনো বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু সম্ভবত তার প্রয়োজন নেই।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দশম সংখ্যা মাঘ ১২৮০-তে ৪৫৬-৫৮ পৃষ্ঠায় অস্বাক্ষরিত ২২টি শ্লোকে নিবদ্ধ 'ভারত-ভূমি' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। টীকায় লিখিত হয়: 'এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন/কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। /বং সম্পাদক'। বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ড সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' [৩য় সং, ১৩৪৯] গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ [পৃ ১ল°- ১।°]। ড সেন তাঁর অনুমানের সপক্ষে বলেছিলেন, কবিতাটির মধ্যে ঘরে পণ্ডিতের কাছে পড়া মেঘনাদবধকাব্য-এর কিছু প্রভাব

আছে ও 'সে সময়ে বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় ছিল প্রধানতঃ patriotism বা দেশানুরাগ, এবং ভাব ছিল বিষাদময়'—এই লক্ষণগুলিও কবিতাটিতে দেখা যায়। তাছাড়া তিনি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথই কনিষ্ঠের কবিতাটি তাঁকে প্রকাশার্থ দিয়েছিলেন এবং 'কবিতাটির রচনারীতি বালক রবীন্দ্রনাথের রচনা-রীতির অনুরূপ। বিশেষতঃ যে কালে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল সেকালে চৌদ্দ বছরের আর কোন কবির কলম হইতে

"যবে দুই ফুলবালা গলে ধরি করে খেলা

দোলাইয়া যায় যদি মলয় পবন;"

অথবা

"জ্বলিতে চন্দ্রের ছায়া নদীর উপরি"

এমন ছত্র বাহির হওয়া অসম্ভব ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনাকে "ফুলবালা"র যুগ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়।'

ড কালিদাস নাগ তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব্ব' [*প্রবাসী,* ফাল্গুন ১৩৪৯] প্রবন্ধে কবিতাটির পুনর্মুদ্রণ করে মন্তব্য করেন, '"ভারতভূমি" কাঁচা রচনা হলেও কাব্যসরস্বতীর পাদপীঠে শিশু রবীন্দ্রনাথের কচি হাতের প্রথম আল্‌পনা।' 'কিন্তু বড়দাদা রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন নিশ্চিত ভাবে বার বছর জেনে বঙ্কিমের মন্তব্যে "চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকে"র রচনা কি ক'রে ছাপালেন সেটা বোঝা যায় না'—এই সংশয় প্রকাশ করেও ড নাগ উল্লেখ করেছেন যে, বয়সের তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে যে বড়ো দেখাত পিতার সঙ্গে অমৃতসর যাত্রার সময় ট্রেনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটিই তার প্রমাণ, সুতরাং বারো বছরের বালককে চতুর্দশবর্ষীয় মনে করার সেটিও একটি কারণ হতে পারে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পূর্ব থেকেই সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী তৈরি করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, *তত্ত্ববোধিনী,* অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক [১২৮১] সংখ্যায় প্রকাশিত 'অভিলাষ' কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথ *প্রবাসী,* বৈশাখ ১৩৫০ [পৃ ৩৬] সংখ্যায় 'আলোচনা/ "রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা"—শীর্ষক প্রসঙ্গে ড সেন ও ড নাগের অভিমতের প্রতিবাদ করলেন। তাঁর এই রচনাটিই কিছুটা পরিবর্তিত আকারে 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' ['পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সং—১০ মাঘ ১৩৫০'; ১ম সং-২ পৌষ ১৩৪৯] পুস্তিকায় [পৃ ৭১-৭৪] প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি ড সেনের অনুমান-এর বিপক্ষে দুটি যুক্তি দেন। তিনি লেখেন, 'এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বৎসর সাত মাস,... সাড়ে বারো বৎসরের বালককে বঙ্কিমচন্দ্র "চতুর্দ্দশ বর্ষীয়" বলিয়া উল্লেখ করিবেন—ইহা কষ্টকল্পনা।' দ্বিতীয় যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন যে, *বঙ্গদর্শন* সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে অত্যন্ত সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন, এ-হেন *বঙ্গদর্শন*-এ তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হলে তিনি নিশ্চয়ই সে-কথা কোথাও উল্লেখ করতেন। এর পর তিনি বলেন, কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রথম রচনা', একথা তিনি জ্যোতিশচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত ডায়ারি পাঠ করে জানতে পেরেছেন। ডায়ারির ১৬ পৃষ্ঠায় 'মৎকর্ত্তৃক লিখিত কবিতাবলী'-র প্রথমেই 'ভারতভূমি'-র উল্লেখ করেছেন

এবং বিভিন্ন পত্রিকায় স্বনামে বেনামে বা নাম না দিয়ে লিখিত কবিতার তালিকাতেও 'anonymous' আখ্যা দিয়ে এই কবিতাটিকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। ডায়ারিতে প্রদত্ত তাঁর জন্মতারিখ '১ জানুয়ারি ১৮৬০' অনুযায়ী কবিতাটি প্রকাশের সময়ে তাঁর বয়স পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর, সুতরাং সেদিক দিয়েও *বঙ্গদর্শন*-এ প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে মেলে। এইসব তথ্য দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, 'জ্যোতিশ্চন্দ্রের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহার পিতার ডায়ারিগুলি আছে; যে কেহ ইচ্ছা করিলে উহা দেখিতে পারেন।'

দীর্ঘদিন পরে সুশান্তকুমার মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা'-শীর্ষক পুস্তিকায় [আশ্বিন ১৩৮২]* বিষয়টির পুনরালোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর আলোচনার সর্বাধিক মূল্যবান অংশ একটি আবিষ্কার—১৭ মাঘ ১২৮০ [বৃহ 29 Jan 1874] তারিখে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ-লিখিত 'মাভৈঃ শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যাতে আলোচ্য 'ভারতভূমি' কবিতাটির ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৯, ১০ ও ১২ সংখ্যক স্তবকগুলি উদ্ধৃত করেন এবং লেখেন: 'মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে একটি কবিতা পাঠে আমাদের অনেক আশার সঞ্চার হইল। এই কবিতাটী একটী চতুর্দ্দশ বর্ষ বালকের রচিত। আমরা বোধহয় এই বালকটিকে চিনি।'

সুশান্তকুমারের বক্তব্য, 'আমরা বোধহয় এই বালকটিকে চিনি' এই কথা লিখে শিশিরকুমার ঘোষ রবীন্দ্রনাথকেই ইঙ্গিত করেছেন, কারণ ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সে-তুলনায় নৈহাটিতে বসবাসকারী বালক জ্যোতিষচন্দ্রকে চেনার সুযোগ অনেক কম ছিল—বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যখন যথেষ্ট মধুর ছিল না। এছাড়া তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ-কথিত জ্যোতিষচন্দ্রের ডায়ারিকে 'অলীক' আখ্যা দিয়ে নানা বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ তথ্য বিচার করে 'ভারতভূমি' কবিতা যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা—জ্যোতিষচন্দ্রের নয়—প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। সমস্ত যুক্তি-তর্কের বর্ণনা ও বিশ্লেষণে যাবার প্রয়োজন নেই, উৎসাহী পাঠক পুস্তিকাটি এবং এ-সম্পর্কে ড সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসাহিত্যে আদিপর্ব' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা [পৃ ১০৮-২১] দেখে নিতে পারেন। এই যুক্তি-পরম্পরাঅনুসরণ করে আমরাও পূর্বে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে সিদ্ধান্ত করেছিলাম। পরে *মহানগর* পত্রিকার Jul 1982 সংখ্যায় গোপালচন্দ্র রায় 'ভারতভূমি কবিতার রচয়িতা কে?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কবিতাটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা, রবীন্দ্রনাথের নয়, প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি-তথ্যের সমাবেশ করেন; পরে এই বিষয়টিই পরিবর্ধিত আকারে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন' [পৃ ৮৯-১১৬] গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে লিখেছেন:

> বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুপুত্র (সাবজজ দিগম্বর বিশ্বাসের পুত্র) ও বিশেষ স্নেহভাজন এবং জ্যোতিশেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু...তারকনাথ বিশ্বাস বহুকাল আগে জ্যোতিশের জীবিত কালেই তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর জীবন কথা' গ্রন্থে লিখেছেন—'...তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) ভ্রাতুষ্পুত্র আমার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়...বাল্যে বিশেষ মেধাবী ছাত্র ছিল। বঙ্গদর্শনে তাহার চতুর্দশ বর্ষকালে লিখিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে তাহার বড় আদর হইয়াছিল।'
>
> ১৩২৬ সালে হিতবাদী কার্যালয় থেকে প্রকশিত 'তারকনাথ গ্রন্থাবলী' ৩য় খণ্ডের ২৫৭ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি লেখা আছে।[২৯]

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত গ্রন্থটির একটি কপির সঙ্গে আমরা উক্ত পাঠ মিলিয়ে দেখেছি, সেখানে ঠিক ঐ কথাগুলিই আছে। সুতরাং আমাদের পূর্বমত পরিবর্তন করতে কোনো দ্বিধা নেই—কবিতাটি জ্যোতিশ্চন্দ্রেরই রচনা, রবীন্দ্রনাথের নয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের সম্বন্ধে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ এখানে সংকলিত হল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি [May 1873] দ্বিজেন্দ্রনাথের সপ্তম সন্তান ও পঞ্চম পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

পৌষ মাসের প্রথম দিকে [Dec 1873] বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র প্রমোদনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, ২৬ পৌষ পুত্রের জাতকর্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ৪ টাকা দান করা হয়।

১৫ পৌষ [সোম 29 Dec 1873] বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুরের অন্তর্গত কালাদ্‌গিতে সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা ইন্দিরা দেবীর জন্ম হয়। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে সিনিয়র অ্যাসিস্টান্ট জজ ও সেসন্স জজ (অস্থায়ী) হিসেবে কর্মরত। বলেন্দ্রনাথ তাঁর রাশিচক্রের খাতায় ইন্দিরা দেবীর জন্মসময়, রাশি, নক্ষত্র ইত্যাদি এইভাবে লিখে রেখেছিলেন: '১৭৯৫। ৮। ১৪। ৩৪। ২৮। ৩০ সোমবার, শিত পক্ষ, একাদশী। ইং ৮। ৩০ সময় রাত্রি, ভরণী মেষ রাশি; শুক্রের দশা ভোগ্য'। মাতা জ্ঞানদানন্দিনী কন্যার জন্ম-সম্পর্কে বলেছেন: 'সে সময় আমার খুব অসুখ করেছিল ও একজন মেম খুব যত্ন করেছিল মনে আছে। তাই আমার মেয়েকে এক মুসলমানী দাইয়ের দুধ খেতে হয়েছিল তার নাম আমিনা। ... পশ্চিমের হিন্দুস্থানী চাকর-দাসী ছোট ছেলেমেয়েদের বলে বিবি, তাই থেকে আমার মেয়েকে আজ পর্যন্ত আপনার লোক সকলে বিবি বলেই ডাকে।'[৩০] সত্যেন্দ্রনাথ কয়েকমাস পরে ১৬ চৈত্র [শনি 28 Mar 1874] দুমাসের ছুটি নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় আসেন, শিশুকন্যা ইন্দিরার বয়স তখন ঠিক তিন মাস।

ইন্দিরা দেবীর জন্মের পনেরো দিন পরে [? ১ মাঘ ১২৮০ মঙ্গল 13 Jan 1874] হেমেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ সন্তান ও তৃতীয়া কন্যা অভিজ্ঞার জন্ম হয়। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন: 'অভি আমার চেয়ে মোটে পনেরো দিনের ছোটো ছিল' [রবীন্দ্রস্মৃতি। ২৮] এবং সেই কারণেই অভিজ্ঞা তাঁকে 'বোনদিদি' বলে ডাকতেন।

১৮ ফাল্গুন [রবি 1 Mar 1874] রবীন্দ্রনাথের ভাবী-পত্নী ভবতারিণী [মৃণালিনী] দেবীর জন্ম হয়। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কবিপত্নী-মৃণালিনী' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'তাঁর সঠিক জন্ম তারিখের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি মৃণালিনী দেবীর ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর পুত্র বিশ্বভারতীর জনসংযোগ বিভাগের কর্মী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ [বীরেন্দ্রনাথ] রায়চৌধুরী জানিয়েছেন মৃণালিনী দেবী ১২৮০ সালের ১৮ ফাল্গুন (১ মার্চ ১৮৭৪) জন্মগ্রহণ করেন।'[৩১]

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

১১ মাঘ শুক্রবার 23 Jan 1874 আদি ব্রাহ্মসমাজের চতুশ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ সংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র বিবরণে দেখা যায়, 'প্রাতঃকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বালকদিগের সুমধুর ব্রহ্ম-সঙ্গীত সহকৃত অর্চ্চনাদি স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া...বক্তৃতা করিলেন।' [*তত্ত্ববোধিনী*, ফাল্গুন।

২১৪] এই বালকদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্তর্ভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ও এই অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।

'সায়ংকালে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য মহাশয়ের ভবনে সঙ্গীতাদি স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা হইলে পর শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া...বক্তৃতা করিলেন।' [ঐ। ২২০] রাজনারায়ণ বসু অতঃপর বক্তৃতা করেন।

উভয় অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত ব্রহ্মসংগীতগুলি গীত হয়:

আলাইয়া—একতালা। দেহ জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান [দেবেন্দ্রনাথ]

আসোয়ারি—ঝাঁপতাল। জাগো সকল অমৃতের অধিকারী [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

আলাইয়া-কাওয়ালী। অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

গৌড় সারঙ্গ—চৌতাল। প্রেমময় সে যে, তাঁরে দেখ, হৃদয়ে রাখ,

"   — "। ভূমা, অনন্ত, জগ-জীবন,

দেশকার—ঝাঁপতাল। হে দেব পরসাদ দেও হে ভকত হৃদয়ে, [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

কেদারা—চৌতাল। কি অনুপম তোমার আনন্দ মূরতি হে নাথ;

বেহাগ—সুর ফাঁকতাল। পরব্রহ্ম সত্য সনাতন [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

দেশ মল্লার—ঝাঁপতাল। হরি তোমা-বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি [ঐ]

—*তত্ত্ববোধিনী*, ফাল্গুন ১৭৯৫ শক। ২২৭-২৮

এর মধ্যে তৃতীয় গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। তিনি লিখেছেন: "ইহারই [শ্রীকণ্ঠ সিংহ] দেওয়া হিন্দিগান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসংগীত আছে—'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—ভুলো না রে তাঁয়।' এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন—'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে'—আবার পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন—'অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে।'"[৩২] এই ঘটনা নিশ্চয়ই অনেক পরবর্তী কালের, কারণ অগ্রহায়ণ ১২৮১-র পূর্বে দেবেন্দ্রনাথের পশ্চিম ভারতে অবস্থান-হেতু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগই ছিল না—কিন্তু এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভক্তির লক্ষণটি খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে, যার মধ্যে 'তিনি' ও 'তুমি'র ভেদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মাঘোৎসবের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ অন্তত এই গানটিতে কণ্ঠদান করেছিলেন এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে, কারণ শ্রীকণ্ঠ সিংহের সাহচর্যে মূল হিন্দি গানটি ও তার রূপান্তর তাঁর আয়ত্তে থাকাই স্বাভাবিক।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

এই বৎসর মাঘ সংক্রান্তি [৩০ মাঘ বুধ 11 Feb 1874] থেকে ৪ ফাল্গুন [রবি 15 Feb] পর্যন্ত সারকুলার রোডে পার্সিবাগানে ['মৃজাপুর ৮২ নং অপর সারকুলার রোড'] হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বার কলকাতার বাইরে কোনো উদ্যানে এই মেলার আয়োজন করা হত। কিন্তু শহরের

অভ্যন্তরে এত দীর্ঘকালব্যাপী মেলার অনুষ্ঠান এই প্রথম। প্রবেশ-দক্ষিণার প্রবর্তনও এইবারের মেলার বৈশিষ্ট্য। ভারত সংস্কারক পত্রিকায় লিখিত হয়েছিল: 'রবিবার মেলা দর্শন জন্য।।০ আনা করিয়া টিকিট হইয়াছে, ইহাতে যে আয় হইবে, তাহার কিয়দংশ দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইবে।' [১। ৪৩, ২ ফাল্গুন। ৫০৫] পরের সংখ্যায় ঐ পত্রিকা লেখে: 'দুঃখের বিষয় কলিকাতার নিকটে হইয়াও এ বৎসর লোক সমাগম অল্পতর হইয়াছিল। অনেকে বলেন আনার প্রবেশ টিকিট না করিলে ভাল হইত।' [পৃ ৫১৮] *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা-ও [১৬। ১৪, ৫ ফাল্গুন] প্রবেশদক্ষিণা-প্রবর্তনের সমালোচনা করে। প্রথম দিন অপরাহ্নে জাতীয় সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে রাজা কমলকৃষ্ণ দেব সভাপতি; রাজা চন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু সহকারী সভাপতি; নবগোপাল মিত্র ও প্রাণনাথ পণ্ডিত সম্পাদক এবং ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক নির্বাচিত হন। শুক্রবার জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। শনিবার অমৃতবাজার-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ 'বর্তমান দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণের উপায়' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবিবার মেলার প্রধান দিবসে দ্বিজেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। *মধ্যস্থ-সম্পাদক* মনোমোহন বসু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই দিন শস্য ও শিল্প প্রদর্শনী, 'বেদের ভেল্‌কি, সাপ-খেলানো, ভালুক-লড়াই প্রভৃতি তামাসা', ব্যায়াম কুস্তি প্রভৃতি এবং আতসবাজি প্রদর্শিত হয়। জাতীয় নাট্যশালা নাটক অভিনয় করে, তবে এর জন্য স্বতন্ত্র এক টাকার টিকিট হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বা উপস্থিত ছিলেন এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, অথচ এই সময়ে তিনি যখন মেটেবুরুজের মেলা, চিরানিজ সার্কাস প্রভৃতি দেখতে গিয়েছেন, সেখানে হিন্দুমেলায় উপস্থিত না থাকা অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রূপক-কাব্য [18 Oct 1875: ২ কার্তিক ১২৮২]। প্রথম যৌবনে 'মেঘদূত'-এর পদ্যানুবাদ [1860] ও কিছু খণ্ড কবিতা রচনার পর তিনি তত্ত্ব-লোকে প্রয়াণ করেছিলেন। 'তত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থের চারটি খণ্ড [1866, 1867, 1868, 1869] এই তত্ত্ব-বৃক্ষের ফল, সুযোগ-সন্ধানী ছাড়া সেই ফল আস্বাদন করার লোকের অভাব ছিল। ['একটি সঙ্গী বড়দাদার জুটেছিলেন, তাঁর নাম জানি নে, তাঁকে সবাই ডাকত ফিলজফার ব'লে। অন্য দাদারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন কেবল তাঁর মটনচপের 'পরে লোভ নিয়ে নয়, দিনের পর দিন তাঁর নানা রকমের জরুরি দরকার নিয়ে।'[৩৩] — রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের বৈকুণ্ঠ ও কেদার চরিত্র দুটির উৎস এখানেই পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর শখ ছিল গণিতের সমস্যা বানানোয়, বিলিতি বাঁশি বাজিয়ে 'অঙ্ক দিয়ে এক-এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে'[৩৩] নেওয়ায়। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গাণিতিক সূত্র দিয়ে কাগজের বাক্স বানানোর শাস্ত্র 'বক্সোমেট্রি' ও বাংলা শর্টহ্যান্ড 'রেখাক্ষর-বর্ণমালা'।[৩৪] বর্তমানে ১২৭৯-র চৈত্র মাসে বোম্বাই থেকে ফেরার পর তিনি আবার কাব্য রচনায় মন দিলেন। দার্শনিক ও গাণিতিক দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যরচনা অন্যান্য কবিদের

পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে পারে না। তাই গোড়ায় শুরু হল কাব্যের উপযোগী ছন্দ বানানো। তার জন্যে 'সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংলা ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে'[৩৩] সাজিয়ে তুললেন, যার অনেকগুলিই তিনি রক্ষা করেননি, দু-একটি 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে আছে, কয়েকটি সংকলিত হয়েছে পরে অন্যত্র। ছন্দোরচনার পর শুরু করলেন কাব্য রচনা করতে। যা লিখতেন তা সহজে পছন্দ হত না, সুতরাং লেখার যতটা রক্ষা করতেন, ফেলে দিতেন তার বেশি—'বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্ন-প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।'[৩৫] গুণেন্দ্রনাথ ও অন্যেরা দক্ষিণের বারান্দায় তাঁর পাশে জড়ো হতেন, তিনি যেমন লিখতেন সকলকে শুনিয়ে যেতেন ও তাঁর ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কেঁপে উঠত—'সেই হাসির ঝোঁকের মাথায় কেউ যদি হাতের কাছে থাকত তাকে চাপড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন।'[৩৬]

স্বপ্নপ্রয়াণ-এর প্রথম সর্গ 'মনোরাজ্য প্রয়াণ' *বঙ্গদর্শন*-এর শ্রাবণ সংখ্যায় [পৃ ১৮৪-৮৭] প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় অতঃপর আর-কোনো সর্গ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু প্রাণনাথ দত্ত সম্পাদিত রহস্য *সন্দর্ভ* পত্রিকার 'নবপর্ব্বাবলী' পর্যায়ের প্রথম পর্ব, পঞ্চম খণ্ডে [? ভাদ্র ১২৮০] ৭২-৭৪ পৃষ্ঠায় পুনরায় 'স্বপ্নপ্রয়াণ/প্রথম সর্গ/ মনোরাজ্যপ্রয়াণ' মুদ্রিত হয় ও তৎসঙ্গে ৭৪-৮১ পৃষ্ঠায় এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ 'বিলাসপুর প্রয়াণ' প্রকাশিত হয়। বাকি সর্গগুলি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। অল্পকালের ব্যবধানে দুটি পত্রিকায় প্রথম সর্গটি দুবার প্রকাশের কারণটি রহস্যাবৃত। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন: ''আমি যখন প্রথম 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও কোনও অংশ বঙ্কিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবার জন্য।... আমার পুস্তকে কতকগুলো কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বঙ্কিমবাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাঁহার 'বিষবৃক্ষের' মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন।'[৩৭] দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তি থেকে মনে হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর প্রথম সর্গটি যথাযথ ছাপেননি বলেই হয়তো তিনি 'রহস্য সন্দর্ভ'-তে সেটি পুনর্মুদ্রিত করেন। কিন্তু দুটি পত্রিকার পাঠ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে উভয়ের পার্থক্য খুবই নগণ্য অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র কিছুই বর্জন বা পরিবর্তন করেননি। মুদ্রিত গ্রন্থে যে পার্থক্য দেখা যায় সেটি পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথই করেছিলেন এবং প্রথম সংস্করণে যেটুকু পাঠান্তর দেখা যায় তা খুবই সামান্য। আর উক্তিটির দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বলা যায়, বিষবৃক্ষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-ফাল্গুন সংখ্যা *বঙ্গদর্শন*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে 'স্বপ্নপ্রয়াণ-প্রথম সর্গ' প্রকাশের পূর্বেই 1 Jun 1873 গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়েছিল। সুতরাং বিষবৃক্ষের উপর উক্ত কাব্যের কোনোরকম প্রভাব না পড়ারই কথা। মনে হয়, এব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতি তাঁকে বিভ্রান্ত করেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেউ কেউ বলেছেন,* এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। কিসের ভিত্তিতে এমন ধারণা করা হয়েছে সে-কথা কেউ উল্লেখ করেননি। ৬ বৈশাখ ১২৮১ তারিখে জোড়াসাঁকোয় 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর যে প্রতিবেদন *ভারত সংস্কারক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও তাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ছিল না, তবু পরবর্তীকালের বঙ্কিমচন্দ্র বেশ কয়েকবার ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এই বৎসরে আর-একটি কাব্য প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবি-জীবনে যার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সেটি হল অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা 'উদাসিনী' গাথা-কাব্য [9 Feb 1874: সোম ২৮ মাঘ] অক্ষয় চৌধুরী [1850—5.9.1898] ঠাকুরবাড়ির 'ধর্মপাঠশালা'য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১২৭৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত চৈত্রমেলা [হিন্দুমেলা]-য় তিনি 'ভারত' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ঐ অনুষ্ঠানে 'উদ্বোধন' নামে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। পরেও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর গতায়াত অব্যাহত ছিল। সংগীত ও সাহিত্যচর্চায় দুই বন্ধুর ক্লান্তি ছিল না। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। সেই সাহিত্যে তাঁর শুধু অধিকার ছিল না, অনুরাগও ছিল। অপর দিকে বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলি, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মধ্যযুগীয় অংশের সঙ্গে প্রাক-আধুনিক যুগের হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতি কবিওয়ালাদের রচনার প্রতিও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। বাংলা বহু উদ্ভট গান তাঁর মুখস্থ ছিল, সেগুলি তিনি মরিয়া হয়ে সুরে-বেসুরে গেয়ে যেতেন। শ্রোতারা আপত্তি করলেও তাঁর উৎসাহ ক্ষুন্ন হত না। সঙ্গে সঙ্গে তাল দেবার জন্যে টেবিল, বই যা কিছু সামনে পেতেন, তাকেই কাজে লাগাতেন। 'আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রসগ্রহণ করিতে ইঁহার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না।'[৩৮] গান ও কবিতা তিনি অসামান্য ক্ষিপ্রতায় রচনা করতে পারতেন, অথচ সেগুলি সম্পর্কে তাঁর কোনো মমত্ব ছিল না। এদিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল, অবশ্য তিনি দার্শনিক ছিলেন না।

'উদাসিনী' ['কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯৩০। মূল্য এক টাকা', পৃ ১০৮] গ্রন্থকারের নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম উল্লেখযোগ্য রোম্যান্টিক গাথা-কাব্যটি অলিভার গোল্ডস্মিথ [1724-78]-এর *Edwina and Angelina* বা *Hermit* অবলম্বনে লিখিত। এই কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কাব্য ও গাথাগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। *সোমপ্রকাশ* [১৬। ১৬, ১৯ ফাল্গুন], ভারত সংস্কারক [১। ৪, ২৩ ফাল্গুন], *বঙ্গদর্শন* [জ্যৈষ্ঠ ১২৮১] প্রভৃতি সমসাময়িক পত্রিকাগুলিতে কাব্যটি উচ্চ-প্রশংসিত হয়।

এই বৎসর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উড়িষ্যার জমিদারি পরিদর্শন করার জন্য মাঘ ও ফাল্গুন মাসে কিছুদিন [Feb 1874] কটকে অবস্থান করেন। এই সময়েই তিনি তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম' রচনা করেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন: 'জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে একবার গুনুদাদার সঙ্গে আমাকে কটক যাইতে হইয়াছিল। হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ-প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি "পুরু-বিক্রম" নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।'[৩৯] ভ্রাতার এই নাট্যরচনার সংবাদ পেয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ কটকে অবস্থানরত গুণেন্দ্রনাথকে লেখেন: '... জ্যোতির নাটক কিরূপ হইয়াছে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত আছি।' নাটকটি কয়েক মাস পরে 9 Jul 1874 [২৬ আষাঢ় ১২৮১] তারিখে প্রকাশিত হয়:'পুরুবিক্রম নাটক।/ "অভিভূতিভয়াদসূনতঃ।/ মুখমুজ্‌ঝন্তি ন ধাম মানিনঃ ॥"/ কিরাতার্জ্জুনীয়ম।/ কলিকাতা/ বাল্মীকি যন্ত্রে/ শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্তৃক/মুদ্রিত।/ শকাব্দা

১৭৯৬।' এক টাকা দামের ১৫০ পৃষ্ঠার বইটি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল গুণেন্দ্রনাথকে: 'সোদর-সদৃশ/শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর/ভ্রাতৃবরেষু।/ভ্রাতঃ।/ আপনার করে আমার এই যত্ন-সঞ্চিত ক্ষুদ্র প্রণয়ো-/পহার সাদরে অর্পণ করিলাম।' সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারত-সন্তান' নাটকটিতে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী সংস্করণে [1879] কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখা 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি নাটকে সংযুক্ত হয়, সে-প্রসঙ্গ আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ ৫

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে তাঁদের ইংরেজি পড়ানোর গৃহশিক্ষক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য এমন অন্যায় রকম ভালো ছিল যে ছাত্রদের একান্ত কামনা সত্ত্বেও তাঁকে একদিনও কামাই করতে হয়নি, 'কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেইসময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল।'[৪০] আমরা আগেই দেখেছি, অঘোরনাথ ১২৭৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে পনেরো দিন কামাই করে ছাত্রদের 'একান্ত মনের কামনা' পূরণ করেছিলেন, কিন্তু তার কারণটি আর যাই হোক এই ধরনের মাথা ফাটাফাটির ব্যাপার নিশ্চয় ছিল না, থাকলে সংবাদপত্রে তার বিবরণ পাওয়া যেত। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমান বৎসরের ৭ শ্রাবণ [সোম 21 Jul 1873] তারিখে এবং সবচেয়ে কৌতুকের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর ছাত্র ছিলেন না—তার আগেই জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই ঘটনায় অঘোরনাথ যদি মাথা ফাটিয়ে শয্যাগ্রহণে বাধ্য হয়েও থাকেন, তার জন্যে তাঁর কোনো বেতন কাটা যায়নি, পরের মাসে তিনি পুরো বেতনই পেয়েছেন।

সোমপ্রকাশ-এ ১৪ শ্রাবণ [28 Jul, ১৫। ৩৭] সংখ্যায় 'সংবাদ' স্তম্ভে দেখা যায়: 'গত সোমবার কলিকাতা মেডিকাল কালেজের মিলিটারি ক্লাশের ইউরোপীয় ছাত্রদিগের সহিত ইংরাজী ক্লাশের বাঙ্গালি ছাত্রদিগের ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালি ছাত্রেরা যে পড়িয়া মার খাইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য।' ঐ একই তারিখে প্রকাশিত একটি 'প্রেরিত' পত্রে [পৃ ৫৮৮-৮৯] ঘটনাটির বিবরণ এই ভাবে দেওয়া হয়েছে: '... গত কল্য মেডিকেল কলেজের গ্যালারীতে কেমেস্ট্রীর লেকচারের সময় মিলিটারি ক্লাসের ছাত্রদিগের সহিত বাঙ্গালী ছাত্র দিগের ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মিলিটারী ক্লাসের জনৈক ছাত্র স্বীয় সঙ্গীর নিমিত্ত পার্শ্বস্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। একজন বাঙ্গালী ছাত্র সেই স্থান অধিকার করাতে দাঙ্গা উপস্থিত হয়। দাঙ্গার প্রারম্ভে ম্যাকনামারা [কেমিস্ট্রির অধ্যাপক] উপস্থিত ছিলেন না। এই দাঙ্গাতে কএকজন বাঙ্গালী ছাত্র গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। অদ্য এতন্নিবন্ধন মহা গোলযোগ উপস্থিত। মিলিটারী ক্লাসের ছাত্রগণ কালেজ স্ট্রীটে সমবেত হইয়া রাস্তায় যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই প্রহার করিতেছে। হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের দুই জন ছাত্র এই রূপ প্রহৃত হওয়াতে উক্ত স্কুলদ্বয়ের সমস্ত ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া মিলিটারী ক্লাসের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছে। লাঠি ইহাদিগের প্রধান শস্ত্র। পুলিষ যথোচিতরূপে গোলযোগ নিবারণে সমর্থিত হইতেছে না। কালেজ স্ট্রীট দিয়া লোক যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইয়াছে।...' 'শ্রীঃ—' স্বাক্ষরিত এই পত্রের তারিখটি—'সম্বৎ ১৯২৯/৭ই শ্রাবণ'—অবশ্য ভুল; কারণ মূল ঘটনার পরের দিনে পত্রটি লেখা হয়েছে। *The Bengalee* [Vol.

XII, No. 30, Jul 26] *Indian Minor*-এর সংবাদ অবলম্বনে কলেজ স্ট্রিটের ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে লেখে, '... the squabble in the Medical College assumed a serious aspect on Tuesday last. There was quite a scene in College Street. The European students of the Apothecary class desperately carried their depredations in the streets, and assaulted almost everybody they came across. The native pupils who were threatened kept away in a body from the Hospital and the College.'

রবীন্দ্রনাথের মনে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুটি ঘটনা কিভাবে সংমিশ্রিত হয়ে জীবনস্মৃতি-তে প্রকাশিত হয়েছে, এই দৃষ্টান্তটি তার একটি উপভোগ্য নিদর্শন।

লক্ষণীয়, এই ঘটনার পরই ৭ আশ্বিন [সোম 22 Sep] তারিখের *সোমপ্রকাশ*-এ সংবাদ প্রকাশিত হয়: 'মেডিকাল কলেজের ছাত্র সংখ্যা ১৪০০ হওয়াতে লেপ্টনান্ট গবর্ণর বাঙ্গালা ক্লাসগুলি শিয়ালদহে স্থাপন করিয়াছেন।' তখন সেখানে Municipal Pauper Hospital অবস্থিত ছিল। ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের নামে এই নূতন প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল।' ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের নামানুসারে বর্তমানে এর নাম 'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ।'

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৬

এই বৎসরটি বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে একটি দুর্বৎসর। ১৬ আষাঢ় [রবি 29 Jun] অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে কবি মধুসূদন দত্তের মৃত্যু হয় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে। কিশোরী চাঁদ মিত্রের মৃত্যু হয় ২৩ শ্রাবণ [বুধ 6 Aug]। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাক্তন উপাচার্য ও *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র ভূতপূর্ব সম্পাদক অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর মৃত্যু হয় ১৫ ভাদ্র [শনি 30 Aug] তারিখে।* ১৭ কার্তিক [শনি 1 Nov] তারিখের নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু হয়। ১৫ ফাল্গুন. [বৃহ 26 Feb 1874] হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র পরলোকগমন করেন এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা ও 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা রাজা কালীকৃষ্ণ দেব ৩০ চৈত্র [শনি 11 Apr] মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উল্লেখপঞ্জি

১ পত্রাবলী। ১০৫-০৬, পত্র ৭৬

২ জীবনস্মৃতি ১৭।৩২০

৩ ছেলেবেলা ২৬।৬২৬

৪ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩৩৫

৫ জীবনস্মৃতি ১৭।৩১৯

৬ বিশ্বপরিচয় ২৫। ৩৪৯

৭ সজনীকান্ত দাস: রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য [সুবর্ণরেখা-সং, ১৩৯৫]। ১৮৬

৮ দ্র অমৃত, ১৮ আষাঢ় [পৃ ২৪-২৮] ও ২৫ আষাঢ় ১৩৮৩ [পৃ ৩৫-৩৬] সংখ্যা

৯ দ্র 'প্রথম গদ্যরচনা' অধ্যায়, পৃ ৩১০-১৪

১০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩০১-০২

১১ ঐ ১৭। ৩২৪

১২ ঐ ১৭। ৩২৮

১৩ ঐ ১৭। ৩০৩

১৪ ঐ ১৭। ২৭২

১৫ ছেলেবেলা ২৬। ৬১২

১৬ ঐ ২৬। ৬১০-১১

১৭ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

১৮ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৯-৩০

১৯ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩২৮

২০ 'রবীনর-জীবনীর নূতন উপকরণ': রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য। ৭৩

২১ Tagore Family Correspondences, Vol. 5, p. 83

২২ দ্র জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২৪৫, তথ্যপঞ্জী ৬০ ॥১

২৩ Tagore Family Correspondences, Vol. 5, p. 91

২৪ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৯৪

২৫ ঐ ১৭। ২৯৬

২৬ সিদ্ধার্থ ঘোষ: ছবি তোলা [1988]। ১৯১-৯২

২৭ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ১৬৪

২৮ পত্রাবলী। ২১৯, পত্র ১৪৩

২৯ রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন। ১০৭-০৮

৩০ পুরাতনী। ৩৬

৩১ *দেশ*, ৩২ শ্রাবণ ১৩৮১। ১৭৭

৩২ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৯৬

৩৩ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৫

৩৪ দ্র আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ২৩

৩৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৩৭

৩৬ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৬

৩৬ বিপিনবিহারী গুপ্ত: পুরাতন প্রসঙ্গ [২য় বিদ্যাভারতী সং, ১৩৭৩]। ২৮৯

৩৮ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৩৯

৩৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১৪১

৪০ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৮৬

---

*[১] 'তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে সরল ভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি যাহা শিখাইতেন তাহা আমাদিগকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাঁহারই নিকট পরীক্ষা দিতে হইত।'—সাহিত্য-স্রোত, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য' [পৃ ৫৬] গ্রন্থে উদ্ধৃত।

*[২] 'তাঁহার তেতলার বসিবার ঘরে দিনকতক তিনি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে ধারাবাহিকরূপে মৌখিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।'—*প্রবাসী,* মাঘ ১৩১৮।৩৮৭

*[৩] জীবনস্মৃতি ১৭।৩১৮; প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এই অংশটি এইভাবে লিখিত হয়েছিল: 'প্রক্টরের লিখিত সরল-পাঠ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে তিনি আমাকে স্থানে স্থানে বুঝাইয়া দিতেন আমি তাহাই বাংলায় লিখিতাম। বাংলা ভাষায়, তখন আমার যতটা অধিকার ছিল ততটা তিনি আশাও করেন নাই।

* বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে Richard A. Proctor-এর *Half Hours with the Telescope* ও *Our Place among the Infinities* বই দুটি আছে। প্রক্টরের লিখিত একটি গ্রন্থ *Myths and Marvels of Astronomy* [1878]-তে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবেঃ "Author of 'Other World than Ours', 'The Expanse of Heaven', 'The I finities Around Us', 'The Sun', 'The Moon', 'The Universe' etc."

* জীবনস্মৃতি ১৭।৩২৭; বর্ণনাটি ডাকঘর [১৩১৮] নাটকের অমলকে মনে করিয়ে দেয়।

† পত্রাবলী। ১০৭; জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে কিন্তু সঠিক তথ্য নির্দেশিত হয়েছিল: 'এইরূপে তিন মাস প্রবাসভ্রমণের পর পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চাটুর্জের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।'

* 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' [প্রথম খণ্ড: ১৭৯১ শক, 1869; দ্বিতীয় খণ্ড: ১৮০৬ শক, 1884] প্রতাপচন্দ্র ঘোষ [1840-1921] কর্তৃক রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ এখানে অবশ্য কেবল প্রথম খণ্ডটি পড়ার কথাই লিখেছেন।

* সাপ্তাহিক *অমৃত* পত্রিকায় ১৫ বর্ষ ৬-১০ সংখ্যা [20 Jun-18 Jul 1975]-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

* 'বিশেষতঃ বঙ্কিমের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের তো তার পূর্বেই মনোমালিন্য শুরু হয়েছিল।'—সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব [১৩৮৫]। ১১৩; শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এই উক্তির পাদটীকায় 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৬। ৬৬ দ্বিজেন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত উপরে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে যে উদ্ধৃতিটি আমরা তুলে দিয়েছি, সেটিই তাঁর সিদ্ধান্তের কারণ। কিন্তু ঐ উক্তিতে মনোমালিন্যের কোনো প্রসঙ্গ নেই। আর আমরা এই মাত্র আলোচনা করেছি বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে এই অংশটিই ভ্রমাত্মক।

* এঁর মৃত্যু তারিখটি বিতর্কিত বিষয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-য় [৯৫। ৩২] *ভারত-সংস্কারক* পত্রিকা-র অনুসরণে ১৩ ভাদ্র [28 Aug] তাঁর মৃত্যু তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। *তত্ত্ববোধিনী,* আশ্বিন সংখ্যায় লেখা হয় '১৬ ভাদ্র শনিবার'; ধর্ম্মতত্ত্ব [১৬ ভাদ্র] লেখে 'বিগত শনিবার' এবং *সোমপ্রকাশ* [১৫। ৪৩] পত্রিকায় লিখিত হয় '৩০ এ আগষ্ট শনিবার'। আমরা 'শনিবার' এই তথ্যটিকে গ্রহণ করে বর্তমান তারিখটি নির্দিষ্ট করেছি।

চতুর্দশ অধ্যায়

১২৮১ [1874-75] ১৭৯৬ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের চতুর্দশ বৎসর

আমরা গত বৎসরের বিবরণে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ ও সহপাঠীদ্বয়ের শিক্ষাজীবনে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি-পর্ব সমাপ্ত হয়েছে; তারপর 'বিদ্যাসাগরের ইস্কুল' বা মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হলেও সম্ভবত একদিনও তাঁরা সেই স্কুলে যাতায়াত করেননি। বাড়িতে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁদের পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে সুফল লাভ করছেন, একথা তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথকে পত্রে জানিয়েছেন এও আমরা জানি। কিন্তু তিনি কতদিন এই উৎসাহ বজায় রেখেছিলেন, বলা শক্ত; সম্ভবত খুব বেশি দিন নয়। ফলে বর্তমান বৎসরের শুরু থেকেই অন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ইংরেজি পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য তো ছিলেন-ই, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন একজন সংস্কৃত শিক্ষক। 'নিজ হিসাবের কেস বহি/১২৮১-র ১ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 14 May] তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'ব° হরিনাথ ভট্টাচার্য্য/দ° সোম রবী সত্যপ্রসাদবাবুদিগের/পণ্ডিত/বৈশাখ মাসের বেতন শোধ... ৮্' [অন্যত্র 'সংস্কৃত পড়াইবার পণ্ডিত' কথাটি উল্লিখিত হয়েছে] অর্থাৎ বৈশাখ ১২৮১-র শুরু থেকেই তিনি এই কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। অবশ্য খুব বেশি দিন তিনি কাজ করেননি, হিসাবের খাতা থেকে দেখা যায় তিনি কার্তিক মাস পর্যন্ত বেতন পেয়েছেন, অর্থাৎ মাত্র সাত মাস তিনি সংস্কৃত পড়াবার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। জীবনস্মৃতি বা অন্যত্র এই শিক্ষকের কথা রবীন্দ্রনাথ লেখেননি। তাঁর সংস্কৃত-শিক্ষা সম্পর্কে এ-পর্যন্ত যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখি জনৈক হেরম্ব তত্ত্বরত্নের কাছে 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' থেকে আরম্ভ করে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করেছিলেন এবং তারপর পিতার কাছে বোলপুরে, অমৃতসরে ও হিমালয়ে বিদ্যাসাগর-প্রণীত 'উপক্রমণিকা' ও 'ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ' পড়তে শুরু করেছিলেন। হরিনাথ ভট্টাচার্য তাঁকে কী পড়াতেন তা বলা সম্ভব নয়, কিন্তু ২১ আশ্বিন [মঙ্গল 6 Oct] 'রবীবাবুর জন্য রিজুপাট' কেনার হিসাব দেখে মনে হয়, তখনো পর্যন্ত স্কুলপাঠ্য সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যেই পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ রয়েছে, জীবনস্মৃতি-র 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে বর্ণিত 'কুমারসম্ভব' বা 'শকুন্তলা' পড়ার পর্যায়ে পৌঁছয়নি।

সংস্কৃত শিক্ষার সময় হয়তো ছিল সন্ধ্যাবেলা। কারণ এযাবৎ-প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি'-র [এই পাণ্ডুলিপিটি সম্পর্কে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব] 50/ ২৬খ পৃষ্ঠায় দেখা যায় ইংরেজিতে লেখা একটি সাপ্তাহিক পাঠক্রমের তালিকায় প্রত্যহই প্রথম পর্বটি ইংরেজি ও শেষ পর্বটি সংস্কৃত পড়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। পাঠক্রমের এই তালিকাটি কখন রচিত হয়েছিল নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও, অনুমান করা যায় এটি আমাদের আলোচ্য সময়েরই পাঠক্রম। পাঠকদের অবগতির জন্য রুটিনটি উদ্ধৃত করছি:

Monday—	Eng Prose—	Geomet—	Eng History—	Sanskrit
Tuesday—	Grammar—	Algebra—	Hist of India—	Sanskrit
Wednessday—	Eng Prose—	Arith—	Geography Phys.—	Do
Thursday—	Grammar—	Mensuration & Algebra—	England history—	Do
Friday—	Eng….[?]	Arthimetic—	General geography—	Do
Saturday—	Do—	Geomet—	History of India	Do
Sunday—	Exercises—			

শুক্রবারের প্রথম পিরিয়ডে '…' চিহ্নিত অংশটি সঠিকভাবে পড়া শক্ত বলে আমরা জিজ্ঞাসা চিহ্নাঙ্কিত করেছি।

প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন: "সাপ্তাহিক পাঠক্রমটি এই 'ঘরের পড়া' যুগেরই পাঠক্রম বলে মনে হয়। কারণ এটিতে সংস্কতশিক্ষার উপরে যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, বেঙ্গল একাডেমি বা সেন্ট জেভিয়ার্সের মতো ইস্কুলে তা প্রত্যাশিত নয়।...তা ছাড়া, ওই পাঠক্রমে দেখা যায় শনিবারের পাঠব্যবস্থা অন্যান্য দিনের সমানই, কিছুমাত্র লঘু নয়। এটাও খ্রীস্টানপরিচালিত উক্ত দুই ইস্কুলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।"[১]

পাঠক্রমটি 'ঘরের পড়া'র জন্যই যদি রচিত হয়, তাহলেও লক্ষণীয়, এখানে এন্ট্রান্সের পাঠ্যসূচিই অনুসৃত হয়েছে এবং এটি সারাদিনের পাঠক্রম—সকালে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ইংরেজি পড়াতেন, দুপুরে অঙ্ক শেখাতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সন্ধ্যায় হরিনাথ ভট্টাচার্য সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন; তার আগে ছাত্রদেরই ইতিহাস ও ভূগোলের পড়া করে নিতে হত। অবশ্য এটি নিছকই অনুমান, আমরা পরের অনুচ্ছেদেই এই অনুমানের কয়েকটি ফাঁক দেখতে পাব।

আমরা বলেছি, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্ভবত সকালেই পড়াতে আসতেন [দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রেও সেইরকম ইঙ্গিত আছে। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোনো গৃহশিক্ষক ছিলেন না, আর বাংলায় অর্থ করে তাঁর 'কুমারসম্ভব' পড়ানোর কথা রবীন্দ্রনাথই উল্লেখ করেছেন—সুতরাং তাঁকে 'পণ্ডিত' বলায় কোনো ভুলও হয়নি] এবং সন্ধ্যায় উক্ত হরিনাথ ভট্টাচার্যের কাছে সংস্কৃত পড়তে হত। [লক্ষণীয়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজি শিক্ষার সময় সন্ধ্যাবেলা নির্দিষ্ট করে অভিভাবকেরা যে ভুল করেছিলেন, এবার আর সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়নি!] কিন্তু দুপুরবেলায় বালকদের পড়ানোর দায়িত্ব দ্বিজেন্দ্রনাথ ত্যাগ করলে সেই সময়ে তাঁদের আটকে রাখার জন্য ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। এইজন্যে একজন শিক্ষক নিয়োগ করার সংবাদ জানা যায় ক্যাশবহি-র ৬ ভাদ্র [শুক্র 21 Aug] তারিখের হিসাবে: 'ব° গিরীশচন্দ্র মজুমদার/ সোম রবীবাবুদিগের দুপুরবেলা ইংরাজি পড়াইবার মাষ্টার/তাহার বেতন ই° ৫ শ্রাবণ না° ৩১ রোজ/২০ হিঃ বিঃ এক বৌচর/গুঃ খোদ/রোক ১৭।লড' অর্থাৎ ৫ শ্রাবণ [সোম 20 Jul] থেকে তিনি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত তিনি বেতন পেয়েছেন অর্থাৎ ঐ মাসেই তাঁর কর্মকাল শেষ হয়। এর আগেও আষাঢ় মাসে মাত্র বারো দিনের জন্য উমাচরণ ঘোষ নামে জনৈক ব্যক্তি 'সোমবাবুদিগের মাষ্টার' রূপে কাজ করে যান। এর থেকেই বোঝা যায় এই তিনটি বালককে নিয়ে কী করা যায় সে-বিষয়ে অভিভাবকেরা

কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছিলেন না, আর সেই কারণেই এই সব পরীক্ষা। এঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো দাগ কাটতে পারেননি বলেই এঁদের কথা তাঁর কোনো স্মৃতিমূলক রচনায় স্থান পায়নি।

এই বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে একমাত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য অব্যাহতভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর ছাত্রেরা স্কুলে না গেলেও স্কুলের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত পুস্তকগুলি অবলম্বনেই তিনি তাঁদের ইংরেজি ভাষা শেখাবার চেষ্টা করেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে Douglus Series-এর *Poetical Selection, Hiley's Grammar* ও *Wilson's Etymology* অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এগুলির সঙ্গে অন্য বইও যুক্ত হয়। ১৮ কার্তিক [মঙ্গল 3 Nov] তারিখের হিসাবে দেখি: 'ব° জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য/দ° সোম রবী সত্যপ্রসাদবাবু দিগের/জন্য লেথব্রিজের সিলেকসন চারি খানা/ও উহার কি একখানা ক্রয়ের মূল্য শোধ... ১০'। * উক্ত হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বইটির চারটি খণ্ড কেনা একখানি অর্থপুস্তক-সহ—তিনটি খণ্ড তিনজন ছাত্রের জন্য, অপর খণ্ডটি সম্ভবত শিক্ষকের নিজের প্রয়োজনে। এই বইটি কেনা থেকে অনুমান করা যায় বাড়িতেই ছাত্রদের এন্ট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী করে প্রস্তুত করার একটি উদ্দেশ্য জ্ঞানচন্দ্র বা অভিভাবকদের মনে কাজ করছিল। কিন্তু শিক্ষক এবং অভিভাবকেরা যতই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা করুন-না কেন, ছাত্রেরা, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, সেগুলি ব্যর্থ করার জন্যই যেন বদ্ধপরিকর ছিলেন। তার পরের কথা রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন: 'ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।'[২] ১৭ শ্রাবণ [শনি 1 Aug] তারিখের হিসাবে দেখা যায় 'সোম রবীবাবুদিগের জন্য মেকবেথ পুস্তক ক্রয়...গুঃ রবীবাবু ১।।o' অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের মাঝামঝি সময় থেকে ম্যাকবেথ পড়া ও অনুবাদ শুরু হয়েছিল এবং সম্ভবত সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হবার আগে মাঘ মাসের [Jan 1875] মধ্যেই বইটি পড়া ও অনুবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এই সময়ের মধ্যেই হরিনাথ ভট্টাচার্যের জায়গায় মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ [ভট্টাচার্য] বালকদের সংস্কৃত পড়াবার কাজে নিযুক্ত হন। ৯ পৌষ [বুধ 23 Dec] তারিখের হিসাবে দেখা যায়: 'ব° রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ/দ° সোমবাবুদিগের পড়াইবার পণ্ডিতের বেতন কার্ত্তিক মাসের সাত দিন/ও অগ্রহায়ণ মাহার শোধ/১০ হিসাবে/বিঃ এক বৌচর/গুঃ রামগোপাল বিদ্যাবাগিশ১২৴৬' অর্থাৎ ২৪ কার্তিক [সোম 9 Nov] থেকে তিনি সংস্কৃত অধ্যাপনা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তাই দেখা যায় Jan 1875-এ যখন দ্বিপেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথকে [এঁদের সঙ্গে বিমান ও বিজয় এই দুটি নাম পাওয়া যায়; এঁদের পরিচয় উদ্ধার করতে পারিনি] নর্মাল স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসনে ভর্তি করা হয়, তখন রামসর্বস্বের মারফৎ বেতন প্রেরিত হয়েছে [পরেও দেখা যাবে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নাটকের প্রুফ-সংশোধনে সাহায্য করছেন]। তিনি তাঁর ছাত্রের ব্যাকরণ শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য যতই ক্ষুব্ধ হোন না কেন, বালকের কবিপ্রতিভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথ-কৃত ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শোনাবার জন্য বালককে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। মেট্রোপলিটান নস্টিটিউশন সেই সময়ে অবস্থিত ছিল ২৬ নং সুকিয়া

স্ট্রিটে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়* বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল—তাঁহা মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই—অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধকরি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। মনে আছে, রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।'[২]

ম্যাকবেথের এই অনুবাদটি-সম্পর্কে জীবনস্মৃতি-র মুদ্রিত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যদিও লিখেছেন, 'সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ওই পরিমাণে হালকা হইয়াছে'[২], কিন্তু পাণ্ডুলিপির বর্ণনা অন্যরূপ: 'সেই অনুবাদের আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেকদিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।' আশ্বিন ১২৮৭ সংখ্যা [পৃ ২৯২-৯৩] 'সম্পাদকের বৈঠক'-এ '(ডাকিনী। ম্যাক্‌বেথ)' শিরোনামায়[৩] এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। এটি পড়লেই বোঝা যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ রবীন্দ্রনাথ পালন করেছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে অনুবাদের সময় সম্ভবত সমগ্র নাটকটি মোটামুটি একই ভাষা ও ছন্দে লিখিত হয়েছিল [এবং হয়তো প্রবহমান অমিল পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে], রাজকৃষ্ণবাবুর উপদেশে বালক কবি হয়তো এই অংশটি লৌকিক ভাষায় ও লৌকিক ছন্দে পুনরায় লেখেন। সজনীকান্ত দাস সাক্ষ্য দিয়েছেন, বৃদ্ধ বয়সেও তিনি এই রচনার একটি পঙ্‌ক্তি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে স্মরণ করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ প্রায় আক্ষরিক বলা চলে। ম্যাকবেথ নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যটি সম্পূর্ণ, তৃতীয় দৃশ্যের প্রথম অংশ [একটি উক্তি খণ্ডিত, সমবেত মন্ত্রপাঠ ও ভবিষ্যদ্‌বাণীর অংশ সম্পূর্ণ বর্জিত] এবং চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের প্রথম অংশ অবিশ্বাস্য দক্ষতায় অনূদিত হয়েছে। এ-ব্যাপারে এই বালক কবির সার্থকতা কতখানি, তা যে-কেউ মূল নাট্যাংশ ও ম্যাকবেথ নাটকের সমসাময়িক অন্যান্য অনুবাদের সঙ্গে এই রচনাটি তুলনা করলে বুঝতে পারবেন।

[এখানে একটি বিষয়ের প্রতি পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ম্যাকবেথ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য ও চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে Hecate নামে একটি ডাকিনীকে দেখতে পাওয়া যায়। এই নামটি নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। সে-প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ম্যাকবেথ পাঠের সমকালীন 'মালতীপুঁথি' নামে বিখ্যাত যে খাতাটিতে তিনি কবিতা লিখতেন, সেই খাতাটির 39/২১ক পৃষ্ঠায় Hecate Thacroon কথাটি তিনবার লিখিত আছে দেখা যায়। এই যোগাযোগের কী কোনো তাৎপর্য আছে? থাকলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের ম্যাকবেথ পাঠের ফলেই কাদম্বরী দেবী এই ডাক নামটি লাভ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য, বিলাতপ্রবাসকালে সত্যেন্দ্রনাথও বালিকা-বধূ জ্ঞানদানন্দিনীকে অনেকগুলি পত্রে 'বর্জিনি' বলে সম্বোধন করেছেন।]

জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য কেবল শেকস্‌পিয়রের ম্যাকবেথ নয়, কালিদাসের কুমারসম্ভব-ও বাংলায় অর্থ করে রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন: '[কুমারসম্ভব] তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।' অর্থাৎ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য এই ভাবী মহাকবির সঙ্গে জগতের আরও দুই মহাকবির পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে এই

দুজনেরই গভীর প্রভাব আছে, বিশেষত কালিদাসের প্রভাব তাঁর কবিমানসে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, এই পর্যায়ে গৃহশিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র কুমারসম্ভব পাঠ করেননি, প্রথমে তিনটি সর্গই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ম্যাকবেথের মতো কুমারসম্ভব-এর পঠিত অংশ জ্ঞানচন্দ্র ছাত্রকে দিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন, কিনা, রবীন্দ্রনাথ সে-সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। কিন্তু তিনি তৃতীয় সর্গের অনেকগুলি শ্লোকের পদ্যানুবাদ করেছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে পূর্বোক্ত মালতীপুঁথি-তে। সেখানে দেখা যায় এই সর্গের ২৫-২৮, ৩১, ৩৫-৩৯, ৪১-৪৯, ৫১-৫৮ ও ৬০-৭২—মোট ৪০টি শ্লোক তিনি অমিল পয়ারে অনুবাদ করেছেন, এর মধ্যে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ নয়; পাণ্ডুলিপির জীর্ণ অবস্থার জন্য কয়েকটি শ্লোকের সম্পূর্ণ পাঠও উদ্ধার করা যায় না। অনুবাদটির সম্পর্কে আর একটি বিশেষ তথ্য হল, ৬২, ৬৩ ও ৭২ সংখ্যক শ্লোক তিনটিতে অন্য একটি হস্তাক্ষরে কিছু কিছু সংশোধনের চিহ্ন রয়েছে এবং এই সংশোধনগুলি একই হস্তাক্ষরে পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে মালতীপুঁথি-রই 43/২৩ক থেকে 48/২৫খ এই ছটি পৃষ্ঠায়। আবার এই অংশটিরই পরিমার্জিত রূপ ভারতী পত্রিকার মাঘ ১২৮৪ সংখ্যায় ৩২৯-৩১ পৃষ্ঠায় 'সম্পাদকের বৈঠক/অনুবাদ'-এ 'মদনভস্ম' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে, পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম ছিল 'কুমারসম্ভব'। প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন, এই সংশোধন ও পরিমার্জনের ব্যাপারে 'বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের হাত কাজ করেছে বহুল পরিমাণে'।[৪]কানাই সামন্তও লিখেছেন: 'হস্তাক্ষরের বিচারে ও ভাষার বিচারে, বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণে, আমরা মনে করি যে, সম্ভবতঃ এটির রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রনাথ।'[৫] প্রখ্যাত গবেষকদ্বয় সিদ্ধান্তে একটু সংশয়ের আভাস রেখে দিয়েছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই মালতীপুঁথি-র এই হস্তাক্ষরকে দ্বিজেন্দ্রনাথের বলে শনাক্ত করতে পারবেন; আর 'লয়্যে', 'এড়ায়্যে', 'হয়্যে' ইত্যাদি বানান এবং 'হোতা' 'হেতা' ধরনের শব্দপ্রয়োগ দ্বিজেন্দ্রনাথকে অবিসংবাদিতভাবে চিনিয়ে দেয় [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'লোয়ে' 'হোয়ে' প্রভৃতি বানানে অভ্যস্ত ছিলেন]। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদটি অনেক বেশি মূলানুগ হলেও রচনাভঙ্গি খুবই আড়ষ্ট, সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ অনেক স্বচ্ছন্দ। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। ৬২ ও ৬৩ সংখ্যক শ্লোক-দুটি রবীন্দ্রনাথ প্রথমে অনুবাদ করেছিলেন:

> উমাও সে পদতলে হইলেন নত
> সহসা অলক হোতে পড়িল খসিয়া
> নব কর্ণিকার ফুল মহেশচরণে! [৬২]
> [অন্য] নারী-অনুরক্ত নহে যেই জন
> [হেন] পতি লাভ কর, আশীষিলা দেব,
> [যাঁহার ক]থায় কভু হয় না অন্যথা। [৬৩]।

কিন্তু এই শ্লোক দুটি পরিমার্জিত রূপ—

> উমাও যেমন তাঁরে করিলা প্রণা[ম]
> সুনীল অলক শোভি নবক[র্ণিকার]

খসিয়া অবনিতলে পড়িল [অমনি] [৬২]
অনন্যভাজন পতি লাভ কর বলি
আশিষিলা মহাদেব; যথার্থ আশীষ
উচ্চারিত হৈল যদি ঈশ্বরের বাণী।
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটন।[৬৩]

—অনেক বেশি মূলানুগ হলেও, কবিতা হিসেবে ততখানি সার্থক হয়নি বলে মনে করি। একই কথা বলা যেতে পারে শেষ শ্লোকটি [৭২ সংখ্যক] সম্বন্ধে। পাশাপাশি দুটি অনুবাদ উদ্ধৃত করছি:

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ	দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ
ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ	ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর এই বাণী
স্বর্গ হোতে দেবতারা কহিতে কহিতে	দেবতা সবার হোতা চরুক্ বাতাসে
হইল মদন তনু ভষ্ম অবশেষ	হেতায় মদনতনু ভস্ম অবশেষে।

এমনকি *ভারতী*-তে প্রকাশিত পুনঃ-সংস্কৃত অনুবাদে—

"ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর বাণী
দেবতা সবার হোথা চরিছে বাতাসে,
হেথায় সে হুতাশন ভবনেত্র-জাত
করিল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ।

— 'তাবৎ স বহ্ন্ভির্বনেত্রজন্মা' এই অংশটির অনুবাদ যুক্ত হলেও 'দেবতা সবার হোথা চরিছে বাতাসে' এই শ্রুতিকটু ও অর্থহীন বাক্যটি রসোত্তীর্ণতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। [লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের 'কভূ' ও ভষ্ম' শব্দদুটির বানান শুদ্ধ নয়। এমন অশুদ্ধ বানান মালতীপুঁথি-তে আরও আছে, যেমন—'ম্রিয়মান, 'বধু', 'সায়াহ্ন', 'চিহ্ন', 'মধ্যাহ্ন', 'বিষ্ময়' ইত্যাদি। অনেক বড়ো বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই অশুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।]

এখন প্রশ্ন, এই অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথ কোন্ সময়ে করেছিলেন? কুমারসম্ভবের এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ-কৃত কিনা সে-বিষয়েই অবশ্য জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ কি 'কুমারসম্ভব' বাংলায় তর্জমা করিয়াছিলেন; জীবনস্মৃতিতে তাহার কোনো ইঙ্গিত নাই। যদি উহার অনুবাদ তিনি করিয়া থাকেন তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ মুখখাপাধ্যায়কে কেবলমাত্র ম্যাকবেথ অনুবাদ শুনাইলেন—কুমারসম্ভবের কোন কথা নাই।"[৬] জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছুরই উল্লেখ বা ইঙ্গিত করেননি, সুতরাং যুক্তি হিসেবে তা গ্রাহ্য নয়। আর দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, রামসর্বস্ব পণ্ডিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যাসাগরকে ম্যাকবেথের অনুবাদ শোনাতে গিয়েছিলেন, তখন কুমারসম্ভবের অনুবাদ প্রস্তুতই হয়নি: কিংবা প্রস্তুত হলেও তা যখন বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তখন তা বিদ্যাসাগরকে শোনাবার যোগ্য বিবেচিত না হওয়াই স্বাভাবিক। এর মধ্যে প্রথম

কারণটি আমাদের কাছে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ মালতীপুঁথি-তে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যে-পৃষ্ঠায় [5/৩ক] কুমারসম্ভবের অনুবাদ শুরু করেছিলেন, তার শীর্ষে চারটি পঙ্‌ক্তি আছে, যেগুলি পূর্ব পৃষ্ঠায় [4/২খ] অনূদিত একটি কবিতার অনুবৃত্তি। কবিতাটি হল ইংরেজি কবি Byron [Lord George Noel Gordon Byron, 1788-1824]-এর *Childe Harold's Pilgrimage* [1812-18] কাব্যগ্রন্থের একটি স্তবক [Canto II, XV] অবলম্বনে লিখিত 'ভালবাসে যারে তার চিতাভস্ম পানে' প্রথম ছত্র-যুক্ত বারো ছত্রের একটি কবিতা। এই পৃষ্ঠাটিতে আরও কতকগুলি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ দেখা যায়, যার চারটি Thomas Moore [1779-1852]-এর লেখা *Irish Melodies* [1807] কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং একটি Byron থেকে অনূদিত। সুতরাং বোঝা যায়, আগে এই অনুবাদগুলি হয়েছে, তার পরেই রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভবের অনুবাদে হাত দিয়েছেন। আমাদের মনে হয়, ইংরেজি কবিতা থেকে এই অনুবাদগুলি কিছু পরবর্তীকালের রচনা। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ম্যাকবেথ অনুবাদ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য সে ক্ষেত্রে প্রতি পদে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু অন্য ইংরেজি কবিতার অর্থ বুঝে তার যথাযথ অনুবাদ নিজে করার শক্তি তিনি সেই সময় অর্জন করেছিলেন, একথা মনে হয় না। এ ব্যাপারেও অন্যের সাহায্য তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই স্বীকৃতি আছে ইংরেজি সাহিত্যচর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অসমবয়সী বন্ধুত্ব আরও কিছুকাল পরে গড়ে উঠেছিল। যথাসময়ে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে আমরা আর-একটি তথ্য উপস্থিত করতে পারি। উপরে উল্লিখিত 'ভালবাসে যারে তার চিতাভস্ম পানে' অনুবাদ-কবিতাটির পাশে ও আলোচ্য কুমারসম্ভবের অনুবাদের শেষে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের একটি শ্লোকের [প্রথম অঙ্ক, ৩১ সংখ্যক শেষ শ্লোক] দুটি অনুবাদ দেখা যায়, যেটি রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের কাছে শকুন্তলা পড়ার সার্থকতার প্রমাণ। কিন্তু রামসর্বস্ব 'অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ' দেবার পরই অর্থ করে শকুন্তলা পড়াতে শুরু করেছিলেন। ব্যাকরণ শিক্ষা ও সংস্কৃত অনুবাদে তার প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের কতখানি অগ্রগতি [?] ঘটেছিল, তার প্রমাণ রয়ে গেছে মালতীপুঁথি-র প্রথম পৃষ্ঠায় কথামালা-র প্রথম গল্পটি* ['বাঘ ও বক'—'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল'] সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ ও দেবনাগরী লিপিতে তা লেখার দুটি প্রচেষ্টার মধ্যে। এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টার পরই রামসর্বস্ব শকুন্তলা পড়াতে শুরু করেছিলেন, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। আমরা জানি রামসর্বস্ব কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে [Nov 1874] গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং শকুন্তলা-পাঠের সময় আমরা সচ্ছন্দে ১২৮২ বঙ্গাব্দের প্রথম দিক বলে নির্ধারণ করতে পারি। ইংরেজি কবিতাগুলির ও কুমারসম্ভবের অনুবাদ তারই অব্যবহিত পরবর্তীকালের—এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত।

এই বৎসর অগ্রহায়ণ সংখ্যা *তত্ত্ববোধিনী*-তে [৮ম কল্প ৪র্থ ভাগ, ৩৭৫ সংখ্যা, পৃ ১৪৮-৫০], 'অভিলাষ' নামে ৩৯টি স্তবকে রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নামের তলায় লেখা ছিল 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত', কিন্তু রচয়িতার নাম দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই সজনীকান্ত দাস এটি 'আবিষ্কার' করেন [Nov 1939]। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আবিষ্কার-প্রসঙ্গে লেখেন: 'রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।... কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস, ইহা আরও এক বৎসর পূর্বের রচনা।'[৭] রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতির ফলে

রচয়িতার পরিচয় নিয়ে সংশয় সৃষ্টির কোনো অবকাশ এখানে ছিল না, ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতার গৌরব খুব সহজেই তা লাভ করতে পেরেছিল। কিন্তু এতেই সব সংশয়ের অবসান ঘটেছে এমন মনে করা যায় না। সংশয়টি সৃষ্টি হয়েছে কবিতাটির রচনাকালকে কেন্দ্র করে। 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত' এই সংকেতটি অবলম্বন করে ব্রজেন্দ্রনাথ কবিতাটির রচনাকাল নির্ণয় করেছেন প্রকাশের এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ১২৮০ [Nov-Dec 1873] বা এর কাছাকাছি কোনো সময়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও এই মত সমর্থন করে লিখেছেন: 'খুব সম্ভব উহা ১২৮০ শীতকালে রচিত হয়।'[৮] অন্যত্রও তিনি লিখেছেন: "১৮৭৩ সালে যখন জ্ঞানচন্দ্রে নিকট 'ম্যাকবেথ' পড়িতেছিলেন, তাহার পর লিখিত হইলে লেখকের বয়স 'দ্বাদশবর্ষ' হয়,... এই কবিতার মধ্যে সদ্য ম্যাকবেথ-পাঠের প্রভাব রহিয়া গিয়াছে।...।"[৯] কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে ম্যাকবেথ পড়া ১২৮১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি [Aug 1874] থেকে শুরু হয়েছিল এবং বাংলায় অর্থ করে পুরো গ্রন্থটি পড়ানো ও অনুবাদ করানোর কাজে নিশ্চয়ই দু-এক মাস সময় লেগেছিল। সুতরাং উপরোক্ত যুক্তি অনুসরণ করলে কবিতাটির রচনাকাল কিছুতেই আশ্বিন ১২৮১-র পূর্বে হওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় সাড়ে তেরো বৎসর। অন্য এক যুক্তির আশ্রয় নিয়ে ড সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাটির রচনাকাল '১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসের পরে' নির্ধারণ করেছেন,[১০] যা আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রকারান্তরে সমর্থন করে। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত যুক্তিটির পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে, কারণ রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার মানসিকতা বোঝার পক্ষে তা সহায়ক হবে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাটির মধ্যে লক্ষ্য করেছেন, এতে কবির নিজস্ব কোনো অভিলাষ নয়, 'জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ' যা শেষ পর্যন্ত মানুষকে অধর্ম ও বিনাশের দিকে চালিত করে তার প্রতি ধিক্কারই প্রকাশিত হয়েছে। এই ধিক্কারের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের মত[১১] অনুসরণ করে বলেছেন, *বঙ্গদর্শন*-এর শ্রাবণ ১২৮১ (পৃ ১৪৫-৫৪] সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চাভিলাষকে খুব উচ্চ স্থান দিয়ে বাঙালিকে খুব জোরের সঙ্গেই ওদিকে যে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন, 'অভিলাষ' কবিতাটি সম্ভবত বঙ্কিমের ওই প্রবন্ধেরই প্রতিবাদ। তিনি তাতে বলেছেন, বঙ্কিমের বক্তব্যের মধ্যে ধর্মের প্রবর্তনা মোটেই স্থান পায়নি। অথচ সেটি ঠাকুরবাড়িতে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করত। "তাই স্বভাবতঃই এই কবিতাটিতে সুখাভিলাষকে ধিক্কৃত করে ধর্মের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। আর, কবিতাটি প্রকাশিতও হল ধর্মচিন্তার বাহক 'তত্ত্ববোধিনী'তে।"

কিন্তু আমাদের কাছে এই যুক্তির ভিত্তি খুব দুর্বল বলে মনে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে বাঙালি যেন জাতীয় সুখের অভিলাষে [লক্ষণীয় ব্যক্তিগত সুখের অভিলাষের কথা তিনি বলেননি] উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়কে একত্রিত করতে পারে, বাঙালির বাহুবল বলতে বঙ্কিমচন্দ্র একটি 'মানসিক অবস্থা'কে বুঝিয়েছেন শারীরিক বলের কথা বলেননি, বরং প্রকারান্তরে তার নিন্দাই করেছেন —'মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র।' একথা ঠিকই যে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে কোনো ধর্মীয় প্রবর্তনার কথা বলেননি। কিন্তু ধর্মীয় প্রবর্তনার ভিত্তি যে নৈতিকতা উক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে তার প্রকাশ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বা ঠাকুরবাড়ির পক্ষে এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করার মতো কোনো কারণ থাকতে পারে বলে

মনে হয় না। আর ব্রাহ্মধর্মের পৃষ্ঠপোষক ঠাকুরবাড়ির চিন্তাধারা এত সংকীর্ণও ছিল না; থাকলে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের অনুসারী হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার আনুকূল্য করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না।

প্রকৃতপক্ষে, ম্যাকবেথ পাঠের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় কবিতাটি রচিত। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ আক্ষরিকভাবে ম্যাকবেথের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। কিন্তু গীতিকবির মন তাতেই তৃপ্ত হয়নি, তাই উচ্চাভিলাষ কেমন করে মানব-চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিয়ে তাকে বিষাদময় পরিণতির পথে টেনে নিয়ে যায়—ম্যাকবেথ নাটকের এই ভাববস্তু অবলম্বন করে একটি গীতিকবিতা রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'অভিলাষ' কবিতার ২৪, ২৫, ২৬ ও ৩১ সংখ্যক স্তবক পর পর পাঠ করলে ম্যাকবেথ নাটকের কথা-ও ভাব-বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। এই ভাবটিকেই রামায়ণ ও মহাভারতের দৃষ্টান্ত সহযোগে বৃহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত করার চেষ্টাও কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়। আর সেই কারণেই অভিলাষের উপকারী 'সোপান'গুলি চিত্রিত করার প্রয়াস কবিতাটির শেষ তিনটি স্তবকে দেখতে পাই। কিন্তু ভাবটি যথাযথভাবে পরিস্ফুট হবার আগেই কবিতাটি হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র ম্যাকবেথ-পাঠের অনুপ্রেরণাই কবিতাটির পিছনে কার্যকরী ছিল না, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক ও নিজের সম্পর্কে মনোভাবের কিছু ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয়। দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য-ধন্য হিমালয়-প্রত্যাগত যে বালকটি বাড়ির সকলের মনে তাঁর সম্পর্কে উচ্চাভিলাষের জন্মদান করেছিল, তাঁর পরবর্তী আচরণ তার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে সংগতিপূর্ণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।" আমি বেশ বুঝিতাম, ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে...।'[১২] উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রসঙ্গে করলেও তার আগের পর্বেও তাঁর সম্পর্কে আত্মীয়স্বজনের মনোভাব ভিন্নতর ছিল বলেই মনে হয়। এই আত্মগ্লানিই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে উচ্চাভিলাষের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল, 'অভিলাষ' কবিতাটির মধ্যেও তার আভাস আছে:

> ঐ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
> দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়
> পছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
> লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান। [৬ষ্ঠ স্তবক]।

—ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হবার জন্য 'চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাঁসপাতাল-জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির সঙ্গে' নিজেকে জুড়ে দেবার অক্ষমতা ও সেই কারণে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধিক্কারের নিত্য বর্ষণ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তার একটি সুন্দর প্রকাশ আছে সমকালীন একটি রচনায়। মালতীপুঁথি-র একেবারে প্রথমে সংস্কৃত-শিক্ষার নিদর্শন-যুক্ত পৃষ্ঠাটির পরেই 'প্রথম সর্গ' শিরোনামে একটি অসমাপ্ত কবিতা আছে। প্রবোধচন্দ্র সেন কবিতাটি এই পাণ্ডুলিপির-ই অন্তর্গত 'শৈশবসঙ্গীত' [রচনাকাল: ২৪ আশ্বিন ১২৮৪ মঙ্গলবার 9 Oct 1877] শীর্ষক কবিতার কাছাকাছি সময়ের রচনা বলে অনুমান করেছেন। আমরা তা মনে করি না। মালতীপুঁথি-র পাতাগুলির

পৌর্বাপর্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি এ তথ্য মনে রেখেও আমাদের ধারণা, কবিতাটি এই পাণ্ডুলিপি-খাতাতে রচনারম্ভের সমসাময়িক কালে লেখা। স্মরণ রাখতে হবে, যে পৃষ্ঠায় এই 'প্রথম সর্গ' কবিতাটির লেখা [পৃ 3/২ক] তার পরের পৃষ্ঠাতেই [পৃ 4/২খ] পূর্ব-কথিত *Irish Melodies* ও *Byron*-এর কবিতার অনুবাদ করা হয়েছে, যার সমাপ্তি কুমারসম্ভবের অনুবাদের ঠিক উপরে। ইংরেজি কাব্যানুবাদগুলি যদি 4/২খ পৃষ্ঠাতেই শেষ হয়ে যেত, তাহলে এই পাতা-ক'টি পৌর্বাপর্য থেকে বিশ্লিষ্ট বলে অনুমান করা চলত। কিন্তু 5/৩ক পৃষ্ঠায় বায়রনের কবিতা অনুবাদের ক্রমানুসৃতি সেইরূপ অনুমানের কোনো সুযোগ রাখেনি। আর অধ্যাপক সেন 'প্রথম সর্গ' কবিতাটিকে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের 'কবিকৃত দ্বিতীয় সংস্করণের অসমাপ্ত অংশ' বলে অভিহিত করে প্রকারান্তরে আমাদের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছেন।

যাই হোক, উক্ত কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার মানসিকতাটি ধরা পড়েছেন বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন:

> তবে হে ঈশ্বর! তুমি কেন গো আমারে
> ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে করিলে নিক্ষেপ;
> যেখানে সবারি হৃদি যন্ত্রের মতন;
> স্নেহ প্রেম হৃদয়ের বৃত্তি সমুদয়
> কঠোর নিয়মে যেথা হয় নিয়মিত।...
> হৃদয় বিহীন প্রসাদের আড়ম্বর
> গর্ব্বিত এ নগরের ঘোর কোলাহল
> কৃত্রিম এ ভদ্রতার কঠোর নিয়ম
> ভদ্রতার কাষ্ঠ হাসি, নহে মোর তরে।

এই জগতের 'হৃদয়হীন উপেক্ষা' ও 'দ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদ' থেকে মুক্ত হয়ে তিনি যে-জীবনের স্বপ্ন দেখেন তার ছবিটিও এঁকেছেন এই কবিতায়:

> কেন আমি হলেম না কৃষক বালক,
> ভয়ে ভয়ে মিলে মিলে করিতাম খেলা,
> গ্রাম প্রান্তে প্রান্তরে পর্ণের কুটীরে
> পিতামাতা ভাইবোন সকলে মিলিয়া
> স্বাভাবিক হৃদয়ের সকল উচ্ছাসে,
> মুক্ত ওই প্রান্তরের বায়ুর মতন
> হৃদয়ের স্বাধীনতা করিতাম ভোগ।

—কবিতাটি ঠিক কোন্ সময়ে লেখা তা আমরা জানি না বটে, কিন্তু এখানে বর্ণিত মনোভাবটি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে রচিত বহু কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—যা নিছক কবি-কল্পনা নয়, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা। আমাদের মনে হয় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সংঘাতে সৃষ্ট এই মানসিকতা থেকেই তিনি

'অভিলাষ' কবিতায় 'জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ'-কে ধিক্কার দিয়েছেন ও দরিদ্র কুটীর মাঝে বিরাজে সন্তোষ'-এই সত্যকে ঘোষণা করেছেন।

তত্ত্ববোধিনী-তে 'অভিলাষ' প্রকাশের পরের মাসেই পৌষ সংখ্যায় [পৃ ১৬১-৬৩] 'গ্রহগণ জীবের আবাস-ভূমি' শীর্ষক জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, সুতরাং এখানে আর-কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

এর পরে বৃহত্তর জনসমাজের সম্মুখে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রকাশ ঘটল হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে। এই অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে তাঁর নাম-সহ এই সংবাদটি পরিবেশিত হয়। ইতিপূর্বে হিমালয়যাত্রার সময়ে *সোমপ্রকাশ পত্রিকা*-য় নাম ছাড়া তাঁর গতিবিধির সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল; তারপর *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় মুদ্রিত আকারে তাঁর নাম প্রকাশিত হয়—এ-সব তথ্য আমরা পূর্বেই সরবরাহ করেছি। বর্তমান ক্ষেত্রে বহুজন-পঠিত ইংরেজি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়েছে, তথ্য হিসেবে এটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *Indiand Daily News* নামক দৈনিক পত্রিকার 15 Feb 1875 [সোম ৪ ফাল্গুন) সংখ্যা থেকে সংবাদটি সংকলন করে দেন: '"*The Hindoo Mela.*". The Ninth Anniversary of the Hindoo *mela* was opened at 4 P.M. on Thursday, the 11th instant, at the well-known Parseebagan...on the Circular Road, by Rajah Kamal Krishna, Bahadoor, the President of the National Society.../Baboo Robindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendro Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone much pleased his audience.'[১৩] এই বিবরণ অনুযায়ী ৩০ মাঘ ১২৮১ বৃহস্পতিবার 11 Feb 1875 রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ [তাঁকে প্রায় ১৫ বৎসর বয়সের বালক বলে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর বয়স তখন তেরো বছর ন-মাস] সেখানে 'ভারত' বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত [১৩৭৫] গ্রন্থে উক্ত উদ্ধৃতির দ্বিতীয় বাক্যটি উদ্ধার করেছেন এবং লিখেছেন, 'এবারেই সর্বপ্রথম কিশোর রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ তখন চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক) সাধরণ সমক্ষে দাঁড়াইয়া "হিন্দুমেলার উপহার" শীর্ষক স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।' [পৃ ৪২]

জীর্ণ হয়ে যাবার জন্যে *Indian Daily News*-এর ফাইল দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি; কিন্তু *Bengalee* পত্রিকার 20 Feb 1875 সংখ্যায় [Vol. XIV, No. 8, p. 57] উপরোক্ত বিবরণটি হুবহু একই ভাষায় প্রকাশিত হয়। বিবরণটি অবশ্য অনেক দীর্ঘ, [হয়তো *Indian Daily News*-এর প্রতিবেদনও অনুরূপ দীর্ঘ ছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ তার থেকে কেবল প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সংকলন করেছিলেন] কিন্তু শুরুতেই একটি ছোটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়: 'The Ninth Anniversary of the Hindoo *mela* was opened at 4 P.M. of Friday last' অর্থাৎ উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হয় শুক্রবার ১ ফাল্গুন 12 Feb তারিখে। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা-য় [১৮। ১৫, ১১ ফাল্গুন, পৃ ২৩৪] ৬ ফাল্গুন বুধবার তারিখ দিয়ে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়: 'গত পূর্ব্ব শুক্রবার সারকিউলার রোড পারসী বাগানে মহা সমারোহে হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০০ হিন্দু

ভদ্র লোক মেলার স্থলে উপস্থিত হন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র একটী উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া উহা মুখস্থ পাঠ করিয়া সকলের চিত্ত রঞ্জন করেন এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। সভাপতির বক্তৃতার পর গীত বাদ্য হইয়া অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।' এখানেও শুক্রবারের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। অথচ উক্ত পত্রিকার ৪ ফাল্গুন সংখ্যায় লিখিত হয়: '৩০এ মাঘ ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া আজ শেষ হইবে।' সুতরাং সংবাদগুলির এই পরস্পর-বিরোধী বিবরণের জন্য উদ্বোধন দিবসের তারিখটি সম্পর্কে একটু সংশয় থেকে যাচ্ছে। অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে, পূর্ববর্তী বৎসরে অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনও আরম্ভ হয়েছিল ৩০ মাঘ ১২৮০ [বুধ 11 Feb 1874] তারিখে এবং চলেছিল বর্তমান বৎসরের মতোই ৪ ফাল্গুন পর্যন্ত।

বহুদিন পর্যন্ত জানা ছিল, এই উদ্বোধন দিবসে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলায় উপহার' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন এবং কবিতাটি কয়েকদিন পরে দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা-য় ১৪ ফাল্গুন ১২৮১ বৃহস্পতিবার 25 Feb 1875 তারিখে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নাম স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত হয়।* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকা-র পুরোনো ফাইল থেকে কবিতাটি আবিষ্কার করে মাঘ ১৩৩৮ [Jan 1932] সংখ্যায় প্রবাসী-তে [পৃ ৫৮০-৮১] পুনর্মুদ্রিত করেন। সাময়িক পত্রে এটিই রবীন্দ্রনাথের নাম-স্বাক্ষরিত প্রথম মুদ্রিত কবিতা। এই কবিতাটির কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি বা অন্য কোথাও উল্লেখ করেননি।

কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা'-শীর্ষক প্রবন্ধে[১৪] "হোক্ ভারতে জয়" নামের ৮০টি পঙ্‌ক্তিতে রচিত একটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত করে এতদিনকার স্বীকৃত ধারণা পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। উক্ত কবিতাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত বান্ধব মাসিক পত্রিকাটির মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় [১। ৮, পৃ ২০২-০৩] প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির শেষে '(র)' অক্ষরটি লেখা আছে এবং পাদ-টীকায় উল্লিখিত হয়েছে: 'হিন্দুমেলা উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল।' শ্রীঘটক চৌধুরী মনে করেন, হিন্দুমেলা উদ্বোধন দিবসে এই কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা 'পঠিত' হয়েছিল— 'হিন্দুমেলায় উপহার' [প্রবন্ধে সর্বত্র কবিতাটি 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে অভিহিত হয়েছে, স্পষ্টতই তা ভুল] নয়। তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা হল এই যে, এটি 'হিন্দুমেলা উপলক্ষে রচিত কবিতা' এবং কবিতাটির 'এস এস ভ্রাতৃগণ! সরল অন্তরে', 'এসেছে জাতীয় মেলা ভারতভূষণ', 'এস এস এস করি প্রিয় সম্ভাষণ', 'এই দেখ হিন্দুমেলা' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে কোনো সভাকে উদ্দেশ করে ভাষণ দেওয়ার একটা ভাব আছে। এটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সেটি প্রমাণ করতে তিনি সমকালীন রচনা 'হিন্দুমেলায় উপহার' ও 'প্রকৃতির খেদ'-এর সঙ্গে কবিতাটির 'ভাব-ভাষা ও ছন্দ-সাদৃশ্য' তুলনা করে দেখিয়েছেন। আরও দু-একটি যুক্তি তথ্য তিনি উপস্থিত করেছেন, কিন্তু সেগুলি ছাড়াই কবিতাটিকে রবীন্দ্ররচনা বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন: "'হিন্দুমেলা উপলক্ষে' রচিত সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটি সে যুগে রবীন্দ্রনাথকে স্বাদেশিকতার প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছিল"—এর সঙ্গে আমরা বলতে পারি বর্তমান কবিতাটি যেন সত্যেন্দ্রনাথের রচনাটি সামনে রেখেই লেখা, এমন-কি "হোক্ ভারতের জয়" এই শিরোনামটি এবং কবিতার মধ্যে তার প্রয়োগ সরাসরি উক্ত রচনাটি থেকে গৃহীত হয়েছে, শিরোনামে উদ্ধৃতি-চিহ্নের ব্যবহারটিও লক্ষ্য করার মতো। এই কবিতাটিই যে হিন্দুমেলার উদ্বোধনী দিবসে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেছিলেন, তার প্রমাণ *Indian Daily News* ও *Bengalee*-

র প্রতিবেদনেই আছে— সেখানে কবিতাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে 'a Bengali poem on Bharut (India)', যা এই শিরোনামটিকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল। তখনকার দিনে খুব কম বাংলা মাসিক পত্রিকা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হত, সুতরাং কবিতাটি মাঘ-সংখ্যা বান্ধব-এ প্রকাশিত হয়েছিল এ-নিয়ে কোনো সংশয় সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির দীর্ঘকালীন সম্পর্কের বহু প্রমাণ আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির গ্রাহক ছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটকের এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উৎকৃষ্ট সমালোচনা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়, আর রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী কাব্যের সমালোচনার কথা তো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবনস্মৃতি-তে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হিন্দুমেলায় কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটির জন্য সেটি সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।
*

আমরা পূর্বেই বলেছি, 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামে একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-যুক্ত হয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা-য় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি মেলার কোনো অনুষ্ঠানে পঠিত বা আবৃত্তি করা হয়েছিল কিনা তার নিঃসন্দিগ্ধ উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। তবে যাঁরাই এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরাই কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথ শ্রোতাসাধারণকে শুনিয়েছিলেন এ-বিষয়ে একমত। জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]-র গ্রন্থপরিচয়ে লেখা হয়েছে: '১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তিনি স্বরচিত কবিতা প্রথম পাঠ করেন; অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু'—উদ্ধৃতির দ্বিতীয় অংশটি অবশ্যই ভুল, কারণ সংবাদপত্রের প্রতিবেদনেই প্রকাশিত হয়েছে যে সেদিন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতিত্ব করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ বসু যে আত্মচরিত-এ লিখেছেন: '১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য আমি সম্পাদন করি। ...এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত মৌলাবক্সের গান হয়', সেটি মেলার চতুর্থ ও প্রধান দিবস অথাৎ ৩ ফাল্গুন [রবি 14 Feb] তারিখের অধিবেশনের কথা, কারণ মৌলাবক্সের গান এই দিনই পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যদি রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি পাঠ বা আবৃত্তি করে থাকেন, তাহলে তিনি তা করেছিলেন এই দিনের অধিবেশনেই। রবীন্দ্রনাথ যে এদিন হিন্দু মেলা-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ক্যাশবহি-র ৭ ফাল্গুন [বৃহ 18 Feb] তারিখের হিসাব থেকে: 'সোম রবীবাবুদিগের/হিন্দুমেলায় জাতাতের গাড়ি ভাড়া/৩ ফাল্গুনের ২ বৌচর শোধ/২ °'। তাছাড়া 'হিন্দুমেলায় উপহার' যে কেবলমাত্র ব্যঞ্জনার্থে উপহার ছিল না, একেবারে আক্ষরিক অর্থে 'উপহার' ছিল, এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিও আমরা ক্যাশবহি থেকে জানতে পারি। এতে ২ আষাঢ় ১২৮২ [মঙ্গল 15 Jun 1875] তারিখের হিসাবে দেখা যায়: 'ব° বাবু নবগোপাল মিত্র/দ° গত হিন্দু মেলায় রবীবাবুর একটী লেখা/ছাপান হয় তাহার ব্যয়...৫্' অর্থাৎ কবিতাটি কেবল পাঠ বা আবৃত্তি করা হয়েছিল তাই নয়, এটিকে মুদ্রিত করে 'উপহার' হিসেবে সমবেত দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। অনুমান করা চলে, এরই একটি কপি থেকে *অমৃতবাজার পত্রিকা-য়* কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়ে বৃহত্তর জনসমাজের কাছে পৌঁছে। গিয়েছিল।

এই দিনের অনুষ্ঠানের একটি বিবরণ দিয়েছেন খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র কথা' গ্রন্থে [পৃ ৩৫৮]: 'আমরা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের পিতা অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি সেদিন পার্শীবাগানে হিন্দুমেলায় উপস্থিত ছিলেন, কোন সাল তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। কবির বয়স তখন

১৩। ১৪ বৎসর হইবে। সভাপতি রাজনারায়ণ বসু হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। একজন পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট এই বলিয়া পরিচিত করাইয়া দেন যে, "ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ" লিখিয়া কবি তখন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা একখানি চৌকা কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়া হিন্দুমেলার উপহার বলিয়া বিতরিত হইয়াছিল।... মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও পার্শীবাগানের সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনিও অতুলবাবুর বিবরণ সমর্থন করেন। অধিকন্তু বলেন যে, কবিতাটির কিয়দংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিবার পর তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ বেশ উচ্চকণ্ঠে উহা পাঠ করিয়া শোনান।' রাজনারায়ণ বসুর পক্ষে হিন্দিতে বক্তৃতা করা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই দিনের কর্ম্মসূচিতে নির্ধারিত ছিল 'এ বৎসর কলিকাতার নেপালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগকে একত্রিত করা হইবে। সকলে মিলিয়া হিন্দুসাধারণের সর্বপ্রকার উন্নতির বিষয় কথোপকথন ও আলোচনা করিবেন।'[১৫] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ' নামে কোনো কবিতার সংবাদ আমাদের জানা নেই, অথচ উক্ত পণ্ডিত জনমণ্ডলীর কাছে তাঁকে এই বলে পরিচিত করেছিলেন যে, তিনি কবিতাটি লিখে তখন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অর্থাৎ কবিতাটি নিশ্চয় কোনো সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র খগেন্দ্রনাথ লিখেছেন [পৃ ১৮৭]:'কবির স্বরচিত কবিতা "ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ" চৈত্রমেলার প্রকাশ্য সভায় তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত হয়'—এ বিষয়েও নির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ' সম্পর্কে শুনে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর উত্তর তিনি লিখে রেখেছেন পূর্বোল্লিখিত নোটের খাতায়:

> লর্ড লিটনের সময়ের কবিতা [৩০/১/১৯৩২ কথাবার্তা] এ কবিতাটা খুব ভালো। বিষয়টা হচ্ছে যে যুধিষ্ঠিরের সময় রাজসূয় যজ্ঞে সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে রাজারা কাকে সম্মান দেখাতে এসেছিল? [কৃষ্ণ, অথাৎ ভগবানকে লক্ষ্য ক'রে), আর এখনই বা কাকে সম্মান দেখাতে আস্‌ছে? কম বয়সের পক্ষে ideaটা মন্দ ছিল না, আর বেশ ঝাঁঝ ছিল। এইটাই বোধহয় "ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ"।

31 Jan 1932 তিনি এবিষয়ে আবার লেখেন:

> 'ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ' লেখাটা সত্যি ভালো হয়েছিল বল্‌লেন। কবির সব ঠিক মনে নেই তবে ওর ভাবখানা হ'চ্ছে এই যে, একদিন ইন্দ্রপ্রস্থে ভারতবর্ষের রাজারা এসেছিলো রাজসূয় উপলক্ষ্যে কাকে সম্মান দেখাবার জন্য— (অর্থাৎ কৃষ্ণকে), আর আজ (দিল্লী-দরবার উপলক্ষ্যে) রাজন্য-সমাগমই বা কাকে সম্মান দেখাবার জন্য? স্বর্গ থেকে ধৃতরাষ্ট্র এই কথা ভাবছেন।
>
> [মন্তব্য: —কবি যা বলছেন সে হিসাবে 'ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ' লেখা হয় দিল্লী-দরবার উপলক্ষ্যে অথাৎ ১৮৭৭ (?) সালে; ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'যে-কবিতা বের করেছেন হিন্দুমেলায়, রাজনারায়ণবাবুর সভাপতিত্বে, পঠিত—তার তারিখ হচ্ছে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫। তা হলে অতুলকৃষ্ণ ঘোষ যে বলেছেন, যে, হিন্দু-মেলায় কবির পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, এই ব'লে, যে, ইনি 'ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ' কবিতা রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ করেছেন, তা সম্ভবপর হয় কী ক'রে?]

অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত 'মন্তব্য' —কিন্তু রচনাটি যতদিন না উদ্ধার করা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত সমস্যাটির সমাধান করা দুরূহ। উল্লেখ্য, *সাধারণী*-র ২৮ বৈশাখ ১২৮১ ও ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ সংখ্যায় 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ' নামে একটি গদ্য রস-রচনা মুদ্রিত হয়—কিন্তু রচনাটি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা [দ্র রূপক ও রহস্য, অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার-শেষার্ধ। ৫২৬-২৮], তার বিষয়ও আলাদা।

ক্যাশবহি আমাদের আর-একটি বিচিত্র সংবাদ দেয়, যা সকলের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে। ৬ ফাল্গুন ১২৮১ [বুধ 17 Feb] তারিখের হিসাবে লিখিত হয়েছে: শ্রীযুক্ত রবীবাবুর কৃত/ছবি এক খানা

বাঁধাইবার ব্যয়/এক বৌচর ২৫⁄০/গুঃ যদুনাথ চট্টোপা-[ধ্যায়]'। আমরা জানি, কৃষি শিল্প ও চিত্র প্রদর্শনী হিন্দুমেলার একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল, বর্তমান বৎসরেও যে তার আয়োজন ছিল সংবাদপত্রের বিবরণে তার উল্লেখ আছে। রবীবাবুর 'কৃত' যে ছবিটি বাঁধাবার উল্লেখ উক্ত হিসাবে পাওয়া যায়, সেটি কি হিন্দুমেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল? দুঃখের বিষয়, এই সম্ভাবনার উল্লেখটুকু করা ছাড়া এ-বিষয়ে আর কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। রবীন্দ্রনাথ যে ড্রয়িং শিক্ষকের কাছে এ সময়ে চিত্রাঙ্কনের পাঠ নিতেন সে-বিষয়ে ক্যাশবহি-র ৩১ আষাঢ় [বুধ 14 Jul] তারিখের একটি হিসাব আমাদের অবহিত করে: 'ব° বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর/দ° সোম রবীবাবুদিগের ড্রইং শিক্ষার/সাবেক মাষ্টারের বেতন ছয়মাসের ৫, হিঃ/৩০, টাকা উক্ত বাবুকে দেওয়া যায়'— এ-প্রসঙ্গে 'সাবেক' শব্দটি লক্ষণীয়, আষাঢ় ১২৮২-তে উক্ত ড্রয়িং-শিক্ষক 'সাবেক'-এ পরিণত হয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবত মাঘ ১২৮১-তে তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁরই অধীনে রবীন্দ্রনাথ যে ছবি এঁকেছিলেন তারই একটি বাঁধানো ও হিন্দুমেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল এমন সম্ভাবনার কল্পনাই আমাদের পুলকিত করে। এই অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনীর ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় যোগ করা দরকার হবে।

আমরা পূর্ব বৎসরের বিবরণে উল্লেখ করেছি, 1874-এ রবীন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন বলে সজনীকান্ত দাস যে অনুমান করেছেন, সেটি যথার্থ নয়। এই অনুমানটি বহু রবীন্দ্র-গবেষককে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। প্রকৃত তথ্যটি পাওয়া যায় ক্যাশবহি-র ২৪ আষাঢ় ১২৮২ [বুধ 7 Jul 1875] তারিখের হিসাব থেকে:

'ব° সেন্ট জাবিয়ার্স কলেজ
দ° সোম রবী সত্য প্রসাদ বাবু দিগের ফি
১৮৭৫ সালের ফেবরূয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত
পাঁচ মাসের প্রতি জনের মাসিক ৮৲ হিঃ—
১২০৲
বাদ রবীবাবু কয়েকদিন পরে ভরতি হন
৫৲

১১৫৲
Entrance fee তিনজনার
৬৲

১২১৲'

—এই হিসাব থেকে বোঝা যায় 1874-এ নয়, Feb 1875-এ [মাঘ ১২৮১] সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ মাসের শুরুতেই এবং রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগে [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৬] ভর্তি হন। পুরো 1874 বৎসরটি তাঁরা স্কুলের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন এবং গৃহশিক্ষকদের অধীনে পড়াশুনোর এই অধ্যায়টিকেই রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে 'ঘরের পড়া' বলে অভিহিত করেছেন। উপরের হিসাবটি আমাদের কিছু অতিরিক্ত সংবাদও জ্ঞাপন করে। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথকে সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন পরে উক্ত স্কুলে ভর্তি করা হয়। এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় স্কুলে পাঠানো সুবিবেচনার কাজ হবে কিনা এ-বিষয়ে অভিভাবকেরা প্রথমেই মনঃস্থির করে উঠতে পারেননি। স্কুলটির পঠন-পাঠনের সুনাম, বিচক্ষণ মিশনারি অধ্যাপকদের যত্ন এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গণ-সহ সুন্দর স্কুলবাড়ি হয়তো বন্ধনভীরু এই বালকের কাছে খুব দুঃসহ হবে না এই ভেবেই সম্ভবত অভিভাবকেরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্কুলে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অভিভাবকদের প্রাথমিক আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী আচরণ থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। সে-সম্পর্কে তিনি জীবনস্মৃতি-তে যা লিখেছেন, তাছাড়াও কিছু অতিরিক্ত তথ্য আমরা যথাস্থানে সরবরাহ করব।

আরও একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, ভর্তি ফি সহ পাঁচ মাসের বেতন [Feb থেকে Jun] শোধ করা হয়েছে 7 Jul তারিখে এবং রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পরে ভর্তি হয়েছিলেন বলে ৫ টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে [এই

ধরনের ঠিকা প্রথায় বেতন পরিশোধ করার রীতি আমরা আগেও দেখেছি, হিমালয়ভ্রমণের কয়েকমাসের বেতন বেঙ্গল অ্যাকাডেমিকে দেওয়া হয়নি]! এমন নয় যে কয়েক মাসের বিল একত্রিত করে একসঙ্গে হিসাব লেখা হয়েছে। উপরোক্ত হিসাবটি ১২৮২ সালে 'PERSONAL ACCOUNT /খতিয়ান বহি'র 'বিদ্যাভ্যাস খাতা' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু ঐ একই বৎসরের 'নিজ হিসাবের ক্যাশবহি' নামক খাতায় উক্ত হিসাবের সঙ্গে একটু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়: নোট ১০০্ ও রোক [খুচরো টাকা] ২১্'-এর থেকে বোঝা যায় পুরো টাকাটাই এক সঙ্গে শোধ করা হয়েছিল। * এখনকার দিনে স্কুল-কলেজের বেতন শোধের ক্ষেত্রে এরকম রীতির কথা ভাবাই সম্ভব নয়। তাঁরা যে Feb 1875-এর শুরু থেকেই স্কুলে যাতায়াত করতে শুরু করেছিলেন, সে খবর জানা যায় ৭ বৈশাখ ১২৮২ [সোম 19 Apr] তারিখের হিসাব থেকে: 'ব° এলাইবক্স/দ° সোম রবীবাবুদিগের/ইস্কুলের গাড়ি/উক্ত এলাইবক্সের জায়গায় থাকে/ঐ জায়গার ভাড়া ই° ১৬ মাঘ না° ৩০ চৈত্র/ মাসিক ২্ হিঃ শোধ দেওয়া যায়...৫্' [১৬ মাঘ কিন্তু খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 28 Jan; সম্ভবত হিসাবের সুবিধের জন্য ৪ দিনের ভাড়া অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছিল]। 'সোম রবী বাবু দিগের ইস্কুলে যাইবার জন্য নূতন কেম্পাস ঘোড়া একটা ক্রয়' করা হয়েছে ২০০ টাকা দিয়ে, এ হিসাব আমরা ক্যাশবহি-তে পাই ৬ ফাল্গুন [বুধ 17 Feb] তারিখে।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই সহপাঠী সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগে যে-শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন, তখনকার দিনে তার নাম ছিল 'Fifth Year's Class', এর পরের শ্রেণীটিই ছিল Entrance Class, সুতরাং এখনকার হিসেবে Fifth year's class ছিল নবম শ্রেণীর সমতুল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগের 1875-এর মুদ্রিত তালিকায়[১৬] [Calender of St. Xavier's College, 1976] দেখা যায় এই ক্লাসে মোট ৪০টি ছাত্র, তার মধ্যে Gangoolee Suttyaprosad, Tagore, Nubindronath [রবীন্দ্রনাথের নাম ভ্রমক্রমে 'নবীন্দ্রনাথ' মুদ্রিত হয়েছে, এবং পরের বৎসরেও সংশোধিত হয়নি] ও Tagore, Sumendronath-এর নাম বর্ণানুক্রমে ছাপা হয়েছে: রবীন্দ্রনাথের রোল নাম্বার ছিল ৩৬। † এই শ্রেণীতে তাঁদের সহপাঠীদের মধ্যে বাঙালি ছিলেন তিন জন—দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, প্রিয়নাথ দত্ত ও নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের বিস্তৃত কোনো হিসাব পাওয়া যায় না [ক্যাশবহি-র ৮ ফাল্গুন থেকে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত হিসাব-সংবলিত পাতাগুলি হারিয়ে গেছে], কেবল জানা যায় ২৮ মাঘ [মঙ্গল 9 Feb] চার টাকা বারো আনা দিয়ে 'সোম রবী সত্যপ্রসাদ বাবু দিগের পুস্তক ক্রয়' করা হয়েছে এবং ৭ ফাল্গুন [বৃহ 18 Feb] 'সোম রবী বাবু দিগের জন্য উডস আলজেবরা একখানা ক্রয়' বাবদ ব্যয়িত হয়েছে ছ'টাকা চার আনা। বর্তমান অধ্যায়ের কালসীমায় রবীন্দ্রনাথ মাত্র আড়াই মাস সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াশুনো করেছেন, সুতরাং প্রসঙ্গটির আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য স্থগিত রাখছি।

এ বৎসর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে সব চেয়ে বড় ঘটনা সারদা দেবীর মৃত্যু। [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২] ২৭ ফাল্গুন ১২৮১ বুধ 10 Mar 1875 তারিখে আনুমানিক ৪৯ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় [সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর হিসাব-খাতায় লিখেছেন: 'কর্ত্তাদিদিমাতা ঠাকুরাণীর স্বর্গারোহণ ২৭ ফাল্গুন ১২৮১ বুধবার রাত্রি ৩-৪৫ মিনিট']। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র তেরো বৎসর দশ মাস। তিনি জীবনস্মৃতি-তে মায়ের মৃত্যুর বর্ণনাটি দিয়েছেন এই ভাবে:

অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন-যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।" তখনই বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সেকথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না;—সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।... কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক-দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতলায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।[১৭]

সারদা দেবীর মৃত্যুর পর ৩০ ফাল্গুন [শনি 13 Mar] সৌদামিনী দেবী ও অন্যান্য কন্যাগণ চতুর্থী শ্রাদ্ধ করেন। তাঁর আদ্য শ্রাদ্ধ হয় ৭ চৈত্র [শনি. 20 Mar] তারিখে। *ধর্মতত্ত্ব* পত্রিকা ১৬ চৈত্র [৮। ৬, পৃ ৬৮] সংখ্যায় 'সংবাদ' শিরোনামায় সংক্ষেপে লেখে: 'প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বনিতা পরলোকগমন করিয়াছেন। বিশেষ সমারোহের সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।' মনে হয় বৃশ্চিকের পশ্চাদ্দেশের হুলের মতো এই শেষ বাক্যটি লেখার জন্যই যেন সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছিল!

রবীন্দ্রনাথের রচনায় মায়ের উল্লেখ অবিশ্বাস্য রকমে কম। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত শারদীয়-সংকলন *আগমনী* [১৩২৬]-র জন্য 'মাতৃবন্দনা' শিরোনামে তিনি ৬টি ছোটো কবিতা [তার মধ্যে 'জননি, তোমার করুণ চরণখানি' ১৩১৫-তে লিখিত ও গীতাঞ্জলি-তে মুদ্রিত] পাঠিয়ে দেন (দ্র র°র°৩ [প, ব, ১৩৯০]। ১২৯৫-৯৬)। অনেকের মতে, এগুলির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ মায়ের বন্দনা করেছেন—কিন্তু কবিতাগুলির মধ্যে দেশজননী বা জগজ্জননীর ভাবই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

ছেলেদের দেখাশোনার ভার সারদা দেবীর উপর ছিল না, এবং প্রায় এক বৎসর যাবৎ অসুস্থতার জন্য মায়ের সঙ্গে আগে বালক রবীন্দ্রনাথের যেটুকু যোগাযোগ ছিল সেটুকুও অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তাছাড়া বৃহৎ পরিবারের মধ্যে চাকর-দাসীদের তত্ত্বাবধানে থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় মায়ের অভাব খুব একটা বোধ করার কথা নয়। কিন্তু মাতৃহীন বালকদের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি-বশত বাড়ির কনিষ্ঠা বধূ কাদম্বরী দেবী তাঁদের ভার গ্রহণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নতুন বউঠাকরুনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সূত্রপাত এখানেই। হিমালয় থেকে ফিরে আসবার পর 'বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন তাঁদের কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর' তিনি পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে সহানুভূতি ও মমতার মাধুর্য মিশ্রিত হয়ে তাঁদের সম্পর্ক অন্য এক স্তরে পৌঁছে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন।'[১৮] হিমালয় ভ্রমণের পর অন্তঃপুরের রুদ্ধ দ্বার রবীন্দ্রনাথের কাছে খুলে গিয়েছিল, এখন নারী-

হৃদয়ের রহস্যলোকে তাঁর প্রবেশের সুযোগ ঘটল। সেই উপলব্ধিই সম্ভবত কিছু দিনের মধ্যে কাব্যরূপ লাভ করেছে এই ছত্রগুলির মধ্যে:

'অনন্ত-প্রণয়ময়ী রমণী তোমরা
পৃথিবীর মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
তোমাদের স্নেহধারা যদি না বর্ষিত
হৃদয় হইত তবে মরুভূমি সম
স্নেহ দয়া প্রেম ভক্তি যাইত শুকায়ে।
তোমরাই পৃথিবীর সঙ্গীত, কবিতা,
স্বর্গ, সে ত তোমাদের হৃদয়ে বিরাজে...'[১৯]

রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ফাল্গুন ১২৭৯-তে হিমালয়ের উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন, সারদা দেবীর অসুস্থতার জন্য প্রায় দু-বছর পরে এই বৎসর পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার তিনি লেনু সিং নামে একটি পাঞ্জাবী ভৃত্যকে সঙ্গে করে আনেন। ১৭ পৌষ [বৃহ 31 Dec] 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বেহারা লেনু চাকরের ইজের ও কোরতা তৈয়ারির ব্যয় ও উড়ানী একজোড়া ও কোমরবন্দ' বাবদ চার টাকা বারো আনা খরচ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে এই ভৃত্যটি স্থান করে নিয়েছিল তার মধ্যে দূরের রহস্য লুকিয়ে ছিল বলে। তিনি লিখেছেন:

সে আমাদের কাছে যে-সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিতসিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবি—ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জুনের প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবি জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা—ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়া হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম।[২০]

কাদম্বরী দেবীর ঘরে কাঁচের আবরণে ঢাকা একটি খেলার জাহাজ ছিল, তাতে দম দিলেই রঙকরা কাপড়ের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠত এবং জাহাজটা অর্গানের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকত। অনেক অনুনয়ে বউঠাকুরানীর কাছ থেকে আশ্চর্য জিনিসটি সংগ্রহ করে আনতেন আশ্চর্যতর জগতের মানুষ এই পাঞ্জাবিকে চমৎকৃত করে দিতে। [এই খেলনাটির স্মৃতি গোরা উপন্যাসের মধ্যেও স্থান করে নিয়েছে,[২১] সেখানে অবশ্য লেনুর কথা নেই।] তিনি লিখেছেন, 'ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা-কিছু বিদেশের, যাহা-কিছু দূরদেশের, তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেনুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম।'[২২]

কিন্তু হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ ঠিক ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলেন না। শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে বালিগঞ্জ হেদুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বেড়াতে যাওয়ার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আলিপুরে ফ্যানসি ফেয়ারে যাওয়া তো একটা বাৎসরিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। বর্তমান বৎসরেও এইরূপ বেড়ানো বা আমোদপ্রমোদে যোগদানের অনেকগুলি সংবাদ ক্যাশবহি থেকে পাওয়া যায়। ২৫ বৈশাখ [বৃহ 7 May] তারিখের হিসাবে দেখি: 'ছেলেবাবুরা থিএটর দেখিতে জান/টিকিট ক্রয়... ৮'; তখনকার দিনে বৃহস্পতিবারে

অভিনয়ের প্রথা ছিল না, অভিনয় হত বুধ ও শনিবারে। সুতরাং তাঁরা ২০ বৈশাখ শনিবার কিংবা ২৪ বৈশাখ বুধবার অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন, সম্ভবত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে।*

৩০ আষাঢ় [সোম 13 Jul] তারিখের হিসাবে দেখা যায়: 'সোম রবিবাবুর দিগের/মুলাজোড় বাগানে জাওয়া আশায়/ব্যায়...৪।লঙ'। শ্যামনগর স্টেশনের কাছে গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই বাগান তখন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পত্তির অন্তর্গত ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।'[২৩] যে-সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে তাকে রবীন্দ্রনাথের 'নিতান্ত শিশুকাল' কিছুতেই বলা যায় না, কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ করেছেন, কারণ ১২৭৯ বঙ্গাব্দে পেনেটিতে 'প্রথম বাহিরে যাত্রা'র পর মুলাজোড়ে এইটিই তাঁর প্রথম আগমন এবং পেনেটিতে অবস্থানও 'নিতান্ত শিশুকালে'র ঘটনা নয়। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনারই যে স্মৃতিচারণ করেছেন, তার বর্ণনা অনেকটা যথাযথ:

> অনেক দিন হইল, বাল্যকালে গঙ্গার ধারের এক বাগানে বসিয়া দাদার মুখে যখন শুনিয়াছিলাম,-"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং"—তখন বোধ হয় উপক্রমণিকা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি; সংস্কৃত শব্দগুলি কানে কতকটা পরিচিত ঠেকে, মনে হয় যেন ভাবটা একটু একটু ধরিতে পারিতেছি, কিন্তু তবু কিছুই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। অর্থাৎ, যে দুটা একটা শব্দ বুঝা যায়, তাহার সহিত সংস্কৃত ছন্দের ঝঙ্কার মিশ্রিত হইয়া মনের মধ্যে কেবল একটা সঙ্গীত উৎপন্ন করিত; তাহাকে ভাষায় পরিণত করা দুরূহ। মেঘদূতের মেঘমন্দ্র ছন্দ এবং "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং" এই ছত্রটি শুনিয়া প্রাচীন কালের এক ঘন বর্ষার দিন আমার উপরে ঘনাইয়া আসিল। যেমন দূর হিমালয়ের শিখরে যে দিন বর্ষা নামিয়া আসে, সে দিন হঠাৎ গ্রামের প্রান্তে সৈকতশয্যাশায়ী শীর্ণ নদীস্রোতটুকুর মধ্যে একটা স্ফীতি উপস্থিত হয়, তেমনি সেই উজ্জয়িনীর অতি পুরাতন কোন্ এক প্রথম আষাঢ়ের বর্ষা এই এক যুগপ্রান্তবর্তী বালকের হৃদয়ে আপনার সংবাদ প্রেরণ করিল। হঠাৎ পরিপূর্ণ ছন্দের স্রোতে এবং ধ্বনির গাম্ভীর্যে হৃদয়ের দুই কূল নিমগ্ন হইয়া গেল।[২৩ক]

এছাড়া ৬ শ্রাবণ 'সোম রবীবাবুদিগের আহিরিটোলা জাতাতের', ১৯ অগ্রহায়ণ 'জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে' এবং ২৬ পৌষ [শনি 9 Jan 1875] 'ঠাকুদ্দাস পণ্ডিতের বাটী জাতাতের' জন্য গাড়ি ভাড়া পরিশোধের হিসাব দেখা যায়। 'ঠাকুদ্দাস পণ্ডিতের' পরিচয় আমাদের জানা নেই, কিন্তু এখানে যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে বিদ্যাসাগরকে ম্যাকবেথের অনুবাদ শোনাবার সময়টি সুনির্দিষ্ট হয়ে আসে।

অন্যান্য বারের মতো এবারেও ১৮ পৌষ [শুক্র 1 Jan 1875] 'সোম রবী সত্যপ্রসাদবাবুদিগের ফেনসি ফেয়ার দেখিতে যাইবার টিকিট ইত্যাদি' বাবদ দশ টাকা এবং ১০ পৌষ [বৃহ 24 Dec] 'সোম রবী সত্যপ্রসাদবাবুদিগের ক্রিসমস উপলক্ষে উইলসেনর বাটির খাবার ক্রয় জন্য' পাঁচ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শুরু এই বৎসরেই—সেটি হল বৈষ্ণব পদাবলি-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস-পাঠকদের জানা আছে, চৈতন্যপরবর্তী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাই কিভাবে রাধাকৃষ্ণ প্রেম-গীতির থেকে রস আকর্ষণ করে নিজেদের পুষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈষ্ণব আখড়াগুলির নৈতিক অধঃপতনে ও কবিওয়ালাদের কুরুচিপূর্ণ ব্যবহারে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বর্ণনা এমন এক কুৎসিত রূপ ধারণ করেছিল যে, ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য বাঙালিরা

বৈষ্ণবপদাবলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই প্রেমকে অশ্লীলতার গহ্বর থেকে প্রথম মুক্তি দেন মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' [1861]-তে। এর পর বৈষ্ণব-বংশোদ্ভূত নব্য ব্রাহ্মনেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির প্রভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যখন বৈষ্ণবদের অনুকরণে সংকীর্তন-সহ নগর পরিক্রমা ইত্যাদির প্রবর্তন হল, তখন ধীরে ধীরে শিক্ষিত বাঙালি আবার বৈষ্ণব পদাবলির প্রতি আকৃষ্ট হল। এরই প্রথম ফল জগদ্বন্ধু ভদ্র [1842-1906] সম্পাদিত 'মহাজনপদাবলী সংগ্রহ' [১২৮০]*। এর পর *সাধারণী*-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার [1846-1917], সারদাচরণ মিত্র [1848-1917] ও বরদাকান্ত মিত্রের সম্পাদনায় ১২৮১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নামে বিদ্যাপতির পদাবলি টীকা-সহ প্রকাশিত হতে থাকে। পরে অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় এই পর্যায়ে 'চণ্ডীদাস-কৃত পদাবলি' [১২৮৫], 'রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ অর্থাৎ শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত সত্যনারায়ণের পালা', 'গোবিন্দদাস কৃত পদাবলি' [১২৮৫] প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থগুলির রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত খণ্ডগুলি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সুরক্ষিত আছে।† এদের মধ্যে বিদ্যাপতি পদাবলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এরই মাধ্যমে তিনি বৈষ্ণব কাব্য-জগতে প্রবেশ করেন, যা নানাভাবে তাঁর কাব্যভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন: 'আমার পূজনীয় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে এই সংগ্রহের অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত খণ্ডগুলি আসিত। তাঁহাদের পড়া হইলেই আমি এগুলি জড় করিয়া আনিতাম।'[২৪] মুদ্রিত গ্রন্থে বর্ণনাটি এইরূপ: 'শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।'[২৪] এইটিই বালক রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। যে-কোনো রহস্যের আভাস তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। যে বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের জন্য দক্ষিণের বারান্দার কোণে আতার বিচি পুঁতে তাতে রোজ জলসেচন করতেন বা পিতার পাঞ্জাবি বালকভৃত্য লেনু সিং যে সুদূরতার রহস্যের জন্য তাঁর সমাদর লাভ করেছিল, সেই একই কারণে বিদ্যাপতির মৈথিলী-মিশ্রিত দুর্বোধ্য ভাষা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল—'গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নিচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল।'[২৫] তাছাড়া তাঁর বন্ধনভীরু যে মন বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তককে সযত্নে এড়িয়ে চলেছে, সেই মনই আবার 'শুধু অকারণ পুলকে' দুরূহ শব্দের তালিকা ও তাদের ব্যাকরণগত বিশেষত্বগুলি টুকে রাখার পরিশ্রম স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি—এর মধ্যেও তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। পরবর্তীকালে তিনি গদ্যরীতিতে ছাপা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস-প্রকাশিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করার প্রয়াস করেছেন বা সমগ্র কাব্যটিকে একটি খাতায় নকল করে নিয়েছিলেন, সে-ও এই একই মানসিকতা থেকে।

যাই হোক, তাঁর এই সাধনা ব্যর্থ হয়নি। এর প্রথম ফল দেখা যায় বিদ্যাপতির অনুকরণে ভানুসিংহের কবিতা রচনার মধ্যে। জীবনস্মৃতি-তে বা অন্যত্র এই কবিতাগুলিকে তিনি একটু লঘু করে দেখানোর প্রয়াস করলেও এগুলির সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ সন্ধ্যাসংগীত-এর পূর্ববর্তী কৈশোরক-পর্বের সমস্ত কবিতাকে তিনি রচনাবলি থেকে নির্বাসিত করতে চাইলেও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-কে সেই দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয়নি।

তাছাড়া বিদ্যাপতির পদাবলি নিয়ে দীর্ঘকাল তিনি চর্চা করেছেন, তার নিদর্শন রয়ে গেছে বিভিন্ন বয়সে লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধে। George A. Grierson যখন প্রধানত বিদ্যাপতিকে অবলম্বন করে তাঁর বিখ্যাত *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing a Grammar, Chrestomathy & Vocabulary* [1882] গ্রন্থ প্রকাশ করলেন, রবীন্দ্রনাথ কত যত্নে সেই গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত উক্ত গ্রন্থের পাতায় পাতায় তাঁর স্বহস্ত-লিখিত বাংলা ও ইংরেজি শব্দার্থ, গদ্য ও পদ্যানুবাদের মধ্যে। এমন-কি বিদ্যাপতির পদাবলির একটি সংস্করণ সম্পাদনা করতেও তিনি ব্রতী হয়েছিলেন, কোনো অজ্ঞাত কারণে সেই গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত হওয়ার পরও প্রকাশিত হয়নি। বহুকাল পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী-র দ্বিতীয় খণ্ডে [পৌষ ১৩৪৬] ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-র 'সূচনা'য় তিনি লিখেছিলেন: 'পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত আমার কৌতুহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি।' এটা আমাদেরও দুর্ভাগ্য, রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিশেষ দিক আমাদের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হবার সুযোগ পেল না!

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

১৬ চৈত্র ১২৮০ [শনি 28 Mar 1874] সত্যেন্দ্রনাথ দু' মাসের ছুটি নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় এসে পৌঁছন। ফার্লো ছুটি নিয়ে ইংলন্ড যাবার ইচ্ছা হয়তো তখনই তাঁর মনে জেগে থাকবে। ইংলণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতার আবহাওয়ায় পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে সব রকমের সংস্কারমুক্ত করে নিজের প্রকৃত সহধর্মিণীতে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা আই. সি. এস. পড়ার সময় থেকেই তিনি পোষণ করে আসছিলেন। এবারে বাড়িতে এলেন হয়তো তারই আয়োজন করতে। এমন-কি তাঁর সেই ইচ্ছা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হল: 'বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস, (ইনি এক্ষণে কলিকাতায় আছেন) পুত্র কলত্র সহিত শীঘ্র ইংলণ্ড গমন করিবেন।' [*সোমপ্রকাশ*, ১৭ | ২২, ৮ বৈশাখ] কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক এখনই তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ হয়নি। তার পরিবর্তে এখানে অবস্থানকালে তিনি একটি সাংস্কৃতিক ও একটি সামাজিক অনুষ্ঠান সমাধা করলেন। তাঁর ও দ্বিজেন্দ্রনাথের

আমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ৬ বৈশাখ [শনি 18 Apr] 'বিদ্বজ্জন-সমাগম'-এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩] আর বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি পঞ্চম মাসে উপনীতা কন্যা ইন্দিরার অন্নপ্রাশন দিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশনও একই সঙ্গে হয়।

২৭ শ্রাবণ [মঙ্গল 11 Aug] দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মের পরেই তার মৃত্যু হয়।

ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে [Sep 1874] স্বর্ণকুমারী দেবীর চতুর্থ সন্তান ও তৃতীয়া কন্যা ঊর্মিলা জন্মগ্রহণ করে।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে [Dec 1874] শরৎকুমারী দেবীর তৃতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র যশঃপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।

পৌষ মাসে বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র প্রমোদনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা ঊর্মিলা ও হেমেন্দ্রনাথের কন্যা মনীষার অন্নপ্রাশন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের উপর দায়িত্ব পড়ে উপাসনান্তে শিশুদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার। এই উদ্দেশ্যে ৭ পৌষ [সোম 21 Dec] 'সোম রবী ও সত্যপ্রসাদবাবুদিগের জন্য চেলির জোড় তিনটা ক্রয়' করা হয় ছেচল্লিশ টাকা ছ' আনায়। এই ধরনের কাজ তাঁদের আগেও করতে হয়েছে, যথাস্থানে আমরা সেকথা উল্লেখ করেছি।

এই বৎসর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বহির্বাটীর প্রাঙ্গণের চেহারার কিছু বদল হয়। ৪ চৈত্র ১২৭৮ [শনি 16 Mar 1872] 'বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর খাতে' ১৫০০্ টাকা খরচ লেখা হয়েছিল; এই টাকা দিয়ে জনৈক মহেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ির সামনের খানিকটা জায়গা কেনা হয়। সেই জায়গায় একটি বাগান তৈরি করা হয়েছিল। ৩ আশ্বিন [শুক্র 18 Sep 1874] তারিখের হিসাবে দেখা যাচ্ছে 'বাটীর সম্মুখের জায়গার বাগানের গোলপ্রাচীর দেওয়া ও বাগানের ভিতর বেড়াইবার পথ তৈয়ারি করা ও আস্তাবল সমুদায়ের সম্মুখে প্রাচীর দেওয়ার জন্য' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্বশুর শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ১০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। এই গোলপ্রাচীর দেওয়া বাগানের কথা অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন জোড়াসাঁকোর ধারে-তে, তখন অবশ্য সেখানে বাগান ছিল না, জুড়িগাড়িতে জোতবার আগে সেখানে ঘোড়ার গা গরম করানো হত: 'যেখানে রবিকার লালবাড়ি সে জায়গা জোড়া ছিল চক্কর প্রাচীরঘেরা। একপাশে ছোট্ট একটি ফটক। সহিসরা ঘোড়া দুটো চক্করে ঢুকিয়ে ফটক বন্ধ করে দিল। সমশের [কোচোয়ান] লম্বা চাবুক হাতে প্রাচীরের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বাতাসকে চাবুক লাগাল —শট্। সেই শব্দ পেয়ে ঘোড়া দুটো কান খাড়া করে গোল চক্করে চক্কর দিতে শুরু করলে। একবার করে ঘোড়া ঘুরে আসে আর চাবুকের শব্দ হয়ে শট্ শট্। যেন সার্কাস হচ্ছে।'[২৬]

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সারদা দেবীর মৃত্যু হয় ২৭ ফাল্গুন ১২৮১ বুধবার 10 Mar 1875 তারিখের শেষ রাত্রে। তাঁর মৃত্যুর কারণটি সম্পর্কে নানা ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়। পুত্রবধূ প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছেন: 'হাতের উপর একবার একটি লোহার সিন্দুকের ডালা পড়িয়া যাওয়াতে সেই অবধি হাতের ব্যথাতে

প্রায়ই কষ্ট পাইতে থাকেন। পাঁচ ছয়জন বড় বড় ডাক্তার দেখানোর পর ভাল না হওয়াতে পুনরায় অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। ক্ষতটি যখন শুকাইতেছিল সেই সময় একজন আচার্যিনীর পরামর্শে তেঁতুলপোড়া বাটিয়া ক্ষতের চারিদিকে লাগাইবার পর বিষাক্ত হইয়া আবার পাকিয়া উঠে। সেইটাই ক্রমশঃ ভিতরে দূষিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।'[২৭] দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন: 'হাতে ক্যানসার হওয়াতে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিতেছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হারাইতেছিলেন। যে ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।'[২৮] অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনাটি একটু ভিন্ন: 'কর্তাদিদিমা আঙুল মটকে মারা যান। বড়পিসিমার ছোটো মেয়ে [ইন্দুমতী], সে তখন বাচ্ছ, কর্তাদিদিমার আঙুল টিপে দিতে দিতে কেমন করে মটকে যায়। সে আর সারে না, আঙুলে আঙুলহাড়া হয়ে পেকে ফুলে উঠল। জ্বর হতে লাগল কর্তাদিদিমা যান-যান অবস্থা। কর্তাদাদামশায় ছিলেন বাইরে—কর্তাদিদিমা বলতেন, তোরা ভাবিস নে, আমি কর্তার পায়ের ধুলো মাথায় না নিয়ে মরব না।... একদিন তো কর্তাদিদিমার অবস্থা খুবই খারাপ, বাড়ির সবাই ভাবলে আর বুঝি দেখা হল না কর্তাদাদামশায়ের সঙ্গে। অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে, এমন সময়ে কর্তাদাদামশায় এসে উপস্থিত। খবর শুনে সোজা কর্তাদিদিমার ঘরে গিয়ে পাশে দাঁড়ালেন, কর্তাদিদিমা হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। ব্যস, আস্তে আস্তে সব শেষ।'[২৯] সৌদামিনী দেবীও প্রায় একই কথা লিখেছেন: "যে ব্রাহ্মমুহূর্তে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল পিতা তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় হিমালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে মা ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হারাইতেছিলেন। পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন, 'বসতে চৌকি দাও।' পিতা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, 'আমি তবে চললাম।' আর কিছু বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হইল, স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য এ পর্যন্ত তিনি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অভ্র দিয়া শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন 'ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম'।"[৩০] অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রধানত সৌদামিনী দেবীর এই রচনা অবলম্বন করে সারদা দেবীর মৃত্যুর বর্ণনাটি লিখেছিলেন। এই সব বর্ণনায় কয়েকটি অসংগতি পাঠকদের নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে। আমরা ক্যাশবহি অবলম্বনে যে তথ্য পরিবেশন করব, তাতে আরও কতকগুলি ভ্রান্তির নিরসন হবে।

সারদাদেবীর অসুস্থতার বিষয়ে উল্লেখ ক্যাশবহি-তে প্রথম দেখা যায় ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ [মঙ্গল 2 Jun 1874] তারিখে: 'কত্রিমাতাঠাকুরাণীর হাতে বেদনা হওয়ায় পাণিহাটীর বাগান হইতে আসিবার ব্যয়... ৩৬' এবং 'উহার হাতের পীড়ার জন্য আরনিকা ঔষধ ও অইল ক্লথ ইত্যাদি...৩ ৩ অথাৎ হাতের উপর লোহার সিন্দুকের ডালা পড়ে যাওয়া বা আঙুল মটকে যাওয়া যে-কারণটিই হোক তার সূচনা পানিহাটির বাগানে থাকার সময় এবং প্রথম দিকে আর্নিকা ইত্যাদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাধ্যমেই হাতের বেদনা উপশম করানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো উপকার না হওয়াতে গৃহচিকিৎসক ডাঃ নীলমাধব হালদার ও মেডিকেল কলেজের সার্জারির অধ্যাপক Dr. S.B. Partridge, M.D., F.R.C.S. ৪ আষাঢ় [বুধ 17 Jun] তাঁকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমশই অবনতি হওয়ায় ২৭ শ্রাবণ [মঙ্গল 11 Aug] ড্যালহৌসিতে দেবেন্দ্রনাথের কাছে টেলিগ্রাম করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ কী উত্তর দিয়েছিলেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাঁকে

ফিরে আসতেও দেখা যায় না। কয়েকদিনের মধ্যেই মেডিকেল কলেজের পাঁচজন বিখ্যাত য়ুরোপীয় ডাক্তার [প্রত্যেকের ফী ৩২ টাকা করে] একত্রে চিকিৎসা-বিষয়ে পরামর্শ করেন। তাঁরা হচ্ছেন মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ও মেডিসিনের অধ্যাপক Dr. N. Chevers, M.D., জেনারেল অ্যানাটমি ও ফিজিওলজির অধ্যাপক Dr. J. Ewart, M.D., রসায়নের অধ্যাপক Dr. W.J. Palmer, M.D., F.R.C.S.E., সার্জারির অধ্যাপক Dr. S.B. Partridge, M.D., F.R.C.S. এবং ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক Dr. T.E. Charles, M.D.—এঁদের ফী শোধ করার তারিখ ৩০ শ্রাবণ [শুক্র 14 Aug]। চিকিৎসায় যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে তার জন্যে হোমিওপ্যাথির বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ি ও ডাঃ সালাজারও সারদা দেবীকে পরীক্ষা করেন। ক্যাশবহি অবশ্য কেবল এই ধরনের সংবাদই আমাদের সরবরাহ করতে পারে, কিন্তু ঠিক কী রীতিতে চিকিৎসা করা হয়েছিল, অপারেশন করা হয়েছিল কিনা এসব প্রশ্নের উত্তর তার কাছ থেকে পাওয়া যায় না। প্রফুল্লময়ী দেবীর বর্ণনা থেকে মনে হয়, তাঁর হাতে অন্তত দুবার অপারেশন করা হয়। এই অপারেশন প্রসঙ্গে আমরা একটি অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ পাই ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত হেমেন্দ্রনাথের রচনাবলী 'হেমজ্যোতি'-র [১৩১১] ভূমিকায়: 'আপনার প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার মাতার জন্য যে তিনি নিজ বাহুমূল হইতে এক বৃহৎ মাংসখণ্ড কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনে এক মহা হেমকীর্ত্তিরূপে (Golden deed) পরিগণিত হইবে।' হেমেন্দ্রনাথের অপর পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথও দ্বারকানাথ-প্রসঙ্গে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন: 'এই দ্বারকানাথেরই পৌত্র হেমেন্দ্রনাথ, যিনি স্বীয় মাতার জীবনরক্ষার্থে নিজের বাহু হইতে মাংস খণ্ড কাটিয়া দিতেও দ্বিধা করেন নাই।'[৩১]

এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শে গঙ্গার বায়ু সেবনের জন্য সম্ভবত ১০ কার্তিক [সোম 26 Oct] 'কোম্পানির বাগানের নিচে' [বিডন স্কোয়ার বা রবীন্দ্রকাননের নিকটবর্তী গঙ্গায়?] একখানি বোটে তিনি কিছুদিন বাস করেন। ১৬ অগ্রহায়ণ ঠাকুরবাড়ির ভূতপূর্ব গৃহচিকিৎসক ডাঃ দ্বারিকানাথ গুপ্ত বোটে গিয়েই তাঁকে পরীক্ষা করেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনো আশা দিতে পারেননি, তাই ১৮ অগ্রহায়ণ [বৃহ 3 Dec] 'শ্রীযুক্তা কত্রীমাতাঠাকুরাণীর পীড়ার জন্য কর্ত্তাবাবু মহাশয়কে বাটী আগমনের জন্য বড়বাবু মহাশয় অমৃতসরে টেলিগ্রাফ করেন।' এই টেলিগ্রাম পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ সেখান থেকে রওনা হয়ে পথিমধ্যে শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন অবস্থান করে জোড়াসাঁকো এসে পৌঁছন পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে। *ধর্ম্মতত্ত্ব* পত্রিকায় ১৬ পৌষ সংখ্যায় [৭। ২৪, পৃ ২৮৬] 'সংবাদ' স্তম্ভে লেখা হয়: '... বহু দিনান্তে আমাদের ভক্তিভাজন প্রাচীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আশা করি আগামী ব্রহ্মাৎসব পর্য্যন্ত তিনি এখানে থাকিয়া ব্রাহ্মদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ... গত বুধবারে [৯ পৌষ 23 Dec] তিনি এবং তাঁহার প্রথম ও পঞ্চম পুত্র, রাজনারায়ণ বাবু এবং জামাতা 'কুটুম্বগণ অনেকে সমাজে আসিয়াছিলেন।' সুতরাং তিনি সারদা দেবীর মৃত্যুর পূর্ব দিন হিমালয় থেকে প্রত্যাগমন করেন, এই তথ্য যে সঠিক নয় তা আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি। স্বামী-সন্দর্শনের জন্য সারদা দেবী বোট থেকে চলে আসেন এবং ১০ পৌষ থেকে ১৬ পৌষ গৃহে অবস্থান করেন, আমরা ক্যাশবহি-র হিসাবে তার উল্লেখ দেখতে পাই। এর পরে তিনি আবার বোটে ফিরে যান। এদিকে দেবেন্দ্রনাথ ৯ মাঘ ব্রাহ্মসম্মিলন ও ১১ মাঘের উৎসবে যোগদানের পর মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে শিলাইদহ অঞ্চলে জমিদারি পরিদর্শনার্থে গমন করেন। *ধর্ম্মতত্ত্ব* পত্রিকা ১ ফাল্গুন সংখ্যায় এই সংবাদটিও পরিবেশন করে: 'শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মফস্বল জমিদারী

পরিদর্শনার্থে বহির্গত হইয়াছেন।' এখান থেকেই হয়তো তিনি সারদা দেবীর মৃত্যুর পূর্ব দিন তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেটিকে সৌদামিনী দেবী বিস্মৃতিবশত হিমালয় থেকে বাড়ি ফিরে আসা বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয়বার বোটে অবস্থানের পর সারদা দেবীকে কবে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়, তা জানা যায়নি। কিন্তু ৭ ফাল্গুন [বৃহ 18 Feb 1875] তারিখের হিসাবে দেখা যায়: 'কর্ত্রীমাতাঠাকুরাণীর/বাতাষের বিছানা দুরস্ত করিয়া/আনিতে উইলসন হোটেলে গত রোজ/শ্যামবাবুর জাতাতের গাড়ি ভাড়া [আধুনিক কালের পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, বর্তমান গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকেই তখনকার দিনে উইলসনের হোটেল বলা হত এবং তখন সেখানে হোটেল ব্যবসায়ের সঙ্গে বড়ো আকারে বিদেশী স্টেশনারি জিনিসের ব্যবসায়ও চালানো হত] —এর থেকে বোঝা যায়, সারদা দেবী তার আগেই জোড়াসাঁকোয় ফিরে রবীন্দ্রনাথের বর্ণানুযায়ী অন্দর মহলে তিনতলার একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সম্ভবত তখন তাঁর শরীরে যন্ত্রণাদায়ক শয্যা ক্ষত [bedsore] দেখা দেওয়ার জন্যই এই 'বাতাষের বিছানা'-র [air-cushion] ব্যবস্থা।

৭ ফাল্গুনের পর ক্যাশবহি-র পাতাগুলি না পাওয়ায় আর বেশি-কিছু তথ্য দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ৩০ ফাল্গুন [শনি 13 Mar] কন্যারা তাঁর যে চতুর্থী শ্রাদ্ধ করেন, সৌদামিনী দেবী সেই উপলক্ষে উপাসনা করতে গিয়ে বলেন: '... আমি মাতৃহীনা হইয়া সংসারের অনেক সুখে বঞ্চিত হইলাম। তাঁহার সেই কোমল শান্ত মূর্ত্তি আর এ পৃথিবীতে দেখিতে পাইব না এবং তাঁহার সেই স্নেহময় বাক্য আর শুনিতে পাইব না। তাঁহাকে যেমন সংসারের সকল সুখে সুখী করিয়াছিলে, এখন তাঁহার আত্মাকে তোমার অমৃত ক্রোড়ে রাখিয়া আরও সুখী কর।'[৩২]

৭ চৈত্র [শনি 20 Mar] মহাসমারোহে সারদা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদায় দেওয়া হয়, তা আমরা *ধর্ম্মতত্ত্ব*-প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানতে পেরেছি। বলা বাহুল্য, শ্রাদ্ধক্রিয়া দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান-পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে প্রার্থনা করেন: '... এখানে আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, তাঁহার আহ্বান আর শুনিতে পাইব না। আমাদের স্নান ভোজনের একটুকু বিলম্ব হইলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য তেমন আগ্রহ আর দেখিতে পাইব না। কোন বিষয়ে অনিয়ম করিলে তেমন মিষ্ট ভর্ৎসনা আর আমরা শুনিতে পাইব না। কোন প্রতিষ্ঠার কার্য্য করিলে তেমন উজ্জ্বল হাস্যমুখ আর দেখিতে পাইব না। পীড়ার সময় তেমন হস্তের স্পর্শ আর আমাদিগকে আরোগ্য প্রদান করিবে না।... এখানে যেমন তাঁহার দয়া, হিতৈষণা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সকলের মন আকর্ষণ করিত, সেখানে তোমার প্রসাদে সে সকল হইতে যেন মধুময় ফল প্রসূত হইতে থাকে।...'[৩৩]

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ৬ বৈশাখ [শনি 18 Apr] তারিখে বিদ্বজ্জন সমাগম-এর প্রথম অধিবেশন হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।[৩৪] জন বীম্‌স 1872-তে যে ধরনের অ্যাকাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন, সে ধরনের না হলেও, 'সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব বর্ধিত হয় এই

উদ্দেশ্যে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভা স্থাপিত হয়। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই সভার নামকরণ করেন। 'এই উপলক্ষ্যে অনেক রচনা ও কবিতাদিও পঠিত হইত, গীতবাদ্যের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইত এবং সর্বশেষে সকলের একত্র প্রীতিভোজনে এই সাহিত্য-মহোৎসবের পরিসমাপ্তি হইত।'[৩৫]

এই বৎসরে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয় ভারত-সংস্কারক সাপ্তাহিকের ১২ বৈশাখ [শুক্র 24 Apr] সংখ্যায় [২। ২, পৃ ১৪-১৫]: '... বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে বাঙ্গলা গ্রন্থকার ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের অনেকে তাঁহাদিগের জোড়াসাঁকোর ভবনে সমবেত হন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে আমরা এই কয় ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম— রেবরন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো। সর্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক ১০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।' একজন যুবক প্রথমে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি উদ্দীপনাময় কবিতা আবৃত্তি করেন। পর প্যারীমোহন কবিরত্ন স্বর্গত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের স্তুতিমূলক একটি সংগীত করেন এবং বিলাতী দ্রব্যের সঙ্গে এদেশীয় দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হল বলে ইংলণ্ডেশ্বরীর কাছে ক্রন্দন এই বিষয়ে স্বরচিত একটি গান করেন। 'অতঃপর ঠাকুর পরিবারের ছোট ছোট কয়েকটি বালক-বালিকা চৌতাল প্রভৃতি তালে তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিয়া সভাস্থবর্গকে চমৎকৃত করিল। ... পরে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এক অঙ্ক নাটক পাঠ করিলেন, তাহাতে পুরুরাজা যখন শত্রু নিপাত করিবার জন্য সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং সৈন্যদল তাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বীরমদে মাতিতেছে। [দ্র পুরুবিক্রম নাটক, ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক] তদনন্তন দ্বিজেন্দ্র বাবু স্বরচিত স্বপ্ন বিষয়ক একটি সুন্দর কবিতা [স্বপ্নপ্রয়াণ] পাঠ করিলে শিশুরা সঙ্গীত করিতে লাগিল এবং পান, গোলাপের তোড়া, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা নিমন্ত্রিতগণের প্রতি সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সভাকার্য্য শেষ হইল।'

এই বিবরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানটিতে কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কিনা তার উল্লেখ নেই। বালকবালিকা যাঁরা সংগীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিক, অবশ্য নিশ্চিত করে বলার মতো তথ্যপ্রমাণ নেই। কিন্তু অনুষ্ঠানে এই বালক-কবি উপস্থিত ছিলেন ঠিকই এবং যাঁদের রচনার সঙ্গে ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের চাক্ষুষ-দর্শন তাঁকে পুলকিত করেছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। ভবিষ্যতে এই 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর বার্ষিক অধিবেশনে তিনি আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন, এমনকি তিনিই অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পুরুষ হয়ে দাঁড়াবেন, এই প্রসঙ্গে আমরা সে-কথা স্মরণ করতে পারি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

১১ মাঘ [শনি 23 Jan 1875] তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব পালিত হয়। প্রাতে সমাজমন্দিরে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বক্তৃতা করেন এবং সন্ধ্যায় দেবেন্দ্র-ভবনের বহির্বাটার প্রাঙ্গণে ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু বক্তৃতা করেন। উভয় অনুষ্ঠান মিলিয়ে নিম্নলিখিত মোট দশটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়:

পঞ্চম বাহার—ধামাল। প্রথম সমাজে আজু মহোৎসব;
ভৈরব—সুরফাঁকতাল। সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি [দ্বিজেন্দ্রনাথ]
ভৈরবী—কাওয়ালি। অকূল ভব সাগরে তারহে তারহে [ঐ]
জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল। গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে [রবীন্দ্রনাথ]
গারা—কাওয়ালি। কি মধুর তব করুণা প্রভো [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]
দেশ—"। পরমেশ্বর একতুহি ভজরে প্রাণ
নারায়ণী—জৎ। ভজোরে ভজরে ভব-খণ্ডনে [দ্বিজেন্দ্রনাথ]
রাজবিজয়ী—সুরফাঁকতাল। নিখিল-ভুবন-পতি, পরম-গতি ব্রহ্ম
কেদারা—চৌতাল। এক প্রথম জ্যোতি, অতি শুভ্র, পরম, [দ্বিজেন্দ্রনাথ]
বেহাগ—"। ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর, [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

—*তত্ত্ববোধিনী*, ফাল্গুন ১৭৯৬ শক। ২০৮-১০

—এর মধ্যে প্রথম তিনটি গান প্রাতঃকালীন অধিবেশনে গীত হয়। 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে গানটি সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 'কি মধুর তব করুণা প্রভো গানটির সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ সিংহের স্মৃতি জড়িত রয়েছে; রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'তাঁহার কন্যার কাছে শুনিতে পাই, আসন্ন মৃত্যুর সময়েও 'কী মধুর তব করুণা প্রভো' গানটি গাহিয়া চির-নীরবতা লাভ করেন।'[৩৬]

তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত বিবরণে বালক-বালিকাদের সংগীত-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার কথা উল্লিখিত হয়নি, সুতরাং নিশ্চিত করে বলা যাবে না রবীন্দ্রনাথ গানের দলে ছিলেন কিনা।

এই বৎসরের মাঘোৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। *ধর্ম্মতত্ত্ব* পত্রিকায় লিখিত হয়: 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয়তল গৃহের পূর্ব্ব দিকে স্ত্রীলোক উপাসকদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান করা হইয়াছে। এজন্য নূতন একটি দীর্ঘ সোপান প্রস্তুত করা হইয়াছে। গত উৎসবে তথায় কোন কোন ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। [৮। ২-৩, ১৬ মাঘ ও ১ ফাল্গুন, পৃ ৩২] বোঝা যায়, ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাল রাখার প্রয়োজনীয়তা আদিসমাজও উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। আর এই ঘটনা ঘটেছে যখন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-প্রণেতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, যাঁর স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে মনোনাভাবের ক্রমবিবর্তন পরবর্তীকালের লিখিত একটি পত্রে প্রকাশ পেয়েছে : 'আমার মনে পড়ে, প্রথমে যখন মেয়েরা গাড়ি করে বেড়াতে আরম্ভ করেন—গাড়ির দরজা খুলতে আমি কিছুতেই দিতেম না—ক্রমশঃ একটু একটু খুলে দিতে আরম্ভ করলেম—সিকিখানা—আধখানা—ক্রমে যোল আনা। তখন বাহিরের কোন পুরুষ আমাদের মেয়েদের মুখ দেখলে আমার যেন মাথা কাটা যেত; প্রথমে দরজা বন্ধ ঢাকা গাড়ি, পরে দরজা-খোলা ঢাকা গাড়ি, পরে টপ-ফেলা ফিটেন গাড়ি—ক্রমে একেবারে খোলা ফিটেন গাড়ি ধরা গেল—গুটিপোকা ক্রমে প্রজাপতিতে পরিণত হ'ল।'[৩৭]

মাঘোৎসবের দু-দিন পূর্বে ৯ মাঘ [বৃহ 21 Jan] অপরাহ্নে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সদস্যেরা দেবেন্দ্র-ভবনে একটি সভায় সম্মিলিত হন। *ধর্ম্মতত্ত্ব* পত্রিকার উপরোক্ত সংখ্যায় এ-সম্বন্ধে লেখা হয়: 'উভয় ব্রাহ্মদলের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তারের জন্য অদ্য অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে এক সভা হয় অহাতে নগরবাসী, প্রবাসী এবং বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণ অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসক সভার বিগত মাসিক অধিবেশনে সাধারণের সম্মতিতে আমাদের

প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসুর প্রতি ভার দেওয়া হইয়াছিল যে তিনি দেবেন্দ্র বাবুর নিকট পুনঃসম্মিলনের বিষয় প্রস্তাব করেন এবং তাঁহার দ্বারা এক সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সকলকে একত্রিত করেন। প্রথমবারের উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া যায়, শেষ আনন্দ বাবুর দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় এই সভাটী আহূত হইয়াছিল। অনুমান চারিশত লোক তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সদ্ভাব-স্থাপনের জন্য কোনো বিশেষ উপায় নির্ধারিত করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু উক্ত পত্রিকা আশা করে : 'মধ্যে মধ্যে এরূপ সভা করিয়া তদনুসারে কিছু কার্য্য করিলে, অন্ততঃ বিদ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নীচ ভাব সকল হ্রাস হইতে পারে।'

দুই সমাজের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপনের চেষ্টা চললেও কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। ২৩ মাঘ ১২৭৮ [5 Feb 1872] কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়ার বাগানে 'ভারত-আশ্রম' স্থাপন করেন। দুবার স্থান পরিবর্তন করে এই আশ্রম মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি বাড়িতে উঠে আসে। প্রথমাবধিই আশ্রমটি বিরেধী সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন একেই ব্যঙ্গ করে লেখা। কিন্তু ভারত-আশ্রমের আভ্যন্তরীণ পরিবেশও খুব সুশৃঙ্খল ছিল না। অবস্থা চরমে উঠল যখন জনৈক আশ্রমবাসী হরনাথ বসু সপরিবারে আশ্রম ত্যাগ করে সংবাদপত্রে একটি চিঠি প্রকাশ করলেন [আষাঢ় ১২৮১]। সাপ্তাহিক সমাচার নামক একটি পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি পত্র প্রকাশিত হলে কেশবচন্দ্র এই পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা রুজু করেন; শেষ পর্যন্ত অবশ্য মামলাটির আপসে নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, কেশবচন্দ্রের প্রত্যাদেশ-বিষয়ক মতবাদ ও সমাজ-পরিচালনায় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা ধরনের মতবিরোধ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি দুর্বল করে তুলছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় অগ্রহায়ণ ১২৮১ থেকে '*সমদর্শী OR LIBERAL*' নামে দ্বিভাষিক একটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। ক্ষণজীবী এই পত্রিকাটি মতবিরোধে যথেষ্ট পরিমাণে ইন্ধন সরবরাহ করেছিল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫

আমরা বর্তমান বৎসরের আলোচনায় বার-বার 'মালতীপুঁথি' নামক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্র-জীবন ও রচনার আলোচনায় এই পাণ্ডুলিপিটি একটি অমূল্য উপাদান রূপে গণ্য হবার যোগ্য। আমরা জানি, সেরেস্তার কোনো কর্মচারীর কৃপায় সংগৃহীত একটি নীল ফুল্‌স্‌-ক্যাপ খাতা রবীন্দ্ররচনার প্রথম পাণ্ডুলিপি। হিমালয় যাত্রার সময়ে একটি বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারি হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি, যাতে তিনি বোলপুরে থাকার সময়ে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামক বীররসাত্মক কাব্যটি রচনা করেছিলেন। হিমালয় থেকে ফিরে এসে বিভিন্ন কবিতাও হয়তো এই বিলুপ্ত পাণ্ডুলিপিতেই লেখা হয়েছিল। এরই পরবর্তীকালের তৃতীয় পাণ্ডুলিপি হচ্ছে এই 'মালতীপুঁথি', মহাকালের ভ্রূকুটি এড়িয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছননা প্রাচীনতম রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি। 1943-এর প্রথম দিকে দিল্লির লেডি আরউইন স্কুলের অধ্যাপিকা মালতী সেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহন সেনের হাত দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনকে উপহার দেন। তাঁরই নামানুসারে এটিকে 'মালতীপুঁথি' নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীমতী সেনের ভ্রাতা সুধীন্দ্রকুমার সেন [মৃত্যু 1919] ছিলেন একজন

রবীন্দ্র-অনুরাগী এবং তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁদের তৎকালীন বাসস্থান লাহোরে একটি সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে কোনো এক সময়ে তাঁর পুস্তকসংগ্রহের মধ্যে পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়। এটি কিভাবে সুধীন্দ্রকুমারের হাতে গেল, সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের সাহিত্য-সহায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী লাহোর-নিবাসিনী শরৎকুমারী চৌধুরানীকে রবীন্দ্রনাথের হয়তো কোনো সময়ে এই পাণ্ডুলিপিটি উপহার দেন এবং তাঁর কাছ থেকেই এটি সুধীন্দ্রকুমারের হস্তগত হয়।[৩৮]

পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে আসার অল্পকাল পরে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন "রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা" প্রবন্ধে এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে লেখেন, 'পাণ্ডুলিপিখানি স্পষ্টতঃই একখানি বৃহৎ বাঁধানো খাতা ছিল। কিন্তু এখন সেটির সেলাই খুলে গিয়েছে এবং খোলা পাতাগুলিও অত্যন্ত জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছে। এক দিকের শক্ত রঙিন মলাটও পাওয়া গিয়েছে। অন্য দিকের মলাট ও কতকগুলি পাতা পাওয়া যায় নি।[৩৯] বর্তমানে রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাগারে প্রতিটি পাতা অভঙ্গুর স্বচ্ছ পত্রাবরণে আচ্ছাদিত (laminated) করে নূতন মলাট দিয়ে বাঁধানো এই পাণ্ডুলিপিটির অভিজ্ঞান-সংখ্যা ২৩১। নূতন করে বাঁধানো অবস্থায় এর মলাটের মাপ $৯\frac{১}{৪} \times ৬\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি এবং পাতাগুলির মাপ $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। প্রথম থেকে যথেষ্ট সতর্কতার অভাবে পাতাগুলির পৌর্বাপর্য ঠিকমতো রক্ষিত হয়নি। কতকগুলি পাতা হারিয়ে গেছে, অনেকগুলি পাতার প্রান্তদেশ কিছু কিছু ভেঙে যাওয়ায় স্থানে স্থানে লিখিত অংশের পার্শ্ববর্তী অংশ লুপ্ত হয়ে গেছে, কালের প্রভাবে লেখাগুলিও অনেক জায়গায় অস্পষ্ট। এটি একটি খসড়া খাতা বলে প্রচুর কাটাকুটি আছে, সংশোধিত পাঠগুলিও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লেখা। বর্তমানে সমগ্র পুঁথিটি মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয়েছে। কিন্তু পুঁথিটির ক্ষেত্রে যেটি সর্বাধিক প্রয়োজন—ফোটোকপি নয়— Zerox পদ্ধতিতে এর প্রতিলিপি প্রস্তুত করে ও মুদ্রিত করে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া এবং পাতাগুলির পৌবাপর্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা। শেষোক্ত কাজটি অত্যন্ত কঠিন; কারণ সন্দেহ হয় যে, পরবর্তীকালের মতো এই সময়েও একটানা লিখে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-বিরোধী ছিল। পুঁথিটি যে-অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাতে তার মোট পত্রসংখ্যা ৩৮ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৬। প্রথমে প্রতিটি পৃষ্ঠায় পেনসিল দিয়ে ইংরেজিতে পত্রাঙ্ক বসানো হয়, কিন্তু তাতে যথেষ্ট ভুল থেকে যায়। বর্তমানে প্রতিটি পাতাকে বাংলা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে সম্মুখের ও পিছনের পৃষ্ঠা যথাক্রমে ক ও খ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেইভাবে পুঁথিটি শুরু ১ক সংখ্যা দিয়ে, শেষ ৩৮খ সংখ্যায়। রচনাগুলির বেশির ভাগ কালিতে লেখা, কিছু কিছু আবার পেনসিলেও। কবিতাগুলি বেশির ভাগই দুইস্তম্ভে লিখিত, কোথাও কোথাও এক স্তম্ভও আছে। এর অনেক রচনা পরবর্তীকালে ঈষৎ বা বহুলভাবে সংশোধিত হয়ে সাময়িকপত্রে ও গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে; অনেকগুলির আবার সে সৌভাগ্য ঘটেনি। কার্তিক ১৩৭২-এ ড বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে এই পাণ্ডুলিপিটি বিস্তৃত টীকা-সহযোগে মুদ্রিত হয়েছে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ডে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'পাণ্ডুলিপি পরিচয়' ও চিত্তরঞ্জন দেব-কৃত তথ্যপঞ্জী [যার পরিশিষ্ট অগ্রহায়ণ ১৩৭৫-এ প্রকাশিত রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ২য় খণ্ডে মুদ্রিত] এই গ্রন্থটির অমূল্য সম্পদ। উপরে প্রদত্ত তথ্যের বেশির ভাগ প্রথমোক্ত প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

অধ্যাপক সেন তাঁর উক্ত প্রবন্ধে এই পাণ্ডুলিপিতে কাব্যরচনার উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা নির্ণয় প্রসঙ্গে বহু যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত করে সিদ্ধান্ত করেছেন: "মালতীপুঁথির রচনাকালের উর্ধ্বসীমা ১৮৭৪ সালের পূর্ববর্তী নয়, হয়তো অল্প কিছু পরবর্তী। আর বোধ করি বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের 'উপহার' কবিতাটি রচনার সময়কে (১৮৮২) তার নিম্নসীমা বলে আপাততঃ গ্রহণ করা যায়।" এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলেই মনে হয়। তিনি অনুমান করেছেন, এর পরেও পুঁথিটি অন্তত 1886 পর্যন্ত তাঁর অধিকারে ছিল, কারণ বালক পত্রিকার চৈত্র ১২৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অবসাদ' কবিতাটি গৃহীত হয়েছিল এই পুঁথি থেকেই। এর পরে কবে পাণ্ডুলিপিটি তাঁর হাতছাড়া হয়, সে-সম্পর্কে অনুমান করা শক্ত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬

আমরা আগেই জেনেছি, রবীন্দ্রনাথ মাঘ ১২৭৯ [Feb 1875]-তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি হন। ইংরেজ জেসুইটদের দ্বারা কলেজটি প্রথম স্থাপিত হয় 1 Jun 1835 তারিখে মুর্গিহাটায় পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীটে। প্রথম রেক্টর ছিলেন ফাদার চাড়উইক [Father Chadwick]। এর পর নানা স্থান ঘুরে ও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বেলজিয়ান জেসুইটদের হাতে আসে। ঐতিহাসিক 'সাঁ সুসি' ['*Sans Souci*'] থিয়েটার যেখানে অবস্থিত ছিল সেই ১০ নং পার্ক স্ট্রীটে মাত্র ৮৩টি ছাত্র নিয়ে কলেজের পুনরুদ্বোধন হয় 16 Jan 1860 তারিখে। ফাদার ডেপেলচিন [Depelchin] রেক্টর পদে নিয়োজিত হন। 1862-তে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন [affiliation] লাভ করে। মনে রাখা দরকার, সেই সময়ে ও আরও অনেকদিন পর পর্যন্ত বহু স্কুল এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাতে পারলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন-প্রাপ্ত স্কুল-কলেজের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃত ফাদার ইউজিন লাফোঁ [Eugene Lafont, 26 Mar 1837-10 May 1908] 10 Oct 1871 তারিখ থেকে কলেজের রেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ 1875-এ যখন ভর্তি হন, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু তখন এখানকার এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ 1932-তে দুবৎসরের জন্য বিশেষ শর্তে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন; কিছুদিন তিনি প্রাক্তন ছাত্রদের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ 1893-তে এই কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। [তথ্যগুলি John Pinto M.A. লিখিত 'A Brief History of St. Xavier's College 1860-1935' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত; দ্র *Saint Xavier's College Magazine*, Jubilee Number, 1935. Vol. IV]

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে এই স্কুলের একজন শিক্ষক ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর পুরো নাম Alphonsus de Penaranda [1834-96] 1875-তে তিনি Fifth year's class-এর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন ও ফাদার হেনরি [Revd. J. Henry] ছিলেন স্কুলের পাঠ-পরিচালক (Prefect of Studies)। পরের বৎসর ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার হাতে নিজের দায়িত্ব তুলে দিয়ে ফাদার হেনরি এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়ানো শুরু করেন।[৪০]

রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন, তাকে বলা হত 'প্রিপারেটরি এন্ট্রান্স ক্লাস' অর্থাৎ এন্ট্রান্স পরীক্ষার সিলেবাসই এই শ্রেণীর পাঠ্য ছিল। কৌতূহলী পাঠকের জন্য তখনকার সিলেবাস বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। তখন ইংরেজির জন্য কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না। গ্রামার, ইডিয়ম ও কম্পোজিশন ছিল অন্যতম পরীক্ষণীয় বিষয়। ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি যে-কোনো একটি ভাষা পড়তে হত। বাংলায় পাঠ্য ছিল রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত *Selections* —এই গ্রন্থটির সঙ্গে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, তখনকার দিনের স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য রচিত 'পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত পূর্বতন এন্ট্রেন্স-পাঠ্য বাংলা গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন'[৪১]—এই মন্তব্য তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা-প্রসূত বলেই মনে হয়। অন্যান্য বিষয়গুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Calendar থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"II. History and Geography. The outlines of the History of England and of the History of India. The Elements of Physical Geography, as in Blandford's Physical Geography, Chapters I, II, III, VIII, IX, and so much of General Geography as is required to elucidate the Histories. [*Calendar 1877*-এ ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে Lethbridge-এর *History of England* ও *Easy Introduction to the History of India* নির্দিষ্ট হয়েছে।]

'III. MATHEMATICS./Arithmetic. The four Simple Rules; Vulgar and Decimal Fractions; Reduction; Practice; Proportion; Simple Interest; Extraction of Square Root.

'Algebra. The four Simple Rules; Proportion; Simple Equations; Extraction of Square Root; Greatest Common Measure; Least Common Multiple.

'Geometry and Mensuration. The first four books of Euclid, with easy deductions. The mensuration of plane surfaces, including the theory of surveying with chain, as in Todhunter's Mensuration, Chapters 1 to 8 and 10 to 15 inclusive, and Chapters 44 to 47 inclusive.

বলা বাহুল্য বাংলা ছাড়া সমস্ত বিষয়ই পড়তে ও পরীক্ষা দিতে হত ইংরেজি ভাষায়।

গোপালচন্দ্র রায় 1875-এর Programme of Studies অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের তালিকাটি 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন' [পৃ ৭৫]-এ উদ্ধৃত করেছেন:

Butler's Catechism, throughout

Angus. Handbook of the English Tongue, Chap. V-VIII

Letter Writing, Paraphrases, Resumes etc.

Latin University Course, 1876

Geography: Southern Europe and Asia

History: Lethbridge's India and Collier's British Empire

Arithmetic: Miscellaneous Examples.

Hamblin Smith's Algebra, Chap. XV-XVIII

Hamblin Smith's Euclid, Book II-IV

Todhunter's Mensuration.

উল্লেখপঞ্জি

১ ড বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১. [১৩৭২]। ১৩৯

২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৩০

৩ দ্র ঐ [১৩৬৮]। ১৭৪-৭৫

৪ 'ভোরের পাখি': শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ [১৩৬৮]

৫ 'রবীন্দ্র প্রতিভার নেপথ্যভূমি': রবীন্দ্রপ্রতিভা [১৩৬৮]। ২৪৯-৫০

৬ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ৪৪, পাদটীকা ১

৭ রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয় [১৩৫০]। ৬৬

৮ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৫, পাদটীকা ১

৯ 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা: কালানুক্রমিক সুচী': রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ২৩১

১০ দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব। ১২২-২৪

১১ দ্র 'ভোরের পাখি': শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ

১২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩২৮

১৩ রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়। ৭৫

১৪ দেশ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ [29 May 1976]। ৩০৯-১১

১৫ দ্র হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত *সোমপ্রকাশ*-এ প্রকাশিত কার্যসূচি [পৃ ৪০]।

১৬ দ্র 'সেন্ট জেভিয়ার্সে'—সংগ্রাহক: সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়: *আনন্দবাজার পত্রিকা*, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ [সোম 4 May 1961], পৃ 'জ'

১৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪২১-২২

১৮ ঐ ১৭। ৪২২

১৯ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ৩

২০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩০৪

২১ দ্র গোরা ৬। ১৫০

২২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩০৪-০৫

২৩ ঐ ১৭। ৩০৭

২৩ক 'মেঘদূত': *সাহিত্য*, অগ্র ১২৯৮। ৩৬৪

২৪ ঐ ১৭। ৩৩৩

২৫ ঐ ১৭। ৩৬৪

২৬ জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮]। ৪৭

২৭ *প্রবাসী,* বৈশাখ ১৩৩৭। ১১৪; অপিচ, বলেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। ২৩

২৮ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকর। ৪৫৯

২৯ ঘরোয়া [১৩৭৭]। ৬৮-৬৯

৩০ 'পিতৃস্মৃতি': মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৫২-৫৩

৩১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী। ১৯

৩২ তত্ত্ব, বৈশাখ ১৭৯৭ শক [১২৮২]। ১৬

৩৩ ঐ। ১৭।

৩৪ দ্র সা-সা-চ ৬। ৬৮। ২০

৩৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১৫৮

৩৬ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৯৬

৩৭ 'ভুক্তভোগীর পত্র' (২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ তারিখে লিখিত]: ভারতী, শ্রাবণ ১৩২০। ৪৫৩

৩৮ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৫২৮

৩৯ বি. ভা, প., বৈশাখ ১৩৫০। ৬৫৪

৪০ সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সেন্ট জেভিয়ার্সে'

৪১'বঙ্কিমচন্দ্র' : আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪০১

---

* এই বইটির পূর্ণ পরিচয় *The Bengal Magazine* [Mar 1874]-এর সমালোচনা (pp. 349-52) থেকে উদ্ধার করে দিচ্ছি: 'Selections from Modem English Literature for the Higher Classes in Indian Schools. By E. Lethbridge, M.A., Late Scholar of Exeter College, Oxford; Professor of History and Political Economy in Presidency College, Calcutta. Calcutta: Thacker, Spink & Co, 1874'. উক্ত সমালোচনাতেই লিখিত হয়েছে, বইটি ছিল বড়ো আকারের আট পেজী ৪০০ পৃষ্ঠার ও তার দাম ছিল দু টাকা।

* সজনীকান্ত দাস এই নামটির উল্লেখে একটি ভুল লক্ষ্য করেছেন: তাঁর মতে ইনি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [1845-86] নন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়[?]—'ভুলটি বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।'—রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য। ২২৮। ড সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার এই বক্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব। ১০৩-০৪, পাদটীকা ৭। আমরাও তাঁর যুক্তিই সমর্থন করি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের লেখক, পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা ও বঙ্গদর্শনের একজন প্রধান লেখক। তাঁর মৃত্যুর পর সাবিত্রী লাইব্রেরিতে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ অনেক বেশি ছিল। তাছাড়া বর্তমান সময়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ [31 May 1875] তারিখে বিদ্যাসাগর যে উইল করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন।

* কথামালা-র গল্পটি রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। তাঁর অনুবাদের অন্য কোনো আদর্শ ছিল কিংবা স্বাধীনভাবে তিনি গল্পটি সংস্কৃতভাষায় রচনা করেছিলেন কিনা, তা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। মালতীপুঁথি-র সম্পাদক ড বিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখেছেন: 'যে মূল থেকে অনুবাদ করা হচ্ছিল তার ভাষা ইংরেজি নয় ব'লে মনে হচ্ছে।' এই প্রসঙ্গে ড ভট্টাচার্য অনুবাদটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, দ্র রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা ১ [১৩৭২]। ২৮০-৮১

* যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত [১৩৭৫] গ্রন্থে অমৃতবাজার পত্রিকা-র ঐ পৃষ্ঠাটির আলোকচিত্র মুদ্রিত করেছেন। আলোকচিত্রটি থেকে জানা যায়: 'এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দচন্দ্র চাটুয্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।'

* উল্লেখযোগ্য, বান্ধব-এর বর্তমান সংখ্যাতে সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় (পৃ ১৮৫-৮৯]। প্রবন্ধটি তাঁর প্রভাত চিন্তা [১২৮৪] গ্রন্থে সংকলিত হবার কয়েক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭ সংখ্যায় 'বাঙ্গালি কবি নয়' ও আশ্বিন সংখ্যায় 'বাঙ্গালি কবি নয় কেন?' দুটি প্রবন্ধে সমালোচিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি পরে 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামে পুনর্লিখিত হয়ে সমালোচনা [১২৯৪] গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। দ্র অ-২। ৭৯-৮৬

* গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন, অন্য-কেউ মাসে-মাসে বেতন দিয়ে পরে একসঙ্গে সরকারী তহবিল থেকে টাকাটা শোধ করে নিয়েছিলেন [দ্র রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন। ৭৩]; এমন হতেও পারে, কিন্তু সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে 'বঃ' বা 'গুঃ' সংকেত-সহ কোনো ব্যক্তির নাম লেখার রীতি ক্যাশবহিতে দেখা যায়।

† গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন: 'পরে নামে N কেটে কালি দিয়ে করা আছে R' —কিন্তু *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় মুদ্রিত প্রতিলিপিতে সংশোধনের কোনো চিহ্ন নেই। গোপালবাবু রবীন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথের নামের বানান যা লিখেছেন, উক্ত প্রতিলিপির সঙ্গে তা মেলে না।

* 'কাম্য কানন' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন হয় ১৭ পৌষ ১২৮০ [বুধ 31 Dec 1873] তারিখে।

* 'মহাজনপদাবলী সংগ্রহ।/বিদ্যাপতি।/ বহুবাজার, স্মিথ এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি পড়েছিলেন; পুরাতন বইয়ের দোকান থেকে পৃথ্বীসিংহ নাহার-কর্তৃক সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত একটি বই তিনি দেখেছিলেন। দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ৭২; কিন্তু এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পরবর্তীকালে পড়েছিলেন।

† 'চণ্ডিদাস কৃত পদাবলি'-তে ১২৯-৩৬ পৃষ্ঠাগুলি নেই; রবীন্দ্রনাথ পেন্সিলে মন্তব্য করেছেন: 'এখানে গোটা আষ্টেক/পাতা দেখিতেছি না'। 'গোবিন্দদাস কৃত পদাবলির ২৩৭ পৃষ্ঠার উপরে একটি মুখের প্রোফাইল আঁকা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১২৮২ [1875-76] ১৭৯৭ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চদশ বৎসর

রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ মাঘ ১২৮১ [Feb 1875]-তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগের এন্ট্রান্স ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, গবর্মেন্ট পাঠশালা বা বেঙ্গল অ্যাকাডেমির সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বহু দিক থেকেই পার্থক্য ছিল। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে গাছপালা ঘেরা স্কুল বাড়িটি ঠিক খাঁচা ছিল না, এখানকার শিক্ষকেরাও অন্য স্কুলের শিক্ষকদের মতো ছিলেন না—তবু রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশের সঙ্গেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না। তিনি লিখেছেন : 'যে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাঁসপাতাল-জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।'[১]

এরই মধ্যে সেন্ট জেভিয়ার্সের যে পবিত্রস্মৃতি তাঁর মনে দীর্ঘকাল অম্লান থেকেছে, তা সেখানকার একজন অধ্যাপকের স্মৃতি। তাঁর পুরো নাম রেভারেণ্ড আলফোনসাস ডি পেনারাণ্ডা [1834-96]। এঁর সম্পর্কে জনৈক H.W.B. Moreno 9 Mar 1931 রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I was about those days—perhaps a little later,-in S. Xaviers'...He was a Spanish Count and gave up all when he entered the Order. He was a real ascetic. He was a brilliant musician; and played excellently on the piano; but he gave up all for Jesus as he frequently say. ...He was a wonderful mathematician and astronomer.'[২] রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র এঁর সম্বন্ধে বলেছেন: 'শুনেছিলুম তিনি স্পেনদেশের একটি সম্ভ্রান্ত ধনীবংশীয় লোক, ভোগৈশ্বর্য সমস্ত পরিত্যাগ করে ধর্মসাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ কিন্তু তিনি তাঁর মণ্ডলীর আদেশক্রমে এই দূর প্রবাসে এক বিদ্যালয়ে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীতে অধ্যাপনার কাজ করছেন।'[৩] স্পেনীয় বলে তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ কিছু পরিমাণে বিকৃত ছিল, ফলে ছাত্রেরা তাঁর ক্লাসের শিক্ষায় যথেষ্ট মনোযোগ দিত না। তাঁর মুখশ্রীও সুন্দর ছিল না, কিন্তু তাঁকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের মনে হত, 'তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন—অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।'* কপি করার জন্য রুটিনে আধঘণ্টা নির্দিষ্ট ছিল, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কলম হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক থাকতেন। একদিন ফাদার ডি পেনেরাণ্ডা সেই ক্লাস দেখাশুনো করার সময় প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করে যাচ্ছিলেন। হয়তো কয়েকবার তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে রবীন্দ্রনাথ কিছুই লিখছেন না। একবার তিনি তাঁর পিছনে থেমে নত হয়ে তাঁর পিঠে হাত রেখে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাগোর, তোমার কি শরীর ভালো নাই?' এই স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ কখনো ভোলেননি। তাই তিনি লিখেছেন: 'অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে

দেখিতে পাইতাম—আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।'[৪]

কিন্তু স্কুলের সকল শিক্ষক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব সপ্রশংস মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেননি। সাধারণ শিক্ষকেরা যেমন শিক্ষাদানের কল হয়ে উঠে বালকদের হৃদয়ের দিকে পীড়িত করে থাকেন এঁরা তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি, উপরন্তু ধর্মানুষ্ঠানের বাহ্য আয়োজনের জাঁতায় পিষ্ট হয়ে তাঁদের হৃদয়প্রকৃতি আরও শুষ্ক হয়ে উঠেছিল, সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এঁদের মধ্যে 'ভগবদ্‌ভক্তির গম্ভীর নম্রতা' লক্ষ্য করেননি। তিনি লিখেছেন: 'যাহারা ধর্মসাধনার সেই বাহিরের দিকেই আটকা পড়িয়াছে তাহারা যদি আবার শিক্ষকতার কলের চাকায় প্রত্যহ পাক খাইতে থাকে, তবে উপাদেয় জিনিস তৈরি হয় না—আমার শিক্ষকদের মধ্যে সেইপ্রকার দুইকলে ছাঁটা নমুনা বোধকরি ছিল।'[৫] এই ধরনের বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই পরিণত চিন্তার ফসল, কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল রবীন্দ্রনাথের কবিমন বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকদের নিরানন্দ হৃদয়স্পর্শশূন্য শিক্ষাপদ্ধতির চাপে ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ করেছে। ফলে অভিভাবকদের এই নূতন পরীক্ষাও তাঁর ক্ষেত্রে সার্থক হয়নি।

বেঙ্গল অ্যাকাডেমি থেকে পালানোর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ মুন্‌শির সহায়তা পেয়েছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পালানোর উপায় তাঁকে নিজেকেই করে নিতে হয়েছে অসুস্থতার ছুতো করে। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেও বারবার বলেছেন এবং ক্যাশবহি-র হিসাব থেকেও আমরা জানতে পারি যে, শিশু বয়স থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ছিল অত্যন্ত ভালো। এই হিসাব থেকে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে তাঁর অসুস্থতার খবর পাওয়া যায়: ১১ আশ্বিন ১২৭৭ [সোম 26 Sep 1870] 'সোম রবী সত্যপ্রসাদ বাবু ও শ্রীমতী বর্ণর পীড়া হওয়ায় পামরুটী'; ১৬ আষাঢ় ১২৭৮ [বৃহ 29 Jun 1871] 'রবীন্দ্রবাবুর কাণে ঘা হওয়ায় পিসকারি খরিদ' এবং ঐ বৎসরেরই ১৩ আশ্বিন [বৃহ 28 Sep] 'ব° বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার/দ° রবীন্দ্রবাবুর কাশী হওয়ায় উক্ত ডাক্তারের ফি শোধ বিঃ এক বৌচর ১০্'—মনে হয় এদের মধ্যে শেষের অসুখটিই একমাত্র গুরুতর রূপ ধারণ করেছিল, নইলে তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। এম. ডি.-কে ডাকা হত না বাড়িতে দুজন পারিবারিক চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও। চোদ্দ বছরে মাত্র তিনবার অসুস্থতা! এর পাশাপাশি শুধু বর্তমান ১২৮২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের জন্য কতবার চিকিৎসককে আহ্বান করতে হয়েছে এবং ঔষধাদির প্রয়োজন হয়েছে আমরা শুধু তারিখ-সহ তার তালিকা করে দিচ্ছি, আশা করি কোনো বিশ্লেষণ ছাড়াই পাঠক এর থেকে যা বোঝবার ঠিকই বুঝে নিতে পারবেন। তালিকার শুরু ১৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 3 Aug] 'রবিবাবুর চিকিৎসার জন্য ব্রজেন্দ্র কবিরাজের বিজিট... ৬্' [তাঁর ভিজিট ছিল ২, সুতরাং তিনবার তিনি রোগীকে দেখেছেন], এরপর ১৫ ভাদ্র [সোম 30 Aug] 'রবীবাবুর অসুখ হওয়ায় ব্রজেন্দ্রনাথ কবিরাজের ফি শোধ/বিঃ দুই বৌচর ৪্' ও 'ব° ঐ/দ° রবীবাবুর অসুখ হওয়ায়/ঔষধের অনুপাণ জন্য মুগের ডাউল ক্রয়'; ৮ আশ্বিন [বৃহ 23 Sep] 'ব° ব্রজেন্দ্রনাথ কবিরাজ/রবীবাবুর পিড়া হওয়ার ঔষধ ক্রয় এক বিল—১৯, ৯ আশ্বিন 'রবীন্দ্রনাথবাবুর পিড়ার জন্য/ব্রজেন্দ্রনাথ কবিরাজের বিজিট/৫। ৬ আশ্বিনের দুই বৌচর —৪, ও ১২ আশ্বিন 'রবীবাবুর অসুখ হওয়ায়/ব্রজেন্দ্র কবিরাজের বিজিট... ২্'; ১৮ অগ্রহায়ণ [শুক্র 3 Dec] 'রবীবাবু ও সতীশবাবুর পুত্রের পীড়া হওয়ায় নিলমাধব ডাক্তার ও ব্রজেন্দ্র কবিরাজের জাতের গাড়ি ভাড়া। মনে রাখতে

হবে আশ্বিন ও কার্তিক মাসের অনেকটাই কেটেছে পুজোর ছুটিতে, হয়তো সেই কারণেই চিকিৎসকের আনাগোনায় দীর্ঘকালের ছেদ দেখা যায়! সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত "ইর্‌রেগুলার" ছিলেন; প্রায়শই কামাই করিতেন'[৬]—উপরোক্ত তথ্য থেকে তার পটভূমিকাটি আমাদের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েই দেখা দেয়।

এই বৎসরেও যথারীতি জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ও রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য [বিদ্যাভূষণ] তাঁদের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। স্কুলের সংস্কৃত পাঠ্য না থাকলেও গৃহে সংস্কৃতচর্চা যে অব্যাহত ছিল রামসর্বস্বের উপস্থিতিই তা বুঝিয়ে দেয়। এমন যুক্তি অবশ্য দেখানো সম্ভব যে, রামসর্বস্ব দ্বিপেন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য বালকদের শিক্ষার জন্যই নিযুক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শিক্ষকতার কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও রামসর্বস্বের যোগাযোগের এত প্রমাণ রয়েছে [আমরা এই অধ্যায়েই তা দেখতে পাব] যে। এমন যুক্তি মেনে নেওয়া শক্ত। বরং আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন 'অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন'[৭]—সেটি এই সময়েরই ঘটনা। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো তিনি ছাত্রকে দিয়ে নাটকটির কোনো অনুবাদ করিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না—খুব সম্ভব করাননি—কিন্তু এই পাঠের পরোক্ষ প্রভাব ছড়িয়ে আছে কিছু পরে লেখা 'বনফুল' কাব্যে এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় পূর্বের অধ্যায়ে উল্লিখিত উক্ত নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ শ্লোকটির দুটি অনুবাদে। বোঝা যায়, কালিদাসের এই শ্রেষ্ঠ নাটকটি তাঁর বালকমনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল যা তাঁর পরিণত মনের গঠনে অনেক বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অনুবাদ দুটি সম্ভবত আরও কিছু পরবর্তীকালের, তাই সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে আর একটি প্রসঙ্গ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

এই বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবিপ্রতিভার যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছিল, তার প্রতি নিস্পৃহ থাকা পরিচিত কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ফলে বিদ্যালয়গত শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবহেলা সকলের পক্ষেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু শিক্ষকতা কার্য ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করার পর জোড়াসাঁকো বাড়ির সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং এই সুকণ্ঠ বালকের কবিপ্রতিভা তাঁর অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। হয়তো রবীন্দ্রনাথের বহু বাল্যরচনা তাঁর সহৃদয় সমাদর লাভে উৎসাহদায়ী হয়ে উঠেছিল। সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছু না লিখলেও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেছেন: 'ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন।'[৮] সুতরাং রাজনারায়ণ বসু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই কবি-বালকটির যথাযথ শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হবেন এটাই স্বাভাবিক। 'ঘরের পড়া' যুগেই তাঁর এই মনোযোগ পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বক্রোটা শেখর' থেকে তাঁকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের ১২ আশ্বিন ১৭৯৬ শক [১২৮১ : রবি 27 Sep 1874] তারিখের পত্রে: '... রবীন্দ্রের তত্ত্বাবধারণ মধ্যে মধ্যে করিয়া

থাক, ইহাতে আমি অতীব সন্তোষ লাভ করিয়াছি।'[৯] বর্তমান বৎসরেও 'বক্রোটা শেখর' থেকে ১১ শ্রাবণ [সোম 26 Jul] তারিখের পত্রে তিনি লিখেছেন : '...রবীন্দ্রর ইংরাজী পড়া যে ভাল হইতেছে আমার এমন বোধ হয় না, তুমি তাহাকে শ্রেষ্ঠ ইংরাজী কবিদিগের এক ফর্দ করিয়া দিয়াছ। তাহা কি রবীন্দ্র আপনা আপনি পড়িয়া বুঝিতে পারিবে।'[১০] আমাদের কাছে পত্রগুলির ধারা একমুখী, কারণ রাজনারায়ণের লিখিত পত্রগুলি রক্ষিত হয়নি; যদি সেগুলি পাওয়া যেত, সমস্ত বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু এর থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি, জন্ম-শিক্ষক রাজনারায়ণ রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি-শিক্ষা ও কবিত্বশক্তির বিকাশের উপযোগী করে সযত্নে তাঁর পাঠ্যতালিকা রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা যথেষ্ট সুফল প্রসব করতে পারেনি। সজনীকান্ত দাস এ-সম্পর্কে লিখেছেন : দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই সন্দেহ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের নির্বাচিত "শ্রেষ্ঠ" ইংরেজী কবিরা রবীন্দ্রনাথকে মোটেই আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথকে এই তালিকার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের মনে আছে, এই কবিকুলের শিরোভাগে ছিলেন—Mark Akenside; তাঁহার The Pleasures of Imagination এবং Dodsley-র কবিতা সংগ্রহে (Collection of Poems) "Human to the Naiads" রবীন্দ্রনাথের imagination কে মোটেই অধিকার করিতে পারে নাই। রাজনারায়ণবাবু পরাস্ত হইয়াছিলেন।'[১১]

আমাদের ধারণা, রাজনারায়ণবাবুর এই কবিতার তালিকার সূত্রেই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। Akenside-এর কবিতার পাণ্ডিত্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতিকে উদ্দীপ্ত করতে সমর্থ ছিল না, এবং ঠিক সেইখানেই অক্ষয়চন্দ্রের উপযোগিতা ছিল অসাধারণ। 'সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।'[১২] রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনের পক্ষে এইটির প্রয়োজনই বেশি ছিল। তাই অক্ষয়চন্দ্র যখন অনেক রাতে দাদাদের সভা থেকে বিদায় নিতেন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে টেনে আনতেন নিজেদের ইস্কুল-ঘরে। সেখানে রেড়ির তেলের মিটমিটে আলোতে পড়বার টেবিলের উপর বসে সভা জমিয়ে তুলতে তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না। 'এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাঁহাকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে-লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।'[১২] মনে হয় এই ইংরেজি সাহিত্য-চর্চা সূত্রেই মালতীপুঁথি-তে পূর্বোল্লিখিত টমাস মূরের 'আইরিশ মেলডিস্' ও বায়রনের 'চাইল্ড হ্যারল্ড'স্ পিলগ্রিমেজ' থেকে অনুবাদগুলি করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র-করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লণ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করিয়াছিল।'[১৩] উদ্ধৃতিটিতে অক্ষয়চন্দ্রের উল্লেখ অনুবাদগুলির সঙ্গে তাঁর যোগটিকে স্পষ্টতর করে। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত এই বইটি বর্তমানে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সুরক্ষিত রয়েছে। এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ : MOORE'S IRISH MELODIES/ILLUSTRATED BY/D. MACLISE, R. A./LONDON:/PRINTED FOR/LONGMAN, BROWN, GREEN, AND

LONGMANS,PATERNOSTER ROW./1846.* বইটিতে সর্বমোট ৩৪টি কবিতা টি (tick)-চিহ্ন দেওয়া—যার অনেকগুলিই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে অনুবাদ করেছিলেন। এর ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠার "The Journey Onwards' কবিতাটির ১ম, ৩য় ও ৪র্থ স্তবকগুলির অনুবাদ মালতীপুঁথি-র 4/২খ পৃষ্ঠায় প্রথমেই দেখা যায়। আমাদের অনুমান, এ-যাবৎ রবীন্দ্রনাথের যে অনুবাদ কবিতাগুলি পাওয়া গেছে, এইটিই তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। সেই দিক থেকে কবিতাটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এর মধ্যে প্রথম স্তবকটি প্রথম বর্ষ *ভারতী*-র সপ্তম সংখ্যা [মাঘ ১২৮৪]-তে ৩২৬ পৃষ্ঠায় 'সম্পাদকের বৈঠক/অনুবাদ' বিভাগে 'বিচ্ছেদ' শিরোনামে মুদ্রিত হয়, নীচে 'Moore's Irish Melodies' লেখা ছিল [রচনাটি সম্পর্কে একটু পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব]। অনুবাদ কবিতাটির অপর দুটি স্তবক কোথাও মুদ্রিত হয়েছিল বলে জানা যায় না [বর্তমানে অবশ্য রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ডে পুরো মালতীপুঁথি-টিই মুদ্রিত হয়েছে। এই পৃষ্ঠায় অনূদিত দ্বিতীয় কবিতাটিও উক্ত গ্রন্থের ১৩৩-৩৪ পৃষ্ঠার 'Come, rest in this. bosom,my own stricken deer' কবিতাটির অনুবাদ, *ভারতী*-র উপরোক্ত সংখ্যায় 'জীবন উৎসর্গ' নামে প্রকাশিত হয়, যার প্রথম পঙ্ক্তিটি হল—এস এস এই বুকে, নিবাসে তোমার' [দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ৫]। ভারতী ও রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা-র [২-৬ পঙক্তি খণ্ডিত) পাঠ চতুর্দশ মাত্রার পয়ারে গঠিত, কিন্তু মালতীপুঁথি-তে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম কবিতাটি ৮+৮+১০ মাত্রার ত্রিপদীতে অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ন'টি ছত্র লেখার পর পুরোটা কেটে দিয়ে অন্য রীতিতে লেখেন—এই ধরনের পরিবর্তন পরেও রবীন্দ্রনাথ বহুবার করেছেন, বর্তমান দৃষ্টান্তটি তার প্রথমতম প্রাপ্ত নিদর্শন।

এই পৃষ্ঠায় লিখিত অপর দুটি অনুবাদই বায়রনের 'চাইল্ড হ্যারল্ড'স্ পিলগ্রিমেজ' গ্রন্থ থেকে করা। প্রথমটি 'কষ্টের জীবন' [শিরোনামটি পুঁথিতেই আছে; প্রথম পঙ্ক্তি—'মানুষ কাঁদিয়া হাসে, পুনরায় কাঁদে গো হাসিয়া'] উক্ত কাব্যের তৃতীয় সর্গ [Canto the Third]-এর ৩২, ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক স্তবকের অনুবাদ, শেষ স্তবকটির শেষ আড়াইটি ছত্র অনুবাদ করা হয়নি। [অনুবাদটি শুরু হয়েছিল 'গভীর হৃদয় তলে আছে যত প্রাণের কথন' পঙ্ক্তিটি লিখে, সম্ভবত ৩০ সংখ্যক স্তবকটি থেকে অনুবাদ করার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সেটি কেটে দিয়ে ৩২ সংখ্যক স্তবক থেকে আরম্ভ করেন।] এইটি ভারতীর উক্ত সংখ্যায় [পৃ ৩২৬-২৭] প্রকাশিত হয়েছিল। পরের অনুবাদটি বায়রনের উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ১৫ সংখ্যক স্তবকটি থেকে করা, অনুবাদের শেষের চার পক্তি পরবর্তী 5/৩ক পৃষ্ঠায় বিস্তৃত হয়েছে; যার পর থেকে পূর্বোক্ত কুমারসম্ভব-এর অনুবাদটির সূচনা। বায়রন থেকে করা এই অনুবাদটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

আলোচ্য অনুবাদটির প্রথম চার পঙ্ক্তি হচ্ছে:

> 'ভালবাসে যারে তার চিতাভস্ম[স্ম]পানে
> প্রেমিক যেমন চায় কাতর নয়ানে
> তেমনি যেন তোমাপানে নাহি চায় গ্রীস্
> তাহার হৃদয়মন পাষাণ কুলিশ।'

এরই ডান পাশে কাত করে লেখা চারটি পঙ্ক্তি দেখা যায়, যার কিয়দংশ অবলুপ্ত হয়ে গেছে:

‘[শরীর] সে ধীরে ২ যাইতেছে আগে
[অধীর] হৃদয় কিন্তু চায় পিছু বাগে
... ... যায় যবে তরী।
... ... আগে ধায় ফিরি ২।’

—এ-সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন : ‘বলা বাহুল্য, ‘ভালবাসে যারে তার’ ইত্যাদি রচনার পাশেই এই চার পংক্তি লেখার কারণ হচ্ছে দুটি রচনার ভাবগত (আংশিক) সাদৃশ্য। শেষোক্ত চার পংক্তি রবীন্দ্রনাথের নিজের রচিত। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি-দুটি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই তাঁকে ওই দুটি পংক্তি নূতন করে লিখতে হয়েছিল নিম্নলিখিত রূপে—

“ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে
অংশুক তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে।”

—মালতীপুঁথি, পৃ ৬ দ্বিতীয় স্তম্ভ

এই পংক্তি-দুটি স্থান পেয়েছে কুমারসম্ভব তৃতীয় সর্গের পদ্যানুবাদের (পৃ ৫-৬) ঠিক পরেই। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আলোচ্যমান চারটি পংক্তি কালিদাসের একটি শ্লোকের অনুবাদ।’[১৪] এর পর তিনি অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ শ্লোক ‘গচ্ছতি পুরঃ শরীরং’ ইত্যাদি উদ্ধৃত করেছেন।

অধ্যাপক সেন এবার উক্ত চারটি পঙ্ক্তিকে ‘রবীন্দ্রনাথের নিজের রচিত’ বলেছেন, আবার পরে তাকেই ‘কালিদাসের একটি শ্লোকের অনুবাদ’ বলে উল্লেখ করেছেন! কিন্তু এই অসংগতিটুকু ছেড়ে দিয়েও, তাঁর মূল প্রতিপাদ্য অথাৎ ‘ভালবাসে যারে তার’ ইত্যদির সঙ্গে এই চারটি পঙক্তির ভাবগত (আংশিক) সাদৃশ্য আমরা মেনে নিতে পারছি না। একথা ঠিকই যে পঙ্ক্তি চারটি বায়রনের উক্ত কবিতার অনুবাদের পাশেই লিখিত হয়েছে, কিন্তু তা সাদৃশ্যের কারণে নয়—অন্যত্র লেখার উপযুক্ত স্থানের অভাবে। প্রকৃতপক্ষে এই চারটি পঙ্ক্তির ‘সম্পূর্ণ’ ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে একই পৃষ্ঠায় লেখা প্রথম পদ্যানুবাদটির সঙ্গে; মূর ও বায়রনের কবিতাগুলি অনুবাদ করার পর রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণের কাছে শকুন্তলার প্রথম অঙ্কটি পড়বার সময়েই তার শেষ শ্লোকটি সঙ্গে মূরের কবিতাটির প্রথমাংশের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ঐ শ্লোকটির অনুবাদ করেন ও পৃষ্ঠার উপরে যথেষ্ট জায়গা না থাকায় নীচে একপাশে সেটি লিপিবদ্ধ করেন। আমরা মূল ইংরেজি কবিতা ও তার বঙ্গানুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু পাশাপাশি উদ্ধৃত করছি, তাতে একই সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্ত ও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হবে :

‘As slow our ship her foamy track
Against the wind was cleaving,
Her trembling pennant still look’d back
To that dear isle ‘twas leaving’.

'প্রতিকূল বায়ুভরে ঊর্ম্মিময় সিন্ধুপরে
তরীখানি যেতেছিল ধীরি,
কম্পমান কেতু তার, চেয়েছিল কতবার
সে দ্বীপের পানে ফিরি ফিরি।'

—আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই স্তবকটি 'বিচ্ছেদ' শিরোনামে *ভারতী*-তে প্রকাশিত হয়েছিল; আর শকুন্তলা'র উক্ত অনুবাদটিও *ভারতী*-র একই সংখ্যায় একই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে [পৃ ৩২৫], সেটিরও শিরোনাম ছিল 'বিচ্ছেদ'। রামসর্বশ্বের কাছে শকুন্তলা পড়ার সুফলের সমকালীন নিদর্শন এটি।

আমাদের ধারণা, মালতীপুঁথি-তে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গ থেকে অকাল বসন্ত ও মদনভস্মের যে অনুবাদ পাওয়া যায় সেটি উপরোক্ত ইংরেজি অনুবাদগুলির পরে করা হয়েছে; শকুন্তলা পাঠ ও অনুবাদ তারও পরবর্তীকালের।

কিন্তু জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ও রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করলেও স্কুলের পাঠ্যবিষয়ের প্রতি মনোযোগী করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁরা অবশ্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। মালতীপুঁথি-র কয়েকটি পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ও ইংরেজি অনুবাদ-চর্চার কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায় [দ্র পৃ1/১ক, 40/২১খ, এবং সম্ভবত 32/১৭খ পৃষ্ঠায় 'ঝান্সী রাণী' রচনাটি], সেগুলি পাঠাভ্যাসের জন্যই করা হয়েছিল।

যাই হোক, সবরকম সদিচ্ছা ও আয়োজন থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা সার্থক হতে পারেনি। অসুস্থতা ইত্যাদি অজুহাতে তিনি প্রায়ই স্কুল কামাই করেছেন, আর গৃহশিক্ষকেরা তাঁকে বাঁধা পথের শিক্ষায় চালিত করতে না পেরে ম্যাকবেথ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ইত্যাদি পড়িয়ে অন্য পথে হলেও কিছুটা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তা রবীন্দ্রনাথের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আমরা উপরোক্ত আলোচনায় দেখতে পেয়েছি। কিন্তু স্কুলে পড়লে স্কুলের নিয়ম কিছু মানতে হয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গেলে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকও পড়তে হয়। তার কিছুই না করার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের 1876-এর রেকর্ডে দেখা যায়, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ এন্ট্রান্স ক্লাসে পৌঁছে গেলেও রবীন্দ্রনাথ ফিফ্‌থ্ ইয়ার'স্ ক্লাসেই রয়ে গেছেন। এখানেও তাঁর নাম Tagore, Nubindronath রূপেই মুদ্রিত হয়েছে, স্কুলের খাতায় নিজের নাম বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল করে রাখবার দিকে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না, এটা তারই প্রমাণ! রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি কিংবা পরীক্ষা দিতেই যাননি—এ-সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়; তবে শেষোক্ত সম্ভাবনাটিই প্রবল। এর পরে অবশ্য বেশিদিন স্কুলের খাতায় নাম টিকিয়ে রাখার কষ্টও রবীন্দ্রনাথকে ভোগ করতে হয়নি। ২৬ মাঘ [মঙ্গল 8 Feb 1876]-এর হিসাবে দেখা যায় : ব° সেন্ট জেবিয়ার্স কলেজ/ দং সোম রবী সত্ত্বপ্রসাদ বাবু দিগের/১৮৭৫ সালের নবেম্বর হইতে ১৮৭৬ সালের মার্চ পয্যন্ত পাঁচ মাসের ফি শোধ/৮ হিঃ মাসিক ২৪, হিসাব/গুঃ সত্ত্যপ্রসাদবাবু/নোট—১২০্'। এর পর যখন ২০ চৈত্র [শনি1 Apr] তারিখে বেতন দেওয়া হয়েছে, তখন তাতে রবীন্দ্রনাথের নাম অনুপস্থিত: 'ব° সেন্ট জাবিয়ার্শ কলেজ/দং সোমবাবু ও সত্ত্যবাবুর এপ্রেল মাহার/ ফি শোধ/ গুঃ সত্যপ্রসাদবাবু—১৬্। স্পষ্টই বোঝা যায় অভিভাবকেরা আর অনর্থক খরচের বোঝা বহন করে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।

1876-এ রবীন্দ্রনাথের ক্লাসে বাঙালি সহপাঠী ছিলেন কৃষ্ণকিশোর বসু, নবকিশোর বসু, শ্রীশচন্দ্র বসু, গোকুলচন্দ্র দে, আশুতোষ ধর ও কালীরঞ্জন ঘোষ। তবে এঁরা সম্ভবত স্কুলের খাতাতেই তাঁর সহপাঠী ছিলেন, 1876-এ রবীন্দ্রনাথ একদিনের জন্যও স্কুলে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ এর মধ্যে অনেকটা সময় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহতেই কাটিয়েছিলেন, সে-প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব। বরং এই সময়ে এন্ট্রান্স ক্লাসে সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের বাঙালি সহপাঠীদের তালিকাটি অনেক মূল্যবান, কারণ তাঁদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন এবং সে-ঘনিষ্ঠতা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল। 1876-এ এন্ট্রান্স ক্লাসের অন্যান্য বাঙালি ছাত্রেরা হচ্ছেন : দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন দাস, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বদনচন্দ্র চন্দ্রনাথ জ্ঞানচন্দ্র ও নীরদনাথ মুখার্জি, দেবেন্দ্রনাথ রায়, আনন্দলাল সান্যাল ও নবকৃষ্ণ সাহা। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে যে ফাদার হেনরি [Rev. J. Henry]-র কথা লিখেছেন, তিনি এই বৎসর পাঠ-পরিচালক (Prefect of Studies-এর দায়িত্ব ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার হাতে ছেড়ে দিয়ে এন্ট্রান্স ক্লাসের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন[১৫]। এই প্রাচীন অধ্যাপককে ছাত্রেরা খুব ভালোবাসত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে পড়েননি বলে তাঁকে ভালো করে জানতেন না। এঁর সম্পর্কে একটি মজার গল্প রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে বর্ণনা করেছেন—ঘটনাটি নিশ্চয়ই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, সোমেন্দ্রনাথ বা সত্যপ্রসাদের কাছে শোনা, কারণ ব্যাপারটি 1876-এ এন্ট্রান্স ক্লাসেই ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তিনি [ফাদার হেনরি] বাংলা জানিতেন। তিনি নীরদ নামক তাঁহার ক্লাসের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার নামের ব্যুৎপত্তি কী।" নিজের সম্বন্ধে নীরদ চিরকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল—কোনোদিন নামের ব্যুৎপত্তি লইয়া সে কিছুমাত্র উদ্‌বেগ অনুভব করে নাই—সুতরাং এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অভিধানে এত বড়ো বড়ো অপরিচিত কথা থাকিতে নিজের নামটা সম্বন্ধে ঠকিয়া যাওয়া যেন নিজের গাড়ির তলে চাপা পড়ার মতো দুর্ঘটনা—নীরু তাই অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "নীরু ছিল রোদ, নীরদ—অর্থাৎ, যাহা উঠিলে রৌদ্র থাকে না তাহাই নীরদ".'[১৬] এই নীরদ হচ্ছেন উপরের তালিকায় উল্লিখিত নীরদনাথ মুখার্জি, ইনি সম্ভবত 1876-এই সেন্ট জেভিয়ার্সে এন্ট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হন, কারণ আগের বছরের এন্ট্রান্স বা ফিফ্‌থ ইয়ার'স্ ক্লাসের তালিকায় এঁর নাম পাওয়া যায় না। নীরদনাথ হচ্ছেন গুণেন্দ্রনাথের দিদি কুমুদিনী ও নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র—সেই আত্মীয়-সূত্রেই ডাক নাম 'নীরু'র প্রয়োগ।

অপর সহপাঠীদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র ঘোষের নাম অনেক পরিচিত। ইনিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ 'কবি-কাহিনী'র [5 Nov 1878 : ১২৮৫] প্রকাশক।

উল্লেখযোগ্য, Dec 1875-এ অনুষ্ঠিত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র বসু সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। এই সময়ে অবশ্য তাঁদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না।

দেবেন্দ্রনাথ ২১ অগ্রহায়ণ [সোম 6 Dec 1875] তারিখে বোটে করে শিলাইদহ যাত্রা করেন। এ-যাত্রায় তিনি রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর সঙ্গী করেন। রবীন্দ্রনাথ অন্য প্রসঙ্গে এই ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

'একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন

অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না।* বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং' [২। ১১]—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'* —এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।'[১৭]

উদ্ধৃতিটি খুবই দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু এর থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত বার করে নিতে চাই বলেই এই অংশটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছি। আমরা জানি, সংস্কৃতে লেখা হলেও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' থেকেই বাংলার প্রেমগীতিসাহিত্য, বিশেষ করে বৈষ্ণব সাহিত্য, তার প্রাণরস আহরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, গীতগোবিন্দ সম্পূর্ণ না বুঝলেও অলক্ষিতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতার প্রেমরহস্য নিশ্চয়ই তাঁর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মনে রাখা দরকার, ব্রাহ্মধর্মের আবহাওয়ায় বড়ো হওয়ার জন্য রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্কে কোনো ধর্মীয় সংস্কার অন্তত এই সময়ে তাঁর মনে গড়ে ওঠার কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে আগে পড়া বিদ্যাপতির পদাবলি ও বোটভ্রমণের সময়ে পঠিত গীতগোবিন্দ বিশুদ্ধ প্রেমকবিতা হিসেবেই তিনি উপভোগ করেছেন। আদিরসাত্মক বর্ণনাগুলি বয়ঃসন্ধিকালে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে কিছু পরিমাণে অবশ্যই আবিল করেছে—এ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি কিন্তু বাংলার মূল কাব্যধারার সঙ্গে এর দ্বারা যে পরিচয় সাধিত হয়েছে, তার মূল্য অনেক বেশি, তাঁর চিত্তবিকাশের পক্ষে তা অনেকখানি লাভজনক হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গদ্য রীতিতে ছাগানো বই থেকে জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করার আনন্দ ও শিক্ষা তাঁর ক্ষেত্রে অনর্থক হয়নি, পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের ছন্দোরচনা, বিশেষ করে বাংলা ছন্দে ধ্বনিমাত্রিকতার প্রয়োগের পিছনে গীতগোবিন্দের প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তৃতীয়ত, 'রবীন্দ্রকাব্য-ভাষায় বারবার ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দাবলীর মধ্যে জয়দেবের পদাবলী থেকে নেওয়া এই কয়েকটি শব্দ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য : তিমির, নিভৃত, নিলয়, নিলীন, বিপুল, মেদুর, রভস, বিপিন, বিতান, তল, নিবিড়, গহন, মধুযামিনী ইত্যাদি।'[১৮] চতুর্থত, শিক্ষক ও অভিভাবকদের বহু চেষ্টা ও ভদ্রসমাজের বাজারে দর কমে যাওয়ার আশঙ্কাও যে-রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকের প্রতি মনোযোগী করতে সমর্থ হয়নি, তিনিই অকারণ আনন্দের দুরূহ গীতগোবিন্দ বারবার পাঠ করেছেন এমন-কি পুরো বইটি নকল করে নেওয়ার কঠোর পরিশ্রমকেও স্বীকার করে নিয়েছেন—এর মধ্যে রবীন্দ্র-চরিত্রের একটি গুঢ় বৈশিষ্ট্য নিহিত হয়ে রয়েছে। বাইরে থেকে চাপিয়ে না দিয়ে অন্তর থেকে বিকশিত করে তুলতে পারলেই শিক্ষা ব্যাপারটি উপাদেয় হয়ে ওঠে—কোনো যুক্তি-তর্ক দিয়ে নয়, নিজের বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন যা তাঁর পরবর্তীকালের শিক্ষাদর্শের ভিত্তিস্বরূপ বলে গণ্য হতে পারে।

পিতার সঙ্গে বোটে যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে শিলাইদহে পৌঁছন নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে ২৩ অগ্রহায়ণ [বুধ ৪ Dec] তারিখে 'কর্ত্তামহাশয়ের নিকট ছোটবাবুর সরোজিনী পুস্তক...ও রবীবাবুর নামের

ডাকের পত্র পাঠাইবার টিকেট ব্যয়'-এর হিসাব পাওয়া যায়। এ-যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি দিন শিলাইদহে ছিলেন না, কিন্তু 'ছোট বাবু মহাশয়ের' নামে 'রবীবাবুর নিকট এক পত্র পাঠান টিকিট ব্যয়'-এর হিসাব অন্তত আরও তিনবার দেখা যায় ২৯ অগ্রহায়ণ এবং ২ ও ৬ পৌষ তারিখে। অনুমান করা যায়, এই চারটি চিঠির সবগুলি না হোক বেশির ভাগই নতুন বধূঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর লেখা এবং রবীন্দ্রনাথও মফঃস্বল থেকে অন্তত সমসংখ্যক পত্র লিখেছেন। এইসব চিঠির কোনোটিই রক্ষিত হয়নি [বস্তুত কাদম্বরী দেবী-সংক্রান্ত কোনো চিঠিপত্রই পাওয়া যায় না], রবীন্দ্রজীবনী-রচনা ও উভয়ের পরস্পরিক সম্পর্কটি যথাযথ চিত্রিত করার পক্ষে যা খুবই ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হতে পারে।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের এইটিই প্রথম আগমন। এই অঞ্চলে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, 'কস্যচিৎ দর্শকস্য'-প্রদত্ত তার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী মাঘ-সংখ্যার ১৮৫ পৃষ্ঠায়:

'গত ৪ঠা পৌষ শনিবার পূজ্যপাদ প্রধান আচার্য্য মহাশয় জলপথে ভ্রমণ করিতে করিতে রামপুর বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হয়েন। তাঁহার আগমনে এখানকার ব্রাহ্মমণ্ডলী মহা উৎসাহিত হইয়া, গত ৫ই পৌষ রবিবার [19 Dec 1875] প্রাতঃকালে অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। উপাসনাসমাজে প্রায় তিন শতেরও অধিক ভদ্রলোকের সমাগম হয়। ...শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদী গ্রহণ করেন।... স্বাধ্যায়ের পর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুমধুর স্বরে একটী মনোহর ব্রহ্মসঙ্গীত করেন।

এর কিছু পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের তারিখটি সম্ভবত ৮ পৌষ [বুধ 22 Dec], কারণ ২২ পৌষের হিসাবে লেখা হয়েছে : 'দ° গত ৯ পৌষের জমা/মা° রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য/দঃ গতরাত্রে সিলাইদহায় শ্রীযুক্ত কর্ত্তা/মহাশয়ের নিকট হইতে রবীবাবু/ও উক্ত ভট্টাচার্য্য আইসেন উহাদের/ আসিবার খরচ শ্রীযুক্ত কর্ত্তামহাশয়/২০ টাকা দেন খরচ বাদে বাকী ফেরত পাওয়া গেল গুঃ খোদ—/৬ ´০'। রামসর্ব্বস্ব বোটেও তাঁদের সঙ্গী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ থেকে জোড়াসাঁকোয় ফিরে এলেন, তখন সমস্ত কলকাতা ভারতসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলসের কলকাতা আগমন* উপলক্ষে আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে। তিনি সেরাপিস (Serapis) নামক রাজকীয় জাহাজে ৯ পৌষ [বৃহ 23 Dec] বিকেলে ভারত-সাম্রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় এসে পৌঁছন। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য নগরীর সৌধগুলি ও রাজপথসমূহ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িও অনুরূপ সজ্জিত হয়েছিল কিনা জানি না, অন্তত হিসাব-খাতায় সে বাবদে কোনো ব্যয় দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই আনন্দোৎসবে দর্শক হিসেবে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ ক্যাশবহি-তে আছে; ২১ পৌষ [মঙ্গল 4 Jan 1876] তারিখের হিসাব থেকে জানা যায় 'মহারাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র আশায় বাবুমহাশয়রা তাঁহাকে দেখিবার জন্য পটলডাঙ্গায় ['বহুবাজার'] বাটী ভাড়া করেন' এবং মহারাণীর বড়পূত্র আশায় তাহা দেখিতে বাবুমহাশয়রা জান তাহার গাড়ি ভাড়া বাবদ দুটি গাড়ির ভাড়া বাইশ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। শুধু বাবুমহাশয়রা নন, ছোটোরাও যে তাঁদের সঙ্গী ছিলেন তার হিসাব পাওয়া যায় ২২ পৌষ তারিখে : 'প্রিন্স ওয়েলের আগমন দেখিতে ছেলেবাবুরা জাইবার সময় উইলসেনের হটেলে মেঠাই ক্রয়' করা হয় পাঁচ টাকার। ২০ পৌষ [সোম 3 Jan 1876] রাত্রি দশটার সময় যুবরাজ ট্রেনে কলকাতা ত্যাগ করেন, সুতরাং এই সব খরচ আগেই করা হয়েছে—ক্যাশবহি-তে হিসাব লেখা হয়েছে হুজুগ মিটে যাবার পর, তা বলাই বাহুল্য।

এই বৎসরই রবীন্দ্রনাথ আরও একবার শিলাইদহে যান ফাল্গুন মাসে। ৫ ফাল্গুন [বুধ 16 Feb] তারিখের হিসাবে দেখা যায় : 'বেড়াইবার খাতে/ব° অভয়চরণ ঘোষ/দ° রবীবাবুর সিলাইদহায় বেড়াইতে/জাওয়ায় ট্রেণভাড়া একবৌচর/গুঃ প্রাণনাথ বসু—৭।'[৩] অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যান। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেখান থেকে ফিরে ২২ মাঘ [শুক্র 4 Feb] দৌহিত্রী ইন্দুমতীর বিবাহ-কার্য সমাধা করে শান্তিনিকেতন হয়ে হিমালয় যাত্রা করেছেন ও মফঃস্বলে জমিদারি দেখাশোনা ও ব্যবসা করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। [উল্লেখযোগ্য, ৪ ফাল্গুন তারিখে দেবেন্দ্রনাথ বার্ষিক ছ'টাকা সুদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ৫০০০ টাকা ঋণ দেন।[†] সুদের উল্লেখ দেখে পাঠকের ভ্রূকুঞ্চিত করার কোনো প্রয়োজন নেই, মনে রাখা দরকার সেই বৃহৎ যৌথ পরিবারের সমস্ত সম্পত্তিই তখন এজমালি অবস্থায় ছিল।] রবীন্দ্রনাথ এইবারের শিলাইদহ ভ্রমণের কথা লিখেছেন ছেলেবেলা-য়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' প্রকাশের [30 Nov 1875] পর থেকেই তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রমোশন দিয়ে সমশ্রেণীতে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথকে সেখানে আহ্বান করা অস্বাভাবিক ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন, ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাসের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ছিল আকাশে বাতাসে চরে বেড়ানো মন—সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই।'[১৯] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছু ভুল বোঝেননি, একটু আগে 'গীতগোবিন্দ'-প্রসঙ্গে আমরা ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছি।

এইবার রবীন্দ্রনাথের চোখে সেই সময়কার শিলাইদহের রূপটি একবার দেখে নেওয়া যাক্ :

পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল।... সেদিনকার আর যা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর।[২০]

রবীন্দ্রনাথ যদিও শিলাইদহে প্রথম এসেছিলেন পিতার সঙ্গে, কিন্তু সেবার এখানে অবস্থানকাল দীর্ঘ ছিল না, ফলে স্থানটির সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তোলার সুযোগ ঘটেনি। সেই সুযোগ ঘটল এইবারের ভ্রমণে। তিনি লিখেছেন:

একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এইসঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পদ্যে। সেগুলো যেন ঝরে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফসলের আমের বোল—ঝরেও গেছে।[২১]

এই খাতা মালতীপুঁথি কিনা, তা বলা সম্ভব নয়। অবশ্য এই সময়ে লিখিত সব কবিতাই যে উক্ত পুঁথিতে লেখা হয়েছে, তা নয়। মনে রাখা দরকার, সমসাময়িক কালে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রলাপ প্রভৃতি কবিতা এতে পাওয়া যায় না। সুতরাং স্বীকার করে নিতে হয় মালতীপুঁথি নামে পরিচিত খাতাই তাঁর কবিতারচনার একমাত্র বাহন ছিল না, পাশাপাশি আরও খাতা ছিল যাতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন। লেট্স ডায়ারির সব পাতা কবে ভরে গিয়েছিল তা-ও আমরা জানি না। হতে পারে মালতীপুঁথি-তে যখন থেকে কবিতা রচনা শুরু হয়েছে, তখনও লেট্স ডায়ারিতে কবিতা লেখা চলেছে। 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' ছাড়াও 'বনফুল' 'অভিলাষ' 'হিন্দুমেলায় উপহার' 'প্রকৃতির খেদ' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা হয়তো লেট্স ডায়ারিতেই প্রথম লেখা হয়েছিল। অন্য খাতা থাকার সম্ভাবনাও অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শিলাইদহে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ যে কেবল কবিতা লিখে খাতা ভরিয়েছেন, তা নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। ভাইকেও তিনি শুধু ঘরের কোণে বসিয়ে রাখেননি, তাঁকে সাহসী করে তোলার জন্যে একটা টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে। সেই এবড়ো-খেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না, তাঁর মনে এই জোর ছিল বলেই আমি পড়ি নি।'[২২] এর পরে কলকাতাতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে বড়ো ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে সুখের হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দুক ছুঁড়ে শিকার করতে ভালোবাসতেন। শিলাইদহে এ ব্যাপারে তাঁর সহকারী ছিল বিশ্বনাথ নামে এক অসম-সাহসী শিকারী, যার কাছে রবীন্দ্রনাথ শিকারের গল্প শুনতেন আগ্রহের সঙ্গে। শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিকার করতে যেতেন, রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় সেই বাঘশিকারের দুটি বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার মধ্যে যেটি লক্ষণীয় সেটি হল, নিঃসংকোচে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। এতে যে কোনো বিপদ ঘটতে পারে এমন চিন্তা তাঁর মনকে এতটুকু পীড়িত করেনি।

শিলাইদহে মালী এসে ফুল দিয়ে ফুলদানি সাজিয়ে দিত। রবীন্দ্রনাথের শখ হল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে। ফুল টিপে টিপে যেটুকু রস পাওয়া যায় তা কলমের নিবে উঠতে চায় না। তাই তিনি পরিকল্পনা করলেন ছিদ্রযুক্ত কাঠের বাটির উপর হামানদিস্তের নোড়া দড়িতে-বাঁধা চাকার সাহায্যে ঘুরিয়ে বৃহদাকারে ফুলের রস উৎপাদনকারী একটি যন্ত্র তৈরি করতে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে দরবার জানাতে তিনি একটুও না হেসে ছুতোরকে হুকুম করলেন। যন্ত্র তৈরি হল, কিন্তু ফুলে-ভরা কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাঁধা নোড়া যতই ঘুরতে থাকে ফুল পিষে কাদা হয়ে যায়, রস বেরয় না। 'জ্যোতিদাদা দেখলেন, ফুলের রস আর কলের চাপে ছন্দ মিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না।'[২৩]

উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে অনেকটা হঠকারিতা ও কিছুটা হাস্যকরতা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে এগুলির প্রয়োজন ছিল। স্কুলের ছাত্র হিসেবে তাঁর ব্যর্থতা কেবল অভিভাবকদেরই হতাশ করেনি, নিজের সম্পর্কে বড়ো কিছু আশা করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে যে-সব কাজে প্রবৃত্ত করেছেন, তা তাঁর হারানো আত্মবিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছে। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন জীবনস্মৃতি-তে :

> তিনি আমাকে খুব একটা বড়রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর-কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না—সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে-সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত।...শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্রদেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহাকিছু দেওয়া হইয়াছে। তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিস্ফল বেদনা ছাড়া আর-কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দের মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মাপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতে আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।[২৪]

এইবার রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বোধহয় এক মাসেরও বেশি সময় অবস্থান করেছিলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন সম্ভবত ৮ চৈত্র [সোম 20 Mar] তারিখে। ক্যাশবহি-র ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ [শনি 3 Jun 1876] তারিখের হিসাবে দেখা যায় : 'রবীবাবু সেলাইদহা হইতে আসায় ইষ্টীসেনে পোটমোণ্ট থাকায় গুদাম ভাড়া।

।ল০ ...বিঃ ৮ চৈত্রের এক বৌচর'। ফিরে আসার পরের দিনই তিনি একটি আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করেন, তা জানা যায় ঐ মাসেরই ১৯ তারিখের হিসাবে: 'সোম রবীবাবুর ৯ চৈত্র গড়ের মাটে নাছ দেখিতে জাতের গাড়ি ভাড়া...২্'। এতে আমাদের পূর্বসিদ্ধান্তই সমর্থিত হয় যে, যদিও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের 1876-এর ক্যালেণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের নাম দেখা যায় ও Mar 1876 পর্যন্ত তাঁর বেতনও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি এই বৎসরের শুরু থেকেই স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেন। তাঁর নিজের মতো করে পড়াশুনো অবশ্য অব্যাহত ছিল। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ [মঙ্গল 15 May 1876] তারিখের হিসাবে দেখা যায়: 'রবীৰাবুর কএকখান পূস্তক গত ১৯ ফাল্গুন বুক পোষ্টে সেলাইদহায় পাঠান মাশুল' খাতে এক টাকা বারো আনা ব্যয় করা হয়েছে। মাশুলের পরিমাণ থেকেই অনুমান করা চলে, অনেকগুলি পুস্তকই তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছিল। বোঝা যায়, নিজের শক্তিতে নিজের ফুল বিকশিত করবার সাধনায় রবীন্দ্রনাথ কখনোই ক্ষান্ত হননি। ফিরে আসার পরও ২৪ চৈত্রের হিসাবে দেখি.'রবীবাবুর দুইখান পুস্তক ক্রয়/বিং এক বৌচর/গুঃ খোদ—৮ ০'। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, বইগুলির নাম এখানে উল্লিখিত হয়নি, ফলে আমরা জানতে পারি না রবীন্দ্রনাথের পাঠরুচি কোন্ পথে অগ্রসর হয়ে তাঁকে স্বশিক্ষিত করে তুলছিল।

শিলাইদহ থেকে ফিরে এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি পত্র লেখেন, তার মাশুল ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে ১৫, ১৭, ২৩ ও ২৪ চৈত্র তারিখে। ১৮ ও ২২ চৈত্র নূতনবধূঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীও স্বামীকে দুটি পত্র প্রেরণ করেন। দুঃখের সঙ্গে আবার উল্লেখ করতে হয়, রবীন্দ্রজীবনী-রচনার অমূল্য উপাদান এই পত্রগুলির একটিও সংরক্ষিত হয়নি।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষার পাঠগ্রহণের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই বৎসর তিনি আরও একজন বিখ্যাত সংগীতশিল্পীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলেন—তিনি হলেন যদুভট্ট [যদুনাথ ভট্টাচার্য, 1840-83]। [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩] ইনি ঠিক কবে ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে আসেন বলা যায় না, তবে হিসাবখাতায় এঁর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ [বুধ 9 Jun 1875] তারিখে : 'যদুনাথ ভট্টোর জন্য চা ক্রয় ও চায়ের দুগ্ধ ও মিছরি'। আবার ৯ শ্রাবণ [শনি 24 Jul] তারিখের হিসাবে দেখা যায় : 'যদুনাথ ভট্টো গায়ক/দ° উহার বেতন গত আষাঢ় মাসের/এক বৌচর ৫০, মধ্যে/নিজবাটীর অংশে/শোধ ২৫্'। এর থেকে বোঝা যায়, যদুভট্ট দেবেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের পরিবারে মাসিক বেতনের বিনিময়ে সংগীত-শিক্ষা দিতেন। খাওয়া-দাওয়াও করতেন, তার হিসাবও পাওয়া যায়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের হিসাবেও তাঁর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এর পরে তাঁর কোনো উল্লেখ নেই। তাই মনে হয় যদু ভট্ট খুব দীর্ঘদিন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তার পরে যখন আমার কিছু বয়েস হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড় ওস্তাদ এসে বসলেন যদু ভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই; সেইজন্যে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে—ভালো লাগল কাফি সুরে 'রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া', রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে।'* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কাফি ঠাটে সুরফাঁকতালে রচিত 'শূন্য হাতে ফিরি হে' ব্রহ্মসংগীতটি [*তত্ত্ববোধিনী*, ফাল্গুন ১৮২৪ শক] এই গানটির সুরে কথা বসিয়ে তৈরি। কিন্তু এ-বিষয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হল, এই গানটি ভেঙেই দ্বিজেন্দ্রনাথ 'দীন হীন ভকতে, নাথ, কর দয়া' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তালের সামান্য পরিবর্তন করে ঝাঁপতালে 'তুমি হে ভরসা মম, অকূল পাথারে'

ব্রহ্মসংগীত দুটি রচনা করেন এবং দুটিই প্রকাশিত হয় *তত্ত্ববোধিনী*, আশ্বিন ১৭৯৪ শক [১২৭৯ : Sep 1872] সংখ্যায় ৯৩ পৃষ্ঠাতে অর্থাৎ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যদু ভট্ট আসবার অনেক আগেই। গানটি যদি যদু ভট্টের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকে, তবে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক আরো আগেই গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করতে হয়।

শ্রীকণ্ঠ সিংহ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যদু ভট্টের নাম না করে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন জীবনস্মৃতি-তে :

আমাদের বাড়িতে একসময়ে একজন বিখ্যাত গায়ক কিছুদিন ছিলেন। তিনি মত্ত অবস্থায় শ্রীকণ্ঠবাবুকে যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। শ্রীকণ্ঠবাবু প্রসন্নমুখে সমস্তই মানিয়া লইতেন, লেশমাত্র প্রতিবাদ করিতেন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য সেই গায়কটিকে আমাদের বাড়ি হইতে বিদায় করাই স্থির হইল। ইহাতে শ্রীকণ্ঠবাবু ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। বারবার করিয়া বলিলেন, "ও তো কিছুই করে নাই, মদে করিয়াছে।"[২৫]

'তথ্যপঞ্জী' [১৩৬৮ সং]-তে 'বিখ্যাত গায়ক'-প্রসঙ্গে সংশয়-চিহ্ন যোগে যদু ভট্টের নাম করা হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে পারি, ক্যাশবহি-তে ভাদ্র মাসের হিসাবে শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও যদু ভট্ট দুজনেই জোড়াসাঁকোয় অবস্থান করতেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, ভাদ্র মাসের পরে যদু ভট্ট সম্পর্কে কোনো উল্লেখ ক্যাশবহি-তে দেখা যায় না। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, উক্ত 'বিখ্যাত গায়ক' নিঃসংশয়িতভাবেই যদু ভট্ট, অন্য কেউ নন।

বর্তমান বৎসর রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা ও কাব্যপ্রকাশের দিক থেকে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ১২৮১ থেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল, বর্তমান বৎসরে তা যথেষ্ট ব্যাপকতা অর্জন করেছে। এর প্রথমটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত *প্রতিবিম্ব* পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় [বৈশাখ ১২৮২, পৃ ১৩-১৭] 'প্রকৃতির খেদ' নামে। যথারীতি কবিতাটি অ-স্বাক্ষরিত, এবং কবিতাটির শেষে 'ক্রমশঃ' কথাটি লেখা আছে, কিন্তু পরবর্তী অংশটি কখনো প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এই কবিতাটি অন্য রূপে ও সংক্ষিপ্ত আকারে 'বালকের রচিত' আখ্যায় ভূষিত হয়ে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* আষাঢ় ১৭৯৭ শক [১২৮২ : Jun 1875] সংখ্যায় ৫২-৫৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। *তত্ত্ববোধিনী*-তে প্রকাশিত রচনাটি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষট্টি বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা।'[২৬] প্রবোধচন্দ্র সেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত *সাধারণী* পত্রিকার ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ [রবি 16 May 1875, ৪ ভাগ, ৫ সংখ্যা, পৃ ৫৬] সংখ্যায় উদ্ধৃত নিম্নলিখিত সংবাদটি তুলে দিয়ে কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা তার নিঃসংশয়িত প্রমাণ উপস্থিত করেন[২৭]:

বিদ্বজ্জন সমাগম। সাপ্তাহিক হইতে।

গত রবিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটিতে "বিদ্বজ্জন সমাগম" সভা হইয়াছিল। প্রায় একশত গ্রন্থকার ও বিদ্বান ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সাহিত্য ও সঙ্গীতের আমোদ এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। সভাগৃহ কৃত্রিম তরুরাজি, পুষ্পমালা, আলোকাবলি ও সুন্দর আসনে সুশোভিত হইয়াছিল।

প্রথমে বাবু রাজনারায়ণ বসু বাঙলা ভাষার উৎপত্তি এবং বঙ্গকবি ও গ্রন্থকারদিগের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, পরে প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পঠিত হয়। তাহার পর রাজনারায়ণবাবু কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে একটুকু পাঠ করেন। অনন্তর হুতোম প্যাঁচা ও নবীন তপস্বিনী হইতেও কিছু কিছু পাঠ করা হয়। তদনন্তর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রকৃতির খেদ" নামে স্বরচিত একটি পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি

মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর [? ১৪ বৎসর]।

পরে বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা নামে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা [? নবমবর্ষীয়া] ও তদপেক্ষা+অল্পবয়স্ক আর একটি বালক [হিতেন্দ্রনাথ?] উভয়ে মিলিয়া সেতার বাজাইলেন। তাহার পর প্রতিভা পিয়ানোতে দুইটি গত বাজাইলেন, পরে ঐ দুটি শিশু ৩। ৪টি হিন্দী গান গাইলেন। সে গান হার্মোনিয়ম, বেহালা ও তবলার সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছিল। তাহার পর প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবুর একটি গানে ঐ বালকটি তবলা সঙ্গত করিল। পরে আর ৪/৫টি গানের সঙ্গে প্রতিভা তবলা সঙ্গত করিলেন।

২ জ্যৈষ্ঠ [শনি 15 May] শিলাইদহ থেকে গুণেন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন : 'গুণু দাদা/বিদ্বজ্জনের card ও রবির কবিতা পাইয়াছি কর্ত্তামহাশয় কবিতাটা পাঠ করিয়া ভাল বলিলেন।.../সাপ্তাহিক সমাচারে "বিদ্বজ্জনসমাগমের" একটা graphic description দিয়াছে। তাহা কি দেখ নাই?'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে 'রবির কবিতা' বলতে 'প্রকৃতির খেদ'কেই বুঝিয়েছেন, যেটি 'বিদ্বজ্জন-সমাগম'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। চিঠিটি সজনীকান্ত দাস 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' [পৃ ১৯৬-৯৭] গ্রন্থে উদ্ধৃত করতে গিয়ে 'পাইয়াছি' শব্দের স্থানে 'পাঠাচ্ছি' লিখে একটি সংশয় সৃষ্টি করেছিলেন গুণেন্দ্রনাথের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় তিনিই অনুপস্থিত থাকার মতো অসৌজন্য তাঁর কাছে আশা করা যায় না বলে। কিন্তু মূল চিঠিটি আমরা দেখেছি, সেখানে এরূপ সংশয়ের সুযোগ নেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ উভয়েই এই সময়ে শিলাইদহে ছিলেন বলে 'card ও রবির কবিতা গুণেন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন; তারই প্রাপ্তিস্বীকার ও মন্তব্য পত্রটিতে রয়েছে।

প্রবোধচন্দ্র সেন বিভিন্ন যুক্তি তর্ক উত্থাপন করে সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর আলোচ্য অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০ বৈশাখ ১২৮২ রবি 2 May 1875 তারিখে।[২৮] সনৎকুমার গুপ্ত ১ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা *এডুকেশন গেজেট* থেকে সঠিক তারিখটি উদ্ধার করেছেন:

গত ২৭শে বৈশাখ ১২৮২ রবিবার [9 May] সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের ভবনে বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়া গিয়াছে। সমাগমে কার্য্য সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আরম্ভ হয়। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ঐ কার্য্যে অতিবাহিত হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় বঙ্গভাষায় পুরাবৃত্ত ও মৃত বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থের দোষগুণ এবং বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান অভাব মোচন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে মেদিনীপুর হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয় বিদ্যাপতি প্রভৃতি কতকগুলি কবি ও গদ্য গ্রন্থকারের গ্রন্থের কোন কোন অংশ পাঠ করেন। তৎপরে ঠাকুরবংশীয় একটি চতুর্দশ বর্ষীয় বালক 'প্রকৃতির খেদ এই শীর্ষকযুক্ত একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতাটি সমাগত সভ্যবৃন্দের অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তৎপরে ঐ বংশীয় অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা ও একটি ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক বিশিষ্ট নিপুণতার সহিত সেতার পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্রবাদন ও তবলার বিশুদ্ধ শ্রুতি-মনোহর সঙ্গীত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নৈপুণ্যে সমাগত ব্যক্তিগণ মোহিত হইয়াছিলেন। একজন শ্রোতা বলিয়াছিলেন, ইহা ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তদনন্তর রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটি মনোজ্ঞ অথচ সংক্ষেপ বক্তৃতা করিয়া সমাগমের কার্য্যের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ ও তাহার অধ্যক্ষদিগকে প্রশংসা করিলেন। পরিশেষে সকলকে নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়া হইল। একটি হিন্দু মহিলা কর্ত্তৃক চিত্রিত দুইখানি চিত্রপট প্রদর্শিত হইয়াছিল। চিত্রকারিণীর চিত্র-নৈপুণ্য দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। নানাবিধ চিত্রের পুস্তক সমাগত ব্যক্তিদিগের দর্শন জন্য টেবিলের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। গত বৎসরের সমাগম অপেক্ষা এ বৎসরের সমাগমের কার্য্য অধিকতর পরিপাট্যরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। ঠাকুরবাবুদিগের সৌজন্যে সকলেই যে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য।[২৯]

বিদ্বজ্জন সমাগম-এ রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি যে আকারে পাঠ করেছিলেন, *প্রতিবিম্ব*-তে প্রকাশিত পাঠ তা থেকে ভিন্নতর। এ-বিষয়ে উক্ত পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠায় একটি সম্পাদকীয় টীকা মুদ্রিত হয়,: 'আমাদিগের সম্ভান্ত [সম্ভ্রান্ত] লেখক প্রথমে এই পদ্যটির কাপি যেরূপ প্রেরণ করেন, প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া দেন। গত রবিবার "বিদ্বজ্জন-সমাগম" সভায় কতিপয় মান্য বন্ধুর অনুরোধে রচয়িতাকে সাধারণের সম্মুখে এই কবিতাটি পাঠ করিতে হয়। লেখকের সংশোধিত পদ্যটি তৎকালে আমাদের নিকট থাকায় অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়া অর্দ্ধাংশ মাত্র মুদ্রিত করিয়া "বিদ্বজ্জনসমাগম" সভায় প্রদান

করা হয়। এজন্য রচয়িতার এই সংশোধিত রচনার সহিত সভার মুদ্রিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে [।]'[৩০]

এই পাদটীকাটি অত্যন্ত মূল্যবান। এটি না থাকলে কবিতাটি সম্পর্কে অনেক তথ্যই আমাদের অজানা থেকে যেত। প্রথমত, এই পাদটীকাটি থেকেই আমরা জানতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি প্রথমে যেভাবে লিখেছিলেন, *প্রতিবিম্ব* পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগে প্রুফ-সংশোধনের সময় তার অনেক পরিবর্তন করেন। 'স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ' থাকার জন্য বোঝা যায় পরিবর্তন বেশ ব্যাপকভাবেই করা হয়েছিল। পত্রিকাটির 'সূচনা' থেকে জানা যায়, *প্রতিবিম্ব* ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১২৮২-র শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছিল। তার পূর্বে ২৭ বৈশাখ তারিখে বিদ্বজ্জন সমাগম-এ পঠিত হবার আগেই কবিতাটির ফর্মা সাজানো, প্রুফ তৈরি, রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক প্রুফে ব্যাপক সংশোধন ইত্যাদি হবার পর সংশোধিত কপিটি পুনরায় প্রেসে চলে গিয়েছিল। এর থেকে অনুমান করা চলে, কবিতাটির রচনাকাল সম্ভবত ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের শেষ ভাগ। মনে রাখা দরকার, ২৭ ফাল্গুন তারিখে মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু ও ৭ চৈত্র তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ হয়। এই সময়টি কবিতা রচনার পক্ষে অনুকূল না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং বাড়িতে শোকের পরিবেশটি একটু লঘু হয়ে যাবার পর কবিতাটি লিখিত হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসংগত।

দ্বিতীয়ত, উক্ত পাদটীকা থেকে অনুমান করা চলে, কবিতাটি রচনার পিছনে নিজস্ব প্রেরণা কিংবা *প্রতিবিম্ব* পত্রিকার প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে সম্পাদক [গৃহশিক্ষকও বটে] রামসর্বস্বের তাগিদই কার্যকরী ছিল। 'হোক ভারতের জয়' বা 'হিন্দুমেলায় উপহার' যেমন বিশেষভাবে হিন্দুমেলার জন্যই রচিত হয়েছিল, এই কবিতাটি সেরূপ অন্তত 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এ পাঠ করার উদ্দেশ্যে যে রচিত হয়নি, উদ্ধৃতিটি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কতিপয় মান্য বন্ধুর অনুরোধে'ই কবিতাটি উক্ত সভায় পঠিত হয় এবং পরিকল্পনাটি প্রায় শেষ মুহূর্তে গৃহীত হওয়ায় তাড়াহুড়ো করে অসংশোধিত কপিটি থেকেই মাত্র অর্ধাংশ মুদ্রিত করে সভায় বিতরণ করা হয়েছিল, সম্পূর্ণটি ছাপানোর হয়তো সময়ই ছিল না। নইলে গৃহশিক্ষক রামসর্বস্ব জোড়াসাঁকো বাড়িতে এমন কিছু দুর্লভ মানুষ ছিলেন না, সময়াভাব যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াত তাহলে তাঁর কাছ থেকে সংশোধিত কপিটি এনে পুরোটাই মুদ্রিত করা যেত। সুতরাং প্রবোধচন্দ্র সেন যে লিখেছেন: 'একদিকে বিদ্বজ্জনসমাগমের আসন্ন অধিবেশন আর অন্য দিকে প্রতিবিম্বের আসন্ন প্রকাশ, এই উভয় তাগিদেই 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি রচিত হয়',[৩১] এর প্রথম অংশটি আমরা সচ্ছন্দে বাদ দিতে পারি।

তৃতীয়ত, 'হোক্ ভারতের জয়' যেমন হিন্দুমেলায় স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করা হয়েছিল ['delivered from memory'], এটি সেরূপ আবৃত্তি করা হয়নি, মুদ্রিত রচনা দেখে পাঠ করা হয়েছিল। গুণেন্দ্রনাথ এই মুদ্রিত রচনার কপি বিদ্বজ্জনসমাগমের কার্ডের সঙ্গে শিলাইদহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেছিলেন।

চতুর্থত, পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে, মূল রচনাটির অর্ধাংশ মাত্র মুদ্রিত করে বিদ্বজ্জনসমাগম সভায় প্রদান করা হয়। প্রবোধচন্দ্র সেন *প্রতিবিম্ব*-তে প্রকাশিত পাঠ অবলম্বনে এই অর্ধাংশ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। উক্ত পাঠে কবিতাটি মোট সাতাশটি অসমান স্তবকে বিভক্ত, শেষ দিকের স্তবকগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। প্রথম ষোলোটি স্তবকে পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ১০০, শেষ নয়টি স্তবকেও [১৯-২৭] তাই এবং মধ্যবর্তী ধুয়া-স্থানীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ স্তবক দুটিতে [যেটি সপ্তবিংশ স্তবকের শেষাংশে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পুনরুক্ত হয়েছে। শ্রীযুক্ত সেন অবশ্য শুধু সপ্তদশ স্তবকটির কথাই লিখেছেন; স্পষ্টতই সেটি ভুল।] আছে ১১টি পঙ্‌ক্তি। দুটি

ভাবপর্যায়ে বিভক্ত এই কবিতাটিতে প্রথম পর্যায়টি শেষ হয়েছে ষোড়শ স্তবকের শেষে। শ্রীযুক্ত সেনের অনুমান, ধুয়া-স্থানীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ স্তবক দুটি এই ষোলোটি স্তবকের সঙ্গে যুক্ত করে প্রায় অর্ধাংশ' এই অংশটিই মুদ্রিত হয়ে 'বিদ্বজ্জনসমাগম'এ বিতরিত হয়েছিল।[৩২] আদিত্য ওহদেদার একটি প্রবন্ধে[৩৩] তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত পাঠ অবলম্বনে এই অর্ধাংশ নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু তাতে শ্রীযুক্ত সেনের মূল প্রতিপাদ্যটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে।

কিন্তু এর পরেই শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন : এমনও হতে পারে যে, একশো বিদ্বজ্জনের সভায় একশো লাইনের কবিতা পড়াই বালক কবির অভিপ্রায় এবং সে অভিপ্রায়ে ওই অংশটুকুই বিদ্বজ্জনসভার জন্য রচিত হয়েছিল এবং ভাবের সম্পূর্ণতার খাতিরে এগারো লাইনের ধুয়াটিও যুক্ত হয়। কিন্তু কল্পনার বেগ কবিকে আরও রচনায় প্রবৃত্ত করে এবং কবির মনে তার পরেও কবিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প জাগায়। তারই ফলে প্রতিবিম্বে প্রকাশিত দুই পর্যায়ের পরেও 'ক্রমশঃ কথাটি লিখিত হয়'[৩৪]—আমরা এই অনুমান সমর্থন করি না। আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত প্রেরণায় কিংবা *প্রতিবিম্ব*-এর জন্যই কবিতাটি রচনা করেন এবং কতিপয় মান্য বন্ধুর অনুরোধেই এটি সভাস্থলে পাঠ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং 'কল্পনার বেগ কবিকে আরও রচনায় প্রবৃত্ত করে' ইত্যাদি অনুমান এ-প্রসঙ্গে অবান্তর।

প্রতিবিম্ব-তে প্রকাশিত কবিতাটির শেষে 'ক্রমশঃ' লিখিত থাকায় এবং উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার [জ্যৈষ্ঠ ১২৮২] পিছনের মলাটে 'গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন :—আমাদের প্রতিবিম্বের কলেবর অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া এবারে "প্রকৃতির খেদ"...পূর্বখণ্ড-প্রকাশিত এই কয়টী বিষয়ের পরিশিষ্টভাগ প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না।...'—সম্পাদকের এই বিবৃতি আমাদের একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করে যে, রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির পরবর্তী অংশ রচনা করেছিলেন কিনা এবং সেটি উক্ত পত্রিকার পরবর্তী কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা। *প্রতিবিম্ব* পত্রিকার আর কোনো সংখ্যা না পাওয়ায় এ-প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে উক্ত 'নিবেদন'-এ সম্পাদক স্থানাভাবকেই কবিতাটির পরবর্তী অংশ প্রকাশিত না হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সেটি লিখিত না-হওয়া বা কপি না-পাওয়াকে দায়ী করেননি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির ক্রমানুসরণ করেছিলেন, এ-সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু কোনো প্রমাণ না থাকায় এ-সম্পর্কে জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

বর্তমান প্রসঙ্গের শেষে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন : 'অতঃপর কবিতাটি[র] পূর্বসংকল্পিত শেষাংশ রচনার অভিপ্রায় কবি ত্যাগ করেন এবং প্রতিবিম্বে প্রকাশিত পর্যায় দুটিকে আরও পরিমার্জিত করার প্রয়োজন বোধ করেন। এই পরিমার্জিত রূপটি পরে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়'।[৩৪] আদিত্য ওহদেদার তাঁর প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সেনের এই মতটি বিশেষভাবে পুনর্বিচার করেছেন। তাঁর মতে : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠই হল প্রকৃতির খেদ কবিতাটির প্রথম পাঠ, এবং এই পাঠেরই অর্ধাংশ বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার জন্য মুদ্রিত ও তথায় পঠিত হয়। প্রতিবিম্বে যে পাঠ মুদ্রিত হয়েছে, তা হল তত্ত্ববোধিনীর পাঠের সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ। সুতরাং প্রতিবিম্বে যে পাঠ পাই তা হল প্রকৃতির খেদ কবিতার দ্বিতীয় পাঠ।[৩৫]

শ্রীওহদেদারের বক্তব্যে যুক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার স্বদেশমূলক কবিতা প্রধানত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার ভাব-ভাষা-ছন্দকে অনুসরণ করেছে। শ্রীযুক্ত সেনও স্বীকার করেছেন :

“হিন্দুমেলার[য়] উপহার’ কবিতায় (১৮৭৫ ফেব্রুআরি) যেমন হেমচন্দ্রের ‘ভারতসংগীত’ কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট, প্রকৃতির খেদ’ কবিতাতেও তেমম হেমচন্দ্রের ‘ভারতবিলাপ’ কবিতার ছায়া দেখা যায়।”[৩৬] অনুরূপভাবে ছন্দেও হেমচন্দ্রের অনুসরণ দেখা যায় তত্ত্ববোধিনীর পাঠে—‘অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায়রে’ হেমচন্দ্রের হতাশের আক্ষেপ কবিতার আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে’ চরণটির অনুরূপ। কিন্তু ৮+৭ মাত্রার এই চরণ বন্ধ অল্প পরেই পরিত্যক্ত হয়ে ৮+৬ মাত্রায় পরিণত হয়েছে—যেটিকে একটি ছন্দোদোষ হিসেবে গণ্য করা যায়। *প্রতিবিম্ব*-র পাঠে এ-ধরনের ত্রুটি নেই। তাছাড়া *তত্ত্ববোধিনী*-পাঠের ‘দুলায়্যে’ ‘চড়ায়্যে’ ইত্যাদি বানানের সম্পূর্ণ না হলেও বেশির ভাগ পরিবর্তিত হয়েছে *প্রতিবিম্ব*-পাঠে, ‘অই’ পরিবর্তিত হয়েছে ‘ওই’-তে। অনেকগুলি শব্দ বা বাক্যবন্ধ পরিবর্তনেও প্রতিবিম্ব-পাঠে উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। *প্রতিবিম্ব*-পাঠের কয়েকটি চরণ *তত্ত্ববোধিনী*-পাঠে অনুপস্থিত, কিন্তু একে বর্জন না বলে *প্রতিবিম্ব*-পাঠে সংযোজন বলেও বর্ণনা করা যায়। এছাড়া *প্রতিবিম্ব*-পাঠের যেটি সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে এতে বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের পঙক্তিবিন্যাস, ছন্দোবন্ধ এবং ভাষার অনুসরণের প্রয়াস খুবই স্পষ্ট। কিছুদিন আগে আর্য্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত [ভাদ্র-পৌষ ১২৮১] এই কাব্য তার ‘ভাষায় ভাবে এবং সংগীতে’ রবীন্দ্রনাথকে নিরতিশয় মুগ্ধ করেছিল। এই মুগ্ধতার প্রকাশ আছে *প্রতিবিম্ব*-পাঠে। সুতরাং আদিত্য ওহদেদার যে *তত্ত্ববোধিনী*-পাঠকে প্রথম পাঠ এবং প্রতিবিম্বপাঠকে দ্বিতীয়-পাঠ বলে অভিহিত করেছেন, তার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। তিনি আরও বলেন, *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের অর্ধাংশই মুদ্রিত হয়ে ‘বিদ্বজ্জনসমাগমে’ বিতরিত হয়েছিল, তৃতীয় কোনো পাঠের অস্তিত্ব ছিল না।

কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রবোধচন্দ্র সেন ও আদিত্য ওহদেদার উভয়েরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত সেন ‘ভোরের পাখি’ প্রবন্ধের শেষাংশে পাঠান্তর-সহ প্রতিবি-পাঠটি অবিকল উদ্ধৃত করেছেন। এতে দেখা যায় ১-১৮ স্তবকের মধ্যে ‘দুলায়্যে’ ‘চড়ায়্যে’ ইত্যাদি বানানগুলি ‘দুলায়ে’ ‘চড়ায়ে’ রূপে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ১৯-২৭ স্তবকে একটি ছাড়া এই রূপগুলি অপরিবর্তিতই থেকে গেছে—এমনকি ১৭-১৮ স্তবকের ধুয়াটি ২৭ স্তবকের শেষে যখন পুনরাবৃত্ত হয়েছে তখন প্রথমটিকে সংশোধিত ও দ্বিতীয়টিকে অপরিবর্তিত রূপে পাওয়া যায়, ১৮ স্তবকের ‘খুলে দাও’ শব্দ দুটি ২৭ স্তবকে খুল্যে দেও’ বানানে মুদ্রিত। ১৭ স্তবকের ‘স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল হোক্ একাকার’ চরণটি *তত্ত্ববোধিনী*-পাঠের অতিরিক্ত, কিন্তু ২৭ স্তবকে এই চরণটিকে দেখা যায় না। তাছাড়া প্রথম ১৮টি স্তবকে [১১১ চরণ] পরিবর্তনের সংখ্যা যেখানে ৩৮টি, শেষ ৯টি স্তবকে [১০০ চরণ] এই সংখ্যা সেখানে ১০টি মাত্র, বলা যেতে পারে চরণ বিন্যাসের পার্থক্য ছাড়া কবিতাটির শেষাংশের পাঠ মোটামুটি এক। এর থেকে বোঝা যায়, কবিতাটির যে অংশ মুদ্রিত হয়ে বিদ্বজ্জনসমাগম’-এ প্রদত্ত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়েছে, প্রধানত সেই অংশটুকুতেই ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। একই কবিতার দু’অংশে দু’রকম বানানরীতি ব্যবহারের এই অসংগতি সম্পাদক রামসর্বস্ব ও লেখক রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেনি, এটি খুব আশ্চর্যজনক। শেষ অংশটিতে সংশোধনের কোনো চিহ্ন না থাকলে মনে করা যেত রবীন্দ্রনাথ এই অংশের প্রুফ দেখেননি, কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি এখানেও ১০টি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই রহস্য সমাধানের জন্য পণ্ডিত-মণ্ডলীকে আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রতিবিম্ব পত্রিকার সংখ্যাগুলি আমরা দেখিনি। কিন্তু ভাদ্র-সংখ্যা *তত্ত্ববোধিনী*-র ‘নূতন পুস্তক সমালোচনা’-য় [পৃ ৯৬] এর প্রথম সংখ্যাটির যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তা থেকে পত্রিকাটির আখ্যাপত্র ও

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কিছু সংবাদ জানা যায় : ‘প্রতিবিম্ব। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাবৃত্ত, বার্তা শাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দ শাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম সূচনা, ২য় মনু ও তাঁহার রাজনীতি, ৩য় উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়, ৪র্থ বিজ্ঞান, ৫ম আলঙ্কারিক শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেদ, ৭ম পৌরাণিক ভূবৃত্তান্ত, ৮ম আয়ুর্ব্বেদ। স্বীয় লেখকগণের নাম ঘোষণা বিষয়ে প্রতিবিম্বের কোন আড়ম্বর নাই কিন্তু আমরা শুনিতে পাই এই মাসিক পত্র প্রণয়ন কার্য্যে উত্তম উত্তম লেখক ব্রতী আছেন। “আলঙ্কারিক শিল্পের” ন্যায় গদ্য প্রস্তাব ও “প্রকৃতির খেদের” ন্যায় কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা সাধারণের সমাদর ভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না।...আমরা শুনিলাম পরলোকগত শ্যামাচরণ শ্রীমণি মহাশয় আলঙ্কারিক শিল্প ও পৌরাণিক ভূবৃত্তান্ত এই প্রস্তাবদ্বয় লিখিয়াছেন।...’

এর পরে রবীন্দ্রনাথের যে-রচনাটির সন্ধান আমরা পাই, তার কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও উল্লেখ করেননি এবং আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যেত যদি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি-রোমন্থন না করতেন। তিনি বলেছেন :

রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে রামসর্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। আমি ও রামসর্ব্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই, “সরোজিনী”র প্র সংশোধন করিতাম। রামসর্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া, কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রফু দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্যরচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন—এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই “জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ” এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।[৩৭]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক ‘সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক’ প্রকাশিত হয় [বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী] 30 Nov 1875 [মঙ্গল ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২]। গানটি আছে নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের একেবারে শেষ অংশে[১ম সং, পৃ ২৩৩-৩৮]। সুতরাং শেষ ফর্মার প্রুফ দেখার সময়েই ঘটনাটি ঘটেছিল। কাজেই নাটকের প্রকাশের তারিখটি যদি ঠিক হয় [ঠিক বলেই মনে হয়; রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ যখন বোটে করে শিলাইদহে যান, তখন ২৩ অগ্র ‘কর্ত্তামহাশয়ের নিকট ছোটবাবুর সরাজিনী পুস্তক’ পাঠাবার হিসাব পাওয়া যায়], তাহলে আমরা গানটির রচনাকাল কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ [Nov 1875-এর মাঝামাঝি] বলে নির্ধারণ করতে পারি। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যে যথার্থ ছিল, তার সমর্থন পাওয়া যায় *সাধারণী*-র ‘নাটক সমালোচন’-এ : ..আমাদের বিবেচনায় নাটকে স্থল বিশেষে ছন্দোময়ী রচনাভাবে রসহানি ঘটিয়াছে।’ [৯ ফাল্গুন। ১৯৬]

২ মাঘ [শনি 15 Jan 1876] গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে ‘সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক’-এর প্রথম অভিনয় হয়। সরোজিনীর ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী ও বিজয়সিংহের ভূমিকায় অমৃতলাল বসু অভিনয় করেন। তখনকার দিনে নাটকটি সাহিত্য ও অভিনয়-ক্ষেত্রে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আমাদের

ধারণা, এই সমাদরের পিছনে রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই গানটির অবদান কম নয়। কিন্তু বহুকাল প্রকৃত রচয়িতার পরিচয়টি না জানা থাকায় সমস্ত প্রশংসা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খাতেই জমা হয়েছে [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২]।

রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত *প্রতিবিম্ব* পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হয়নি। মাত্র সাত মাস পরে অগ্রহায়ণ ১২৮২ থেকে এটি শ্রীকৃষ্ণ দাস-সম্পাদিত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব নামে প্রকাশিত হতে থাকে। আশ্বিন ১২৭৯-তে জ্ঞানাঙ্কুর প্রথম রাজশাহী বোয়ালিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকারই প্রথম বর্ষে অংশত আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিবিম্বএর সঙ্গে সম্মিলিত হবার পর পত্রিকাটির চতুর্থ বর্ষে [অগ্রহায়ণ ১২৮২-কার্তিক ১২৮৩] রবীন্দ্রনাথের 'প্রলাপ' নামক কবিতা-গুচ্ছ, 'বনফুল' কাব্যোপন্যাস ও প্রথম কাব্যসমালোচনামূলক গদ্যরচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী' প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও পত্রিকাটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র'-শীর্ষক দার্শনিক প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর ['(উদাসিনী গীতিকাব্য লেখক প্রণীত)'] 'মাধবমালতী' গাথাকাব্যটির কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। পৌষ ১২৮২ সংখ্যায় [পৃ ৭৯-৮১]।

এই 'রচনা-প্রকাশ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> এ-পর্যন্ত যাহাকিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমনসময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদগত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষের সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। *

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে অবশ্য একটু ত্রুটি আছে। *তত্ত্ববোধিনী* ও *প্রতিবিম্ব*-তে প্রকাশিত রচনাগুলিকে আপনা-আপনির মধ্যে বদ্ধ বলা গেলেও *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় 'হিন্দুমেলার উপহার' বা বান্ধব-এ 'হোক্ ভারতের জয়' কবিতার প্রকাশ সম্পর্কে তেমন বলা যায় না। আর বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ-কথিত পত্রিকাটির নাম 'জ্ঞানাঙ্কুর' নয়, *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব*-*জ্ঞানাঙ্কুর*-এর প্রথম তিনটি বর্ষে তাঁর কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি।

*জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব*তে বর্তমান বৎসরের কাল-সীমায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার তালিকাটি এইরূপ:

৪।১,	অগ্রহায়ণ	পৃ ১৫-১৭	'প্রলাপ'	দ্র র°র° ৩ [প. ব., ১৩৯০]।১১০১-০৬
ঐ ঐ		পৃ ৩৫-৩৮	'বনফুল। /কাব্য/প্রথম সর্গ'	দ্র বনফুল। অ-১। ৫১-৫৭
৪। ৩, মাঘ,		পৃ ১৩৫-৩৮	'বনফুল/২য় সর্গ'	দ্র ঐ। অ-১। ৫৭-৬৫
৪। ৪, ফাল্গুন,		পৃ ১৯২	'প্রলাপ'	দ্র র°র° ৩ [প. ব.]। ১১০৬-০৮
৪।৫, চৈত্র,		পৃ ২২৮-৩৪	'বনফুল/৩য় স্বর্গ' [য]	দ্র বনফুল। অ-১। ৬৫-৭৯

'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছের আর একটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৮৩ সংখ্যায়, 'বনফুল' আটটি সর্গে সমাপ্ত হয় আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৩ যুগ্ম-সংখ্যায়।

'প্রলাপ' কবিতাগুলি কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল, আমাদের জানা নেই। কিন্তু রচনাকাল ও প্রকাশ-কালের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান নেই বলেই আমাদের ধারণা এবং ভাব ও ভাষা লক্ষ্য করলে মনে হয় তিনটি কবিতা

বিভিন্ন সময়ে রচিত। এই কবিতাগুলি রচনার সময় তাঁর মানসিক পরিপ্রেক্ষিতটি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে চিত্রিত করেছেন:

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনোকিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে-লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে—সেই বাষ্পভরা বুদ্‌বুদ্‌রাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাকিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।[৩৮]

'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে এই মানসিকতার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শুধু প্রলাপ নয়, এই সময়ে লিখিত অধিকাংশ কবিতারই এটি সাধারণ লক্ষণ। 'কল্পনা'-কে সঙ্গিনী করে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে বসে হৃদয়ের কথা-বিনিময়, নিষ্ঠুর পৃথিবীর রূঢ় ব্যবহার, হৃদয়-শোণিত-ক্ষয়কারী তীব্র বিষমাখা মানুষের হাসি ও ঘৃণা উপহাস, হৃদয় দান করে হৃদয় পাবার আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবিতায় প্রায়ই দেখা যায়। পূর্ব-আলোচিত 'অভিলাষ' এবং মালতীপুঁথি-র অন্তর্গত 'প্রথম সর্গ-শীর্ষক কবিতায় এই লক্ষণগুলির পূর্বাভাস আমরা লক্ষ্য করেছি। বর্তমান কবিতাগুচ্ছে লক্ষণগুলি আরো স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

এই কবিতাগুলির আর-একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, এতে বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' [১২৭৬] কাব্যের 'নারী বন্দনা' 'চির পরাধিনী' প্রভৃতি কবিতার ছন্দ অনুসৃত হয়েছে। *অবোধ-বন্ধু* পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই এই কবিতাগুলি ও তার ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: 'বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে-ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক, যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

...একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।...এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।'[৩৯] সারদামঙ্গল-এর সঙ্গে তুলনা করে তিনি লিখেছেন: 'বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতসৌন্দর্য অনুকরণ-সাধ্য নহে।'[৪০] এই যে প্রভেদের কথা তিনি বলেছেন, তা প্রধানত যুক্তাক্ষরের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। বঙ্গসুন্দরী-র ছন্দ যুক্তাক্ষরের ভার সহ্য করতে পারে না। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথও 'প্রলাপ কবিতাগুচ্ছে ও অন্যত্র যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করে চলেছেন ও 'কলপনা' 'স্বরগীয়' 'সউরভ' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তিনি প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্যে মিলটি অনেকটা সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন, সম্ভবত ছন্দের অতিলালিত্য কমানোর জন্যই।

বনফুল কাব্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন: "পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'বনফুল' নামে যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটি বোধ করি জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হইয়াছিল।" এই উক্তিকে

আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করলে বলতে হয়, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ [May 1873]-তে হিমালয় থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য রচনা করেছিলেন। হিমালয়-ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে, বিশেষ করে প্রথম সর্গটি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের যে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাতে আমাদের অন্য ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথাই ভাবতে হয়। রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই আমরা জানি যে, তিনি শকুন্তলা পড়েছিলেন গৃহশিক্ষক রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণের কাছে এবং পূর্বেই আমরা এই পড়ার সময় ১২৮২ বঙ্গাব্দের প্রথম দিক বলে নির্ধারণ করেছি। সুতরাং বনফুল কাব্য প্রকাশের মতো এই কাব্য রচনাও বর্তমান বৎসরের কালসীমায় ঘটেছে বলে মনে হয়। লক্ষণীয়, বনফুল কাব্যের সূচনাতেই অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দশম শ্লোকে দুষ্যন্তের উক্তির একাংশ 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ' উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময় [১২৮৬] শ্লোকটি আখ্যাপত্রে স্থানলাভ করেছে, কিন্তু পত্রিকায় এটিকে শীর্ষনামের নিচেই দেখা যায়। এই শ্লোকটি ব্যবহার শকুন্তলা নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়কেই সপ্রমাণ করে। তাছাড়া এই কাব্যের নায়িকা কমলার চরিত্রগঠনে শেক্সপীয়রের টেম্পেস্ট নাটকের মিরাণ্ডা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ছাড়াও শকুন্তলা চরিত্রের প্রভাব অনুভব করা যায়। পার্বত্য-কুটীর ত্যাগ করে যাবার সময় কমলার উক্তি—

> হরিণ! সকালে উঠি   কাছেতে আসিত ছুটি
> দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়—
> ছিড়ি ছিড়ি পাতাগুলি   মুখেতে দিতাম তুলি
> তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!

—শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার একটি বর্ণনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রভাব থাকা কিছুতেই সম্ভব ছিল না যদি কাব্যটি হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই রচিত হত।

বনফুল কাব্য যে ১২৮২ বঙ্গাব্দেই লেখা তার আরও কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া যায়, প্রধানত ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে। এর তৃতীয় সর্গটি মোটামুটি 'প্রলাপ'-এর ছন্দে লেখা; ভাষার সাদৃশ্যও চোখে পড়ে—

> বহিছে মলয় ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
> নুয়ে নুয়ে পড়ে কুসুমরাশি!
> ধীরি ধীরি ধীরি ফুলে ফুলে ফিরি
> মধুকরী প্রেম আলাপে আসি!

—ইত্যাদি অংশে। এই সর্গে নীরদের গানটির মধ্যে আমরা প্রলাপ-এর সঙ্গে ভাব-সাদৃশ্যটিও স্পষ্ট চিনে নিতে পারি।

সারদামঙ্গল-এর 'গীতসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নয়' মনে করেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ছন্দ ও ভাষার দিক দিয়ে এই সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন তার একটি নিদর্শন তুলে দেওয়া যায় কাব্যটির অষ্টম সর্গ থেকে:

> যেন কোন্ সুরবালা

দেখিতে মর্ত্যের লীলা
স্বর্গ হোতে নামি আসি হিমাদ্রিশিখরে
চড়িয়া নীরদ-রথে—
সমুচ্চ শিখর হোতে
দেখিলেন পৃথ্বীতল বিস্মিত অন্তরে।

যুক্তাক্ষরের সুনিপুণ ব্যবহারে ছন্দের ঝংকার ও ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং সুষ্ঠু অন্ত্যমিল—যেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গল-এর ছন্দের বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছেন,[৪১] তার সব-ক'টিই উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে। এটিও বনফুল যে বর্তমান বৎসরের রচনা তার একটি প্রমাণ—কারণ আমরা জানি, বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল-সংগীত' *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় ভাদ্র-পৌষ ১২৮১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথের জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়। বিভিন্ন সরকারী কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের একটি বার্ষিক সম্মিলনে মিলিত করবার প্রচেষ্টা হিসেবে কলেজ রি-ইউনিয়ন' গত বৎসর থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রথম বার্ষিক কলেজ রি-ইউনিয়ন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1 Jan 1875 [শুক্র ১৮ পৌষ ১২৮১] রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কলকাতার উপকণ্ঠে সিঁথিতে অবস্থিত মরকত-কুঞ্জ [Emerald Bower] নামক উদ্যানে। বর্তমান বসর একই স্থানে দ্বিতীয় বার্ষিক কলেজ রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠিত হয় সরস্বতী পুজোর দিনে ১৮ মাঘ [সোম 31 Jan 1876] তারিখে। [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫] এই বৎসর যোগদানের সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছিল সমস্ত কলেজের ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট। যতীন্দ্রমোহনের ভ্রাতা রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই অনুষ্ঠানের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে রবীন্দ্রনাথের বেতন যদিও Mar 1876 পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ক্লাসে অনুপস্থিতির কল্যাণে তিনি ইতিমধ্যেই উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন; সুতরাং এই অনুষ্ঠানে তাঁর যোগদানে কোনো নীতিগত বাধা ছিল না!

রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক থেকে কয়েকটি তেজোদ্দীপ্ত কবিতা পাঠ করেছিলেন।* আমাদের নিশ্চিত ধারণা, তার একটি হল তাঁরই স্বরচিত 'জ্বল্ জ্বল্, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কবিতাটি। কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ও সবশেষে রামদাসের মুখে একটি কবিতা ছাড়া [দৈববাণী ও ভৈরবাচার্যের দেবীবন্দনা বাদ দিয়ে] তেজোদ্দীপ্ত আর কোনো কবিতা এই গদ্যনাটকে দেখা যায় না।

এখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেন, এই স্মৃতি তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। জীবনস্মৃতিতে তিনি এই অনুষ্ঠান ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন:

> তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। বোধকরি তিনি আশা করিয়াছিলেন, কোনো-এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব—সেই ভরসায় আমাকেও মিলমস্থানে কী একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যুবাবয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্মান যোদ্ধৃকবির যুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্জমা*[১] তিনি সেখানে স্বয়ং পড়িবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আমাদের বাড়িতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।[৪২]

পরবর্তী অংশটি আমরা অন্যত্র থেকে উদ্ধৃত করছি:

সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর [মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং ... আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম-দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্রভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন।*[২] বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে-রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ-করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসংকোচে পলায়নদৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।[৪৩]

জীবনস্মৃতি-তেও রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটির বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন [দ্র ১৭। ৪১৬]।

প্রাসঙ্গিক তথ্য :১

১২৮২ বঙ্গাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ এখানে সংকলিত হল :

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি [Aug 1875] হেমেন্দ্রনাথের সপ্তম সন্তান ও চতুর্থ কন্যা মনীষা দেবীর জন্ম হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে স্বর্ণকুমারী দেবীর তৃতীয়া কন্যা উর্মিলা দেবীর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়।

২২ মাঘ [শুক্র 4 Feb 1876] সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতীর [শিশুবয়সে এঁর নাম রাখা হয়েছিল ইন্দ্রাবতী] বিবাহ হয় নিত্যানন্দ*[৩] চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এঁর সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'নিত্যবাবুর বেশ লম্বা চওড়া গড়ন, বড় ২ উজ্জ্বল কালো চোখ ও টি কলো নাক ছিল।'[৪৪]

১২ ফাল্গুন [বুধ 23 Feb 1876] গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গগনেন্দ্রনাথ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী কাদম্বিনী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপনয়ন হয়।

?৯ চৈত্র [মঙ্গল 21 Mar] সারদাদেবীর 'একদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৎসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় ক্যাশবহি-র ২২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 4 Jun] তারিখের হিসাবে : 'ব° ট্রটমেন এণ্ড ওয়াটকিনস্/শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর জন্য/বেনেপুকুরের বাটী ক্রয় করা যায়/মূল্য ১০০০০৲ /এস্টাম্প মূল্য—১০০৲/১০১০০৲'। এই বাড়ি কেনার পরেই শরৎকুমারী দেবী অবশ্য সেখানে বসবাস করার জন্য উঠে যাননি। বরং দেখা যায় বাড়িটি মেরামত করে ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ট্যাক্স ইত্যাদি সরকারী তহবিল থেকেই দেওয়া হত। সুতরাং বাড়িটি ক্রয় করার তাৎক্ষণিক কোনো বিশেষ তাৎপর্য দেখা যায় না। কিন্তু এটি দেবেন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টির ও সে-অনুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণের মতো বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক। তাঁর পুত্র ও কন্যাদের পরিবার যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাতে দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন যে, জোড়াসাঁকো বাড়ির যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেও একদিন এই বাড়িতে সকলের জন্য স্থান সংকুলান করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া কন্যা-জামাতাদের ভরণপোষণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল গৃহকর্ত্রী সারদা দেবীর উপর। তিনিই ছিলেন এই বৃহৎ পরিবারের গ্রন্থন-সূত্র। তাই তাঁর মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করার প্রয়োজন

দেখা দিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায়, দেবেন্দ্রনাথ সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও বীরেন্দ্রনাথের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করেছেন। আগেই উল্লিখিত হয়েছে তিনি ২০ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 2 Jun] ও ৪ ফাল্গুন [মঙ্গল 15 Feb 1876] জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে স্বাধীন ব্যবসা ইত্যাদির জন্য বার্ষিক ৬ টাকা সুদে দু'দফায় দশ হাজার টাকা ঋণ দেন। এর পিছনেও তাঁর একই উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' প্রথম প্রকাশিত হয় বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 30 Nov 1875 [১৫ অগ্র] তারিখে এবং এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'জ্বল্, জ্বল্, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। নাটকটি সাহিত্য হিসেবে ও অভিনয়ের দিক দিয়ে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা এই কবিতাটি। সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রিকায় নাটকটির যে-সমালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশেই কবিতাটির অনেকখানি করে উদ্ধৃত হয়েছে। সাধারণী-র ৯ ফাল্গুন সংখ্যায় 'নাটক সমালোচন'-এ 'ওই যে সবাই পশিল চিতায়...তবু না হইব তোদের দাসী'—এই দীর্ঘ অংশটি উদ্ধৃত হয়। বান্ধব ৩য় বর্ষ ১-২ যুগ্ম-সংখ্যায় [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩] 'সংক্ষিপ্ত সমালোচন'-এ লেখা হয় : 'আমরা এই নাটক-খানি সমালোচনা প্রসঙ্গে আর কিছু না বলিয়া ইহার দুইটি কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমাদিগের নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি তাহা পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকারকে সুকবি বলিয়া প্রশংসা করিবেন, সহৃদয় বলিয়া ভাল বাসিবেন, এবং স্বদেশবৎসল বলিয়া তাঁহার নিকট শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাশে বদ্ধ হইবেন [পৃ ৬৪]।' এর পর সমালোচক দুটি কবিতা নয়, উপরোক্ত একটি কবিতারই দুটি অংশ—'পরাণে আহুতি দিয়া সমর-অনলে...এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥' এবং 'দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,...সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে ॥'—উদ্ধৃত করেন। আমরা আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের হিন্দুমেলায় পঠিত একটি কবিতা ও 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এ পঠিত 'প্রকৃতির খেদ' সংবাদপত্রের সপ্রশংস মন্তব্য লাভ করেছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যে-ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে তার প্রকৃতিই আলাদা। অবশ্য সমালোচক জানতেন না আলোচ্য কবিতাটির প্রকৃত রচয়িতা কে, সুতরাং তাঁর সমস্ত প্রশংসা নাট্যকারের উদ্দেশেই নিবেদিত হয়েছে; কিন্তু আমরা যেহেতু প্রকৃত তথ্য জানি, সেহেতু রবীন্দ্র-কাব্যসমালোচনার ইতিহাসে উক্ত মন্তব্যকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দিতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'জি পি রায় কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত' 'জাতীয় সঙ্গীত-প্রথম ভাগ'* গ্রন্থে সংকলকের 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ ৬ ফাল্গুন ১২৮২] 'স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতমালা'তে উনত্রিশটি সংগীতের মধ্যে, 'সরোজিনী নাটক' থেকে এই কবিতাটির 'দ্যাখ্রে জগৎ মেলিয়ে নয়ন... এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।' [পৃ ৩৭-৩৮] অংশটিও গ্রথিত হয়েছিল।† গানটির সুর-তাল সম্পর্কে নির্দেশ আছে : 'রাগিনী অহং—তাল একতালা।' পাদটীকায় লিখিত হয়েছে : 'ইংরাজি সুরে গান করিতে হয়।'

অভিনয়ের দিক দিয়েও নাটকটি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল এবং সেই সাফল্যের অনেকটাই আলোচ্য গানটির কারণে। সরোজিনীর ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনী লিখেছেন :

"সরোজিনী" নাটকের একটি দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু'তিন হাত উঁচুতে উঠে লক্‌লক্ করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের ওপর ৪। ৫ ফুট লম্বা সরু সরু কাট জ্বেলে দেওয়া হ'ত। লাল রঙের শাড়ী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই

"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
দেখ্ রে যবন দেখ্ রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥" [পাঠে কিছু ভুল আছে]

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ করে আগুনের মধ্যে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে—তবুও কারু ভ্রূক্ষেপ নেই—তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হ'ত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।[৪৫]

দৃশ্যটি কী ধরনের উন্মাদনা সৃষ্টি করত, উদ্ধৃতিটি থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। বলতে দ্বিধা নেই, এই ব্যাপারে সমস্ত কৃতিত্বই রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই কবিতা বা গানটির প্রাপ্য।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-শিক্ষক যদুভট্ট সম্পর্কে আমরা যে বিবরণ দিয়েছি, তার অতিরিক্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তার পরিমাণ খুবই সামান্য। মোগল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দরবারের সংগীতগুণীরা ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তানসেন-বংশীয় এক ধ্রুপদীয়া বাহাদুর খাঁ এই সময়ে বিষ্ণুপুর রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে গদাধর চক্রবর্তী ও রামশঙ্কর ভট্টাচার্য খুবই বিখ্যাত। যদুভট্ট এই রামশঙ্করেরই শিষ্য। তিনি ধ্রুপদ, বিশেষত খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তানসেনবংশীয় বীনকার কাশেম আলি খাঁর কাছে তিনি সেতার শিক্ষা করেন। সুরবাহার ও পাখোয়াজেও তাঁর দক্ষতা ছিল।[৪৬]

যদুভট্টের জন্ম বিষ্ণুপুরেই। পিতা সেতারবাদক মধুসূদন ভট্টাচার্য। রামশঙ্করের কাছে প্রাথমিক সংগীতশিক্ষার পর ১৫ বৎসর বয়সে কলকাতায় এসে ধ্রুপদাচার্য গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রায় ১০ বৎসর ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। পঞ্চকোটে ও ত্রিপুরার রাজদরবারে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভাগায়ক হিসেবে অনেকদিন নিযুক্ত ছিলেন।[৪৭] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'কয়েক বৎসর ধরিয়া যদু ভট্টের নিকট গান শিখিতেন। একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন।' গোপালচন্দ্র রায় জানিয়েছেন, যদু ভট্টের বাড়ি বিষ্ণুপুরে হলেও তিনি ঐসময় কিছুদিন কাঁটালপাড়ায় তাঁর ভগিনীর বাড়িতে ছিলেন। এই যদু ভট্টই প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সংগীতে সুর দিয়ে গেয়ে তাঁকে শুনিয়েছিলেন।[৪৮] সাধারণী পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় চুঁচুড়ায় একটি সংগীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি যদুভট্ট সেখানে শিক্ষকতা করেন।

'আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীত বিদ্যালয়'-এও যদুভট্ট কিছুদিন সংগীত-শিক্ষা দেন। আষাঢ় ১২৮২-সংখ্যা *তত্ত্ববোধিনী*-তে ২২ জ্যৈষ্ঠ তারিখ দিয়ে একটি 'বিজ্ঞাপন'-এ দেখা যায়: 'আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের জন্য উক্ত সমাজ-মন্দিরের দ্বিতীয়তল গৃহে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অদ্য হইতে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। রবিবার ও বুধবার ব্যতীত প্রত্যহ সায়াহ্ন ৭ ॥ ঘণ্টা হইতে ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে উচ্চ অঙ্গের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীত-শাস্ত্রবেত্তা শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ভট্ট অধ্যাপনা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।...' [পৃ ৫৬]

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় ২৫ বৈশাখ ১২৯০ [২৭। ২৫] তারিখের সংবাদ থেকে জানা যায়, ২২ চৈত্র ১২৮৯ (বুধ 4 Apr 1883] মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে বিশিষ্ট গায়ক যদুনাথ ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়।

স্বল্পকালীন পরিচয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করেছেন আ-জীবন। তিনি বলেছেন: 'ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল—কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দরোয়ানের মতো তাল-ঠোকাঠুকি করত না।...তিনি বিখ্যাত যদুভট্ট'।[৪৯] অন্যত্র তাঁর উক্তি : 'তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না।...যদুভট্টর মতো সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ।'[৫০]

শান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন, বাহার রাগিণী ও তেওড়া তালে রচিত যদুভট্টের একটি গান 'আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আজি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে' গানটি রচনা করেন [১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত]।[৫১]

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

শিলাইদহ অর্থাৎ পরগনা বিরাহিমপুর [নদীয়া কালেকটরেটের ৩৪৩০ নং তৌজি] ঠাকুর পরিবারের অন্যতম প্রাচীন জমিদারি। দ্বারকানাথের পালক-পিতা রামলোচনের উইলে [২২ অগ্রহায়ণ ১২১৪; Dec 1807] স্বোপার্জিত সম্পত্তির তালিকায় এই জমিদারির উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ 20 Aug 1840 [ভাদ্র ১২৪৭] তারিখে যে ট্রাস্টডীড প্রস্তুত করেন, তাতে অন্য তিনটি জমিদারির সঙ্গে এই পৈতৃক জমিদারিটিও ট্রাস্ট সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

শিলাইদহ গ্রামটি ছিল পূর্বতন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালি থানার অধীনে। এই গ্রামের উত্তরে পদ্মা এবং পশ্চিম দিক দিয়ে গোরাই নদী প্রবাহিত; দুটি নদী যেন গ্রামটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে রয়েছে। গ্রামটির নাম পূর্বে শিলাইদহ ছিল না, সরকারী সেট্‌লমেন্ট দলিলপত্রে খোরসেদপুর, কশবা ও হমিরহাট মৌজা নামেই অঞ্চলটি অভিহিত হয়েছে। কথিত আছে, নীলকর সাহেবেরা যখন এখানে কুঠি স্থাপন করে, তখন শেলী নামে একজন সাহেব এখানে বাস করতেন; পদ্মা ও গোরাই নদীর সংগমস্থলে যে একটি দহের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে এই শেলী সাহেবের নাম যুক্ত হয়ে স্থানটির নাম হয় শিলাইদহ। রবীন্দ্রনাথ

পুরোনো নীলকুঠির প্রাঙ্গণে যে দুটি কবরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি নাকি এই শেলী সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর। খোরসেদপুর নামেরও একটি ইতিহাস আছে, জনৈক খোরসেদ ফকিরের নাম তার সঙ্গে যুক্ত—'খোরসেদ দরগা' তাঁরই স্মৃতি বহন করছে।* গ্রামটির নাম মুসলমানী হলেও অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট, তাঁদের অনেকেই ছিলেন উচ্চবর্ণের। গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত গোপীনাথদেবের মন্দির। কথিত আছে, রাজা সীতারাম গোপীনাথজীকে প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে গ্রামটি রানী ভবানীর অধিকারে এলে তিনি দেবসেবার জন্য ব্রহ্মত্র জমি দান করেছিলেন। গোপীনাথদেবের কারুকার্যখচিত কাঠের রথ ছিল প্রকাণ্ড, ছেলেবেলা-য় রবীন্দ্রনাথ রথতলার মাঠের উল্লেখ করেছেন।

কুঠিবাড়িটি অবস্থিত ছিল পদ্মা ও গোরাই [মধুমতী] নদীর সংগমস্থলে বুনাপাড়ায়—এখানেই কুঠিরহাট ও শিলাইদহ খেয়াঘাট।† বিস্তৃত বাগানের মধ্যে অবস্থিত তেতালা কুঠিবাড়ির নীচের তলায় জমিদারি-কাছারি ছিল, উপরতলা ব্যবহৃত হত জমিদারবাবুদের বাসস্থান হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসে এই কুঠিবাড়িটিতেই উঠেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে [শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর অনুমান ১২৯০ সালে] পদ্মা এইদিকের পাড় ভাঙতে আরম্ভ করলে বাড়িটি নদীগর্ভে যাবে এই আশঙ্কায় সেটিকে ভেঙে তার মালমশলা দিয়ে নদী থেকে কিছু দূরে নতুন কুঠিবাড়ি তৈরি হয়। কিন্তু পদ্ম পুরোনো কুঠিটিকে গ্রাস করল না, বাগানের গেট পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গেল। নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ বহুদিন অটুট ছিল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ১৩০৫ বঙ্গাব্দে [1898] রবীন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে শিলাইদহে বাস করতে আসেন, তখনও নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে তাঁরা সেই ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন।[৩]

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫

'কলেজ রি-ইউনিয়ন' নামক অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির দ্বারাই ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে। এটির সূত্রপাত হয় 1875-এ। রাজনারায়ণ বসু এ-বিষয়ে লিখেছেন : 'ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সম্মিলন (College Reunion) হয়। আমি উহা প্রথম বিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রস্তাব করি। জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বপ্রথম জেলা পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন। যখন আমি তাঁহার নিকট ঐ প্রস্তাব করি, তখন তিনি বালেশ্বরের জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। আমি প্রথম এই প্রস্তাব করি কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কোন উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। জগদীশনাথ রায় আমার প্রস্তাবকে প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের ছাত্রদিগকে তাহার অন্তর্ভূত করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকত নিকুঞ্জ" নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি সেই সম্মিলনে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি।...আমার কলেজের সমাধ্যায়ী ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিতের প্রতি বাঙ্গলা পুস্তক হইতে বাছ বাছা স্থান পড়িবার ভার ছিল। তিনি একটি অশ্লীল স্থান খানিক পড়িয়াছেন এমন সময় জগদীশনাথ রায় তাঁহাকে একটি ধমক ও তৎপরে একটি উপহাস দ্বারা তাহা হইতে বিরত করিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচর্যা করিয়াছিলেন। এই সামান্য বেশ ধারণ জন্য

বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকল তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিল।'[৫৩] সম্মিলনটি হয় 1 Jan 1875] [শুক্র ১৮ পৌষ ১২৮১] তারিখে। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার ২২ খণ্ড ১ম সংখ্যাতে [4 Jan 1875] অনুষ্ঠানটির একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণ থেকে জানা যায় সরকারী কলেজগুলির তিন শতাধিক প্রাক্তন ছাত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র এই সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। রাজনারায়ণ বসুর উক্ত বক্তৃতা ছাড়াও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখখাপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন এই উপলক্ষে রচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। উদ্যানটি আলোকমালায় সজ্জিত হয়েছিল এবং সংগীত, খেলাধুলা ও যাদুবিদ্যা-প্রদর্শন অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল। সম্মিলনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পত্রিকাটি এটিকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানারকম প্রস্তাব করে।

দ্বিতীয় বার্ষিক কলেজ রি-ইউনিয়ন একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় সরস্বতী পুজোর দিন 31 Jan 1876 [সোম ১৮ মাঘ ১৮৮২] তারিখে। এই বৎসরের অনুষ্ঠান সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লেখেন : 'দ্বিতীয় বৎসরে কলেজ-সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল।... বিখ্যাত "শকুন্তলাতত্ত্ব" প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম. এ. এইবার সম্মিলনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও গানের শেষে কতকগুলি নাটকের বাছা বাছা স্থান অভিনীত হইয়াছিল ও কতকগুলি মূক অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল।'[৫৩]

বেঙ্গলী পত্রিকার বিজ্ঞাপনে যে অনুষ্ঠান-সূচি ঘোষিত হয় সেটি এইরূপ : 'The business of the Reunion will commence at noon and last till 8 P.M. and consist of the delivery of lectures, recital of poems, readings from authors, musical performances, exhibition of tableaux vivants of Ragas and Raginis and pictures on water, tableaux of Scenes from Meghanada.' এই বিজ্ঞাপনেই কলেজ রি-ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশিত হয় : জগদীশনাথ রায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক এইচ. ব্লখমান, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মৌলভী আবদুল লতীফ খান বাহাদুর, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, ব্রহ্মমোহন মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীনাথ ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রামশঙ্কর সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং জি. সি. দত্ত। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, চন্দ্রনাথ বসু যুগ্ম-সম্পাদক এবং খগেন্দ্রনাথ রায় সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বেঙ্গলী পত্রিকার প্রতিবেদন [Vol. XVII, No. 6, Feb 6] থেকে জানা যায়, বেলা দেড়টা নাগাদ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে চন্দ্রনাথ বসু সম্মিলনের উদ্বোধন করে বলেন, ইংরেজি শিক্ষিত একটি গোষ্ঠী যাঁরা হিন্দু সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন তাঁদের একস্থানে সমবেত করে এবং সৌহার্দ্যের পরিবেশে তাঁদের মধ্যে চিন্তা অনুভূতি ও আবেগ বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে এই সম্মিলন একটি প্রয়োজনীয় কাজ করেছে। সমাজের বর্তমান অবস্থায় যখন ঐক্যসাধনের নীতিগুলি সম্পূর্ণ অস্বীকৃত বা শক্তিশালী নয় তখন এইরূপ পুনর্মিলনের বিশেষ প্রয়োজন এবং এই কারণেই হিন্দু কলেজের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র গত বৎসর এই সম্মিলনের সূচনা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কলেজ সম্মিলন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং এর সংগঠক ও সমর্থকরা যা পরিকল্পনাও করতে পারেননি সেই রকম সংগঠিত ও বিস্তৃত আকারে প্রতিষ্ঠানটি ইতিহাসে স্থান লাভ করবে। সমস্ত শিক্ষিত

দেশবাসীর মধ্যে এই সম্মিলনের প্রস্তাব যেরূপ সহানুভূতি লাভ করেছে, তাঁর কাছে তা খুব উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ বলে মনে হয়েছে এবং রি-ইউনিয়ন কমিটির সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ 'সরোজিনী' নাটক থেকে কয়েকটি তেজোদ্দীপ্ত কবিতা পাঠ করেন ও চন্দ্রনাথ বসু বিখ্যাত জার্মান কবি ও বীর চার্লস থিওডোর কর্নারের 'Lyre and Sword' কাব্য থেকে দুটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

এরপর শ্রীনাথ দত্ত কৃষি-বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র পরলোকগত প্যারীচরণ সরকারের স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানিয়ে মদ্যপান বিষয়ে তাঁর তীব্র বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেন।

তারপর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনুপম কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকে কয়েকটি আকর্ষণীয় অংশ পাঠ করে শোনান। এরপর যখন সুকবি হেমচন্দ্রের গীতিমূর্চ্ছনাময় একটি কবিতা* মুদ্রিতাকারে সমবেত বিদগ্ধমণ্ডলীর হাতে বিতরণ করা হল এবং উপযুক্ত গাম্ভীর্যসহকারে পঠিত হল তখন তাঁরা পবিত্র ও বিষাদময় শান্তরসের আস্বাদন লাভ করে প্রীতি, বেদনা ও আশার একটি অজানা অথচ প্রচণ্ড আবেগপূর্ণ উপলব্ধির জগতে উত্তীর্ণ হলেন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশের বিবরণ আমরা *সাধারণী* [৫। ১৫, ২৪ মাঘ, পৃ ১৭৩] থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি : '...এই বিদ্বজ্জন সভায় কয়েকটী নির্ব্বাক জীবন্ত প্রতিমা প্রদর্শিত হইয়াছিল।...সস্ত্রীক শ্রীরাগ, পুষ্পলাঙ্কৃত বসন্তরাগ, ইন্দ্রজিতের রণযাত্রা নিবারণ-কারিণী প্রমীলা, মহাযোগীর যোগভঙ্গকারী—সশস্ত্র ফুলবাণ, সরমা অঙ্ক দেশে মূর্চ্ছিতা সীতা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ভূপাতিত মেঘনাদ, সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী এবং কাব্যাধিষ্ঠাত্রী বাগেদবী—সকলই সুন্দর, পৌরাণিক, মনোরম এবং উজ্জ্বল।

'বাঙ্গালার রঙ্গভূমিতে যাহা কখন প্রদর্শিত হয় নাই, এরূপ একটী অভিনব অভিনয় প্রকরণ শৌরীন্দ্র বিদ্বজ্জন সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। "প্রহেলিকা অভিনয়" বলিয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে এবং 'অভিনয় দর্শনে কোন যৌগিক শব্দ নিরূপণ' বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে।...'

'নাস-তরঙ্গ', সানাই ইত্যাদি বাদ্য পরিবেশনের পর রাত্রি প্রায় ন-টায় অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এই বিবরণের মধ্যে 'প্রহেলিকা অভিনয়'টি আমাদের খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ একসময়ে অনেকগুলি 'হেঁয়ালি নাট্য' বা Charade রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি *বালক* এবং *ভারতী ও বালক* পত্রিকায় ১২৯২-৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাভাষায় এই ধরনের নাট্যরচনার সূত্রপাত এই প্রহেলিকার মাধ্যমেই হয়েছে বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এ-প্রসঙ্গে আমরা এ তথ্যটিও স্মরণ করতে পারি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬

এ বৎসরে হিন্দুমেলার দশম বার্ষিক অধিবেশন হয় ৮ ও ৯ ফাল্গুন শনি ও রবিবার [19-20 Feb 1876] রাজা বদনচাঁদের টালার বাগানে। প্রথম দিন স্ত্রীলোকদের তৈরি কার্পেটের জুতো, টুপি, আসন, ছবি প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। দুটি বালিকা বিদ্যালয় থেকে দুজন করে চারজন বালিকা সভায় স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করে [যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, এই বালিকাচতুষ্টয়ের মধ্যে একজন হয়তো লেডি অবলা বসু (দাস), দ্র হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত। ৪৪]। সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ উক্ত বালিকাদের ও বালিকা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের উদ্দেশ্যে বলেন বালিকারা যেন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাব রক্ষা করতেও শেখে।

রবিবার মেলার প্রধান দিবসে সকালে বাচখেলা ও কৃষি-প্রদর্শনী হয়। বার্ষিক অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে কয়েকটি কবিতা পঠিত হয়। 'একটি অল্প বয়স্ক বালক যেরূপ দুঃখ ও অভিমান ভরে একটি পদ্যের আবৃত্তি করেন, তাহাতে সকলেই স্তব্ধ ও সাশ্রুনয়ন হইয়াছিল। সকলেরই শিরার উপর শোণিতের সঞ্চরণ অনুভূত হইয়াছিল। এ সকল পদ্য শুনিয়া ভারতমাতার পূর্ব্ব সৌভাগ্য ও ইদানীন্তন হতশ্রী —উজ্জ্বলভাবে সকলের মনে চিত্রিত হইয়াছিল। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহদ্বংশজাত, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন এবং এক্ষণে তাঁহারা বীর্য্যশূন্য হইয়াছেন। সকলেরই কর্তব্যজ্ঞান, স্বভাবতঃ সেই সময় জাগরূক হইয়াছিল [*সাধারণী*, ৫। ১৮, ১৬ ফাল্গুন]।' এর পর মনোমোহন বসু একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার পর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'জাতীয় চরিত্র' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন [দ্র *আর্য্যদর্শন*, বৈশাখ ১২৮৩।১৪-২৫]। সভাপতির বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার এই অধিবেশনে যোগদান করেননি, এর কয়েকদিন পূর্বে ৫ ফাল্গুন তিনি শিলাইদহ যাত্রা করেন। তবে সোমেন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৭

এই বৎসরটি বাংলা তথা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি কারণে স্মরণীয়। ইতিপূর্বে Mar 1838-এ স্থাপিত 'ভূম্যধিকারী সভা' [Zamindary Association বা Landholder's Society], 20 Apr 1843-তে স্থাপিত Bengal British India Society বা 20 Oct 1851-এ প্রতিষ্ঠিত British Indian Association ভারতবর্ষীয়দের রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করত এবং প্রয়োজনমতো স্বদেশে গভর্নর জেনারেলের কাছে কিংবা ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের কাছে আবেদন-নিবেদন জানাত। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তার জন্মের কিছুদিন পরেই 1852-তে ভারতের বিভিন্ন শাসনসংস্কারের প্রস্তাব জানিয়ে পার্লামেন্টের কাছে আবেদনপত্র পাঠায়। ড রমেশচন্দ্র মজুমদার এটিকে 'ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে একখানি অমূল্য দলিল' বলে অভিহিত করেছেন।[৫৪] পরেও বিভিন্ন বিষয়ে ভারতীয়দের অধিকার দাবি করে ও সুবিচার প্রার্থনা করে নানারকম আন্দোলনে অ্যাসোসিয়েশন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এটি ছিল প্রধানত শিক্ষিত অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায়ের মিলনকেন্দ্র। জমিদার শ্রেণীর প্রভাবও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হত। ফলে এই অ্যাসোসিয়েশন সর্বশ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র বলে পরিগণিত হতে পারেনি। মুসলমান সম্প্রদায় একে তাদের যথার্থ প্রতিনিধি

বলে স্বীকার না করে 1865-এ Muhammadan Association of Calcutta নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে সরকারী ও বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরিজীবী যে একটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তাঁরা প্রথমদিকে ধর্ম ও সমাজসংস্কারমূলক বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে মেতে থাকলেও, ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা দেয়। এঁদের কাছেও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এক সময়ে হিন্দুমেলা এঁদের মনোভাবকে ভাষা ও কার্যকরী রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিন্দুমেলা জাতীয় ভাব-চর্চা ও আত্মনির্ভরতার সাধনার উপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে, রাজনীতিচর্চার দিকে ততটা সচেতন প্রয়াস করেনি। এইসব কারণেই প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত হয়ে পুনর্নিয়োজিত হবার জন্যে নানা ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর Jul 1875এ[৫৫] ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে এসে শিক্ষকতা-কার্যে ব্রতী হয়েছেন। ইতিমধ্যে কেমব্রিজের প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার ও প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু 2 Nov 1874 [১৭ কার্তিক ১২৮১] তারিখে কলকাতায় ফিরে আসেন। এঁরা দুজন ও শিবনাথ শাস্ত্রী এই ধরনের একটি সভা স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। পরে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি এই পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক এঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ফলে শিশিরকুমার, মতিলাল ঘোষ, *Rais and Rayyet* পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান লীগ [Indian League] নামে একটি সভা স্থাপিত হয় 25 Sep 1875 [১০ আশ্বিন ১২৮২] তারিখে। এর কয়েকমাস পরে 26 Jul 1876 [১২ শ্রাবণ ১২৮৩] আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। ইণ্ডিয়ান লীগ দীর্ঘজীবী হয়নি, কিন্তু ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত-সভা 1885-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

এর আগে আরও একটি ঘটনা বাংলাদেশের ছাত্র ও যুবসমাজের প্রবল আবেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। আনন্দমোহন বিলেত থেকে ফেরবার সময় কিছুদিন বোম্বাইয়ে অবস্থান করে সেখানকার শিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ ও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটি যুব-ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেন। কলকাতায় ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সভাপতিত্বে 23 Apr 1875 Students' Association প্রতিষ্ঠা হয়।[৫৬] সুরেন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। স্টুডেন্টস্' অ্যাসোসিয়েশনে তাঁর প্রথম বক্তৃতা হয় হিন্দু স্কুল থিয়েটারে 'শিখ জাতির অভ্যুদয়' বিষয়ে; দ্বিতীয় বক্তৃতা ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি'স্ ইনস্টিটিউশন হলে—বিষয় 'চৈতন্য'। এছাড়াও খিদিরপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি জায়গায় তিনি ভারতীয় ঐক্য, ইতিহাস-পাঠ, মাৎসিনির জীবন প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় অজস্র জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। ইতালীয় বিপ্লবী মাৎসিনি তাঁর রাজনৈতিক গুরু-স্থানীয় ছিলেন। মাৎসিনির বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেম, উচ্চ আদর্শ, মানবতার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা সুরেন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, তিনি *আর্য্যাদর্শন*-এর সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্তকে মাৎসিনির জীবনী রচনার জন্য অনুরোধ করেন। যোগেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই *আর্য্যাদর্শন*-এ 'সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাসি বিদ্রোহ' মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে [জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র ১২৮১] প্রকাশ করে এই কাজের সূত্রপাত করেছিলেন, এখন

সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে ভাদ্র ১২৮২ থেকে ‘জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী’ [‘Joseph Mazzini and La Giovina Italia or Young Italy’] নামে মাৎসিনির জীবনকথা ও আদর্শ সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেন। সুরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনাময় বক্তৃতা ও যোগেন্দ্রনাথের লেখা তরুণসমাজের মনে যেন আগুন জ্বেলে দিল। সুরেন্দ্রনাথ যদিও মাৎসিনির বিপ্লববাদী গোপন কার্যকলাপ ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার পটভূমিকায় অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু উদ্বেলিত তরুণসম্প্রদায় ইতালির কার্বোনারি [Carbonari] সম্প্রদায়ের অনুকরণে গুপ্তসমিতি স্থাপন করতে শুরু করল। এইগুলি রবীন্দ্রনাথ-কথিত ‘সঞ্জীবনী-সভা’র পূর্বপুরুষ।

উপরে উল্লিখিত স্টুডেন্টস’ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির তরুণদের, বিশেষ করে সোমেন্দ্রনাথের, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ৪ শ্রাবণ ১২৮৩ [18 Jul 1876] তারিখের একটি হিসাবে দেখি : ‘সোমবাবুমহাশয় দিগের /ভবানীপূর লেকচার শুনীতে/ জাতাতের গাড়ি ভাড়া...২’—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে চৈতন্যদেব বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, সম্ভবত সেটি শোনার জন্যই সোমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তরুণেরা সেখানে গিয়েছিলেন [রবীন্দ্রনাথও এই দলে থাকতে পারেন। বর্তমান বৎসরেও ‘সোমবাবু ও রবিবাবু তালতলায় জাতাতের গাড়ি ভাড়া (জিতেন্দ্রবাবুর নিকট)’ মেটানোর হিসাব পাওয়া যায় ৭ ভাদ্র [রবি 22 Aug 1875] তারিখে—এই ‘জিতেন্দ্রবাবু’ সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত ব্যায়ামবীর [ক্যাপ্টেন] জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [1860-1935]। সোমেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্টুডেন্টস’ অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পরবর্তী কালেও ছিল—২৮ ভাদ্র ১২৮৫ [12 Sep 1878] তারিখে ক্যাশবহি-তে ‘সোমবাবু মহাশয়ের...Student association জাতাতের গাড়ি ভাড়া’র হিসাব পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ তিনি কার্যকরী করতেও আগ্রহী ছিলেন, তার উল্লেখ দেখি সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে : ‘সোমকাকা তাঁহার জীবনের প্রথম অবস্থায় আমাদের দেশের বালক-যুবকদিগের শারীরিক ও মানসিক বলসাধন এবং নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য নানাবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নারিকেলডাঙ্গায় এক শিক্ষালয় স্থাপন করেন। আমরাও বালক-কালে এই শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। প্রতি সপ্তাহে সোমকাকা আমাদের শিক্ষা ও আমোদের জন্য আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাদুঘর, আলিপুর চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরাইয়া আনিতেন [এইরূপ ভ্রমণের কিছু হিসাব ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায়]। সোমকাকা রোগাক্রান্ত হওয়ায় এই শিক্ষালয়টি উঠিয়া যায়।’ [তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮৪৩ শক [১৩২৮]। ২৯০]

ড প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ‘কলকাতার গুপ্তসমিতি: উনিশ শতক’ [১৩৯২] গ্রন্থে ছাত্র-আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক বর্তমান প্রসঙ্গে সেই গ্রন্থটি দেখে নিতে পারেন।

উল্লেখপঞ্জি

১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩২৮

২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৩ ‘শুচি’ : শান্তিনিকেতন ১৬। ৪১৪

৪ জীবনস্মৃতি ১৭।৩২৯

৫ ঐ ১৭। ৩২৮

৬ *শনিবারের চিঠি*, আশ্বিন ১৩৪৮। ৯০৩; রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৭৩

৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৩০

৮ ঐ ১৭। ৩৫২-৫৩

৯ পত্রাবলী। ১১৪, পত্র ৮৩

১০ ঐ।১১৩, পত্র ৮২

১১ শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬। ৪৪২-৪৩

১২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪০

১৩ ঐ ১৭। ৩৮০

১৪ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।১৪১-৪২

১৫ সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সেন্ট জেভিয়ার্সে'

১৬ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩২৯

১৭ ঐ ১৭। ৩০৮

১৮ ড সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৩ [১৩৭৬]। ৬-৭

১৯ ছেলেবেলা ২৬।৬১৮

২০ ঐ ২৬। ৬১৮; দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

২১ ঐ ২৬। ৬১৯

২২ ঐ ২৬। ৬২০

২৩ ঐ ২৬। ৬২২

২৪ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪০-৪১

২৫ ঐ ১৭। ২৯৫

২৬'রবীন্দ্ররচুনাপঞ্জী', *শনিবারের চিঠি*, অগ্র ১৩৪৬। ৩০৭-০৮; রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ১৯১

২৭'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' : দেশ, ১৬ চৈত্র ১৩৫২। ৩৭৫-৭৬; জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]।১৮৬তে উদ্ধৃত

২৮ দ্র 'ভোরের পাখি' : বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮।১২৪-২৫

২৯ দ্র 'ভূমিকা' : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি [প্রজ্ঞাভারতী, ১৩৮৯]। চ-ছ

৩০ 'ভোরের পাখি'। ১২৩

৩১ ঐ। ১২৭

৩২ ঐ। ১২৬-২৭

৩৩ দ্র "রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির খেদ' পাঠভেদের পুনর্বিচার" : *অমৃত*, ২২ বৈশাখ ১৩৭৯। ২০-২২

৩৪ 'ভোরের পাখি'। ১১৭

৩৫ অমৃত / ২০

৩৬ 'ভোরের পাখি'। ১২৭

৩৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি।১৪৭

৩৮ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪২

৩৯ ঐ ১৭। ৩৮৬-৮৭

৪০ 'বিহারীলাল': আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪২০

৪১ ঐ ৯।৪১৮, ৪২০

৪২ জীনস্মৃতি ১৭। ৪১৫

৪৩ 'বঙ্কিমচন্দ্র' :আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪০৭-০৮

৪৪ 'জীবনকথা' : *এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৯৯।১৯

৪৫ বিনোদিনী দাসী : 'আমার অভিনেত্রী জীবন', আমার কথা ও অন্যান্য রচনা [১৩৭৬]। ১০৬-০৭

৪৬ শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত। ৪৯-৫০ থেকে তথ্যগুলি গৃহীত।

৪৭ দ্র ভারতকোষ ৫ [১৩৮০]।৩৮৮, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়-রচিত বিবরণ

৪৮ গোপালচন্দ্র রায় : বঙ্কিমচন্দ্র [১৩৮৮]।১৪২

৪৯ সংগীতচিন্তা [১৩৯২] ৮৭

৫০ ঐ।২২৯

৫১ রবীন্দ্রসংগীত। ৩৫

৫২ দ্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পিতৃস্মৃতি [১৩৭৮]। ২৭

৫৩ রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত [১৩৬৮]।১৫৭

৫৪ দ্র ড রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস ৩ [১৩৮১]। ৫২০-২৩

৫৫ দ্র প্রতাপ মুখোপাধ্যায় : বিষয় কলকাতা [1990]। ৫

৫৬ দ্র ঐ। ২০

---

* জীবনস্মৃতি ১৭। ৩২৯; এঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ণনায় কিছু ত্রুটি আছে। তিনি লিখেছেন, ফাদার ডি পেনেরাণ্ডা কিছুদিন নিয়মিত শিক্ষকের বদলি রূপে তাঁদের ক্লাসে পড়িয়েছিলেন; কিন্তু স্কুলের কাগজপত্র থেকে জানা যায় 1875-এ তিনি ফিফ্‌থ্ ইয়ার ক্লাসের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন।

* গ্রন্থটিতে পেনসিলে 'James winse' নামে জনৈক ইংরেজের নাম লেখা আছে।

* উক্তিটি ভ্রমাত্মক; সংস্কৃতের উপর সম্পূর্ণ দখল না জন্মালেও ঋজুপাঠ, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা পড়ার ফলে তিনি এই ভাষার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় অন্তত স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

* শ্রীগীতগোবিন্দম, ৭ম সর্গ, ৭ম শ্লোক। ড সুকুমার সেন লিখেছেন: 'যিনি কখনো পদটিকে ছন্দোবিভাগ করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন এ কাজ শিক্ষিত প্রবীণের পক্ষেও বড় সহজ নয়।'—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৩ [১৩৭৬]।

* প্রিন্স অব ওয়েলসের এই কলকাতা-আগমন উপলক্ষে উদ্ভূত কয়েকটি ঘটনা 1876-এর 'Dramatic Perfomances Act বিধিবদ্ধ হবার জন্য দায়ী, যা পরবর্তীকালের নানাভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়ের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত

হয়েছে। দ্র শিশির বসু, একশ বছরের বাংলা থিয়েটার [১৩৮০]। ১৬৬-৮১

† এর আগেও ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ (বুধ 2 Jun 1875) তারিখে দেবেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে একই হারে ৫০০০ টাকা ঋণ দেন।

* ছেলেবেলা ২৬। ৬০৬; শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন: 'কিন্তু এ গানটি তিনি বর্ষাসংগীতে পরিণত করেন নি বলেই আমার বিশ্বাস, করেছে একটি উপাসনার গীতে। ...এই সুরে তাঁর কোনো বর্ষার গান না পেয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, হয়তো ভুল করেছেন, তাঁর সঠিক স্মাণ ছিল না যখন এ কথা লেখেন, পরে সংশোধন করে দেবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।'—রবীন্দ্রসংগীত [১৩৭৬]।১২৩। উক্তিটি অবশ্য সংশোধিত হয়নি।

* জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৩৪; এই-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন : 'জ্ঞানাঙ্কুরে আমার পাঠানো এই ভাবের [বিহারীলালের ত্রি-মাত্রিক ছন্দের অনুকরণে] লেখা সেখানেই পড়িয়াছিল। ছাপা হয় নাই। পরে বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুরোধে এই মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। আমার বয়স তখন তেরো-চোদ্দ। খুবই উৎসাহ হইল।'—'জীবনস্মৃতির জন্মকথা' : ক্ষিতিমোহন সেনের অনুলেখন, শারদীয়া *আনন্দবাজার পত্রিকা* ১৩৮৩। ১১

* রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বার বার বঙ্গসুন্দরী কাব্যের 'সুরবালা' নামক তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। এই কবিতাটি *অবোধ-বন্ধু* পত্রিকায় ১২৭৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং পত্রিকাটির মাধ্যমেই তিনি এই কবিতাটি ও তার ছন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচিত এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কবিতাটি বঙ্গসুন্দরী কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গৃহীত হয়নি, 1880-তে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়।

* 'Baboo Rabindro Nath Tagore read some very spirited verses from the *Sarajini Natuck*. —*The Bengalee*, 5 Feb 1876/44.

*[১] 'He [Rabindranath] was followed by Baboo Chunder Nath Bose M.A., who recited two exquisite picces of poetry from the "Lyre and Sword" of Charles Theodore Kor ner, the celebrated German poet and soldier.'—*Ibid.*

*[২] 'সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা বাগাড়ম্বরে বক্তৃতা করিতে থাকেন, তাহাতে অনেকে আমোদিত হইয়াছিলেন।'—*সাধারণী*, ২৪ মাঘ। ১৭১

*[৩] ড চিত্রা দেব এঁর নাম 'নিত্যরঞ্জন' বলে উল্লেখ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী-তে প্রদত্ত বংশলতিকায় নামটি 'নিত্যানন্দ' রূপে দেখা যায়। ইরাবতী দেবীর স্বামীর নাম নিত্যরঞ্জন হওয়ায় সৌদামিনী দেবীর দুই জামাতা 'বড়ো নিত্য' ও 'ছোটো নিত্য' বলে পরিচিত ছিলেন, ড দেব এই সংবাদটি দিয়েছেন। দ্র ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল [১৩৮৭]। ৮৭

* পুস্তকটির মলাটে এইরূপ লেখা আছে; 'NATIONAL SONG BOOK/PART I, (PATRIOTIC SONGS.)/ জাতীয় সঙ্গীত।/প্রথম ভাগ।/(স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতমালা।)/Calcutta:/PRINTED BY G.P. ROY & CO., 21 BOw BAZAR STREET/1876/ মূল্য আনা মাত্র। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৬+৪২। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থের সংকলক বলে নির্দেশ করেছেন। দ্র সা-সা-চ ৭। ৮০। ২৯-৩০

† *আর্য্যদর্শন* ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় [বৈশাখ ১২৮৩] পুস্তকটির সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত সন্তান', দ্বিজেন্দ্রনাথের মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি প্রভৃতি চারটি গান উদ্ধৃত করে যেক'টি উদ্ধৃত করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে এই গানটিও আছে।

* খোরসেদ ফকির সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে, দ্র শচীন্দ্রনাথ অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ [১৩৮০]। ৩৭৯-৮৩

† প্রমথনাথ বিশী-রচিত 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' [১৩৭৯] গ্রন্থে প্রদত্ত একটি হতনক্সায় কুঠিবাড়িটির অবস্থান অন্যত্র—ডাকঘর ও হানিফের ঘাটের পূর্বদিকে পদ্মার তীরে। এটি ভুল।

* হেমচন্দ্রের এই কবিতাটি 'সুহৃৎ-সঙ্গম' নামে বঙ্গদর্শন-এর অগ্রহায়ণ ১২৮২ [পৃ ৩৭৯-৮১] সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল [*বঙ্গদর্শন*-এর প্রকাশ তখন অত্যন্ত অনিয়মিত]। দ্র কবিতাবলী [সাহিত্য পরিষদ সং, ১৩৭১]। ১০২-০৬

ষোড়শ অধ্যায়

১২৮৩ [1876-77] ১৭৯৮ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ষোড়শ বৎসর

আমরা আগেই বলেছি, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যদিও Mar 1876 পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ঐ বছরের শুরু থেকেই স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন; আর এপ্রিল মাস থেকে তো বেতন দেওয়াই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং বর্তমান বৎসরে রবীন্দ্রনাথ বিধিবদ্ধ পড়াশুনোর সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পড়লেন। অবশ্য সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ যথারীতি ঐ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসেবে এন্ট্রান্স ক্লাসে থেকে গিয়েছিলেন। উপরন্তু জুন মাস থেকে দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথকেও সেখানে ভর্তি করে দেওয়া হয়। গৃহশিক্ষকের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০ মাঘ ১২৮২ তারিখে রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্মত্যাগ করায় চৈত্র মাস থেকে দিননাথ ন্যায়রত্ন সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত হন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যও ৯ বৈশাখ [বৃহ 20 Apr] পর্যন্ত কাজ করে কর্মত্যাগ করেন*; পরের দিনই মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রজনাথ দে† 'সোমবাবুদিগের ইংরাজি পড়াইবার মাষ্টার' হিসেবে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। স্কুলের বন্ধন থেকে মুক্ত হলেও গৃহশিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে মুক্তি দিতে চাননি। তিনি লিখেছেন : 'তিনি [ব্রজবাবু] আমাকে প্রথমদিন গোল্ড্স্মিথের ভিকর অফ ওয়েক্ফীল্ড্ হইতে তর্জমা করিতে দিলেন। সেটা আমার মন্দ লাগিল না; তাহার পরে শিক্ষার আয়োজন আরও অনেকটা ব্যাপক দেখিয়া তাঁহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ দুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম।'[১] রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতেও লিখেছিলেন : '[ব্রজবাবু] কয়েকদিন আমাকে পড়াইবার অসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন।' অথচ মানুষ হিসেবে ব্রজবাবু খুব আকর্ষণীয় ছিলেন; সরলা দেবীর স্মৃতিকথায় তাঁর একটি চিত্র পাই: 'ওঁদের [দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যাদের] মাস্টারমশায় ছিলেন "স্যর্"—মেট্রপলিটনের হেডমাস্টার [সুপারিন্টেন্ডেন্ট] ব্রজবাবু। অতি সরস, অতি সহাস্য, অতি মজাড়ে লোক। তাঁর কোনোই শাসন ছিল না, বরঞ্চ অহেতুক পুরস্কার ছিল। তাঁর শাসনপ্রবৃত্তি মেট্রপলিটনের ছাত্রদের উপর দিয়েই নিঃশেষিত হত। তাদের কাছ থেকে শাস্তিস্বরূপ বাজেয়াপ্ত করা ছুরি, রঙীন পেন্সিল প্রভৃতি কিছু না কিছু পকেট থেকে ফস্ করে বাড়ির পড়ুয়াদের দেখিয়ে ও দিয়ে তিনি তাদের আনন্দে আনন্দ পেতেন।'[২] [রবীন্দ্রনাথও তাঁর সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, তা আমরা পরে দেখব।] বোঝা যায়, অভিভাবকেরা সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, স্কুলের বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেও অন্যভাবে পড়াশোনার গণ্ডির মধ্যে তাঁকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সকলের পক্ষেই 'দুরধিগম্য' হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সহজ পথটাই বেছে নিয়েছেন, তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি আবার শিলাইদহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলেন—১৯ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 31 May 1876]-এর হিসাবে দেখি 'রবীবাবু মহাশয় বিরাহিমপুর/বেড়াইতে জাওয়ার ট্রেণ ভাড়া...৭।ল০'। ১৪ জ্যৈষ্ঠ 'ছোট বাবুর [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] নিকট

সেলাইদহায় নূতন বধু ঠাকুরাণীর এক পত্র পাঠান টিকিট' বাবদ ব্যয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়—যা সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপস্থিতিরই প্রমাণ। সম্ভবত এবারেও রবীন্দ্রনাথ সেখানে প্রায় মাসখানেক ছিলেন, কারণ 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভায়/গত ৯ আষাঢ় বড় বাবু মহাশয়ের ও/সত্যবাবু ও সোমবাবু মহাশয়দিগের/জাতাতের দুইখানা গাড়ি ভাড়া'—এই হিসাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সময়েই তিনি ফিরে এসেছিলেন বলে মনে হয়, তার কারণ জুলাই মাসে তাঁর জন্যে একজন ড্রয়িং শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন বলে দেখা যায় ১৬ ভাদ্রের হিসাবে : 'ব° কালীদাস পাল ড্রইং মাষ্টার/রবিবাবুর ড্রইং শিক্ষার জন্য/উক্ত মাষ্টারের ১৮৭৬ সালের জুলাই/বেতন শোধ বিঃ এক বৌচর/গুঃ খোদ ৮্' জুলাই মাসের পুরো বেতনই যখন তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তখন মনে হয় মাসের শুরু থেকেই তিনি শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, নতুবা ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুযায়ী পুরো বেতন তিনি পেতেন না। কিন্তু সম্ভবত তিনি এই এক মাসই রবীন্দ্রনাথকে ড্রয়িং শিক্ষা দিয়েছিলেন, কারণ এই খরচের পুনরাবৃত্তি আর দেখা যায় না। চিত্রবিদ্যার দিকে ঝোঁক রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল, পরবর্তীকালে ইন্দিরা দেবীকে ৩০ আষাঢ় ১৩০০ [13 Jul 1893] তারিখে লেখা একটি চিঠিতে তার ইঙ্গিত রয়েছে :'লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ-যে চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ; তূলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।'[৩] বর্তমান সময়ে হয়তো এরূপ হয়রান হয়েই তিনি ড্রয়িং-চর্চা ত্যাগ করেছিলেন, শুধু কিছু কিছু নিদর্শন থেকে গেছে 'মালতীপুঁথি' নামক সমসাময়িক পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো পৃষ্ঠায়। এর আগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যার চর্চা সম্পর্কে ১২৮১ বঙ্গাব্দের বিবরণে আমরা কিছু কিছু তথ্য উল্লেখ করেছি।

বর্তমান বৎসরের ক্যাশবহি-র রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত হিসাবগুলি খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে যে-জিনিসটি আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হল তাঁর চিকিৎসার প্রসঙ্গটি। ১২৮২ বঙ্গাব্দেও রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্র কবিরাজের [ব্রজেন্দ্রকুমার সেন] চিকিৎসাধীনে ছিলেন, সেকথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি এবং মন্তব্য করেছি যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পালাবার উপায় হিসেবেই তিনি হয়তো অসুস্থতার ছলনা সৃষ্টি করে থাকবেন। কিন্তু বর্তমান বৎসরে তো স্কুলের উপদ্রব ছিল না, ব্রজবাবু যেটুকু অসুবিধা ঘটিয়েছিলেন তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বৎসরব্যাপী অসুস্থতার ভান করার দরকার ছিল না। সুতরাং বিশ্বাস করতে হয় যে সত্য সত্যই তাঁর ক্ষেত্রে দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাল্য ও কৈশোরের নীরোগ স্বাস্থ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এতবার এত জায়গায় গর্ব প্রকাশ করেছেন যে, তার সঙ্গে এই তথ্যকে খাপ খাওয়ানো মুশকিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া ক্যাশবহি-র শুষ্ক হিসাবগুলি আমাদের চিকিৎসার খবরটুকুই শুধু জানায়, কী রোগের জন্য চিকিৎসা সে-সম্পর্কে আন্দাজ করবার মতো কোনো সুযোগ দেয় না। এই সব হিসাব থেকে জানা যায় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় [Jun 1876] মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে ছিলেন, তখন কলকাতা থেকে ডাকে ওষুধ পাঠানো হয়; ভাদ্র মাসে ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কবিরাজকে 'রবিবাবুর চিকিৎসার ঔষধ' ও দ্বারকানাথ রায় কবিরাজকে 'রবিবাবুর চিকিৎসার জন্য ঘৃতের মূল্য' দেওয়া হয়, একটি খলও কেনা হয় 'রবীবাবুর পীড়ার জন্য'; ১৯ আশ্বিন হিসাবে লেখা হয় 'রবিবাবুর পীড়ার চিকিৎসার জন্য/কবিরাজের জাতাতের গাড়িভাড়া/এক বৌচর ৪

ভাদ্র না° ২ আশ্বিন শোধ/১০।।০ ও ঔষধের মূল্য ১৫ ভাদ্র না°/১১ এগারই আশ্বিন শোধ দ্বারকানাথ রায়/ কবিরাজকে দেওয়া হয় এক বৌচর/১৬, একুনে...২৬৷৷০'; কার্তিক মাসেও দুবার ঔষধ ক্রয়ের উল্লেখ দেখা যায়। অগ্রহায়ণ মাস থেকে একটি নূতন ধরনের খরচ দেখা যায়; ৪ অগ্র হিসাবে দেখি : 'রবীবাবুর জন্য বিয়ার ক্রয়/এক ডজন মায় মুটে...৪⁄৬', ২৪ ফাল্গুনের হিসাব : 'রবীবাবুর বিয়ার ক্রয় ২। ১৯ মাঘ ও ১০ ফাল্গুন তিন ডজন ক্রয়/১২⁄০', আবার ১২ চৈত্রের হিসাবে দেখা যায় 'রবীবাবুর পীড়া হওয়ায়/সোডাওয়াটার লেমনেড বরফ ও হোমিয়পাথী/ঔষধ ক্রয় বিঃ এক বৌচর/৭ ⁄০০' এবং 'উক্ত বাবুর বিয়ার ক্রয়/২৬ ফাল্গুনের এক বৌচর শোধ/৪ ল০'। প্রচুর পরিমাণে বিয়ার কেনা হয়েছে; যদিও কী উদ্দেশ্যে এগুলি কেনা তার কোনো উল্লেখ নেই, তবু আমরা অনুমান করতে পারি এগুলি নেশার প্রয়োজনে নয়, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্যেই আনা হয়েছিল—সোডাওয়াটার লেমনেড বরফ ও হোমিয়পাথী ঔষধ ক্রয়ের উল্লেখ এই অনুমানকেই সমর্থন করে। চিকিৎসা-বিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ আমাদের এক বন্ধু জানিয়েছেন, সেই সময়ে বিয়ার স্নায়বিক রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। কবিরাজী ঔষধ ও ঘৃতও একই কারণে ব্যবহৃত হতে পারে। সম্ভাবনাটি আমাদের চমকিত করে। রবীন্দ্রনাথের মামা ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের মস্তিষ্কবিকৃতি ছিল, তাঁর দাদা বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথও উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন, ভ্রাতুষ্পুত্র কৃতীন্দ্রনাথও সাময়িকভাবে এর শিকার হয়েছিলেন। প্রতিভা ও উন্মত্ততার মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। রবীন্দ্রনাথ 'পাগল' প্রবন্ধে খ্যাপা-মহেশ্বরের প্রশস্তি করে লিখেছেন : 'পাগলও ইঁহারই কীর্তি এবং প্রতিভাও ইঁহারই কীর্তি। ইঁহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায় সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্বে সুরে বাজিয়া উঠে সে হইল প্রতিভাবান।'[8] এ সবই জল্পনা—কিন্তু যেটি আমাদের বিস্মিত করে, সেটি হল পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে ইংরেজ চিকিৎসক ডাঃ কেলী ও বাঙালি চিকিৎসক ডাঃ নীলমাধব হালদার নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের চিকিৎসার কোনো উল্লেখ না থাকা। অবশ্য ঔষধ হিসেবে বিয়ার ব্যবহারের নির্দেশ তাঁরাও দিয়ে থাকতে পারেন।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়েছিল ২৫ মাঘ ১২৭৯ [বৃহ 6 Feb 1873) তারিখে। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রদের ও দৌহিত্রের উপনয়ন দিয়েছিলেন অনেকটা কেশবচন্দ্রের বর্ণাশ্রমবিরোধী ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়ায়। নতুবা ব্রাহ্মদের জন্য তিনি যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি রচনা করেন, সেখানে ব্রাহ্মণসন্তানদের জন্যও উপনয়ন-সংস্কারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে উপনয়ন নামে যে ক্রিয়ার বর্ণনা আছে, তা কেবল ব্রাহ্ম-উপদেষ্টার কাছে কোনো বালককে এনে তাঁর উপর তার ধর্মশিক্ষার ভার অর্পণ করা। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথম ব্রহ্মদীক্ষার আয়োজন করা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ১০ আষাঢ় ১২৭১ [27 Jun 1864] তারিখে। ঠাকুরপরিবারে দ্বিতীয় বার এই আয়োজন করা হল এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের বেলায়। এর আগে অবশ্য বর্ণকুমারীর এবং বর্তমান বৎসরে দ্বিজেন্দ্রনাথের কন্যা সরোজার বিবাহের সময় জামাতাদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, ব্রহ্মদীক্ষার সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ত্রয়ীর ব্রহ্মদীক্ষা হয় সম্ভবত অগ্রহায়ণ মাসে। ঠিক কোন্ তারিখে এই অনুষ্ঠান হয়, তা নির্দিষ্ট করে বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। ক্যাশবহি-তে এ-সম্পর্কে তিনটি হিসাব দেখতে পাওয়া যায় : ২৫ কার্তিক [বৃহ 9 Nov]'সোম রবীবাবুর দিক্ষা উপলক্ষে খরচ জন্য—৩০ৎ', অগ্রিম দেওয়া হয়, ১ অগ্রহায়ণ [বুধ 15 Nov] 'সোমবাবুদিগের দীক্ষার ব্যয় ১৩৬ৎ' এবং ১৪ অগ্রহায়ণ [মঙ্গল 28 Nov] 'ব° বেণীমাধব রায়/দ° সোম রবী ও সত্যপ্রসাদবাবুদিগের/দীক্ষার ব্যয়...৩৯৮ ল ৩'।

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই বেণীমাধব রায়-ই মৃণালিনী দেবীর পিতা, রবীন্দ্রনাথের ভাবী শ্বশুর। বর্তমান বৎসরে তিনি ২৬ কার্তিক থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ এই কুড়ি দিন মাসিক বারো টাকা বেতনে ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তায় কাজ করেন। পরে অবশ্য তিনি আরও একবার দীর্ঘতর সময়ের জন্য এই কাজে ফিরে এসেছিলেন।] দীক্ষা-উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁদের দানের সংবাদ প্রকাশিত হয় *তত্ত্ববোধিনী*-র ফাল্গুন ১৭৯৮ শক সংখ্যাতে ২০৮ পৃষ্ঠায়। আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্তিক-পৌষ মাসের 'আয়ব্যয়'-এর বিবরণে দেখা যায় 'শুভকর্ম্মের দান' উপলক্ষে সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ প্রত্যেকে বারো টাকা করে দান করেছেন।

এই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা আর একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখি। ঘটনাটি অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাটির দীপালোকে অন্তঃপুরের মাধুর্যলোকের এমন একটি চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে তাকে অবহেলা করাও শক্ত। ৩ অগ্রহায়ণের একটি হিসাব এইরকম : 'ব° নূতন বধু ঠাকুরাণী/দ° সোম রবীবাবু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময়/বড়দিদি ঠাকুরাণীকে প্রণাম করেন/ঐ প্রণামী টাকার হা° [হাওলাত, ঋণ] শোধ...৮্'। পৌত্তলিকতার তীব্র বিরোধী হলেও দেবেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ইত্যাদির মতো পারিবারিক আনন্দানুষ্ঠানগুলিকে হিন্দু-গন্ধী বলে বর্জন করতে চাননি। এখানে তারই একটি নিদর্শন দেখতে পাই। মাতার মৃত্যুর পর বড়দিদি সৌদামিনী দেবী জোড়াসাঁকোর বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রীর আসনটি অধিকার করেছিলেন। ইনি এবং নতুন বধূঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী তাঁদের নারী প্রাণের গভীর মমতায় মাতৃহীন বালকদের মায়ের স্থান পূর্ণ করে রেখেছিলেন। উপরের হিসাবে এই দুটি নারীকে একটি চিত্রেরই অঙ্গীভূত করে দেখা যায়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠানে বড়দিদিকে প্রণাম করে ভাইয়েরা প্রণামী দিয়েছেন, আর সেই প্রণামীর টাকা ভ্রাতৃবধূ নিজের মাসোহারা থেকে সরবরাহ করেছেন—এর চেয়ে মধুর দৃশ্য আর কী হতে পারে!

এইবার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-জীবনের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক। আমরা গত বৎসরের বিবরণে দেখেছি, ***'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'*** পত্রিকায় তাঁর 'বনফুল' কাব্যোপন্যাস ও 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। চৈত্র ১২৮২-র মধ্যেই 'বনফুল'-এর তিনটি সর্গ ও 'প্রলাপ'-এর দুটি গুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান বৎসরে এইগুলির প্রকাশতালিকাটি এই রকম:

৪। ৬, বৈশাখ,	পৃ ২৭৮-৮০	'প্রলাপ'	দ্র র°র°	৩ [প.ব.]।১১০৮-১০
৪।৭, জ্যৈষ্ঠ,	পৃ ৩১৬-১৮	'বনফুল'। ৪র্থ সর্গ	দ্র বনফুল,	অ-১। ৭৯-৮৩
	পৃ ৩১৮-১৯	'বনফুল'। ৫ম সর্গ	দ্র ঐ	অ-১। ৮৪-৮৬
৪। ৯, শ্রাবণ,	পৃ ৪২০-২৫	'বনফুল কাব্য'। ৬ষ্ঠ সর্গ	দ্র ঐ	অ-১। ৮৬-৯৯
৪।১০, ভাদ্র,	পৃ ৪৫৮-৬১	'বনফুল কাব্য। ৭ম সর্গ'	দ্র ঐ	অ-১।৯৯-১০৬
৪।১২, কার্তিক,	পৃ ৫৬৭-৭১	'অষ্টম স্বর্গ[য]। বন-ফুল কাব্য'	দ্র ঐ	অ-১।১০৬-১৬

[পত্রিকায় 'স্বর্গ' বানান আছে, ইতিপূর্বে চৈত্র সংখ্যায়ও '৩য় স্বর্গ' মুদ্রিত হয়েছিল।]

পত্রিকার সংখ্যাগুলি যথাসময়ে প্রকাশিত হত বলে মনে হয় না। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র ও আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা যুগ্ম-সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণী ৫ আষাঢ় [৬।১০] সংখ্যায় [পৃ ১১৫] লেখে, 'ফাল্গুনের জ্ঞানাঙ্কুর পূর্ব্ব কয় মাসের অপেক্ষা কিছু ভাল। শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীরবীন্দ্র ঠাকুর প্রণীত

''প্রলাপ'' পদ্যটী সুন্দর।' রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করে তাঁর কবিতা সম্পর্কে মন্তব্যের এইটিই প্রথম নিদর্শন। উক্ত পত্রিকার ২ শ্রাবণ [৬। ১৪] সংখ্যার ১৬৬ পৃষ্ঠায় বনফুল-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয় : 'চৈত্রের জ্ঞানাঙ্কুর। ...''বনফুল'' অতি সুন্দর। জয়দেবের লালিত্য ও শেলীর সুগন্ধ, বনফুলের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে বিরাজ করিতেছে। দুর্ভাগা বাঙ্গালায় এরূপ আলুলায়িত-কুন্তলা, স্খলিত-বসনা ললিত রচনার অভাব নাই। জয়দেবের পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া এই রচনা ক্রমে ইন্দ্রজালে প্রায় সমস্ত দেশই মুগ্ধ করিয়াছিল, এখন আবার শেলীর গীতিকাব্যের সহিত মিলিত হইয়া দ্বিগুণতর বল সঞ্চয় করিয়াছে। এবার আর বাঙ্গালির নিস্তার নাই। বাঙ্গালি তাহার স্বরচিত কাব্যের মত কর্পূরস্বভাবে, আকাশকুসুমের সহিত, নিশীথ স্বপ্নের সহিত, মিশিয়া যাইবে। এই মৃদুরসপ্লাবিত দেশে বালকে পর্য্যন্ত মধুর রসের ধারা ঢালিতে লাগিল, মধুসূদনের হেমচন্দ্রের ফুৎকারে আর কি ভিজা কাঠে আগুণ ধরে?'

'প্রলাপ' ও 'বনফুল' সম্পর্কে আমাদের মূল বক্তব্য আমরা আগেই বলেছি। 'প্রলাপ' রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। ১২৯১ বঙ্গাব্দে [1884] তিনি যখন 'শৈশব সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থে তাঁর 'তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ' করেন, তখন 'অভিলাষ' 'হিন্দুমেলায় উপহার' 'প্রকৃতির খেদ' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতার সঙ্গে 'প্রলাপ'-কেও তার অন্তর্ভুক্ত করেননি। রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে 'প্রলাপ' সর্বপ্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। 'বনফুল' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় 9 Mar 1880 [২৭ ফাল্গুন ১২৮৬; তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী]। গ্রন্থপ্রকাশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন : 'বছর তিন চার পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উৎসাহে এটি গ্রন্থ আকারে ছাপাইয়াও ছিলেন।' এর পরে কাব্যটি পুনরায় গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে [আশ্বিন ১৩৪৭ : 1940]। পুস্তকাকারে মুদ্রিত কাব্যটি সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য আমরা যথাসময়ে উপস্থিত করব।

'বনফুল' কাব্য *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব* পত্রিকার যে-সংখ্যায় সমাপ্ত হয় [অর্থাৎ ৪।১২, কার্তিক ১২৮৩] সেই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-সমালোচনামূলক গদ্যরচনা 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী/ও দু[ঃ]খ সঙ্গিনী' [পৃ ৫৪৩-৫০] প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছেন : 'প্রথম যে-গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা।' [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩] রচনাটি তাঁর প্রথম 'গ্রন্থসমালোচনা' একথা ঠিক, কিন্তু 'প্রথম গদ্যপ্রবন্ধ' নয়, সে-মর্যাদা সম্ভবত *তত্ত্ববোধিনী*-তে প্রকাশিত জ্যোতিষ-বিষয়ক রচনা 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' নামক প্রবন্ধটির প্রাপ্য।

এই প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কোনো রচনা-সংগ্রহে গৃহীত হয়নি। দীর্ঘকাল পরে *বিশ্বভারতী পত্রিকা*-র ১৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা-তে [বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯। ৩১৭-২৩] পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১৫শ খণ্ডে ১০৬-১২ পৃষ্ঠায় 'সম্পূরণ' অংশে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনার একটি ইতিহাস দিয়েছেন।[৫] 28 Dec 1875 [১৪ পৌষ ১২৮২] 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি ভুবনমোহিনী-নাম্নী কোনো মহিলার লেখা বলে সকলের ধারণা হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সাধারণী ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক পত্র কাব্যটির ও কবির যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে বড়ো এক বন্ধু* তাঁকে মধ্যে মধ্যে 'ভুবনমোহিনী' সই-করা চিঠি এনে দেখাতেন। 'ভুবনমোহিনী'র কবিতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে প্রায়ই কাপড় বা বই ভক্তি-উপহাররূপে পাঠিয়ে দিতেন। [আমাদের ধারণা বন্ধুর সঙ্গে কৌতুক করার প্রলোভনে রবীন্দ্রনাথ এখানে একটু অতিরঞ্জন করেছেন।] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল অন্যরকম :'এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় মনে করা অসম্ভব হইল।'[৫] রবীন্দ্রনাথ এই বইটি এবং হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' [20 Oct 1875] ও রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর সরোজিনী' [13 May 1876] অবলম্বনে এই সমালোচনা-প্রবন্ধটি রচনা করেন। 'খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম।' খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম।'[৫] সুবিধে ছিল এই যে, ছাপার অক্ষরে রচনা দেখে লেখকের বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু উক্ত বন্ধুটি উত্তেজিত হয়ে এসে জানালেন যে, একজন বি.এ. এই লেখার জবাব লিখছেন। স্কুল-পলাতক কিশোর রবীন্দ্রনাথের তখনকার মনোভাবটি অনুমেয় : 'আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমি যে-কীর্তিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়াছি বড়ো বড়ো কোটেশনের নির্মম আঘাতে তাহা সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়াছে এবং পাঠকসমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ।'[৬] কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যবশত কোনো বি.এ. সমালোচক এই প্রবন্ধটির সমালোচনা করতে অগ্রসর হননি।

রবীন্দ্রনাথ এই গদ্যরচনাটি নিয়ে যে-ধরনের পরিহাস করেছেন, তা প্রবন্ধটির প্রাপ্য নয়। এতদিন ধরে কৃশকায় বাংলাসাহিত্যের পাঠ্য-অপাঠ্য প্রায় সমস্ত বই, রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাসের কাব্য-নাটক, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য, রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সাহায্যে পঠিত ইংরেজি কাব্যসাহিত্য চর্চার ফলে রবীন্দ্রনাথের মানস-গঠন কত পরিণত হয়ে উঠেছিল, প্রবন্ধটিতে তার পরিচয় আছে। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'এই প্রবন্ধে বালক-সমালোচককে মেঘদূত, ঋতুসংহার, Lalla Rookh, Irish Melodies প্রভৃতির উল্লেখ করিতে দেখি। এইসব মতামত স্বল্প ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন চৌদ্দ বৎসরের বালকের লেখনী-নির্গত হওয়া সহজ নহে। আমাদের মনে হয় এই রচনায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর হাত না থাকিলেও তাঁহার উপদেশ ও উদাহরণমালা সরবরাহ বিষয়ে অকৃপণতা যে ছিল, তাহা প্রবন্ধটি পাঠ করিলে স্পষ্ট হইবে।'[৭] এই মন্তব্য মেনে নিতে আমাদের আপত্তি আছে। এই পর্বে বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যপাঠে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সাহায্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কতটা মূল্যবান ছিল, তা তিনি স্বয়ংই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন;[৮] কিন্তু সেখানে তিনি একথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি যে অক্ষয়চন্দ্রের কাছে যেমন 'কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা' শুনেছেন, তেমনি তাঁকে নিয়ে 'তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা' করতেও ছাড়েননি। আসলে অক্ষয়বাবুর 'সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ' রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন' করে তুলেছিল। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সচেতন বোধশক্তির স্বাধীন প্রকাশ ঘটেছে। এ-প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই 'মালতীপুঁথি'-র পৃষ্ঠায় *Irish Melodies* ও Byron-এর *Childe Harold's Pilgrimage* থেকে কবিতা অনুবাদ করেছেন। সুতরাং প্রবন্ধটি লেখার সমকালে তাঁর মানসিক পরিণতির মাত্রা নিতান্ত কম ছিল না।

সেই যুগে পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থ-সমালোচনার দুটি রীতি দেখা যেত। একটি রীতি ছিল 'সংক্ষিপ্ত সমালোচন', অপ্রধান বা বিশেষ গুণবর্জিত পুস্তকগুলি এই শিরোনামায় সাধারণভাবে সমালোচিত হত। কিন্তু অপর রীতিতে সমালোচনার জন্য গ্রহণ করা হত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলিকে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমালোচ্য গ্রন্থ অবলম্বন করে সমালোচক কোনো বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত বিশ্লেষণ করতেন। *বঙ্গদর্শন*-এর পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র উভয় রীতিতেই সমালোচনা করেছিলেন, বিশেষত দ্বিতীয় রীতির সমালোচনা তাঁর হাতেই বিশিষ্ট চেহারা লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ *বঙ্গদর্শন* ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর এই প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত রীতিকে অনুসরণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তিনি প্রবন্ধের শুরুতে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতির সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করে পরে সমালোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করেছেন, বঙ্কিমের মতো সাহিত্য-উপদেষ্টার উচ্চাসন থেকে 'উপদেশ' দেবার ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন, যদিও তাঁর বয়স তখন পনেরো বছর পাঁচ মাস মাত্র। বাংলাদেশে গীতিকাব্যের বাহুল্য সম্পর্কে তাঁর মতামত অনেক পরিমাণে বঙ্কিম-প্রভাবিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গদ্যরচনারীতিও প্রবন্ধটির মধ্যে যথোচিত সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

প্রবন্ধটি সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন তাঁর 'অগ্রদূত' প্রবন্ধে [দ্র বি. ভা, প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯। ৩৯৮-৪১৮]। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে এই মূল্যবান আলোচনাটি পড়তে অনুরোধ করে বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকার ফাল্গুন ১২৮২ [পৃ ১৫৯-৬৩], চৈত্র ১২৮২ [পৃ ২০৫-১০] এবং ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ [পৃ ২৫৫-৫৯], আষাঢ় [পৃ ৩৪৬-৫০] ও আশ্বিন-কার্তিক [পৃ ৪৮৪-৮৬]-সংখ্যায় নামহীন কোনো লেখকের 'প্রলাপ-সাগর' নামক একটি রচনা প্রকাশিত হয়। ড সুকুমার সেন আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৮-তে 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য-রচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে রচনাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে দাবি করেন, পরে প্রবন্ধটি তাঁর 'রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু' [১৩৯০] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় [পৃ ১৬৪-৮০]। তাঁর দাবির সপক্ষে যুক্তি দুটি : "প্রথম হল প্রবন্ধের—আসলে প্রবন্ধমালার—নাম। দ্বিতীয় হল প্রবন্ধমালার বস্তু ও ভাষা।... 'প্রলাপসাগর কাঁচা হাতের লেখা, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবে ও ভাষার ঢঙে যে বুদ্ধির ও কৌশলের ছাপ আছে তা যে রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব সে কথা বুঝতে এতটুকুও দেরি হবে না তাঁদের যাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখা মন নিয়ে পড়েছেন।" এর পরে ড সেন পাঁচটি সংখ্যা থেকেই প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃতি দিয়েছেন [অবশ্য উদ্ধৃতিগুলি মুদ্রণপ্রমাদে কণ্টকিত]।

পাঁচটি 'উচ্ছ্বাস'-এ লেখক 'আভিধানিক তরঙ্গ', 'সাহিত্যিক তরঙ্গ', 'বৈয়াকরণ তরঙ্গ', 'ঐতিহাসিক তরঙ্গ ও 'ভৌগোলিক তরঙ্গ' আখ্যায় কৌতুকের সুরে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর অনেক রবীন্দ্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে; ড সেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' ও 'রসিকতার ফলাফল' রচনার কথা উল্লেখ করেছেন—১২৮৮ বঙ্গাব্দে লিখিত 'গোলাম চোর', 'চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়', 'জীবন ও বর্ণমালা', 'রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রবন্ধের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য মনে হতে পারে 'অমিত্রাক্ষর লেখার আদর্শ হিসেবে রচিত আঠারো ছত্রের নমুনাটি—মধুসূদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু পরে প্রকাশিত মনোভাবের সঙ্গে তা যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ। দেশীয় সংবাদপত্রের রুচিহীনতা, ইতিহাস ও ভূগোলে বিদেশি নকল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরেও তীব্র সমালোচনা করেছেন।

গোপালচন্দ্র রায় "'প্রলাপ সাগর' কি রবীন্দ্রনাথের লেখা" [রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন। ১৪৫-৫০] প্রবন্ধে ড সেনের মতের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর যুক্তি, এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোথাও উল্লেখ করেননি এবং অভিজাত ও ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে বেড়ে-ওঠা বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এইরকম 'অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ' রচনা লেখা 'কল্পনার অতীত'। কিন্তু 'নাটক লেখার আদর্শ' অংশে একটি যৌন-ইঙ্গিত ও দেশীয় সংবাদপত্র প্রসঙ্গে 'বেশ্যাসক্ত' শব্দটি ব্যবহার করা ছাড়া আর-কোনো অশালীনতা বা কুরুচির পরিচয় রচনাটিতে নেই।

তবে রচনাটিকে নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রনাথের নামে চিহ্নিত করা সত্যই কঠিন, বিশেষত তাঁর বয়সের বিচারে।

হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশন এই বৎসর ৮ ফাল্গুন রবিবার [18 Feb 1877] রাজা বদনচাঁদের টালার বাগানে অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উপলক্ষে বক্তৃতাদি অবশ্য শুরু হয় মাঘসংক্রান্তি-র [২৯ মাঘ শনি 10 Feb] দিন থেকেই। ঐদিন ১নং শঙ্কর ঘোষ লেনে দ্বিজেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন ও রাজনারায়ণ বসু ভগবদ্গীতা থেকে পাঠ করেন। কিন্তু মেলার প্রধান দিন ৮ ফাল্গুন মেলা-স্থলে পুলিশী তাণ্ডবের ফলে অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যায় [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪]। রবীন্দ্রনাথ এবারের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং এখানে পরিবেশন করার জন্য একটি গান ও সদ্যসমাপ্ত দিল্লী-দরবার [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫] অবলম্বনে একটি কবিতাও রচনা করেছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হওয়ায় সেখানে তা পরিবেশন করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য সভাস্থলে না হলেও, মেলা-প্রাঙ্গণেই তিনি কবিতাটি পাঠ করে ও গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে সাধারণী-র প্রতিবেদক লেখেন : 'আমরা নিরাশ মনে নবগোপাল বাবুকে অভিসম্পাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্র বাবু 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছায়ায় দুর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতর বৎসরের অধিক হয় নাই [রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পনেরো বছর ন'মাসের কিছু বেশি]। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্রিত হইয়াছিলাম, তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্য্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাহার কোমল হৃদয় পর্য্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—আয় ভাই "আমরা গাইব অন্য গান।" এক জন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন যখন এই কলি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে। কিন্তু আর এক জন বন্ধু বলিলেন, "পাছে কাঁচা-মিঠা আঁম হয়, এই আশঙ্কা। ঈশ্বর করুন এ আশা অমূলক হউক।"[৯]

এই 'সুপরিচিত কবি' হচ্ছেন নবীনচন্দ্র সেন। তিনিও স্মৃতিকথায় ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন: 'স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে [1877 হবে] আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময় কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে 'ন্যাশনাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম। ...একজন সদ্য-পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে, একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম, সেখানে সাদা টিলা ইজার চাপকানপরিহিত একটি সুন্দর নব-যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত, স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি

স্বর্ণ-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—“ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।” তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম, সেই রূপ, সেই পোষাক। সহাসিমুখে করমর্দ্দন কার্য্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি ‘নোটবুক’ বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটোম্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই এক দিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি ‘ন্যাশনাল মেলা’য় গিয়া একটি অপূর্ব্ব নব-যুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন—“কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচা মিঠা আঁব।”[১০]

এই-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ[১১] লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দপনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। ...সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন একথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।[১২]

কবিতাটি সম্ভবত সমকালীন কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। অনেকে বলেছেন, লর্ড লিটন-প্রবর্তিত Vernacular Press Act [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬] বা দেশীয় সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইনের কঠোর বিধিব্যবস্থার জন্য কবিতাটিকে পত্রিকায় প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়নি। বহুকাল পরে সজনীকান্ত দাসের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 15 Oct 1939 [রবি ২৮ আশ্বিন ১৩৪৬] মংপু থেকে এ-সম্পর্কে লিখেছিলেন : ‘প্রথম লর্ড লিটনের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যে কবিতা লিখেছিলুম হিতৈষীদের সতর্কতা মান্য করে সেটা লোপ করে দেওয়া হয়েছিল। মনে আছে, কেউ কেউ সেটা হাতে লিখে প্রচার করে বেড়াতেন।’[১৩] পরে সজনীকান্ত কবিতাটির ‘একটি রূপান্তরিত মুদ্রিত রূপ শ্রীযতিনাথ ঘোষের ইঙ্গিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘স্বপ্নময়ী নাটকে’র (১৮৮২ খ্রীঃ) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের একটি স্বগত উক্তির মধ্যে আবিষ্কার’[১৪] করেন। সেখানে নাটকের প্রয়োজনে কবিতাটিতে ‘ব্রিটিশ’ শব্দটি বদলে ‘মোগল’ শব্দটি বসানো হয়। কবিতাটির প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি হল:

> ‘দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
> প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।’[১৫]

লক্ষণীয়, কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তিতে ‘আমরা ধরিব আরেক তান’ অংশটি *সাধারণী*-র প্রতিবেদকের হাতে ‘আমরা গাইব অন্য গান’-এ পরিণত হয়েছে। কবিতাটির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এতেও রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে প্রিয় পর্ব-বিন্যাস ৬+৬+৬+৫ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, অবশ্য যুক্তাক্ষরের বহুল

ব্যবহারও লক্ষ্য করবার মতো যা বঙ্গসুন্দরী-র ছন্দ থেকে সারদামঙ্গল-এর ছন্দে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসটিকে চিহ্নিত করেছে।

সাধারণী-র উক্ত প্রতিবেদনে 'দিল্লীর দরবার' কবিতাটির সঙ্গে একটি গীত রচনা ও গেয়ে শোনানোর কথাও বর্ণিত হয়েছে [নবীনচন্দ্র সেন অবশ্য 'কয়েকটি গীত' গাওয়ার কথা লিখেছেন]। এই গীতটি কী? রবীন্দ্রজীবনী-কারের মতে, গানটি হল 'ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি' [গীতবিতান। ৮১৫]।[১৬] তিনি অবশ্য তাঁর এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোনো যুক্তি প্রদর্শন করেননি। আবার গীতবিতান-সম্পাদক অনুমান করেছেন, 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' [গীতবিতান। ৮১৬] গানটিই হিন্দুমেলায় গীত সেই গান। এও নিছক অনুমান, যথেষ্ট যুক্তি-প্রয়োগে প্রমাণিত নয়। বস্তুত 'জাতীয় সঙ্গীত' [২য় সং, 30. Aug, 1878] গ্রন্থে সংকলিত নিম্নোক্ত চারটি গানের মধ্যে ভাব এবং কোথাও কোথাও বাক্য গঠনে ও শব্দপ্রয়োগে এমন সাদৃশ্য দেখা যায় যে, মনে হয় গানগুলি একই সময়ে লেখা—এর মধ্যে যে-কোনো একটি বা একাধিক গান হিন্দুমেলার উক্ত গাছতলার আসরে গীত হয়ে থাকতে পারে। গানগুলির তালিকা ও অন্যান্য বিবরণ দেওয়া হল:

১। 'ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে' দ্র রবিচ্ছায়া [বৈশাখ ১২৯২, 'জাতীয় সঙ্গীত'। ১]। ১৫৯, রাগিণী গৌড়মল্লার; গীতবিতান ৩ | ৮১৮; স্বরবিতান ৪৭।

২। 'তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ' দ্র ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪। ১৪৪, 'উৎসর্গগীতি', জয়জয়ন্তী—চৌতাল; রবিচ্ছায়া [জাতীয়। ২]। ১৬০; গীতবিতান ৩। ৮১৯; স্বরবিতান ৪৭; নরেন্দ্রনাথ দত্ত [স্বামী বিবেকানন্দ]-সম্পাদিত 'সঙ্গীত কল্পতরু' [১২৯৪] গ্রন্থের 'জাতীয় সঙ্গীত' বিভাগে গানটি সংকলিত হয়েছিল।

৩। 'অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী' দ্র সঙ্গীত কল্পতরু; রবিচ্ছায়া-তে গানটি নেই; দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' [১৩১২] গ্রন্থে এটি রবীন্দ্রনাথের নামেই সুরতাল উল্লেখ-সহ মুদ্রিত হয়; গীতবিতান ৩। ৮১৬; স্বরলিপি নেই।

৪। 'ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি' দ্র সঙ্গীত কল্পতরু; রবিচ্ছায়া-তে গানটি নেই; গীতবিতান ৩ । ৮১৫; স্বরলিপি নেই।

উপরোক্ত রচনাগুলি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : "ওই পুস্তকের ['জাতীয় সঙ্গীত'] ১৮৭৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে রচনা চারিটি ছিল না। তাই অনুমান হয় এইগুলি ১৮৭৬ ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৭৮ আগস্টের মধ্যে রচিত [রবীন্দ্রনাথ May 1878-এর মাঝামাঝি সময়ে আমেদাবাদ যাত্রা করেন, সুতরাং সময়ের নিম্নসীমাটিকে কমিয়ে Apr 1878 করা যায়।...শেষের দুইটি কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন, অন্য প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। 'ভারতীয়-সঙ্গীতমুক্তাবলী', ২য় সং ১৮৮৬, পৃ ৪৩-৪৪, 'সঙ্গীত-কোষ', ২য় সং ১৩০৬, পৃ ৯৯১ 'জাতীয়-সঙ্গীত' প্রভৃতি সঙ্গীত-সংগ্রহ-গ্রন্থে এইগুলি তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়া বাহির হইয়াছে।"[১৭] 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী' নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

গানগুলি সম্ভবত 'সঞ্জীবনী সভা'র অনুপ্রেরণায় লেখা। 'সঞ্জীবনী সভা' কবে স্থাপিত হয়েছিল এবং তার উত্তেজনার আগুন পোহানো কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলার মতো তথ্যের অভাব। তবে বৈশাখ ১২৮৩ [Apr 1876]-এর আগে এর প্রতিষ্ঠা হয়নি, একথা জোর করেই বলা যায়—কেননা মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রজনাথ দে এই সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং

তিনি ১০ বৈশাখ তারিখেই ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। তাছাড়া এর পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিলাইদহে ছিলেন এবং ১২৮৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসেরও অনেকটা যে তাঁরা সেখানেই কাটিয়েছিলেন, তার বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতায় 'ভারতকঙ্কাল আর কি এখন/ পাইবে হায় রে নূতন জীবন;/ ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,/ আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে সঞ্জীবনী সভার 'মৃতভারতে প্রাণসঞ্চার'-এর উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে 1874-এর শেষাংশ বা 1875-এর একেবারে প্রথম দিকে সঞ্জীবনী সভার প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে যে অনুমান করেছেন,[১৮] তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যে ধরনের স্বাদেশিকতার উত্তেজনা সঞ্জীবনী সভার মতো গুপ্তসমিতি স্থাপনের পিছনে কার্যকরী ছিল, তা বাংলাদেশে প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি। আমরা আগেই বলেছি, Jul 1875-এ বিলেত থেকে ফিরে তিনি আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত স্টুডেন্টস' অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেন ও বিভিন্ন জায়গায় মাৎসিনির জীবনাদর্শ প্রচার করতে থাকেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ভাদ্র ১২৮২ [Aug-Sep 1875] থেকে আর্য্যদর্শন পত্রিকায় 'জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী' প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এর ফলে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় ইতালির কার্বোনারি সম্প্রদায়ের অনুকরণে অনেকগুলি গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল এ-সম্পর্কে লিখেছেন :

> সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ নব্য ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা আমাদিগের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি করিয়া ম্যাট্‌সিনি এবং ইয়ং ইতালী (Young Italy) সমাজের সভ্যেরা নিজেদের মাতৃভূমিকে অস্ট্রিয়ার শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, সুরেন্দ্রনাথের মুখে এই কাহিনী শুনিয়া আমাদের অন্তরে একটা নূতন স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা আসে। ম্যাট্‌সিনি প্রথমে ইতালীর প্রাচীন বিপ্লববাদী কারবনারাইদিগের (Carbonari) সঙ্গে জুটিয়া পড়েন। কারবনারাই-দল দেশময় বহুসংখ্যক গুপ্ত রাষ্ট্রীয় সমিতির গঠন করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি গুপ্তষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার দ্বারা দেশ উদ্ধার হইবে না, ইহা বুঝিয়া অল্পদিন মধ্যেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যান। কিন্তু কারবনারাইদিগের কথা কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীকে একরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। দলে দলে মিলিয়া তাঁহারা কারবনারাইদিগের অনুকরণে নিজেদের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট গুপ্ত-সমিতি (বা Secret Society) গড়িবার চেষ্টা করেন। এ সকলের পিছনে কোনো প্রবল বিপ্লববাদের প্রেরণা ছিল না।[১৯]

শিবনাথ শাস্ত্রী এই সময়ে বিপিনচন্দ্র, কালীশংকর সুকুল, আনন্দচন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র রায়, তারাকিশোর চৌধুরী ও সুন্দরীমোহন দাসকে নিয়ে এই ধরনের একটি সমিতি গড়েন। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, তখন শাস্ত্রী মহাশয় হেয়ার স্কুলে নিযুক্ত ছিলেন ও ঘটনার ছ-মাস পরে সরকারী কর্মে ইস্তফা দিয়ে তিনি, গগনচন্দ্র হোম ও উমাপদ রায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিবনাথ 15 Feb 1878 [8 ফাল্গুন ১২৮৪] ইস্তফা-পত্র দেন ও 1 Mar থেকে তা কার্যকরী হয়। সুতরাং এই সমিতি প্রতিষ্ঠার সময় সম্ভবত ভাদ্র ১২৮৪ [Aug-Sep 1877] বা তার কাছাকাছি। সঞ্জীবনী সভা যদি এর পূর্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলেও 1876-এর শেষ বা 1877-এর প্রথমে অর্থাৎ পৌষ ১২৮৩-এর কাছাকাছি সময়েই তা হয়েছিল। এছাড়াও শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমানের বিরুদ্ধে বলা যায়, 'সরোজিনী' প্রকাশের [অগ্রহায়ণ ১২৮২ : Nov 1875] পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁদের সমশ্রেণীতে 'প্রমোশন' দিয়েছিলেন, 'সঞ্জীবনী সভা'-র সূত্রে উভয়ের যে ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়, এর পূর্বে তা গড়ে ওঠেনি।

গগনচন্দ্র হোম উক্ত সমিতিতে দীক্ষাগ্রহণের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা খুবই কৌতূহলজনক : 'আমার দীক্ষার দিনে বরাহনগরে গঙ্গাতীরে এক বাগানে গভীর রাত্রে তাঁহারা সকলে [পূর্বদীক্ষিত ছ'জন সভ্য] দীক্ষার্থী উমাপদ রায় ও আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন; সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হইল। আমরা বুক চিরিয়া

রক্ত দিয়া বটপত্রে লিখিয়া নিজেদের প্রবৃত্তির কাম ক্রোধ লোভ হিংসা, ধর্মবিশ্বাসে প্রতিমাপূজা, সমাজে জাতিভেদ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরাধীনতা অগ্নিতে আহুতি দিলাম। তাহার পর বটপত্রগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম।'*

এর সঙ্গে সঞ্জীবনী সভার দীক্ষাগ্রহণের ও সভানুষ্ঠানের রীতি-প্রকৃতির অনেক মিল আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন: 'যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষমহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। ...আদি-ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল-রেশমে জড়ানো বেদ-মন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত।'[২০] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত এক গুপ্তভাষায় সভার কার্যবিবরণী লিখিত হত, এই ভাষায় 'সঞ্জীবনী সভা' নামটির রূপ ছিল 'হামচুপামূহাফ্।' [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৭]

ঠন্‌ঠনের একটি গলির মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে† এই সভা বসত। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তার সভাপতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজনাথ দে প্রভৃতি তার সভ্য ছিলেন, পরে নবগোপাল মিত্রকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল। সভার আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটি ভাঙা ছোটো টেবিল, কয়েকটা ভাঙা চেয়ার ও আধখানা ছোটো টানাপাখা—তারও আবার একদিক ঝুলে পড়েছিল। জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হবে, এই ছিল সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই সব কাজের জন্য সভ্যেরা তাঁদের আয়ের এক-দশমাংশ সভায় দান করতেন। স্বদেশে দেশলাই-এর কারখানা স্থাপন করা জাতীয় উন্নতিকর কাজের অঙ্গ ছিল। অনেক পরীক্ষার পর কয়েক বাক্স দেশলাই প্রস্তুত হল। কিন্তু তার এক বাক্সে যে-খরচ পড়তে লাগল তাতে একটি পল্লী সারা বছর উনুন ধরাতে পারত। 'আরও একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।'[২১] [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৮]

শোনা গেল, একটি অল্পবয়স্ক ছাত্র* কাপড়ের কল তৈরি করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত। সেটি কোনো কাজের জিনিস হচ্ছে কি না তা বোঝা সভার কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু যন্ত্রটি প্রস্তুত করতে যে ঋণ হয়েছিল, তাঁরা তা শোধ করে দিলেন। অবশেষে ব্রজবাবু একদিন মাথায় একটি গামছা বেঁধে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উপস্থিত এবং তাঁদের কলে এই গামছার টুকরো তৈরি হয়েছে বলে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিলেন—তখন তাঁর মাথার চুলে পাক ধরেছে!

ভারতবাসীর সর্বজনীন পোশাক কী হতে পারে তা নিয়েও সভা, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রচুর গবেষণা করেছেন। অবশেষে পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করে একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়ে ও সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির মিশ্রণে একটি পদার্থকে শিরোভূষণ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মধ্যাহ্নের প্রখর আলোয় গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। 'দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে

পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।'[২২]

রবিবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সদলবলে শিকারে† বেরোতেন। রবাহূত অনাহূত নানা শ্রেণীর অপরিচিত ব্যক্তিও দলে এসে জুটতেন। এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল। বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী প্রাতে শিকারে বেরোবার সময় রাশিকৃত লুচি তরকারি সঙ্গে দিয়ে দিতেন। মানিকতলার কোনো পোড়ো বাগানবাড়িতে ঢুকে পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসে লুচিগুলির সদ্ব্যবহার করা হত। ব্রজবাবুর বুদ্ধিতে একদিন ডাবের জলে পানীয়ের অভাবও মিটেছিল।

দলে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তাঁর গঙ্গার ধারের বাগানে একদিন সভ্যেরা জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করলেন। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়ে সকলে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে চীৎকার শব্দে গান জুড়ে দিলেন। 'রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁর ক্ষীণকণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল।'[২৩] অনেক রাত্রে গাড়ি করে তাঁরা বাড়ি ফেরেন।

উক্ত গান-সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি-তে "'আজি উন্মদ পবনে' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গান" বলে উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা হয়, এটি ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সজনি গো,/আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা' প্রথম পঙ্‌ক্তি-যুক্ত 'ভানুসিংহের কবিতা'-শীর্ষক গান, যার পঞ্চম পঙ্‌ক্তিটি হল 'উন্মদ পবনে যমুনা উথলত'। এই তথ্য থেকে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে, উপরোক্ত ঘটনাটি ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কোনো সময়ে ঘটেছিল এবং গানটি সেই সময়েই রচিত। এরূপ সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি অবশ্যই প্রবল, কিন্তু আমাদের ধারণা, দুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক তার আগেই দলে ভিড়ে ও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে সঞ্জীবনী সভার 'স্বর্গলোক' ভেঙে দিয়েছিলেন। এবং সম্ভবত এই উত্তেজনার অবসান ঘটার পরই নতুন উত্তেজনার সন্ধানে শ্রাবণ ১২৮৪ থেকে *ভারতী* পত্রিকার আবির্ভাব হয়। কারণ *ভারতী* প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর এইসব ছেলেমানুষিতে মেতে থাকার মতো অবকাশ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া সঞ্জীবনী সভা যে মন্ত্রগুপ্তির আদর্শে দীক্ষিত ছিল, সেখানকার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত গান পত্রিকায় প্রকাশ করলে সেই আদর্শচ্যুতির সম্ভাবনা। বিশেষত, *ভারতী*র উক্ত সংখ্যাতেই 'উৎসর্গ-গীতি' শিরোনামে 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ' —রবীন্দ্রনাথের লেখা এই গানটি প্রকাশিত হয়, যেটি স্পষ্টতই উক্ত সভার আদর্শে লিখিত—হয়তো ওই সভার জন্যই লেখা। সঞ্জীবনী সভার যদি ইতিমধ্যেই বিলোপ না ঘটত, তাহলে এগুলি পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হত না বলেই মনে হয়। সুতরাং অনুমান করা যায় সঞ্জীবনী সভার আয়ুষ্কাল মোটামুটি ছ'মাস—পৌষ ১২৮৩ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি গান সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ের শেষে সঞ্জীবনী সভার সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে লিখেছেন : 'দেশের সমস্ত খর্বত দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুইচক্ষু জ্বলিতে থাকিত,

তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।'[২৪]

গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটক-এর দ্বিতীয় সংস্করণ [১৮০১ শক (১২৮৬) : 1879 পৃ ৮৮-৮৯]-এ প্রথম মুদ্রিত হয় [১৩০৭ বঙ্গাব্দের সংস্করণে অবশ্য গানটি বর্জিত হয়েছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' [ফাল্গুন ১৮০২ শক (১২৮৭): 12 Feb 1881] গীতিনাট্যে দস্যুদলের মুখে 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটির মধ্যে এর ভাব ও ভাষার কিছুটা প্রতিধ্বনি এবং সুর ও তালের [খাম্বাজ—দাদরা] যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়। বালক পত্রিকার শ্রাবণ ১২৯২ সংখ্যায় [পৃ ১৭৮] গানটির অন্য একটি পাঠ দেখা যায়, সেখানে রচয়িতার কোনো উল্লেখ নেই। এই সময়ে প্রকাশিত 'রবিচ্ছায়া' গীতিসংগ্রহ-গ্রন্থে কিন্তু গানটি সংকলিত হয়নি। এর পর ভারতী ও বালক পত্রিকার কার্তিক ১২৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাসে 'এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন' [পৃ ৩৬৫] গানটির সঙ্গেও আলোচ্য গানটির অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে গানের বহি [১৩০০], কাব্য গ্রন্থাবলী [১৩০৩], কাব্যগ্রন্থ-এর অন্তর্গত 'গান' [১৩১০]—গীতি-সংকলনগুলির কোনোটিতেই এই গানটিকে দেখা যায় না। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত *সঙ্গীতপ্রকাশিকা*-র অগ্রহায়ণ ১৩১২ সংখ্যায় গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা-রূপে স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়, সেখানে 'বন্দে মাতরম্' ধুয়াটি নতুন যুক্ত হয়েছে [সম্ভবত স্বদেশী-আন্দোলনের পটভূমিকায়]। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সম্পাদিত 'গান' [১৩১৫] কিংবা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত গান' [১৩১৬] গ্রন্থে এটিকে পাওয়া যায় না। অবশেষে *সঙ্গীতপ্রকাশিকা*-য় প্রকাশিত পাঠটি দীর্ঘকাল পরে গীতবিতান ৩য় খণ্ডে [আশ্বিন ১৩৫৭ : 1950] সংকলিত হয়েছে।

গানটির এই দীর্ঘ জটিল ইতিহাসকে জটিলতর করেছেন ঐতিহাসিকেরা। রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'আমাদের বক্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথের কোনো গীতগ্রন্থে এই গানটি নাই এবং তিনি ইতিপূর্বে কোনো পত্রে বা প্রবন্ধে এই গান তাঁহার বলিয়া স্বয়ং দাবী করেন নাই। ...সুতরাং এই গানটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।'[২৫] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' [১৩৪৯]-এ লিখেছেন : 'গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি।' শান্তিদেব ঘোষও লিখেছেন : 'সন্দেহগ্রস্ত মন নিয়ে একদিন গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি সত্যই গানটি তাঁর রচিত কি না। তিনি বলেছিলেন গানটি তাঁরই রচনা।'[২৬] রবীন্দ্রজীবনী-কার এই উক্তিগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়েও উক্ত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, বা কোনো পত্রে-প্রবন্ধে নিজের লেখা বলে দাবি করেছেন—তাঁর বাল্য ও কৈশোরের রচনার স্বত্ব নির্বাচনের এই যদি মাপকাঠি হয়, তাহলে স্বয়ং প্রভাতবাবুর দ্বারা স্বীকৃত বহুসংখ্যক রবীন্দ্র-রচনাই আমাদের আলোচনার বহির্ভূত হয়ে পড়ে। সেইজন্যই জীবনস্মৃতি-র উদ্ধৃতি, *সঙ্গীতপ্রকাশিকা*-র উল্লেখ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিদেব ঘোষের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে আমরা গানটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে গ্রহণ করছি।

উপরে আমরা স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা ‘স্নেহলতা’ উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গটি আরও একটু বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। *ভারতী ও বালক* পত্রিকার কার্তিক ১২৯৬ সংখ্যায় এই উপন্যাসের যে অংশটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে চারু নামের এক কবি-বালক ও একটি গুপ্ত সভার যে চিত্র আঁকা হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ ও সঞ্জীবনী সভার একটি প্রতিচিত্র বলে মনে হয়।

স্বর্ণকুমারীর বর্ণনায় ‘চারু এখন যোড়শ বর্ষীয় বালক’ এবং এই গুপ্তসভার সভ্যগণ সম স্বরে যে গানটি গাইত, সেটি হল :

> একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
> জীবনে মরণে রব শপথ বন্ধন
> ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
> সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
> প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান
> সহায় আছেন ধর্ম্ম কারে আর ভয়।

সঞ্জীবনী সভা-পর্বে রবীন্দ্রনাথও ‘যোড়শবর্ষীয় বালক’ এবং সভার সভ্যগণ রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান প্রবল উৎসাহের সঙ্গে গাইতেন—এ-প্রসঙ্গে এই তথ্যগুলি আমরা স্মরণ করতে পারি। আরও একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, স্বর্ণকুমারী কী কৌশলে ‘একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন’ ‘তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ ‘ত্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—/ মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়’ প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি থেকে শব্দ চয়ন করে উপরোক্ত গানটির রূপ গঠন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের ‘তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ’ গানটি স্বর্ণকুমারীর ‘বিচিত্রা’ [১৩২৭] উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে ঈষৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া, সঞ্জীবনী সভার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তিনি এ-সময়ে ‘জ্যোতি’র্মণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় ও সাহায্যে এই কালপর্বেই তাঁর ‘দীপনির্বাণ’ উপন্যাস প্রকাশিত হয় [15 Dec 1876]; সুতরাং সেই ‘খ্যাপামির তপ্ত হাওয়া’র আঁচ তাঁর গায়েও নিশ্চয়ই লেগেছে, তারই প্রকাশ হয়েছে উপরোক্ত রচনায়। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও স্বর্ণকুমারী দেবীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ আছে ক্যাশবহি-র পাতায়, রবীন্দ্রনাথকে বহুবার ‘জানকীবাবুর বাটী’ যাতায়াত করতে দেখা যায়। এ-প্রসঙ্গে এ-কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাহিনীকাব্য ‘বনফুল’ যা *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রথম সর্গটির নাম ছিল ‘দীপ-নির্ব্বাণ।‘

বর্তমান বৎসরের শেষে *আর্য্যদর্শন* পত্রিকার চৈত্র ১২৮৩ [৩।১২] সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ‘ফুলবালা/ গীতিকা’র একাংশ প্রকাশিত হয় ৫৩৫-৩৮ পৃষ্ঠায়। রচনার শেষে ‘ক্রমশঃ প্রকাশ্য’ লেখা থাকলেও পরবর্তী অংশ এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়নি, দীর্ঘকাল পরে ভারতী পত্রিকার কার্তিক ১২৮৫ [২।৭] সংখ্যার ২৯৮-৩০৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ রচনাটি পরে সংকলিত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘শৈশব সংগীত’ [১২৯১: 29 May 1884] কাব্য-গ্রন্থে; বর্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলীর ‘অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ৪২৯-৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ‘তরল জলদে বিমল চাঁদিমা...কহে কলপনাদেবী’ অংশটি *আর্য্যদর্শন*-এ প্রকাশিত

হয়েছিল। এই পাঠটি 'শৈশবসঙ্গীত'-এ পুনর্মুদ্রিত হবার সময়ে একটি পাঠান্তর ও দুটি জায়গায় মোট বারোটি পঙ্‌ক্তি বর্জিত হয়। পাঠক ও গবেষকদের অবগতির জন্য বর্জিত পঙ্‌ক্তিগুলি নিয়ে সংকলিত হল :

'অচলিত সংগ্রহ'-তে ৪৩০ পৃষ্ঠায় 'সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া/আকাশে তুলিয়া করিব গান'-এর পরে—

একই নিমিখে হেরিব দুজনে
আকাশ পাতাল স্বরগ ধরা
তাই বলি বালা বীণাখানি লয়ে
মনে প্রাণে ঢালো সুধার ধারা। [*আর্য্যদর্শন*। ৫৩৬]

৪৩২ পৃষ্ঠায় 'ঘুমঘোরে আঁখি মুদিয়া রহিল/দিকের বালিকা সব' পঙ্‌ক্তিটির প্রথম প্রকাশিত রূপ হল : 'ঘুম ঘোর হতে জাগিয়া উঠিল/দিকের বালিকা সব।' এর পরবর্তী আটটি পঙ্‌ক্তি পরে বর্জিত হয়েছে :

ধীরে ধীরে ধীরে উঠিলরে তান
সুর বালা এল ফেলিয়া কেলী
শুনিতে লাগিল অবাক হইয়া
পৃথিবীর পানে নয়ন মেলি!

ধীরে ধীরে ধীরে উঠিলরে ধ্বনি
মধুরে ছাপিয়া নদীর গান
আকাশ ছাইয়া, স্বরগ ছাইয়া
কোথায় উড়িল মধুর তান। [*আর্য্যদর্শন*। ৫৩৭]

আশ্চর্যের ব্যাপার, ড সুকুমার সেন *আর্য্যদর্শন*-এ 'ফুলবালা' গীতিকার প্রথমাংশ প্রকাশের কথা উল্লেখ করলেও[২৭] পরবর্তী গবেষকেরা সেই তথ্যটিকে উপেক্ষা করেছেন। এর ফলে রবীন্দ্ররচনার কালক্রম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেমন ত্রুটি ঘটেছে, তেমনি ঐতিহাসিক বিচারবিভ্রাটও ঘটেছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে [20 Dec 1880], এতে চারটি গাথা সংকলিত হয়েছে : সাধের ভাসান [*ভারতী*, পৌষ ১২৮৬], খড়্গ-পরিণয় [ঐ, চৈত্র ১২৮৬], সাশ্রু-সম্প্রদান [ঐ, বৈশাখ ১২৮৭] ও অভাগিনী। ড পশুপতি শাশমলের মতে, অভাগিনী লেখিকার প্রথম দিকের রচনা যা রবীন্দ্রনাথের রচনারও পূর্ববর্তী। ড শাশমল তাঁর মতের সমর্থনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি-র লিপিকার বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : 'এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বর্ণকুমারীই বঙ্গসাহিত্যে সর্বপ্রথম গাথা রচনা করেন। গাথা-রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন।'[২৮] বাংলা সাহিত্যের প্রথম গাথা-কবিতা স্বর্ণকুমারীই রচনা করেছিলেন কিনা, সেই বিতর্কে না গিয়ে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠার পদানুসরণ করেছেন এই মত মেনে নিলে বলতে হয় 'অভাগিনী' ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসেরও পূর্বে লেখা। কিন্তু এতখানি অনুমানের যথার্থ কোনো ভিত্তি সত্যই আছে কি?

তথ্যের দিক থেকে 'ফুলবালা' গীতিকাটি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। প্রথমত, এটি কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, সমস্ত কবিতাটি একই সঙ্গে লিখিত কিনা এবং তৃতীয়ত, শেষাংশটি আর্য্যদর্শন-এ প্রকাশিত হয়নি কেন। আমরা আগেই বলেছি, কবিতাটির দুটি অংশের প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান সুদীর্ঘ—প্রথমাংশটি চৈত্র ১২৮৩-তে এবং শেষাংশটি কার্তিক ১২৮৫-তে প্রকাশিত হয়েছিল। *আর্য্যদর্শন*-এ মুদ্রিত অংশের শেষে 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' লেখা দেখে মনে হতে পারে, সমস্ত কবিতাটিই হয়তো একই সঙ্গে লিখিত হয়েছিল এবং ধারাবাহিকভাবে দুটি বা ততোধিক সংখ্যায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা ছিল—কিন্তু ইতিমধ্যে নিজেদের পত্রিকা ভারতী প্রকাশের আয়োজন শুরু হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনাটি পরিবর্তিত হয়। যদিও ভারতী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫ শ্রাবণ ১২৮৪ [রবি 29 Jul 1877] তারিখে, কিন্তু সংবাদটি বিজ্ঞাপিত হয় অনেক আগে ৫ আষাঢ় [সোম 18 Jun] তারিখে, আলাপ-আলোচনা-আয়োজন নিশ্চয়ই আরও আগেকার। তাছাড়া চৈত্র ১২৮৩ সংখ্যা আর্য্যদর্শন চৈত্র মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না [*সাধারণী*-র সংবাদ থেকে জানা যায়, পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪-রও পরে]। কিন্তু এতে তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর মিললেও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। 'ফুলবালা' গাথাটির কোনো সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে না থাকলেও একেবারে শেষে যে গানটি আছে—'দেখে যা—দেখে যা—দেখে যা লো তোরা/সাধের কাননে মোর'—তার প্রাথমিক রূপটি আমরা মালতীপুঁথি-র 24/১৩খ পৃষ্ঠায় পাই। এই পাণ্ডুলিপি থেকে মনে হয় গানটি এই সময়ে রচিত নয়, অনেক পরে ১২৮৫ অব্দের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেদাবাদে ছিলেন তখনকার লেখা; কারণ এই পাতারই অপর পৃষ্ঠায় [23/১৩ক] কয়েকটি অনুবাদ-কবিতা পাওয়া যায়, যেগুলি শ্রাবণ ১২৮৫ সংখ্যা ভারতী-তে 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন সাহিত্য [পৃ ১৭১-৮৪] প্রবন্ধের অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়। সুতরাং অনুমান করা যায়, 'ফুলবালা'র শেষাংশ যে-সময়েই লিখিত হয়ে থাক্-না কেন, আমেদাবাদে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ রচনাটির পরিমার্জনা করেছিলেন এবং সেই সময়েই এই গানটি তাতে যুক্ত হয়েছিল। এই গাথার অন্তর্ভুক্ত অপর গানটিও —'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে,/মধুপ হোথা যাস্ নে'—তাঁর এই পর্বে রচিত 'বলি ও আমার গোলাপ বালা' প্রভৃতি গানের আদর্শে লেখা বলে, মনে হয়, এটিও আমেদাবাদে থাকার সময়েই রচিত। তাছাড়া দুটি অংশের মধ্যে ছন্দ ও রচনারীতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে; প্রথম অংশটি অনেকটা 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছের ভাষায় ও ছন্দে লেখা, কিন্তু শেষাংশটির ছন্দও যেমন বিচিত্র পরীক্ষার পরিচয় বহন করে, ভাষাও তেমনই অনেকটা পরিণত। তাই দুটি অংশকে একই সময়ে লেখা বলে মনে হয় না। সেইজন্য আমাদের অনুমান, প্রথম অংশটি ১২৮৩ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে লিখিত হলেও, শেষাংশটি তিনি অনেক পরে আমেদাবাদে থাকার সময়েই রচনা করেছিলেন। এটি যে উক্ত সময়েই লেখা তার সুনিশ্চিত প্রমাণ আমরা যথাস্থানে উপস্থিত করব।

এই বৎসরে প্রকাশিত আর একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে দাবি করা হয়েছে। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : "১৭৯৮ শকের মাঘ মাসের (৯ম কল্প, ২ ভাগ, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় একটি ছোট অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে; অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট একটি পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেন না, তবে ভাষাটা যে তাঁহার সেকেলে ভাষারই মত, তাহা অস্বীকার করিতে

পারেন না; তিনি লেখেন, সেকালে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় ঠিক এই জাতীয় “কবিতা লিখিয়ে” আর কেহ ছিলেন না।”[২৯]

‘তারকা-কুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময়’—প্রথম পঙ্‌ক্তিযুক্ত ৮ ছত্রের এই অনুবাদ-কবিতাটি ‘রূপান্তর’ [১৩৭২] গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২-তে ‘রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর বলিয়া অনুমিত’ মন্তব্য-সহ মুদ্রিত হয়েছে [পৃ ১৯২-৯৩]। এখানে পঙ্‌ক্তিগুলি অন্যভাবে বিন্যস্ত হওয়ার জন্য কাব্যরূপটি অনেক বেশি স্পষ্ট।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা আমরা স্থগিত রেখেছিলাম, সেটি হল ভানুসিংহের কবিতা রচনার সূচনা-পর্বটি—কারণ এটিকে নির্দিষ্ট কালানুক্রমে বিন্যস্ত করা কঠিন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র-সম্পাদিত ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ’ নামক খণ্ডাংশে প্রকাশিত বৈষ্ণব-পদাবলি সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বিদ্যাপতির মৈথিলীমিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষার দুর্ভেদ্য অরণ্যে অনেক অধ্যবসায়ে তিনি প্রবেশের পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন। এই পদগুলির ভাষা ও ছন্দ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল বেশি; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক ভাবজগতে প্রবেশ করবার চাবিকাঠি তাঁর আয়ত্তে ছিল না, সুতরাং এই প্রেমের বহিরঙ্গ রূপটিই কেবল তাঁর আশ্রয় হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলির ভাব ভাষা ছন্দ ও রূপকল্পের যে অনুষঙ্গ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের কবিতার ভাব ও রূপের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, নিছক অনুকরণের মধ্য দিয়ে তার পদসঞ্চার রবীন্দ্রকাব্যে ঘটল এই সময়ে। তিনি লিখেছেন : ‘এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।’[৩০] এর আগেই তিনি অক্ষয় চৌধুরীর কাছে ইংলণ্ডের বালককবি চ্যাটার্টনের জীবনকথা শুনেছিলেন। চ্যাটার্টনের কবিতার সঙ্গে তাঁদের কারোরই পরিচয় ছিল না, কিন্তু প্রাচীন কবিদের ভাষা ও ছন্দ অনুকরণ করে লিখিত তাঁর Rowley Poems কিভাবে পণ্ডিতদেরও প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছিল, সেই নাটকীয় কাহিনী রবীন্দ্রনাথের ‘কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল’। চ্যাটার্টন মাত্র আঠারো বছর বয়সে [‘ষোলো বছর বয়সে’—জীবনস্মৃতি] আত্মহত্যা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।’[৩১] ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণে লিখিত তাঁর প্রথম কবিতা ‘গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে—অন্তঃপুরের কোণের ঘরে শ্লেটের উপর লেখা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবিতাটির জন্ম-বৃত্তান্ত : ‘একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম ‘গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে’। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম।‘ খুশি হওয়ারই কথা—এটি ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’র একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা, পরবর্তীকালে লিখিত অনেকগুলি পদে দুরূহ অপ্রচলিত এবং কিছুটা কর্কশ যে-সব শব্দ ব্যবহারের লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি, এই প্রথম পদটি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এটি লিখে তিনি এমন একজনকে [?] পড়ে শোনালেন ‘বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না’। সুতরাং সহজেই তাঁর কাছ থেকে বাহবাও পাওয়া গেল।

কবিতাটি সম্ভবত এই বৎসরের গোড়ার দিকেই লিখিত হয়েছিল। ‘কাব্য গ্রন্থাবলী’ [১৩০৩]-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫। ১৬ বৎসর বয়সের লেখা’। তাই মনে হয়, উপরোক্ত কবিতাটি লেখার খুশিতে তিনি পর পর এই জাতীয় অনেকগুলি পদ লিখে ফেলেন। প্রায়

চ্যাটার্টনের অনুকরণেই তিনি তাঁর একটি বন্ধুকে [? প্রবোধচন্দ্র ঘোষ] বললেন যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরি খুঁজতে খুঁজতে বহুকালের জীর্ণ একটি পুঁথি পেয়ে তা থেকে ভানুসিংহ-নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কপি করে এনেছেন এবং তাঁকে স্বরচিত 'কবিতাগুলি' শোনালেন। বন্ধুটি যখন বিষম বিচলিত হয়ে বললেন যে, এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়েও বের হতে পারত না সুতরাং এ পুঁথি অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ছাপাবার জন্য দেওয়া নিতান্তই দরকার—'তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা।'[৩১]

'গহির নীদমে অবশ শ্যাম মম' ['শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে'—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২।১৭, ১২ নং] পদটি ছাড়া অন্যগুলির কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, সুতরাং কবিতাগুলিকে কালানুক্রমিকতায় বিন্যস্ত করার সুযোগ নেই। *ভারতী* পত্রিকায় বা মুদ্রিত গ্রন্থে [১২৯১]-ও কালানুক্রম রক্ষা করা হয়নি। অবশ্য উপরোক্ত পদটি আলোচ্য সময়ের অনেক পরে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে আমেদাবাদে লেখা হয়েছিল, এ-সম্পর্কে প্রমাণ যথাস্থানে উপস্থাপিত হবে। তাছাড়া 'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান', 'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়', 'আজু সখি মুহুমুহু' প্রভৃতি কয়েকটি পদ রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে লেখা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

বৎসরের শুরুতেই, সম্ভবত ১৯ বৈশাখ [রবি 30 Apr 1876] তারিখে, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজার সঙ্গে ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহনের বিবাহ হয়। ললিতমোহন রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের দৌহিত্র। বিবাহের পূর্বে ১৮ বৈশাখ মোহিনীমোহন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিবাহ-সম্পর্কে নানারকম নির্দেশ দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের 'বক্রোটা শেখর' থেকে ৮ বৈশাখ [19 Apr] বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে একটি পত্র লেখেন। পত্রটির কিছুটা অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি, এর থেকে বোঝা যাবে সংসার থেকে দূরে থাকলেও সামান্যতম খুঁটিনাটি বিষয়েও তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন : 'ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল।...তিনি যাহা সংকল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন। এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিসটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কতটুকু ভার থাকিবে, সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোনো অংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না।'[৩২]—সেই বর্ণনা যে কতটা সঠিক এই পত্রই তার প্রমাণ। দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন : দ্বিজেন্দ্রর কন্যা সরোজার শুভবিবাহ উপস্থিত। তুমি, জ্ঞানচন্দ্র ও [শম্ভুনাথ] গড়গড়িকে লইয়া বেদীতে আসন গ্রহণ করিবে এবং আচার্য্যের কার্য্য সমাধা করিয়া এই শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া দিবে। স্ত্রী আচার হইয়া বরকন্যা দালানে আইলে তবে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইবে, তোমরা সেই সময়ে বেদীতে বসিবে, তাহার পূর্ব্বে তাহাতে বসিবে না। দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে বরযাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দরদালানে বসাইবে। পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে বরযাত্রদিগকে দালানের বেদীর পশ্চিমভাগে সমাদর পূর্ব্বক

বসাইবে। এবং বরকে গদি হইতে উঠাইয়া আনিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবে। গদি খালি হইলে সেই গদি বরের জন্য বাটীর ভিতর পাঠাইয়া দিবে এবং তাহার দুই পার্শ্বের বৈঠকীসেজ বেদীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে বেদীতে আলো কম হইবে না। এবং তুমি পুঁথি বেশ দেখিতে পাইবে।...'[৩৩] এই পত্র থেকে ঠাকুরবাড়ির বিবাহ-বাসরেরও একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। ৩ বৈশাখ 'শ্রীমতো সরোজাসুন্দরির বিবাহের এস্টিমেট' দেবেন্দ্রনাথের নিকট পাঠানো হয়, এটিও একটি অবশ্যপালনীয় রীতি ছিল।

শ্রাবণ মাসের গোড়ার দিকে হেমেন্দ্রনাথের একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু ১৪ শ্রাবণ [28 Ju] তারিখে তার মৃত্যু হয়।

১২ ফাল্গুন [বৃহ 22 Feb 1877] তারিখে সৌদামিনী দেবীর একমাত্র পুত্র সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় ইরাবতী দেবীর ননদ মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কন্যা নরেন্দ্রবালা দেবীর [জন্ম : ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭১ বুধ 16 Nov 1864]* সঙ্গে। বিবাহ-সংবাদটি *সাধারণী* [৭। ২০, ২৯ ফাল্গুন]-তে প্রকাশিত হয় : '১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার দিবসে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কন্যার পুত্র বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত এলাহাবাদের মুন্সেফ বাবু মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহটী ব্রাহ্মমতে হইয়াছিল। পাত্রটির বয়ঃক্রম অনুমান ১৮ বৎসর হইবে। ইনি সত্বরেই কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়নের জন্য বিলাতে যাইবেন। পাত্রীটির বয়স অনুমান ১৪ বৎসর [১২] হইবে। সঙ্গীত ও উপাসনাদির সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ স্থলে স্বয়ং দেবেন্দ্র বাবু উপস্থিত ছিলেন।' সত্যপ্রসাদ এর কিছুদিন পূর্বেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছেন, বিবাহের সময় তাঁর বয়স ১৯ বৎসর ৪ মাস [জন্ম : ৩১ আশ্বিন ১২৬৬, 16 Oct 1859]* মাত্র। [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ৮ কার্তিক 23 Oct সত্যপ্রসাদের এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফী বাবদ দশ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁর সহপাঠী সোমেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো খরচ দেখা যায় না। সত্যপ্রসাদ এই পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজেই এফ. এ. পড়া শুরু করেন।]

ফাল্গুন মাসে সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র কবীন্দ্রনাথের [তার ডাক নাম ছিল চোবি] অন্নপ্রাশন হয়। সত্যেন্দ্রনাথ সিন্ধুপ্রদেশে হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত শিকারপুরে ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ (অস্থায়ী) রূপে কাজ করার সময়ে সেখানেই তাঁর এই পুত্রের জন্ম হয়। মাঘ মাসের শুরুতেই [Jan 1877] ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতা আসেন। ফার্লো [Furlough] ছুটি নিয়ে সপরিবারে ইংলণ্ডে যাবার আয়োজন করাই হয়তো তাঁর কলকাতায় আসার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কানাঘুষোয় এই সংবাদ পেয়ে সমাচার চন্দ্রিকা [৬৫। ১৬৪, ১২ ফাল্গুন 22 Feb] লেখে : 'শুনিলাম, সিভিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনশ্চ ইংলণ্ড যাইতেছেন। কেন যাইবেন তাহা কিছু প্রকাশ হয় নাই। বোম্বায়ের জজিয়তী পদ কি ত্যাগ করিয়া যাইবেন?' সংবাদটি *সাধারণী* [৭।১৮, ১৫ ফাল্গুন]-ও কিছু অতিরিক্ত তথ্য-সহ প্রকাশ করে : 'আহমদাবাদের জজ সিবিল বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে যাইবেন। তাঁহার একটি সহোদর ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে সূক্ষ্মশিল্পাদি অধ্যয়নার্থ সেইখানে রাখিয়া আসিবেন।' সত্যপ্রসাদ-সংক্রান্ত যে-সংবাদটি ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে মনে হয় ভ্রাতুষ্পুত্র শব্দটি ভাগিনেয়-র বদলে ভুল ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, সহোদরটি কে? আমাদের ধারণা, এই সহোদর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ নন। শিক্ষার বাঁধা-পথে তাঁকে কিছুতেই চালাতে না পেরে অভিভাবকেরা কতখানি চিন্তিত ছিলেন, তার কিছু আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই হয়তো তাঁর সম্পর্কে বর্তমানে এই পরিকল্পনাটি গৃহীত

হয়েছিল। অবশ্য তাঁর ও সত্যপ্রসাদের ক্ষেত্রে এখনই এই প্রস্তাব কার্যকরী করা কোন কারণে সম্ভব হয়নি, এক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার ঘোষিত সংকল্প নিয়ে বিলাতযাত্রার জন্য তৈরি হন, সত্যপ্রসাদের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিটি সম্পূর্ণ হয় আরও পরে, ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। সত্যেন্দ্রনাথও কোনো কারণে তাঁর সংকল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এবার কলকাতায় খুব ব্যস্ত জীবন যাপন করেন। মাঘোৎসবে ভাষণ দেওয়া ছাড়াও ২২ মাঘ [শনি 3 Feb] তিনি হিন্দু স্কুল থিয়েটারে 'বঙ্গ-ভাষা-সমালোচনীসভা'র দ্বিতীয় বৎসরের ত্রিংশ অধিবেশনে কেশবচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে 'বঙ্গদেশ ও বোম্বাই' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ফাল্গুন মাসের শুরুতে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও জানকীনাথ ঘোষাল [সম্ভবত সপরিবারে] বোলপুর যান; এই সময়ে 'সোমবাবুদিগের'ও বোলপুরে যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায় ক্যাশবহি-তে—রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত না হলেও সম্ভবত তিনিও এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। আর তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর এই দ্বিতীয়বার বোলপুর পরিক্রমায় তিনি শান্তিনিকেতনে কিছু পরিবর্তন দেখেছিলেন। তিনি ফাল্গুন ১২৭৯-তে যখন সেখানে প্রথম গিয়েছিলেন, তখন 'শান্তিনিকেতন' গৃহটি ছিল একতলা—তার একটি ছোটো ঘরে তিনি থাকতেন, আর-একটিতে থাকতেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু ১২৮২ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি থেকে বাড়িটিকে প্রশস্ত ও দ্বিতল করার কাজ শুরু হয়। ২৪ কার্তিক ১২৮৩ [8 Nov 1876] তারিখের হিসাবে দেখা যায়, ঐ সময় পর্যন্ত নির্মাণ-ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৯৮৩১ ল ৩ পাই। এর পরে কত দ্রুতগতিতে এই নির্মাণ-কার্য অগ্রসর হয়েছে, কয়েকটি তারিখ ও ব্যয়ের হিসাব উদ্ধৃত করলে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে : ১১ অগ্র [25 Nov] ১০৩৭৭ ।।ল ৩, ২৩ পৌষ [6 Jan 1877] ১১১৫৯ল° ও বৎসরের শেষ দিনটিতে ৩০ চৈত্র [11 Apr] তারিখে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৩০১৫। ৬ পাই।

এই বৎসর জোড়াসাঁকোর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন হয়। পাঠক অবগত আছেন, দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ মাত্র ২৯ বছর বয়সে 24 Oct 1858 তারিখে মারা যান। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলে তাঁর বিধবা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী মৃত গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করতে চান। সম্পত্তি-সংক্রান্ত গোলযোগের আশঙ্কায় 29 Jan 1859-এ দেবেন্দ্রনাথ সুপ্রীম কোর্টে যে মামলা করেন, তাতে 1860-র ডিক্রি অনুযায়ী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর দত্তক গ্রহণের অধিকার অস্বীকৃত হয় এবং নগেন্দ্রনাথের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দেবেন্দ্রনাথ ও এক-তৃতীয়াংশ গিরীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীরা লাভ করেন। 1874-এ ত্রিপুরাসুন্দরী এই ডিক্রি বাতিল করতে চেয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা করেন [৩৮৪ নং মকদ্দমা]। 17 Jul 1876 তারিখে এই মামলার রায় দেওয়া হয়; তাতে নগেন্দ্রনাথের সম্পত্তির যে এক-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন অমীমাংসিত ছিল, তাতে ত্রিপুরাসুন্দরীর জীবনস্বত্ব স্বীকার করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপসে স্থির হয় এককালীন দশ হাজার টাকা ও আজীবন বার্ষিক এক হাজার টাকা বৃত্তির বিনিময়ে ত্রিপুরাসুন্দরী তাঁর স্বত্ব দেবেন্দ্রনাথের অনুকূলে ছেড়ে দেবেন।[৩৪] এই চুক্তি অনুযায়ী ২৩ ভাদ্র [7 Sep] ত্রিপুরাসুন্দরীকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয় : 'ব° ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী/দ° ১৮৭৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের/ডিক্রি অনুযায়ী স্বর্গীয় বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর/মহাশয়ের বিষয়ের উপর উক্ত দেবীর সমুদায়/ স্বত্ব বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্রয় করার/মূল্য শোধ...১০০০০্'।

ক্রমবর্ধমান পরিবারের ভরণপোষণ ও বাসস্থান-সমস্যার জন্য এরূপ ব্যবস্থা-গ্রহণ দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। দ্বারকানাথ তাঁর উইলে ভদ্রাসন বাড়ির পশ্চিম দিকের সমস্ত জমি নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে গিয়েছিলেন, এই ডিক্রি অনুযায়ী সেই জমির বেশির ভাগ অংশই দেবেন্দ্রনাথের অধিকারে আসে—যা তিনি পরবর্তীকালে কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথকে দান করেন ও সেখানে বিখ্যাত 'বিচিত্রা' লালবাড়ি তৈরি হয়।

এ ছাড়াও ২৪ চৈত্র [বৃহ 5 Apr 1877] তারিখে তিনি জনৈক রাজকৃষ্ণ অধিকারীর কাছ থেকে ৩২৫০ টাকায় জোড়াসাঁকোয় অবস্থিত একটি বাড়ি ক্রয় করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

১১ মাঘ [মঙ্গল 23 Jan 1877] আদি ব্রাহ্মসমাজের সপ্তচত্বারিংশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনার 'উদ্বোধন' হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত 'জাগো সকল অমৃতের অধিকারী' গান দিয়ে। বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার পর ব্রহ্মসংগীত গীত হয়:

ভৈরবী—ঝাঁপতাল। তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ [সত্যেন্দ্রনাথ]।

খট্—সুরফাঁকতাল। মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম [ঐ]

সায়ংকালে বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও নিম্নোক্ত ব্রহ্মসংগীতগুলি গাওয়া হয় :

গৌরী—কাওয়ালি। আহা আজি পুলকে পূরিল দিক চারি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

গুজরাটী ভজন—যৎ। সৎচিদ্‌ঘন প্রভু পরব্রহ্ম পাবন

ঝিঁঝিট—একতালা। ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

বেহাগ—আড়াঠেকা। বিমল রজত ভাসে, পূর্ণ করি নীলাকাশে [ঐ]

মিশ্র—একতাল। জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা [সত্যেন্দ্রনাথ]

ধর্মতত্ত্ব [১১।১, ১৬ মাঘ ও ১ ফাল্গুন] এই অনুষ্ঠান-সম্পর্কে কতকগুলি অতিরিক্ত সংবাদ পরিবেশন করে : 'ব্রহ্মানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে কলিকাতা সমাজের কার্য্যপ্রণালী সম্প্রতি কিছু জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি গত উৎসব রজনীতে একটি উৎসাহকর বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। বিশ্বাসানুযায়ী অনুষ্ঠান এবং স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা ভিন্ন সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না একথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। সত্যেন্দ্র বাবু যাহা বলেন তাহাতে সার আছে, কারণ তাঁহার জীবন আছে। তিনি এবার সমাজমন্দিরে ঠাকুর পরিবারস্থ মহিলাগণকেও উপাসনার জন্য আনিয়াছিলেন। এই কার্য্যটী উক্ত পরিবারের বহুদিনের পুরাতন বদ্ধভাবকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে।'

লক্ষ্য করার বিষয়, আদি ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নানা বিষয়ে যতই বিরোধ থাকুক-না কেন, অন্তত দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সুসম্পর্ক আগাগোড়াই বজায় থেকেছে; উপরে উদ্ধৃত অংশে সত্যেন্দ্রনাথ-সম্পর্কে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার মন্তব্য এরই একটি প্রমাণ। আরও একটি প্রমাণ দেখা যায় ২২ মাঘ [শনি 3 Feb] সত্যেন্দ্রনাথ যখন হিন্দু স্কুল থিয়েটারে 'বঙ্গ-ভাষা-সমালোচনী সভা'য় 'বঙ্গদেশ ও বোম্বাই' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তখন কেশবচন্দ্র স্বয়ং সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর-সরোজিনী' এবং হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' কাব্যত্রয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধের অবলম্বন হয়েছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, প্রধানত তাঁর সমালোচক-রূপে আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ হওয়ার কারণেই কাব্য তিনটির নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হবার গৌরব লাভ করেছে। বস্তুত 'রাজকৃষ্ণ রায় ছাড়া অপর দুজনের 'সাহিত্য-সাধক' পরিচয় এই প্রবন্ধের উপজীব্য হবার সৌভাগ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [২২ আষাঢ় ১২৬০, 5 Jul 1853–১১ ভাদ্র ১৩২৯, 28 Aug 1922]-এর 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ১ম ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৭৯৭ শকে [28 Dec 1875]। কাব্যটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৭৯৯ শকে [18 Nov 1877]। অবশ্য প্রথম ভাগটিই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার উপলক্ষ ছিল। ১১৩ পৃষ্ঠার এই কাব্যগ্রন্থে সতেরোটি কবিতা ছিল : ১। পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, ২। অকৃতজ্ঞ যুবক, ৩। হিমালয় বিলাপ, ৪। অলস-যুবক, ৫। দরিদ্র-যুবক, ৬। জন্ম-ভূমি, ৭। শৈশব-স্বপন, ৮। কেন এত ভালবাসি? ৯। ১৯এ এপ্রেল ১৮৭৫, ১০। দুঃখিনী মহিষী, ১১। আর্য্যসঙ্গীত, ১২। বাঙ্গালীর জ্ঞানালোক, ১৩। উন্মাদিনী, ১৪। নীলাম্বরে কাল মেঘ, ১৫। বঙ্গ-দম্পতির পরিণাম, ১৬। শারদীয় প্রদোষ, ১৭। ভারতে গোলাপ।[৩৫] এই কবিতার অনেকগুলি অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সাধারণী-তে প্রকাশিত হয়, বস্তুত তিনি 'ভুবনমোহিনী দেবী'র কবিতার একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নবীনচন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন : "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারে একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার কারণ, ইহা ভুবনমোহিনী দেবী নামিকা কোন বঙ্গীয় স্ত্রী লোকের রচিত, এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া নানা জনে নানা প্রকার সমালোচনা আরম্ভ করিল।'[৩৬] ১৬ ফাল্গুন ১২৮২-র সাধারণী-তে ও ২৬ চৈত্র ১২৮২-র *এডুকেশন গেজেট*-এ কাব্যটির সপ্রশংস সমালোচনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে এই দুটি সমালোচনার উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে এই গ্রন্থ থেকে যে কাব্যাংশটি উদ্ধৃত করেছেন, তা 'পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী' কবিতার অন্তর্গত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ শ্রাবণ ১২৯০ সংখ্যা ভারতী-তে নবীনচন্দ্রের 'সিন্ধুদূত' [22 Jun 1883] কাব্যের 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' করেন।

রাজকৃষ্ণ রায় [21 Oct 1849-11 Mar 1894]-রচিত 'অবসর-সরোজিনী' ১ম ভাগ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৮৩ [13 May 1876]-তে। কাব্যটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১২৮৬ সালে [18 Sep 1879]; তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাগের অন্তর্গত হয়ে যথাক্রমে ১২ পৌষ ১২৯২ [1885] ও ১ ফাল্গুন ১২৯৫ [1889] প্রকাশিত হয়। রাজকৃষ্ণ রায় বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন—কবিতা, নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য, উপন্যাস, ছোটোগল্প, রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ প্রভৃতি ছাড়াও তিনি 'ভারতকোষ' নামক অভিধান সম্পাদনা ও 'রুসিয়ার ইতিহাস' রচনা করেছিলেন; এছাড়া বীণা মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা ও 'বীণা-রঙ্গভূমি'র পরিচালনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি-তে রাজকৃষ্ণ-সম্পর্কে একটি কৌতুককর কাহিনী উল্লেখ করেছেন, তাছাড়া ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ [26 Feb 1881] 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' উপলক্ষে অভিনীত বাল্মীকি প্রতিভা-র তিনি অন্যতম

দর্শক ছিলেন ও অভিনয়-দর্শনে মুগ্ধ হয়ে 'বালিকা-প্রতিভা' নামে একটি কবিতা লেখেন। এই পরিচিতির সূত্রেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে 'অবসর সরোজিনী' সম্পর্কেই দীর্ঘতর আলোচনা করেছেন। সমালোচনার সুরটি অবশ্য কঠোর : 'রাজকৃষ্ণবাবু যশপ্রাপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া দিতেন না এই মন্তব্য করে তিনি Herrick ও Moore-এর কবিতার সঙ্গে রাজকৃষ্ণের কবিতার সাদৃশ্য দীর্ঘ উদ্ধৃতি সহযোগে প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার কবিতার নিন্দা শুনিলে মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইবেন'—তাঁর আশঙ্কা ভিত্তিহীন ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পিছনে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব অনুমান করেই 'উদাসিনী' প্রকাশের [1874] দীর্ঘকাল পরে রাজকৃষ্ণ স্ব-সম্পাদিত বীণা পত্রিকায় [১২৮৬] গ্রন্থটির সমালোচনা করেন : '...তিনি উচ্চ দরের লেখক না হইলেও একজন ভাল লেখক বটেন। ... কিন্তু উদাসিনীর গল্পটি চোরাই মাল। গ্রন্থকার কবিবর গোল্ডস্মিথের সন্ন্যাসী (Hermit) নামক পদ্যটি সাজাইয়াছেন। পাঠকগণ উদাসিনীর সহিত ইংরাজ কবির সন্ন্যাসী মিলাইয়া দেখিবেন।'[৩৭] হুল ফোটানোর উদ্দেশ্য না থাকলে এতদিন পরে গ্রন্থটির এ ধরনের সমালোচনা—তাও 'গ্রন্থখানি ক্রয়' করে—একটু অস্বাভাবিক মনে হয়।

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী [1854-5 Apr 1930]-রচিত 'দুঃখসঙ্গিনী' ১২৮২ সালে [20 Oct 1875] প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় কাব্যগ্রন্থটি সপ্রশংসভাবে সমালোচিত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

এ বৎসর হিন্দুমেলার একাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় রাজা বদনচাঁদের টালার বাগানে। মাঘ-সংক্রান্তি [২৯ মাঘ শনি 10 Feb] থেকে উৎসবের সূচনা হলেও মূল অধিবেশনের জন্য ৮ ফাল্গুন [রবি 18 Feb 1877] তারিখটি নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত গোলযোগের জন্য সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়। বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন, কারণ যথার্থ অনুসন্ধানের অভাবে এই গোলযোগটি পূর্ব বৎসরে [1876] সংঘটিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা হয়েছে, যোগেশচন্দ্র বাগলও 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সেইভাবেই বর্ণনা করেছেন; অথচ বর্তমান বৎসরের মেলার বর্ণনা-প্রসঙ্গে *সাধারণী*-র প্রতিবেদন থেকে 'আমরা নিরাশ মনে নবগোপাল বাবুকে অভিসম্পাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম' উক্তিটি বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু প্রতিবেদকের নৈরাশ্য ও অভিসম্পাতের কারণটি খুঁজে দেখা হয়নি। এই ভ্রান্তির মূলে আছে বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী *Memories of My Life and Times in the Days of My Youth* [1932] গ্রন্থের ২৬৬-৬৮ পৃষ্ঠায় ['নবযুগের বাংলা' (১৩৬২) গ্রন্থে সংকলিত 'হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র' প্রবন্ধের ১৪৬-৪৯ পৃষ্ঠাতেও ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে] ঘটনার বিবরণে একটি ভুল তারিখের ব্যবহার। তিনি লিখেছেন, 'In 1876, I joined his [Nabogopal Mitra's) gymnastic class at 1, Sankar Ghosh's Lane. Early in the spring of this year, the Hindu Mela was held in the Garden House of Raja Badan Chand at Tala. ...It was here at this Mela that I first came into conflict with Anglo-Indian arrogance and police agression.' বিপিনচন্দ্র ঘটনাটির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে কোনো ভুল

নেই, কিন্তু ঘটনাটি 1876-এ নয়, 1877-এর মেলায় ঘটেছিল। এ সম্পর্কে *সমাচার চন্দ্রিকা*-য় [৬৫।১৬২, ১০ ফাল্গুন 20 Feb 1877] লেখা হয়:

গত রবিবার রাজা বদনচাঁদের টালার বাগানে হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। আমরা এই মেলায় উপস্থিত ছিলাম না বটে, তবে আমরা আমাদিগের দুই তিন জন বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে মেলায় লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল।...যে স্থলে ব্যায়াম ক্রীড়া হইতেছিল, তথায় কোন এক জন সম্ভ্রান্ত সাহেব বিবি লইয়া উপস্থিত হন। শুনিলাম ঐ সাহেব নাকি একজন ক্যান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট। তিনি এবং তাঁহার বিবি ক্রীড়া স্থলে উপবেশন করিবার জন্য দুইটী এদেশীয় যুবককে কাষ্টাসন পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। যুবকদ্বয় সাহেবের কথা গ্রাহ্য করিল না। ইহাতে প্রথমত বাক্‌বিতণ্ডার অভিনয় হয়, শেষে হাতাহাতি হইয়া থানা পুলিস পর্যন্ত এই অভিনয় গড়াইয়াছে। সাহেবকে নাকি উত্তম প্রহার করা হইয়াছিল। তিনি প্রহার খাইয়াই পুলিসের আশ্রয় লন। তৎপরে দুই তিন জন কনষ্টেবল আসিয়া একজন নিরপরাধী যুবককে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমত সময় উনবিংশ শতাব্দির জন কয়েক বাঙ্গালী বীর উহাকে পুলিসের হস্ত হইতে ছড়াইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে যান। তাঁহাদের চেষ্টা নিতান্ত বিফল হয় নাই। কিন্তু সেই চেষ্টায় রাম রাবণের পালা আরম্ভ হইল। একজন কনষ্টেবল এই সংবাদ থানায় দেওয়ায় থানার যাবতীয় কনষ্টেবল এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রণবেশে বাগান আক্রমণ করিল। তৎকালে, আমরা যাহাদিগকে উনবিংশ শতাব্দির বীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা চম্পট দিয়াছিল। শেষে পুলিসের লোকেরা বাগান মধ্যে হল্লা করিয়া প্রবেশ করত দুইজন নিরপরাধী যুবককে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে।

প্রায় এক মাস পরে উক্ত পত্রিকাতেই [৬৫।১৮৬, ৮ চৈত্র 21 Mar] সংবাদ দেওয়া হয়, 'শুনা গেল, হিন্দুমেলার দাঙ্গা ঘটিত মোকর্দ্দমার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এই মোকর্দ্দমায় সাহেব ফরিয়াদী, এদেশীয় আসামী। সাহেবের জয় সর্ব্বত্রই। আসামীর মধ্যে একজনের ['নবগোপাল নিত্র মহাশয়ের কুটুম্ব, তাঁহার জামাতার সহোদর। ইনি হাওড়া গভর্ণমেন্ট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক বা জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার ছিলেন' —নবযুগের বাংলা। ১৫৯] ৫০ টাকা এবং আর একজনের [বিপিনচন্দ্র] ২০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।' বিপিনচন্দ্র পালের প্রদত্ত বর্ণনা আরও বিস্তৃত, কিন্তু মূল ঘটনার বিবরণ—এমন-কি জরিমানার পরিমাণও—উভয়ত এক। সুতরাং সাধারণী-র প্রতিবেদকের নৈরাশ্য ও অভিসম্পাতের এইটিই কারণ।

বালক অবনীন্দ্রনাথও এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মেলার একটি নিখুঁত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন ঘরোয়া [পৃ ৮৬-৮৮]-তে। অবশ্য তাঁর বর্ণনায় 'স্বর্ণবাঈ ছিল সেকালের প্রসিদ্ধ বাঈজী, তারই জন্য কী একটা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়' উক্তিটি ঠিক নয়—হাঙ্গামার উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছিল, তা আমরা আগেই জেনেছি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 1876-এ একটি আইন বিধিবদ্ধ হয় যার দ্বারা যুক্তরাজ্য ও তার অধীনস্থ দেশগুলির রানী ভিক্টোরিয়া অন্যান্য উপাধিতে ভূষিত হবার অধিকার লাভ করেন ['to enable Her Most Gracious Majesty to make an addition to the Royal Style and Titles appertaining to the Imperial Crown of the United Kingdom and its dependencies'] এবং সেই অধিকারবলে 28 Apr 1876 তারিখে একটি ঘোষণা ['Proclamation'] দ্বারা তিনি 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' ['Empress of India'] উপাধি গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যবাদী বড়োলাট লর্ড লিটন এই সুযোগে 18 Aug 1876-এ ঘোষণা করেন 1 Jan 1877 [সোম ১৮ পৌষ ১২৮৩] তারিখে ভিক্টোরিয়ার নূতন উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ভারতের পূর্বতন রাজধানী দিল্লিতে একটি রাজকীয় দরবার অনুষ্ঠিত হবে। এই বিরাট দেশের প্রতি মহারানীর বিশেষ আগ্রহ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজা ও প্রজাদের আনুগত্য সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলেই তিনি এই নূতন উপাধি গ্রহণ করেছেন—এইটি প্রতিপন্ন করাই দরবারের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ['to hold at Delhi, on the first day of January

1877, an Imperial Assemblage for the purpose of proclaming to the Queen's subjects throughout India the gracious sentiments which have induced Her Majesty to make to Her Sovereign Style and Titles an addition specially intended to mark Her Majesty's interest in this great Dependency of Her Crown, and Her Royal Confidence in the loyalty and affection of the Princes and Peoples of India.') । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত মাদ্রাজে, তখন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তারই মাঝখানে প্রভূত অর্থব্যয়ে দিল্লিতে রাজকীয় দরবার এবং অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীতে 'ছোটা দরবার' ও বিভিন্ন জেলাশহরে ঘোষণা-পাঠ ও আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। *সমাচার চন্দ্রিকা*-য় [৬৫।১২৪, ২১ পৌষ, 4 Jan] 'তারের খবর'-এ দিল্লির দরবারের নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশিত হয়:

> গবর্ণর জেনেরলের তাঁবুর দেড় ক্রোশ উত্তরে দরবারের তাঁবু সংস্থাপিত হয়। এই দরবারে ৬৩ জন দেশীয় রাজা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বায়ের গবর্ণরদ্বয় এবং পঞ্জাব, বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণরগণ, কমাণ্ডার ইন চিফ বাহাদুর এবং এতদ্ব্যতীত বিস্তর নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এতদুপলক্ষে ১৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।...গবর্ণর জেনের ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে দরবার স্থলে উপস্থিত হয়েন। তিনি উপনীত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলে মহারাজ্ঞীর রাজ রাজেশ্বরী উপাধি ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় পঠিত হয়...গবর্ণর জেনেরলের বক্তৃতা শেষ হইলে সিন্ধিয়া, কাশ্মীর, জয়পুরের মহারাজারা ভুপালের বেগম এবং স্যার সালার জঙ্গ বাহাদুর অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। অন্যান্য কতকগুলি রাজা, এতৎসম্বন্ধে আপনাপন অভিপ্রায় ব্যক্তি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই।—৩৯ জনকে ভারত নক্ষত্র উপাধি দেওয়া হইয়াছে, এবং বিস্তর মুসলমান ও হিন্দুকে মাননীয় উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

কলকাতায় গড়ের মাঠে একটি বিরাট মণ্ডপ নির্মাণ করে প্রায় চার হাজার আমন্ত্রিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে 'ছোটা দরবার' অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মিঃ বাকলাণ্ড [C.E. Buckland, C.I.E.] ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ও বক্তৃতা দেন। কৃষ্ণদাস পাল বাংলায় ও মীর মহম্মদ আলী উর্দু ভাষায় লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। *সমাচার চন্দ্রিকা*-র [৬৫।১২২, ১৯ পৌষ, 2 Jan] বিবরণ অনুযায়ী ৬১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিঃ বাকলাণ্ডের হাত থেকে বিশেষ সম্মান-পত্র গ্রহণ করেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রলাল সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, মানকজি রুস্তমজী, কানাইলাল দে, তারকনাথ প্রামাণিক, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, ১০১ বার তোপধ্বনি ও সন্ধ্যার পর প্রায় পনেরো হাজার টাকার আতশবাজি পুড়িয়ে এই মহোৎসব সমাধা হয়। বিভিন্ন জেলাশহরেও দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়।

উপরের তালিকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের নামও দেখা যায়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ নিজে দরবারে উপস্থিত থেকে সম্মান-পত্র গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে-সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। খুব সম্ভব তিনি দরবারে হাজির হননি, কারণ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কাগজপত্রের মধ্যে 6 Jan 1877 তারিখে লিখিত Under Secretary to the Government of Bengal, Political Department-এর একটি পত্র পাওয়া যায়, যাতে দেবেন্দ্রনাথকে জানানো হয়েছে ভিক্টোরিয়ার ভারত-সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তাঁকে একটি Certificate of Honour দেওয়া হবে; তিনি দরবারে উপস্থিত থাকলে এই পত্র লেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত না। সম্মান-পত্রটিও উপরোক্ত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে:

By command of *his Excellency the* Viceroy and Governor-General *this certificate is presented in the name of* Her Most Gracious Majesty Victoria, Empress of India, to *Baboo Debendra Nath Tagore in recognition of his position as son of the late esteemed Baboo Dwaraka Nath Tagore. Head of the Conservative Brahmoo.*

January 1st, 1877

Sd/- Richard Temple.

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬

দেশীয় সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন বা Vernacular Press Act (Act IX of 1878) লর্ড লিটনের শাসনকালের অনেকগুলি কলঙ্কের অন্যতম। 14 Mar 1878 [বৃহ ২ চৈত্র ১২৮৪] বড়োলাটের কাউন্সিলের একটিমাত্র অধিবেশনে বিশেষ আলোচনা ছাড়াই আইনটি গৃহীত হয়। এই আইনের বলে গবর্মেন্ট কোনো মামলা-মোকদ্দমা ছাড়াই বিদ্রোহাত্মক [অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সরকার-বিরোধী] রচনার জন্য দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর বা প্রকাশককে শাস্তি দেবার অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভ করেন। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি এই আইনের আওতায় পড়েনি।

1878-এ আইনটি বিধিবদ্ধ হলেও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল অনেক আগেই। 1870-তে বিদ্রোহাত্মক লেখা বন্ধ করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি নূতন ধারা Section 124A যুক্ত হয়। কিন্তু বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর সার জর্জ ক্যাম্বেল কঠিনতর আইন প্রণয়নের জন্য লর্ড নর্থব্রুকের কাছে সুপারিশ করেন। ক্যাম্বেলের বিচিত্র খামখেয়ালিপনা, বিশেষত তাঁর শিক্ষানীতির জন্য তিনি দেশীয় সংবাদপত্রগুলির কঠোর সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক এই সুপারিশ গ্রহণ করেননি। কিন্তু 1875-এ বরোদার গাইকোয়াড়ের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগের হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উপস্থিত হলে শিশিরকুমার ঘোষ-সম্পাদিত দ্বিভাষিক *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় দুটি সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ দুটি *Pall Mall Gazette*-এ উদ্ধৃত হলে সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড সলিসবেরি বড়োলাট লর্ড নর্থব্রুককে লেখেন, যদি সম্ভব হয় ও প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে অমৃতবাজারের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা উচিত। লর্ড নর্থব্রুক অবশ্য সরকারি কর্মচারীদের সম্বন্ধে কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা প্রচার ছাড়া এ-বিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হননি। 1876-এ তিনি পদত্যাগ করলে তাঁর জায়গায় এলেন সাম্রাজ্যবাদের গোঁড়া প্রতিনিধি লর্ড লিটন। বাংলার নবনিযুক্ত [8 Jan 1877] ছোটোলাট সার অ্যাসলি ইডেন বাংলা সংবাদপত্রের রাজদ্রোহমূলক লেখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে *অমৃতবাজার, সোমপ্রকাশ, সাধারণী, ভারত মিহির* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি আপত্তিকর অংশের অনুবাদ লিটনের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি সব প্রাদেশিক গবর্মেন্টের কাছে মতামত চেয়ে পাঠালে মাদ্রাজের গবর্নর ডিউক অব বাকিংহাম লেখেন যে, তাঁর মতে এ ধরনের আইনের কোনো প্রয়োজন নেই—কেননা প্রজার মুখ বন্ধ করার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে রাজার কার্যকলাপ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে দেওয়া সভ্য ও বুদ্ধিমান রাজা মাত্রেরই কর্তব্য। কেউ কেউ প্রস্তাবিত

আইন দেশীয় ও ইংরেজি সংবাদপত্রের উপর অপক্ষপাতে প্রয়োগের পরামর্শ দেন। কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করে লর্ড লিটন কেবলমাত্র দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের কণ্ঠরোধ করার আয়োজন করেন।

সার অ্যাসলি ইডেনের মূল লক্ষ্য ছিল *অমৃতবাজার*-সম্পাদক শিশিরকুমারকে দমন করা। কিন্তু শিশিরকুমার দ্বিভাষিক অমৃতবাজার-কে প্রায় রাতারাতি ইংরেজি সাপ্তাহিকে পরিণত করে এই আইনের বেড়াজালের বাইরে চলে যান। *সোমপ্রকাশ*-সম্পাদক মুচলেকা [Bond] দিতে অস্বীকার করে পত্রিকা বন্ধ করে দেন। পরে Apr 1880 থেকে অবশ্য পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে। এই আইনের প্রতিবাদে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 17 Apr 1878 [বুধ ৫ বৈশাখ ১২৮৫] তারিখে টাউন হলে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রেরিত বহু সমর্থনসূচক পত্র ও টেলিগ্রাম এই সভায় পঠিত হয়। সভার প্রস্তাব-অনুযায়ী এই আইন রদ করার প্রার্থনা জানিয়ে একটি দরখাস্ত ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা গ্ল্যাডস্টোন [1809-98]-এর নিকট প্রেরিত হয়। তিনি পালামেন্টে একটি বিরোধী প্রস্তাব আনলে অনেক বিচার-বিতর্কের পর ১৫২-২০৮ ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়। অবশ্য বিলাতে মন্ত্রীসভা পরিবর্তিত হলে লর্ড রিপনের [1880-84] শাসনকালে 1882-তে এই আইন রদ হয় ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলি তাদের স্বাধীনতা ফিরে পায়।

কিন্তু তথ্যানুসন্ধানী পাঠক সতর্কতা-সহকারে উপরে বর্ণিত ইতিহাসটি পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারবেন, রবীন্দ্রনাথের 'দিল্লী দরবার' কবিতাটি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত না হওয়ার কারণ হিসেবে Vernacular Press Act-কে অন্তত দায়ী করা যায় না। কারণ কবিতাটি হিন্দুমেলায় পঠিত হয় ৮ ফাল্গুন ১২৮৩ [রবি 18 Feb 1877] তারিখে এবং আইনটি বিধিবদ্ধ হয় ২ চৈত্র ১২৮৪ [বৃহ 14 Mar 1878] তারিখে অর্থাৎ এক বৎসরেরও বেশি সময় পরে। সুতরাং কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে না থাকলে তার কারণ অন্যবিধ বলে অনুমান করতে হবে; মেলার দিনে যে মারামারি হয়েছিল এবং একটি মামলা পুলিস-আদালতে বিচারাধীন ছিল, কবিতাটি প্রকাশিত হলে এটিই সেই উত্তেজনা-সৃষ্টির মূল কারণ রূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে—এমন আশঙ্কা থেকেই হয়তো হিতৈষীরা এটি অপ্রকাশিত রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৭

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত একটি গুপ্তভাষায় সঞ্জীবনী সভা-র কার্যবিবরণী লিখিত হত। ইটালির কার্বোনারি-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ গুপ্তভাষার প্রচলন ছিল। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন : '[বন্ধুবান্ধবদিগের] সহিত ম্যাটসিনির এরূপ সঙ্কেত ছিল যে, তিনি জননীকে যে চিঠি লিখিবেন, তাহার একটি অন্তর প্রত্যেক পদের প্রথম অক্ষরগুলি একত্র করিলে যে লাটিন্ পদগুলি প্রস্তুত হইবে, সেইগুলিই তাঁহাদিগের মনোযোগের বিষয়।'[৩৮] এই ধরনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে গুপ্তভাষা সৃষ্টি করলেন, তার কৌশলটি এইরূপ:

আকার স্থানে অকার ॥ অকার স্থানে আকার ॥ই স্থানে উ॥ঈ স্থানে ঊ॥উ স্থানে ই॥ঊ স্থানে ঈ ॥এ স্থানে ঐ॥ঐ স্থানে এ ॥ও স্থানে ঔ ॥ঔ স্থানে ও।। ক খ গ ঘ স্থানে গ ঘ ক খ ॥চ ছ জ ঝ স্থানে জ ঝ চ ছ ॥ট ঠ

ড ঢ স্থানে ড ঢ ট ঠ।। ত থ দ ধ স্থানে দ ধ ত থ।। প ফ ব ভ স্থানে ব ভ প ফ।। শ ষ স স্থানে হ ॥হ স্থানে স।। র স্থানে ল ॥ল স্থানে র॥ম স্থানে ন ॥ন স্থানে ম ॥

এই পদ্ধতি অনুসারে:

স ন্ জী ব নী স ভা
হা ম্ চূ পা মূ হা ফ্।[৩৯]

উল্লেখ্য, ১৩২১ বঙ্গাব্দে *ভারতী*-তে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে অগ্র-সংখ্যায় অনুলেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করার জন্য পাঠকদের আহ্বান জানালে [পৃ ৭৬২] কৃষ্ণপ্রসন্ন পাল ফাল্গুন-সংখ্যায় ['সাঙ্কেতিক ভাষা', পৃ ১০৩২-৩৩] এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৮

এই স্বদেশী দেশলাই-প্রসঙ্গে *সমাচার-চন্দ্রিকা*-র ১১ ফাল্গুন বুধ 21 Feb 1877 [৬৫। ১৬৩] সংখ্যায় একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় :

একটি শুভ চিহ্ন।/আজ আমরা একটি নূতন দেশলায়ের বাক্স দেখিলাম। বাক্সটীর আকার বিলাতি ব্রায়ান্ট এবং মের সেফটিম্যাচের ছোট বাক্সের ন্যায়। পাতলা দেবদারু কাঠেই সুন্দর রূপে বাক্সটী নির্মিত হইয়াছে। দুই ধারে দেশলাই ঘষিবার মসলা মাখান। কাঠিগুলি দেবদারু কাঠের না হইয়া বাঁসের করা হইয়াছে, ঘর্ষণ মাত্রেই উত্তম জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু একটু ঠাণ্ডা লাগিলে বাঁসের কাষ্ঠ যেমন সহজেই শীতল হইয়া জ্বলন শক্তির হ্রাস হয় এগুলিকেও সে দোষ হইতে মুক্ত দেখিলাম না। নির্ম্মাতারা আজিও বাজারে বাহির করিতে পারেন নাই, বোধ হয় শীঘ্রই বাহির হইবে। সাধারণকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ যেন সকলেই এখন হইতে এই দেশলাই ক্রয় করেন, এখন যে দোষ আছে অবশ্যই নূতন অবস্থায় দুই একটি দোষ দেখিতে পাইবেন, কোন কার্য্যই প্রথমে একেবারে নির্দ্দোষ হইতে পারে না, লোকের উৎসাহ পাইলে ক্রমে অবশ্যই সে সমস্ত দোষ চলিয়া যাইবে। ...আমরা এই দেশলাই প্রস্তুতকারী বাবু মহেন্দ্রনাথ নন্দিকে তাঁহার বিপুল পরিশ্রমের জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া একটি অনুরোধ করি যেন তিনি অগ্রে উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া বাজারে বাহির করেন।

এর পরে লেখক এই স্বদেশী দেশলাই দ্বারা কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক উন্নতি সম্ভব হবে এ-সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

আমরা সঞ্জীবনী সভার প্রতিষ্ঠা ও আয়ুষ্কাল সম্পর্কে যে সময় নির্দেশ করেছি, তার যাথার্থ্য এই সম্পাদকীয়টি দ্বারা প্রতিপন্ন হতে পারে।

কাপড়ের কল সম্পর্কেও উক্ত পত্রিকায় কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ১ চৈত্র মঙ্গল 13 Mar 1877 [৬৫। ১৮০] সংখ্যায় 'সংবাদসার' শিরোনামায় লিখিত হয়: 'হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, বাবু দীননাথ সেনের বস্ত্রের কল ক্রয় করিবার জন্য কুমারখালী হইতে দীনবন্ধু প্রামাণিক আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন।... বাবু মহেন্দ্রনাথ নন্দীও একটি বস্ত্রের কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে এক ঘণ্টায় একখানি বস্ত্র হইতে পারে, ইহা হইলে দীন বাবুর যন্ত্র অপেক্ষা উহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিতে হয়।...'

বোঝা যায়, উক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দী-ই সঞ্জীবনী সভা-র পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছাড়াও আরও অনেকে যে যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছিলেন, তার কথা আমরা জানতে পারি উক্ত পত্রিকার ২৪

চৈত্র বৃহ5 Apr 1877 [৬৫।১৯৯] সংখ্যায় প্রদত্ত একটি সংবাদ থেকে:

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসাক কলিকাতায় একটি তেলের কল বাষ্প দ্বারা চেষ্টা পাইতেছে, বাবু সীতানাথ ঘোষ, বাবু মহেন্দ্রনাথ নন্দী ও বাবু দীননাথ সেন, বস্ত্র বুনিবার কল প্রস্তুত করিয়াছেন—পাথুরিয়াঘাটার বাবু আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুদ্রাযন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, বাবু গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সূতার কল প্রস্তুত করিয়াছেন বাবু মহেন্দ্র নাথ নন্দী দেশলাই প্রস্তুত করিয়াছেন। কোন বিষয়ই এদেশীয় বুদ্ধির অগম্য নয়। ইঁহারা যদ্যপি বিজ্ঞান চর্চা করেন তাহা হইলে আমাদিগকে বিদেশীয়দিগের বশতপন্ন থাকিতে হয় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সত্যপ্রসাদকে কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং রবীন্দ্রনাথকে 'সূক্ষ্মশিল্পাদি অধ্যয়নার্থ' বিলেতে পাঠানোর পরিকল্পনা একটি অতিরিক্ত তাৎপর্য লাভ করে।

উল্লেখপঞ্জি

১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪২

২ জীবনের ঝরাপাতা। ১৫

৩ ছিন্নপত্রাবলী। ২২৯, পত্র ১০৭

৪ 'পাগল' : বিচিত্র প্রবন্ধ ৫। ৪৪৭

৫ দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪৫

৬ ঐ ১৭। ৩৪৬

৭ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৬২

৮ দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪০

৯ সাধারণী, ৭।১৯, ২২ ফাল্গুন [রবি 4 Mar 1877]। ২২২-২৩

১০ 'আমার জীবন' ৪র্থ ভাগ : নবীনচন্দ্র রচনাবলী ৩ [সাহিত্য পরিষৎ সং, ১৩৬৬]। ৫৮-৫৯

১১ দ্র 'অত্যুক্তি' : ভারতবর্ষ ৪। ৪৪১-৫৫; *বঙ্গদর্শন*, কার্তিক ১৩০৯। ৩৭৬-৯১

১২ জীবনস্মৃতি ১৭।৩৪৯

১৩ সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি [১৩৮৪]। ৫৩৩

১৪ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২০৪

১৫ 'স্বপ্নময়ী' : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ [১৩৭৬]। ৫২১-২৩

১৬ দ্র রবীন্দ্রজীবনী। ৫৬

১৭ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২০৬

১৮ দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব। ২৬১-৬২

১৯ বিপিনচন্দ্র পাল : 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা', বি.ভা.প., কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫।১৫৮

২০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ২৬৬

২১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫২

২২ ঐ ১৭ | ৩৫০-৫১

২৩ ঐ ১৭। ৩৫১-৫২

২৪ ঐ ১৭। ৩৫৩

২৫ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৫১

২৬ রবীন্দ্রসংগীত। ২৮৫

২৭ দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩। ৩৬, পাদটীকা ৩

২৮ স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। ৩৩১

২৯ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২৩৩

৩০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪৬

৩১ ঐ ১৭। ৩৪৭

৩২ ঐ ১৭। ৩১০

৩৩ পত্রাবলী। ১৫৫-৫৬, পত্র ১১৫

৩৪ দ্র ঠাকুর বাড়ীর কথা। ১০১-০২

৩৫ সা-সা-চ ৩। ৪৪। ১৭

৩৬ ঐ। ১২।

৩৭ সা-সা-চ ৪। ৫০।১৪ থেকে উদ্ধৃত

৩৮ জোসেফ ম্যাটসিনি ও নব্য-ইতালী : যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী ১ [বসুমতী সং]। ১২

৩৯ দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১৬৭

---

* আমাদের পূর্বশিক্ষক জ্ঞানবাবু আমাকে কিছু কুমারসম্ভব, কিছু আর দুই-একটা জিনিস এলোমেলোভাবে পড়াইয়া ওকালতি করিতে গেলেন।'জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪১-৪২; রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, তিনি ওকালতি পাস করেন নাই বা শেষ পর্যন্ত পড়েন নাই; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের B.L. পাসের তালিকায় তাঁহার নাম পাই নাই। ১৯১০ কি ১৯১১ সালে তিনি কয়েক মাসের জন্য শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিতে আসেন। তখন তিনি জরাগ্রস্ত।' রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৩

† এর পুরো নাম ব্রজনাথ দে সরকার। এর পুত্রবধূ মিনতি দে রবীন্দ্রভবনকে জানিয়েছেন : জন্ম ১৮৪৩ সালে হাওড়া জেলার ঝাকড়দহ মাকড়দহ গ্রামে। পিতা জমিদার সনাতন দে সরকার বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ব্রজবাবু হালতু নিবাসী মনমোহন ঘোষের তৃতীয়া কন্যা কাদম্বিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর দুই কন্যা ও এগারো পুত্র। ব্রজবাবু কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হন। বিদ্যাসাগর তখন প্রিন্সিপ্যাল। তিনিই মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজের প্রথম সুপারিন্টেন্টে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৭ রাত্রি ১-১০ মিনিটে মারা যান।

* '? প্রবোধচন্দ্র ঘোষ'—জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]-র 'তথ্যপঞ্জী'তে প্রদত্ত টীকা, দ্র পৃ ২৪৭, ৭৫ ॥৪

* গগনচন্দ্র হোমের 'জীবন-স্মৃতি' [১৩৩৬] থেকে *বিশ্বভারতী পত্রিকা*-র কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫ সংখ্যায় উদ্ধৃত, পৃ ১৫৯; শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' [১৩২৫]-এও অনুরূপ বর্ণনা আছে।

† জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি-র অনুলেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'এ বাড়ীতে পূর্ব্বে নাকি একটা স্কুল ছিল, জ্যোতিবাবুরা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু এ বাড়ীর যে কে মালিক, তাহা তাঁহারা তখন ত জানিতেনই না, আজ পর্য্যন্তও জানেন না।'—পৃ ২৬৬; আমাদের অনুমান, রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্কুল ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির পূর্বসূরী ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল শংকর ঘোষ লেনের যে বাড়িটিতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, খেলাতচন্দ্র ঘোষের মালিকাধীন সেই বাড়িটির একটি ঘরেই সঞ্জীবনী সভার অধিবেশন বসত।

* বিপিনচন্দ্র পাল 'হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছের খ্যাতনামা ডাঃ মহেন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন, মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া—অথবা কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া—মহেন্দ্রবাবু তখন পটুয়াটুলি লেনে থাকিয়া একটা নূতন কলের তাঁত উদ্ভাবন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ... এরূপ শুনিয়াছি যে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাঁতে তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধয়া হিন্দুমেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—লোকে বলে নাচিয়াছিলেন।'—নবযুগের বাংলা [১৩৬২]।১৪৫

† তখনও অস্ত্র-আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বন্দুক-ছোঁড়া বা তরোয়াল-খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দুমেলার বিশিষ্ট কর্মকর্ত্তারা পাখী শিকারের ভান করিয়া বন্দুক-ছোঁড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন।'—নব যুগের বাংলা। ১৪৫

* সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের হিসাব-খাতা থেকে তারিখটি গৃহীত।

সপ্তদশ অধ্যায়

১২৮৪ [1877-78] ১৭৯৯ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের সপ্তদশ বৎসর

এই বৎসরে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা *ভারতী* পত্রিকার প্রকাশ। তত্ত্ববোধিনী যদিও এক অর্থে ঠাকুরবাড়িরই কাগজ ছিল এবং বালক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা *তত্ত্ববোধিনী*-র পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে ধর্মীয় ও সামাজিক নানা দায়দায়িত্ব থাকায় পুরোপুরি সাহিত্য-পত্রিকা হয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাংলা ভাষায় সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন*। তারই আদর্শে পরবর্তীকালে *জ্ঞানাঙ্কুর, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, প্রতিবিম্ব* প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। এর অনেকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি, বাংলা সাময়িক পত্রের জগতে সে-সময়টি খুব ভালো কাটছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* চার বৎসর পরে চৈত্র ১২৮২-তে বিদায়গ্রহণ করে, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বর্তমান বৎসর পুনঃপ্রকাশিত হলেও তখন তার পূর্বমহিমা অনেকটাই অস্তমিত। *প্রতিবিম্ব* প্রকাশের কয়েক মাস পরেই *জ্ঞানাঙ্কুর*-এর সঙ্গে সম্মিলিত হয়েও শেষ পর্যন্ত কেউই আত্মরক্ষা করতে পারেনি। *ভ্রমর* মাত্র এক বৎসর তিন মাসের পরমায়ু আষাঢ় ১২৮২-তেই শেষ করেছে [১২৮৫ বঙ্গাব্দে অবশ্য ভাদ্র ও আশ্বিন দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল]। *বান্ধব* অনিয়মিতভাবে তিন বৎসর প্রকাশিত হয়ে ১২৮৪-তে এক বছরের ছুটি ভোগ করে ১২৮৫-তে পুনঃপ্রকাশিত হয়। *আর্য্যদর্শন*-এর অনিয়মিত প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব অধ্যায়েই আলোচনা করেছি।* এই অবস্থায় সুপরিচালিত একটি মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা এই সময়ে যেভাবে বিভিন্ন দিকে বিপুলভাবে আত্মপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করছিল, অনুরাগী আত্মীয়-বন্ধুরা তার একটি উপযুক্ত মাধ্যম তৈরি করে দিতে আগ্রহী হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। ভারতী-ই হল সেই মাধ্যম।

ভারতী-র চল্লিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে লিখিত 'কবির নীড়' নামক রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাটাই লিখেছেন:

> আমি তেতালায় যে-ঘরটিতে বসতুম, সেখানে একটা গোল টেবিল, তার চারিধারে খানকতক চৌকি। আর দেয়ালের গায়ে একটা পিয়ানো ছিল। রবি আমার নিত্য সঙ্গী (বালক-কবি তখন জগৎ-কবি হন নি), আর-এক কবি, আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয় মধ্যে মধ্যে এসে জুটতেন। আমরা তিন জনে যখন একত্র এই টেবিলের চারিধারে বসতুম, কত গাল-গল্প হত, কত কবিতা পাঠ হত, কত গান বাজনা হত, গান রচনা হত, তার ঠিকানা নেই। পাখীর গানে যেমন ছাদটা মুখরিত হত, এই দুই কবি-বিহঙ্গের গানে ও কবিতা-পাঠে বৈঠকখানাটাও তেমনি প্রতিধ্বনিত হত।
>
> একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করচি—কি-শুভক্ষণে আমার হঠাৎ মনে হল,—এই দুই কবি-বিহঙ্গ কেবল আকাশে-আকাশেই উড়ে বেড়াচ্চে, ওদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লোকালয়ের কোন কুঞ্জ-কুটীরে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা একটা নীড় বাঁধতে পারে, তাহলে কতলোকে ওদের স্বর-সুধা পান করে কৃতার্থ হয়।[১]

রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, এই দুই কবির জন্য নীড় রচনার আকাঙক্ষাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প সৃষ্টি করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর পর লিখেছেন : 'এই কথা মনে হবা মাত্র, দোতালায় নেমে এলুম!/ দোতালার দক্ষিণ বারণ্ডায় আর-একটি প্রবীণ বিহঙ্গরাজের আসন ছিল।...আমার প্রস্তাব শোনবা মাত্রই তিনি রাজি হলেন, আর তখনি দেবী "ভারতী"কে আবাহন করে তাঁরই পুণ্যকুঞ্জে, নবীন কবি-বিহঙ্গদের জন্য একটি নীড় বেঁধে দিলেন।'[১] অবশ্য 'প্রবীণ বিহঙ্গরাজ' দ্বিজেন্দ্রনাথ খুব সহজে রাজি হননি, তিনি এ-সম্পর্কে বলেছেন : "জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনের' মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল।'[২]

পত্রিকার নাম কী হবে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলল।' দ্বিজেন্দ্রবাবু নাম করিলেন "সুপ্রভাত"—কিন্তু এ নামটি জ্যোতিবাবুদের মনোনীত হইল না, কারণ ইহাতে যেন একটু স্পর্দ্ধার ভাব আসে; অর্থাৎ এতদিনে ইহাদের দ্বারাই যেন বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রভাত হইল। সুপ্রভাত নাম যখন গ্রাহ্য হইল না, তখন দ্বিজেন্দ্রবাবুই আবার তাহার নাম রাখিলেন "ভারতী"।'[৩] নামকরণের তাৎপর্য ও পত্রিকার উদ্দেশ্যটি সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যার 'ভূমিকা'-তে ব্যাখ্যা করেছেন :

ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি তাহা তাঁহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আরেক অর্থ বিদ্যা, আরেক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।...যে কারণে ব্রিটেনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানিয়া নাম ধারণ করিয়াছেন এবং তাহার বহুপূর্ব্বে এথেন্সগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিনাভা—এথেনিয়া নাম ধারণ করিয়াছিলেন সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী—ভারতা নাম ধারণ করিতে পারেন।...ভারত ভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি।...ভারত ভূমিতে যদি জাগ্রতা দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে, তাহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না।...আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীর আবাহনপূর্ব্বক এই ত প্রতিষ্ঠা করিলাম, এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাঁহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন। ভারতীর আশীর্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।[৪]

পত্রিকা-প্রকাশের পরিকল্পনা কবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাথায় এসেছিল, ঠিক বলা যায় না। তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকেই এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপ দেওয়া শুরু হয়েছিল, তা বোধহয় জোর করেই বলা যায়। কারণ *ভারতী*-র গ্রাহকতালিকা-ভুক্ত হবার আহ্বান জানিয়ে ৫ আষাঢ় তারিখে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এর আগেও কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ৮ আষাঢ় তারিখেই জলেশ্বর থেকে মূল্যপ্রাপ্তির হিসাব দেখে মনে হয়, অন্য কোনো পত্রিকায় এর আগেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। যাই হোক, এই তথ্য থেকেই বোঝা যায় পত্রিকা প্রকাশের কার্যকরী ব্যবস্থা অনেকটা এগিয়ে না গেলে বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হত না। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারী লিখেছেন,

আমি পঞ্জাব হইতে আসিয়া* শুনিলাম যে, একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা জল্পনা চলিতেছে; প্রবন্ধাদি রচিত ও সংগৃহীত হইবার আয়োজন হইতেছে।...সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে "তাঁহাকে" লইয়া বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন।

কোন কোন দিন বৈকালে আমরা জানকীবাবুর [জানকীনাথ ঘোষাল। রামবাগানস্থ বাড়ীতে যাইতাম—সেখানে ন-বৌঠাকুরাণী [প্রফুল্লময়ী দেবী], নতুন বৌ [কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। ...সকলে মিলিত হইলে 'ভারতী'র জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০। ১১টা বাজিয়া যাইত।[৫]

এই বর্ণনা থেকে *ভারতী*-র উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের পরিচয় ও পরামর্শ-সভানুষ্ঠানের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। শরৎকুমারী আরও একটি সভাস্থলের কথা লিখেছেন—সেটি হল *ভারতী*-র প্রকৃত জন্মস্থান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বাইরের তেতলার ছাদে টবের গাছে সাজানো জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাগান, অক্ষয় চৌধুরী যার নাম দিয়েছিলেন 'নন্দন-কানন'।

এইখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। শরৎকুমারী দেবীর উপরোক্ত বর্ণনা থেকে মনে হতে পারে, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ভারতী প্রকাশের সময় উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, দীর্ঘকাল পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি ঘটনার পারম্পর্য ঠিক রক্ষা করতে পারেননি। কারণ বিহারীলাল যদি প্রথমাবধিই ভারতী-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতেন, তাহলে তাঁর মতো বিখ্যাত কবির যে-কোনো কবিতার সাক্ষাৎ আমরা প্রথম সংখ্যাতেই পেতাম। কিন্তু বিহারীলালের কবিতা ভারতী-তে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ সংখ্যায় ['গীত/ললিত বিভাস–আড়াঠেকা/বিরাজ সারদে কেন']। সুতরাং এ-ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তিই গ্রহণযোগ্য : 'ভারতী-প্রকাশ হইতেই আমাদের আর একজন বন্ধুলাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী। আগে তিনি বড়দাদার কাছে কখনও কখনও আসিতেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না। এখন 'ভারতী'র জন্য লেখা আদায় করিবার জন্য আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম এবং সেই সূত্রে তিনিও আমাদের বাড়ী আরও ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন।...আমাদের বাড়ী যখনই আসিতেন, তখনই তিনি আমাকে বেহালা বাজাইতে বলিতেন। আমি বাজাইতাম, আর তিনি তন্ময় হইয়া শুনিতেন।'[৬] লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে তাঁর মুখে শোনা যে দুটি গানের উল্লেখ করেছেন ['বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে' ও 'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে'] সেগুলি অনেক পরবর্তীকালের রচনা। তাই মনে হয়, বিহারীলালের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা ১২৮৪ বঙ্গাব্দের একেবারে শেষে ঘটেছিল।

পত্রিকা-প্রকাশের সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পর তার অঙ্গসজ্জা বা প্রচ্ছদ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন : 'মলাটের উপরে একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না।'[৭] শরৎকুমারী দেবী লিখেছেন : 'অনেক গবেষণার পর আর্ট ষ্টুডিয়োর দেবী সরস্বতীর ছবির অনুকরণে ভারতীর মলাটের ব্লক প্রস্তুত হয় এবং তখনকার পক্ষে ছবিখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সকলে মানিয়া লইয়াছিলেন।'[৮] কোলে অনাহত নীরব বীণা নিয়ে নতমুখে চিন্তামগ্না দেবী ভারতীর বিষাদিনী মূর্তি ও দূরে পাহাড়ের আড়ালে নবোদিত সূর্যরশ্মির আভাসে সুপ্রভাতের সূচনা—প্রথম সংখ্যায় লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের ভূমিকার সঙ্গে প্রচ্ছদ-চিত্রটি যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ।

কাঠ খোদাই করে এই ব্লকটি তৈরি হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল ভারতী-র প্রচ্ছদ-রূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এই কাঠ-খোদাই ব্লকটি প্রস্তুত করেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত এনগ্রেভার ও ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য ত্রৈলোক্যনাথ দেব [1847-1928]।[৯] ভারতী পত্রিকার আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য জোড়াসাঁকোর সেরেস্তায় একটি স্বতন্ত্র ক্যাশবহি রক্ষিত হত। এই ক্যাশবহি-র ৯ কার্তিক [বুধ 24 Oct] তারিখের হিসাবে দেখা যায় :

‘ব° ত্রৈলক্ষনাথ দে/দং ভারতির পুস্তকের উপরে/ছবি খোদাই করার বি° এক বিল সোদ/মা° সরকারি তহবিল ৪০’ টাকা অর্থাৎ ব্লক তৈরির জন্য খরচ পড়েছিল চল্লিশ টাকা [তখনকার পক্ষে খরচটি কম নয়] এবং সরকারী তহবিল থেকেই খরচটি মেটানো হয়েছিল [লক্ষণীয়, শিল্পীর নামটি ভুল লেখা হয়েছে, পরেও একই ভুল লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন নামটি ইংরেজিতে লেখা হয়েছে তখন ‘T.N. Deb’-ই দেখা যায়]। ভারতী-কে যে ঠাকুরবাড়ির কাগজ বলা হত, তা যে যথার্থ এই হিসাবই তার প্রমাণ। পত্রিকাটি এই পর্বে কখনোই স্ব-নির্ভর হতে পারেনি, এমন-কি ১২৯১ বঙ্গাব্দে যখন স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় কাশিয়াবাগান থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত তখনও প্রতি মাসে ঠাকুরবাড়ির আর্থিক সাহায্য লাভ করেছে।

প্রকাশনার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। বিজ্ঞাপনের একটি আদর্শ আমরা তুলে দিচ্ছি, এটি প্রকাশিত হয়েছিল *The Hindoo Patriot*-এর [Vol. XXIV, No. 25, p. 299] 18 Jun 1877 [সোমঁ ৫ আষাঢ় ১২৮৪] সংখ্যায় :

বিজ্ঞাপন।

আগামী শ্রাবণ মাস হইতে ভারতী নামে সাহিত্য-
বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি নানা-বিষয়িণী এক খানি মাসিক
সমালোচনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এখনকার
সুপ্রসিদ্ধ লেখকের মধ্যে অনেকে এই পত্রিকার
সাহায্য করিবেন। ইহার কলেবর রয়েল ৮ পেজি ৫
ফর্ম্মা। মূল্য বার্ষিক ৩ তিন টাকা। বিদেশে বার্ষিক
।ল০ ছয় আনা ডাকমাশুল লাগিবে। ইহা প্রতি মাসের
১৫ই প্রকাশ হইবে। যাঁহারা ইহার গ্রাহকশ্রেণী-
ভুক্ত হইতে চাহেন তাঁহারা যোড়াসাঁকো দ্বারকানাথ
ঠাকুরের লেন ৬নং বাটীতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার
বিশ্বাসের নামে পত্র লিখিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

এই বিজ্ঞাপনটি উক্ত পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা-তেও [No. 26, p. 311, 25 Jun সোম ১২ আষাঢ়] প্রকাশিত হয়। ২৭ শ্রাবণ [10 Aug] তারিখে এই দুটি বিজ্ঞাপন বাবদ সাত টাকা শোধ করা হয়েছে। কিন্তু শুধু হিন্দু পেট্রিয়ট-এ নয়, ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, *আর্য্যদর্শন* [২ বার] *এডুকেশন গেজেট* [৪ বার] *সোমপ্রকাশ* [৮ বার] *অমৃতবাজার পত্রিকা* প্রভৃতিতেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এর কোনোটিই আমরা দেখিনি, কিন্তু অনুমান করা যায়, বিজ্ঞাপনের বয়ানটি সর্বত্রই একই রকম ছিল।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফল প্রায় হাতেনাতেই পাওয়া গেছে। মাত্র তিনদিন পরেই একজন গ্রাহক হলেন। অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত পত্রিকার প্রথম গ্রাহক, তাঁর নামটি ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। ৮ আষাঢ় [বৃহ 21 Jun] ক্যাশবহি-তে লেখা হয়েছে [হিসাবটি অবশ্য পরে লেখা, কারণ ক্যাশবহিটি-ই কেনা হয়েছে ১৪ আষাঢ় তারিখে] : 'সবস্কৃপনসন খাতে/ জমা ১্/মা° বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত/জলেশ্বর/দ° লক্ষ্মীনাথ সাধারণ পুস্তকালয়/ভারতী পত্রিকা গ্রহণ জন্য অগ্রীম/মূল্য স্বরুপ ডাকে পাঠান/বিঃ উহার চিঠী ৬ হিঃ ডাক টীকীট' অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার জলেশ্বর* থেকে লক্ষ্মীনাথ সাধারণ পুস্তকালয়ের ঠিকানায় শ্যামাচরণ গুপ্ত *ভারতী*-র প্রথম গ্রাহক; অবশ্য অর্থের দিক থেকে *ভারতী*-র ভাণ্ডার তখনও শূন্য, কারণ উক্ত গ্রাহক তাঁর চাঁদা পাঠিয়েছেন দু'পয়সা দামের বত্রিশটি ডাকটিকিট দিয়ে। ভাণ্ডারে প্রথম টাকা জমা পড়ে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ১৪ আষাঢ় [বুধ 27 Jun] তারিখে; নগদ টাকা তিনি জমা দেন বেণীমাধব রায় মারফত (ইনি রবীন্দ্রনাথের ভাবী শ্বশুর, পূর্বে ১২৮৩ বঙ্গাব্দে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মাত্র কুড়ি দিন সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন, কিন্তু এখন থেকে ১২৯০ অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের কয়েকমাস আগে পর্যন্ত তিনি নিয়মিত কর্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই দিনই আবার খরচের খাতে 'ভারতী পত্রিকার কেসবহী, চীঠীবহী, ও বৌচার বহী ও সবস্ক্রাইবার দিগের নাম রেজেষ্টরি ও টীনা বাক্‌স্ তিনটা' কিনতে তিন টাকা এগারো আনা ব্যয় করা হয়। পরের দিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পঞ্চাশ টাকার একটি চেক দেন উক্ত বেণীমাধব রায় মারফত। এইভাবেই প্রধানত দুই ভাইয়ের টাকাতেই ভারতী-র অর্থভাণ্ডার গড়ে ওঠে। কিন্তু এই দিনই জনৈক তিনকড়িবাবুকে 'অক্ষরাদী ক্রয়' বাবদ ৪৫ টাকা 'হাওলাত' দেওয়া হয় এবং ২৮ আষাঢ় উক্ত তিনকড়িবাবুকে 'পাঁচ শত কপী ভারতী ছাপার জন্য কাগজ ক্রয় ও অন্যান্য খুজঁরা ব্যায়' বাবদ ২৭ ৴৫ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ [প্রেস]-কে ভারতী পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বর/ছাপার ব্যায় পাঁচ ফরম ৬ হিঃ ৩০ ও কবরিং ৩ একুণে/৩৩্ -প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার ব্যায় ঐ ৩৩্ হি০...৬৬্' [বাদ হাওলাত ৪৫ টাকা] শোধ দেওয়া হয়। ১১ শ্রাবণ [15 Jul] 'লেখক দিগের কপী রাখার জন্য/ছোটবাবুর নিকট রাখিবার নিমিত্ত/টীন বাক্স ক্রয়' করা হয় ১৷১৫ দিয়ে। এই বাক্সটি সম্পর্কে শরৎকুমারী লিখেছেন : 'একটি হল্‌দে রঙের বাক্স হইল 'ভারতী'র ভাণ্ডার; প্রথমে সেটি জ্যোতিবাবুর কাছেই থাকিত, পরে কোন এক সময়ে সেই ভাণ্ডারটি আমাদের মাণিকতলা স্ট্রীটের ক্ষুদ্র ঘরের তাকের উপর রাখা হয়। সেই বাক্স ও কয়েকটি পরিত্যক্ত প্রবন্ধ অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার সাথের সাথী ছিল—অল্প কিছুদিন হইল বিসর্জ্জন দিয়াছি।'[১০] সেই সময়ে রবীন্দ্রভবনের কথা ভাবাই হয়নি—নইলে এই বাক্সটি তার একটি অমূল্য দ্রষ্টব্য বস্তু হত, 'পরিত্যক্ত প্রবন্ধ'-গুলিও ইতিহাসের কোন্ গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করত তা আজ আর জানবার উপায় নেই।

উপরের হিসাব থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অন্তত প্রথম সংখ্যা ভারতী [শ্রাবণ ১২৮৪] ৫০০ কপি ছাপানো হয়েছিল। ড পশুপতি শাশমল জানিয়েছেন, প্রথম সংখ্যাটি দুবার ছাপা হয়[১১] দ্বিতীয় মুদ্রণটি নিশ্চয়ই পরবর্তী কোন সময়ের, কারণ এটি পুনর্মুদ্রণ নয়, কিছু কিছু পাঠ-সংস্কারের নিদর্শনও তাতে পাওয়া যায়। প্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী ঠিক ১৫ শ্রাবণ ১২৮৪ [রবি 29 Jul 1877] তারিখেই ভারতী-র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়—বাঁধাই করেন নেহাজুদ্দীন দপ্তরী। এই দিনই ৮৪ খানা *ভারতী* মফঃস্বলে ডাক মারফত পাঠানো হয়। কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে গ্রাহক ও অন্যান্যদের কাছে *ভারতী* পৌঁছে দিতেন দুজন 'বিলি সরকার'—দিননাথ [দীননাথ] ঘোষ ও উদয়চাঁদ দাস। ১৭ শ্রাবণ আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের ও

স্কটল্যাণ্ডে ডাক্তারি-শিক্ষা-রত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের [বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী] কাছে দুখানা *ভারতী* পাঠানো হয়।

ভারতী, প্রথমবর্ষ প্রথম সংখ্যা-র সূচিটি ছিল নিম্নরূপ :

১-৩	'ভূমিকা' : [সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ-লিখিত]
৩-৪	'ভারতী' [কবিতা] : [রবীন্দ্রনাথ]
৪-৭	'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' [দ্বিজেন্দ্রনাথ]
৭-১৭	'মেঘনাদ বধ কাব্য'। /(মাইকেল মধুসূদন প্রণীত।)' : 'ভঃ' [রবীন্দ্রনাথ] দ্র র°র°১৫ [শতবার্ষিক সং]। ১১২-২১
১৭-২৪	'জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা/ (বকল্ সাহেব-কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস।)' : 'সঃ' [সত্যেন্দ্রনাথ]
২৪-২৯	'বঙ্গ সাহিত্য।/ (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি এস প্রণীত বঙ্গ সাহিত্য।)' : [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]
২৯-৩৫	'গঞ্জিকা/অথবা/তুরিতানন্দ বাবাজীর আক্ড়া।) : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]
৩৫-৪২	'ভিখারিণী' [১-৩ পরিচ্ছেদ] : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র গল্পগুচ্ছ ২৭। ১০৩-১০
৪২-৪৪	'স্বাস্থ্য।/উপক্রমণিকা।' : 'যঃ—' [ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়]
৪৪-৪৮	'সম্পাদকের বৈঠক।'/'আফ্রিকা দেশের শৃঙ্গী মনুষ্য'; 'একটী চতুর বৃদ্ধ বানর'; 'লূতাতন্তু'; 'কুক্কুরগণ অনেক কাজে লাগে'; 'চতুস্পদ মৎস্য'; 'চীনদেশীয় বহুরূপী বৃক্ষ'; 'বৃহৎ পদ্ম-পর্ণ'; 'সাবান তৃণ'; 'কৃষ্ণ গোলাপ'; 'রামকান্তের সন্তান লাভ'; 'দেবতার মানত'। : [? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

তখনকার দিনে কোনো পত্রিকাতেই বিশিষ্ট লেখক ছাড়া রচয়িতাদের নাম প্রকাশিত হত না। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কেবল নামের আদ্যক্ষরটুকু রচনা-শেষে উল্লিখিত হত। ভারতী-ও এই রীতির ব্যতিক্রম করেনি। এই অদ্ভুত ও অপ্রয়োজনীয় রীতিটি এই যুগের সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অনেক অসুবিধা ঘটিয়েছে। রবীন্দ্র-রচনার ইতিবৃত্ত সংকলনও একই কারণে অনেক সংশয় ও বিতর্কে কণ্টকিত। আমরা উপরে যে সূচিটি উদ্ধৃত করেছি, সেখানেও এই অসুবিধাটি বর্তমান। নানা ধরনের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রমাণের সাহায্যে কয়েকটি রচনার লেখককে নির্দিষ্ট করা সম্ভব, সেগুলি আমরা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি। কিন্তু সবগুলির ক্ষেত্রে এরূপ নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি। শরৎকুমারী দেবী লিখেছেন : 'প্রতি মাসেই সম্পাদক মহাশয়ের, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু ও "তাঁহার" রচনা কিছু-না-কিছু প্রকাশিত হইতই।'[১২] জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বলেছেন : 'প্রথম বর্ষের "ভারতী"তে রবি ও অক্ষয়ের লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল। ...অক্ষয় তখন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা এবং হৃদয়-ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, যেমন "মান ও অভিমানে কি প্রভেদ?" ইত্যাদি। লোকের এ সব তখন খুবই ভাল লাগিত।'[১৩] ভারতী-র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-রচনার সন্ধানে অনেক গবেষণা ও বিতর্ক করা হয়েছে, তার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু অন্যদের রচনা—বিশেষ করে অক্ষয় চৌধুরীর—নিয়ে অনুরূপ সন্ধান খুবই কম হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের মানস-বিকাশের গতিপ্রকৃতি বোঝার পক্ষে এই অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন আছে, কারণ তিনিও 'ভারতীর সম্পাদকচক্রের

বাহিরে' ছিলেন না—প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি বাছাইয়ে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা-বিতর্কে তাঁরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল, যা তাঁর বিচার-বুদ্ধি ও রসবোধকে পরিণত করেছে, তাঁকে চিন্তাজগতের বিচিত্র অলিগলিতে ভ্রমণ করিয়েছে। বিশেষ করে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখাগুলি চিহ্নিত করা খুবই দরকার, কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন : 'ইঁহার সদ্য রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।'[১৪] রচনাগুলি চিহ্নিত করার একটি সূত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী বর্তমান সংখ্যায় 'বঙ্গ সাহিত্য' নামে যে প্রবন্ধটি দেখা যায় [এটি ধারাবাহিকভাবে কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র ১২৮৪ এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, কার্তিক ১২৮৫ ও বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ ১২৮৬ সংখ্যাগুলিতেও প্রকাশিত হয়েছিল] সেটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা। কয়েকটি প্রবন্ধের শেষে 'চ—' অক্ষরটি দেখা যায়, যেটি 'চৌধুরী' শব্দটির আদ্যক্ষর—এই 'চ' অক্ষরটির সাহায্যেও কতকগুলি রচনা অক্ষয়চন্দ্রের লেখা বলে চিহ্নিত করা যায়। 'গঞ্জিকা অথবা তুরিতানন্দ বাবাজীর আক্‌ড়া' রচনাটি দ্বিজেন্দ্রনাথের, এটি সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন : 'ভারতীর প্রথম বর্ষে 'সম্পাদকের বৈঠকে' 'গঞ্জিকা' নামে একটা বিভাগ ছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গকৌতুকের কথাই থাকিত। এইভাগে বড়দাদাই প্রায় সব লিখিতেন। আমি "উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ বা রামিয়াড়" নামে কেবল একটা নক্স [ভাদ্র ১২৮৪। ৬৯-৭৪] লিখিয়াছিলাম মাত্র। আমি তখন অনেক বিষয়েই লিখিতাম।' মনে হয়, বর্তমান সংখ্যার 'সম্পাদকের বৈঠক'-এর সবগুলি যদি না হয়, অনেকগুলি-ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা। 'স্বাস্থ্য' প্রবন্ধটির ক্রমানুসৃতি পরবর্তী অনেকগুলি সংখ্যাতেই দেখা যায়, পড়লে বোঝা যায় প্রবন্ধগুলি কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের লেখা; ১৯ আষাঢ় ১৮০২ শক [১২৮৭] রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি'-তে লিখেছেন : 'অদ্য যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত "শরীর পালন" পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম।'[১৫]

প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়—'ভারতী', 'মেঘনাদ বধ কাব্য' ও 'ভিখারিণী'—এদের মধ্যে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রবন্ধটির শেষে 'ভ' লেখা আছে, বাকি দুটি স্বাক্ষরবিহীন। 'ভারতী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্য-সংগ্রহে আজ পর্যন্ত সংকলিত হয়নি, রবীন্দ্রনাথও কোথাও কবিতাটি সম্পর্কে কিছু লেখেননি, কিন্তু তাঁর জীবৎকালেই সজনীকান্ত দাস অগ্রহায়ণ ১৩৪৬-সংখ্যা *শনিবারের চিঠি*-তে 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' প্রবন্ধে কবিতাটিকে রবীন্দ্র-রচনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। বঙ্গসুন্দরী-র ছন্দে লেখা এই কবিতাটি পাঠ করলে এই অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করতে হয়। ত্রৈলোক্যনাথ দেব ভারতী পত্রিকার জন্য যে প্রচ্ছদ-চিত্রটি অঙ্কন করেন, কবিতাটি যেন সেই চিত্রটিকে উদ্দেশ করেই লেখা:

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
　তোমার ও বীণা নীরব কেন?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
　নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন?
অযতনে আহা সাধের বীণাটি
　ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে আহা এলোথেলো চুল

এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেন গো আজিকে এ ভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রাণী
মলিন মলিন বসন ভূষণ।
মলিন বদনে নাহিক বাণী! [পৃ ৩]

—এই হিসেবে কবিতাটিকে আমরা আষাঢ় মাসের শেষ দিকে [Jul 1877] লেখা বলে মনে করতে পারি। এটিকে এক অর্থে *ভারতী* পত্রিকার 'কাব্য-ভূমিকা' নামে অভিহিত করা যায়; সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভূমিকা'য় গদ্যে যে কথা লিখেছেন : 'তোমার প্রসাদাৎ আমরা দুর্ব্বল হইয়াও সবল, গতশ্রী হইয়াও নবশ্রী, নির্জ্জীব হইয়াও সজীব'—সম্পাদকচক্রের কনিষ্ঠতম সদস্য ও Poet Laureate সেই কথাটিই লিখলেন এই কাব্য-ভূমিকায় :

আজো তুমি মাতা বীণাটি লইয়া
মরমে বিঁধিয়া গাওগো গান
হীনবল সেও হইবে সবল,
মৃত দেহ সেও পাইবে প্রাণ॥ [পৃ ৪]।

'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রবন্ধটি প্রথম বর্ষ *ভারতী*-র শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কোনো রচনা-সংগ্রহে গ্রহণ করা হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থে অংশত উদ্ধৃত হলেও সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি গ্রন্থমধ্যে প্রথম সংকলিত হয় নীলরতন সেন-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রবীক্ষা' [? ১৩৬৮] গ্রন্থে [পৃ ৫-৫৪]; পরে এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-র 'শতবার্ষিক সংস্করণ'-এর পঞ্চদশ খণ্ডে [১৩৭৩] ১১২-৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। দুটি পুনর্মুদ্রণই অবশ্য ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমটি এমনভাবে ছাপা হয়েছে যাতে মনে হয় সমস্ত প্রবন্ধটি একটি সম্পূর্ণ রচনা রূপে লিখিত, ভারতী-র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশের ফলে রচনাভঙ্গিতেই যে বিশিষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে সেটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না, প্রথম সংখ্যার শেষ অনুচ্ছেদ ও দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম অনুচ্ছেদ একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলায় আজকের পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণে এই ত্রুটি না থাকলেও পাদটীকাগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করে আরও বড়ো বিচ্যুতি ঘটানো হয়েছে। আরও একটি হাস্যকর ব্যাপার, সম্ভবত কোনো কীটদষ্ট খণ্ড থেকে রচনাটি কপি করা হয়েছিল—ফলে কীটের আক্রমণে লুপ্ত শব্দগুলির স্থানে '** ' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রথম বর্ষের *ভারতী*-র খুব-একটা অভাব নেই!

এই প্রবন্ধটির স্বত্ব নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথের নামান্তর 'ভানু'র আদ্যক্ষর 'ভ' রচনা-শেষে ব্যবহৃত হয়েছে এবং রচনাটির কথা তিনি জীবনস্মৃতি-তেও উল্লেখ করেছেন : 'ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্ব্বাপেক্ষা

সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।'* তথ্যের দিক থেকে এখানে সবচেয়ে মূল্যবান কথাটি হল 'ইতিপূর্বেই', অর্থাৎ ভারতী প্রকাশের পরিকল্পনা হবার আগেই সম্ভবত তিনি এই সমালোচনাটি লিখেছিলেন। *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব*-তে কাব্য-সমালোচনা প্রকাশের গৌরব হয়তো তাঁকে আরও খ্যাতিমান কবি ও কাব্যবিচারে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রবন্ধটি পত্রিকায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবার সময়ে নিশ্চয়ই মূল রচনার প্রয়োজনীয় সংশোধন-পরিবর্ধন করা হয়েছিল—তার প্রমাণ প্রকাশিত পাঠেই রয়েছে—কিন্তু প্রাথমিক খসড়াটি খুব সম্ভব ১২৮৩ বঙ্গাব্দের শেষ ভাগেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ফাল্গুন ১২৮৪ সংখ্যায় বাল্মীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধবর্ণনার একটি দীর্ঘ অনুবাদ দিয়ে কোনোরকম মন্তব্য ছাড়াই যেভাবে প্রবন্ধটির ইতি ঘটেছে, তাতে সত্য সত্যই সেটি সমালোচকের ঈপ্সিত সমাপ্তি কিনা এ সংশয় প্রকাশ করার সংগত কারণ আছে।

রবীন্দ্ররচনার প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি মালতীপুঁথি-র 41/২২ক পৃষ্ঠায় বাল্মীকি-রামায়ণের দুটি শ্লোকের এবং মধুসূদনের একটি ইংরেজি পত্রের অংশ ও এগুলির গদ্যানুবাদ দেখা যায়, যেগুলি এই 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতেই [শ্রাবণ ১২৮৪] ব্যবহৃত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতেই কিছু সংশোধনের চিহ্ন আছে, প্রবন্ধে গৃহীত হবার সময় আরও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ-সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে রচনাংশগুলি উদ্ধৃত করছি [তৃতীয় বন্ধনী-ধৃত অংশগুলি ভারতী-র পাঠ অবলম্বনে নির্মিত]†:

ক. '[স্ব]বল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষ বধ [শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর] রাবণ দ্বি[গুণ ক্রোধে]/জ্বলিয়া উঠিলেন।'

খ. 'অতঃপর হনু[মান] কর্তৃক কুমার অ[ক্ষ] নিহত হইলে/রাক্ষসাধিপতি মনঃসমাধান পূর্বক শোক সম্ব[রণ] করিয়া ইন্দ্রজিতকে রণে/যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।'

গ. 'People here grumble and say that/the heart of the poet in "মেঘনাদ" is with the Rakshas!/And that is the real truth. I despise Ram and his ra[bble,]/but the idea of রাবণ elevates and kindles my imaginat[ion.]/He was a grand fellow.'

ঘ. 'এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে,/ মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদের প্রতি [!]/বাস্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাঁহার অনুচরদের ঘৃণা করি [,]/কিন্তু রাবণের চরিত্র চিন্তা করিলে আমার কল্পনা প্রজ্বলিত ও উন্নত/হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জমকালো ছিল।'

প্রবোধচন্দ্র সেন উপরোদ্ধৃত অংশগুলি সম্পর্কে লিখেছেন : 'এই অনুবাদটুকুর মধ্যে বালক রবীন্দ্রনাথের শুধু শিক্ষার ধারা নয়, তাঁর ভাষার অধিকার এবং প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শুধু অনুবাদ নয়, এই অংশটুকুর ঠিক পূর্বেই মেঘনাদবধ কাব্যের একটু খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ আলোচনাও লক্ষিতব্য। সব মিলিয়ে এই অনুমান হয় যে, এই আলোচনা ও অনুবাদ 'ঘরের পড়া' যুগেরই (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ১৮৭৩ সালের পরবর্তী কালেরই) কাজ।'[১৬] শ্রী সেন মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধটির সঙ্গে পাণ্ডুলিপির এই অংশটির সম্পর্ক তিনি সম্ভবত অনুধাবন করেননি। কিন্তু এই সম্পর্কটি এতই স্পষ্ট যে, এগুলিকে অনুবাদ-চর্চার নিদর্শন রূপে গ্রহণ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না, উক্ত প্রবন্ধে ব্যবহার করার জন্যই এই অনুবাদগুলি করা হয়েছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত, সুতরাং এই আলোচনা ও অনুবাদ অনির্দিষ্ট 1873-এর পরবর্তী 'ঘরের পড়া' যুগের কাজ নয়, নির্দিষ্টভাবেই 1877-এর প্রথম দিকে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনার সমসাময়িক।

বাল্মীকি-রামায়ণের শ্লোকানুবাদ দুটির প্রসঙ্গ আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলক আলোচনার জন্য মূল রামায়ণ থেকে অংশবিশেষ বঙ্গানুবাদে উদ্ধার করেছেন, তার অনেকগুলিই 'শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ' থেকে উদ্ধৃত। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য [বিদ্যারত্ন] আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন; আমাদের আলোচ্য পর্বে তিনি *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র সম্পাদক [এর আগেও তিনি ১২৭৪-৭৫ এই দু-বৎসরও সম্পাদক ছিলেন]। 1869 থেকে তিনি রামানুজের টীকাসহ সংস্কৃত মূল বাল্মীকি রামায়ণ ও বঙ্গানুবাদ ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত খণ্ডে প্রকাশিত করতে থাকেন। এই গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঋণ-স্বীকার করে আটটি ছোটো ও বড়ো উদ্ধৃতি তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহার করেন। কিন্তু এগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি অনুবাদ প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে [যার মধ্যে উপরে উদ্ধৃত দুটি অনুবাদও আছে] যেগুলি রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত নিজেই অনুবাদ করেন, অবশ্য অন্যের বা স্বয়ং হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের সাহায্যও তিনি নিয়ে থাকতে পারেন এমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণ-অনুবাদের যে প্রকাশ-তালিকা দিয়েছেন,[১৭] তাতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ রচনার পূর্বে বালকাণ্ড [1869-70], অযোধ্যাকাণ্ড [1870], আরণ্যকাণ্ড [1874] ও কিষ্কিন্ধাকাণ্ড [1875] প্রকাশিত হয়েছে—সুন্দরকাণ্ড [1878] ও যুদ্ধকাণ্ড [1878-80]-এর প্রকাশ-কাল এর পরবর্তী। এই তথ্য অনুসরণ করে দেখা যায়, 'অযোধ্যাকাণ্ড' থেকে যে-অংশ উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলির পাদটীকায় হেমচন্দ্রের নাম উল্লিখিত এবং মূল রচনার সঙ্গে তাদের অবিকল সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু আরও যে-দুটি উদ্ধৃতির পাদটীকায় হেমচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তার একটি সুন্দর কাণ্ডের ৯ম সর্গ ও অপরটি যুদ্ধকাণ্ডের ৪র্থ সর্গের অন্তর্ভুক্ত। উপরের তালিকা অনুযায়ী এই খণ্ডদুটি তখনও প্রকাশিত হয়নি, অথচ বিশেষ করে যুদ্ধকাণ্ডের উদ্ধৃতিটির সঙ্গে মূল রচনার অবিকল সাদৃশ্য দেখা যায় ও উৎস-নির্দেশও যথাযথ। কিন্তু সুন্দরকাণ্ড থেকে উদ্ধৃতিটি যদিও হেমচন্দ্রের নাম-সংযুক্ত, কিন্তু রাবণের বাসগৃহের বর্ণনাটি সভাগৃহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে এবং উদ্ধৃতিটিও অসম্পূর্ণ [সর্গ সংখ্যাও উল্লিখিত হয়নি]। অপরপক্ষে, সুন্দরকাণ্ড থেকে আর-একটি অংশ [মালতীপুঁথি-তে প্রাপ্ত 'খ' চিহ্নিত অনুবাদটি] ও যুদ্ধকাণ্ড থেকে ছোটো ও বড়ো অনেকগুলি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের স্ব-কৃত, যেগুলির সঙ্গে হেমচন্দ্রের অনুবাদের পার্থক্য অনেকখানি। আরও লক্ষণীয় যে, এগুলির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সর্গ' শব্দটির জায়গায় 'অধ্যায়' শব্দটি পাদটীকায় ব্যবহার করেছেন এবং অধ্যায়ের যে-সংখ্যা নির্দেশ করেছেন তাতে মনে হয় তিনি অন্য কোনো সংস্কৃত-মূল অনুসরণেই অনুবাদগুলি করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্থ সর্গ থেকে উদ্ধৃতিটি এবং তার যথাযথ মূল-নির্দেশ আমাদের সিদ্ধান্তটিকে দ্বিধান্বিত করে তোলে।

যাই হোক, এই আলোচনা থেকে একটি বিষয় আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে বা অন্যত্র এই সমালোচনা-প্রবন্ধটিকে যতখানি তুচ্ছ করে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন, রচনার পিছনের আয়োজনটি তত সামান্য ছিল না। মনে রাখতে হবে, মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম রাজনারায়ণ বসু, তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতজনেরা রবীন্দ্রনাথের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। সুতরাং প্রবন্ধটি যদি শুধু বাল্যলীলার 'উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতা'র নিদর্শনমাত্র হত, তাহলে তা নির্বিবাদে কয়েক মাস ধরে ভারতী-তে প্রকাশিত হতে পারত না ['য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ-কৃত দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়]। আসলে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের পল্লবগ্রাহী সমালোচনার যে রীতিতে প্রবন্ধটি

লিখিত হয়েছিল, আমরা পরবর্তীকালে সেই রীতি থেকে অনেকখানি সরে এসেছি এবং তা প্রধানত রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ভাবগ্রাহী সমালোচনার আদর্শেই। নতুবা মধুসূদনের কাব্য থেকেই রবীন্দ্রনাথ যে 'অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতা'র দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরেছেন কিংবা নায়ক ও অন্যান্য চরিত্র-চিত্রণে যে অসংগতিগুলি দেখিয়েছেন—আজকের দিনেও সেগুলির যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। কয়েক বছর পরে ভাদ্র ১২৮৯ সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ২৩৪-৪০] 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামক আর-একটি প্রবন্ধেও [সমালোচনা গ্রন্থে সংকলিত, দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ২। ৭৫-৭৯] তিনি কাব্যটির প্রশংসা করেননি। পরের মাসে একই নামের একটি প্রবন্ধে [পৃ ২৬৫-৭২] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-মত প্রকাশ করেন তাকেও অনুকূল বলা চলে না। এমন-কি রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' [১২৮৫, ৪ অগ্র ১২৮৩-তে পঠিত] গ্রন্থে মেঘনাদবধ-এর 'বিকট বিকট প্রয়োগ', রসভঙ্গ-দোষ, জাতীয় ভাব ও প্রাঞ্জলতার অভাব প্রভৃতি ত্রুটি নির্দেশ করে লেখেন : 'মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসে রাজ-গাম্ভীর্য্য ও রচনার জম্‌জমাট্ দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে মধুসূদনের এই কাব্য সম্বন্ধে ভারতী-গোষ্ঠীর অনেকেরই মনোভাব প্রশংসামূলক ছিল না। তাই বাল্যকালে পাঠ্যপুস্তক-রূপে 'মেঘনাদবধ' পড়ার ফলেই রবীন্দ্রনাথের মনে এই কাব্য সম্বন্ধে বিরূপতা জন্মেছিল এবং সেই জন্যই তিনি এর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন—এ ব্যাখ্যা অনেকটা অতিসরলীকরণেরই প্রয়াসমাত্র। অবশ্য দীর্ঘকাল পরে 'সাহিত্য-সৃষ্টি' [সাহিত্য ৮। ৩৯৯-৪১৪; বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৪। ১১৩-২৬] প্রবন্ধে তিনি কাব্যটি সম্পর্কে সপ্রশংস মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও যেটি লক্ষ্য করবার বিষয় সেটি হল য়ুরোপ থেকে আগত নূতন ভাবের সংঘাতে রাম-কথার একটি বিশেষ বিবর্তন হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ সেখানে মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, স্বতন্ত্রভাবে মধুসূদনের কবি-কৃতি তাঁর বিচার্য ছিল না।

ভারতী-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অপর রচনাটি হল 'ভিখারিণী' নামক একটি গল্পের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ। পরবর্তী সংখ্যায় আরও দুটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়ে রচনাটি সমাপ্ত হয়। জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ গল্পটির প্রসঙ্গে কিছু লেখেননি, কিন্তু ছেলেবেলা-য় তিনি লিখেছেন : 'আমার মতো ছেলে, যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল, অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না—এর থেকে জানা যায়, চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন। আমাদের এ ছিল কাঁচাপাকা; বড়দাদা যা লিখছেন তা লেখাও যেমন শক্ত বোঝাও তেমনি, আর তারই মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প—সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।'[১৮] জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'একটা যে ছোটো গল্প লিখিয়াছিলাম, তাহার কথা উল্লেখ করিতেও আমি কুণ্ঠিতবোধ করিতেছি।' এই কুণ্ঠা-বশতই তিনি তাঁর কোনো গল্পসংগ্রহে এই গল্পটিকে স্থান দেননি। পরে 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ডে ও রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৭শ খণ্ডে [পৃ ১০৩-১৬] গল্পটি গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

'ভিখারিণী'র গল্পাংশ অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু পূর্ববর্তী কাহিনীমূলক রচনা বনফুল বা পরবর্তী কবি-কাহিনী-র সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যযুক্ত। সবগুলিরই বিষয়বস্তু প্রেমের ব্যর্থ পরিণতি এবং প্রত্যেকটিরই ঘটনাস্থল হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চল; এমন-কি বনফুল-এর মতো 'ভিখারিণী'-তেও 'শাখাদীপ'-প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখিত হয়েছে : 'পার্বত্য লোক চীড়বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে'। পিতার সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণের বাস্তব

অভিজ্ঞতা তিনটি কাহিনীরই পরিবেশ-রচনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পটির ভাষাও লক্ষণীয়—ড সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, 'কাহিনী যতটা কাঁচা ভাষা ততটা নয়। (প্রথম হইতেই পদ্যের তুলনায় গদ্যে রবীন্দ্রনাথ বেশি দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।)'[১৯]

সমসাময়িক বহু পত্রিকায় ভারতী-র প্রথম সংখ্যাটির প্রাপ্তি স্বীকার করা হলেও সমালোচনা চোখে পড়ে সাধারণী-তে [৮। ১৮, ২৯ শ্রাবণ, পৃ ২১০] : 'শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতী নামে মাসিক সমালোচনী পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। খাস কলিকাতায় একখানি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রের অভাব ইহাতে দূরীকৃত হইয়াছে। ভারতীর সম্যক সমালোচন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবে না, তবে কেবল পরামর্শ স্বরূপ একটা কথা বলিতে প্রস্তুত আছি। 'গঞ্জিকা' প্রবন্ধে ভারতীর হাস্যরস প্রধান রচনার নমুনা আমরা পাইয়াছি। বলিতে কি, ইহা প্রথম শ্রেণীর পত্রের উপযুক্ত নহে; "সম্পাদকের বৈঠকও"—তথৈব চ।'

ভারতী-র দ্বিতীয় সংখ্যা [ভাদ্র ১২৮৪]-র সূচিপত্রটি নিম্নরূপ :

৪৯-৫৬ 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

৫৬-৫৭ 'হিমালয়' [কবিতা] : [রবীন্দ্রনাথ]

৫৭-৬২ 'জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা' : 'সূঃ—' [সত্যেন্দ্রনাথ]

৬২-৬৫ 'বুড়ার কথা।' 'কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উমানাথ রায় প্রণীত। ইঁহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর।'

৬৫-৬৯ 'মেঘনাদ-বধ কাব্য': [রবীন্দ্রনাথ] দ্র র°র° ১৫ [শতবার্ষিক সং]। ১২১-২৪

৬৯-৭৪ 'গঞ্জিকা/অথবা/তুরিতানন্দ বাবাজির আক্‌ড়া'

৭০-৭৪ 'রামিয়াড্‌ অথবা ডাক্তার বাল্মীকি এল্‌ এল্‌ ডি, এফ্‌ আর/সি এস কৃত/উনবিংশ শতাব্দীয় রামায়ণ' : [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

৭৪-৭৮ 'বজ্রাঘাতে মৃত্যু।': 'যঃ—' [ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়]

৭৯-৮৪ 'ভিখারিণী' [চতুর্থ]-পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্র গল্পগুচ্ছ ২৭। ১১০-১৬

৮৪-৮৮ 'কড়ুয়া কণবী' : 'শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর'

৮৮-৯০ 'দুর্ভিক্ষ' : 'শ্রীস' [সত্যেন্দ্রনাথ]

৯০-৯৬ 'সম্পাদকের বৈঠক। বৃষ্টি।' : [? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

এই সংখ্যাতেও রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ভিখারিণী' সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'রামিয়াড্‌... রচনাটি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। নামেই প্রকাশ যে এটি একটি ব্যঙ্গরচনা—রামায়ণ ও ইলিয়াড্‌ নাম দুটির মিশ্রণে 'রামিয়াড্‌' শব্দটি গঠিত হয়েছে—রামায়ণের কাহিনীর উনবিংশ শতাব্দীয় সংস্করণ কি রকম হতে পারে তারই একটি কৌতুকজনক রূপরেখা এই রচনাটিতে অঙ্কন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, রচনাটি নিতান্তই কৌতুকের জন্য লেখা হয়নি, সম্ভবত কনিষ্ঠ ভ্রাতার মেঘনাদবধ কাব্য-সমালোচনার প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন সমর্থন তাঁকে এটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমরা আগেও বলেছি, উক্ত সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে মতামত প্রকাশ

করেছিলেন, তা একান্তই তাঁর নিজস্ব মত ছিল না, *ভারতী*-গোষ্ঠীর অনেকেই তার সমর্থক ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'রামিয়াড্...' রচনাটিকে দেখা উচিত।

'হিমালয়' কবিতাটি অ-স্বাক্ষরিত, এর কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও বলেননি, আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো রচনা-সংগ্রহেই কবিতাটি স্থান পায়নি। সজনীকান্ত দাস অবশ্য *শনিবারের চিঠি*-তে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে কবিতাটিকে তালিকাভুক্ত করেছেন এবং লিখেছেন : 'এই তালিকাধৃত রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি দলিলে স্বীকৃতি দিয়াছেন।' তবু এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার জন্য যে প্রমাণের প্রয়োজন ছিল, সেটি মালতীপুঁথি থেকে চিত্তরঞ্জন দেব সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ঐ পাণ্ডুলিপির 40/২১খ পৃষ্ঠায় 'হিমালয়' কবিতার ৩৭-৫২ সংখ্যক ছত্রগুলির প্রাথমিক রূপটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু এর ফলে একটি সমস্যার সমাধান হলেও, আরও কয়েকটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পাণ্ডুলিপির উক্ত পৃষ্ঠাটির অপর পিঠে অথাৎ 39/২১ পৃষ্ঠায় 'নূতন উষা' শিরোনাম-যুক্ত [শিরোনামটি তিনি পরে বর্জন করেছিলেন কিনা, পাণ্ডুলিপি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না] একটি কবিতার—[সং]সারের পথে পথে, মরীচিকা অন্বেষিয়া/ভ্রমিয়া হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণ কোলাহলে,' ইত্যাদি—সন্ধান মেলে, যেটি ভাব-ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়ে 'হিমালয়' কবিতার শেষ ষোলোটি ছত্রের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য-যুক্ত; এমন-কি 'নূতন উষা' নামাঙ্কিত পৃষ্ঠাটির ১৪শ ছত্রটি—'নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব'–40/২১খ পৃষ্ঠার ২য় ছত্র 'নূতন নূতন রাজ্যে মনোসুখে খেলিব'-র পরিবর্তে 'হিমালয়' কবিতায় গৃহীত হয়েছে ৩৮শ ছত্র হিসেবে। এর থেকে মনে হয়, উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত অংশ দুটি একটি ভাবসূত্রে গ্রথিত সম্পূর্ণ কবিতা রূপেই লিখিত হয়েছিল। পরে নতুন ভাবনার স্রোতে আরও ছত্রিশটি ছত্র লিখিত হলে তার সঙ্গে এই ষোলটি ছত্র যুক্ত হয়ে 'হিমালয়' কবিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু 39/২১ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়নি—এর প্রথম আটটি ও ১১-১২শ ছত্র কিছু কিছু পরিবর্তন-সহ 'ভগ্নহৃদয় কাব্যের ঊনত্রিংশ সর্গে ললিতা-র উক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে [দ্র অচলিত ১। ২৫৯]—সেখানে অবশ্য অতিরিক্ত আরও ষোলোটি ছত্র যোগ করা হয়েছে। মালতীপুঁথি-তে প্রাপ্ত কবিতাটি ঠিক কবে লিখিত হয়েছিল নিশ্চিত করে বলা না গেলেও ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-শ্রাবণ মাসের কোনো সময়ে লেখা বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যদিও লিখেছেন : 'বিলাতে আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল',[২০] কিন্তু কাব্যটির গোড়াপত্তন যে তার অনেক আগে—১২৮৪ বঙ্গাব্দের শুরুতেই—ঘটেছিল এই অংশটিই তার প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে ভগ্নহৃদয় কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের যে রূপটি দেখা যায়, সেটি তাঁর বয়ঃসন্ধিকালের মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। যদিও কাব্যটি সম্পূর্ণ রূপ লাভ করেছে। অনেক পরে [কার্তিক ১২৮৭ : Nov 1880 সংখ্যা থেকে ভারতী-তে প্রকাশিত হতে শুরু করে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ : May 1881], কিন্তু মালতীপুঁথি-র বিভিন্ন পৃষ্ঠায় এর অনেক অংশই স্বতন্ত্র কবিতা বা গানের আকারে দেখতে পাওয়া যায়, যে-গুলির রচনাকাল সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ-কথিত সময়ের অনেক পূর্ববর্তী। ভগ্নহৃদয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব, কিন্তু *ভারতী*-র প্রথম পর্বের কবিতাগুলি—যার মধ্যে 'হিমালয়' 'নূতন উষা' এবং কিয়ৎপরিমাণে ভগ্নহৃদয়-ও পড়ে—রচনার সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থাটি কেমন ছিল তা আমরা বুঝে নিতে পারি তাঁরই একটি উক্তি থেকে:

মোটের উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা উন্মত্ততার সময় ছিল। কতদিন ইচ্ছা করিয়াই, না ঘুমাইয়া রাত কাটাইয়াছি। তাহার যে কোনো প্রয়োজন ছিল তাহা নহে কিন্তু বোধকরি রাত্রে ঘুমানোটাই সহজ ব্যাপার বলিয়াই, সেটা উলটাইয়া দিবার প্রবৃত্তি হইত।...কত গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে, তেতালার ছাদে সারিসারি টবের বড়ো বড়ো গাছগুলির ছায়াপাতের দ্বারা বিচিত্র চাঁদের আলোতে, একলা প্রেতের মতো বিনা কারণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।

কেহ যদি মনে করেন, এ-সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা হইলে ভুল করিবেন। পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যখন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি-উচ্ছাসের সময়। এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়; কিন্তু প্রথম বয়সে যখন তাহার আবরণ এত কঠিন ছিল না এবং ভিতরকার বাষ্প ছিল অনেক বেশি, তখন সদাসর্বদাই অভাবনীয় উৎপাতের তাণ্ডব চলিত। তরুণবয়সের আরম্ভে এও সেইরকমের একটা কাণ্ড। যে-সব উপকরণে জীবন গড়া হয়, যতক্ষণ গড়াটা বেশ পাকা না হয়, ততক্ষণ সেই উপকরণগুলাই হাঙ্গামা করিতে থাকে।[২১]

প্রথম বর্ষের *ভারতী*-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতাতেই এই মানসিকতার ছায়াপাত ঘটেছে।

আমরা মালতীপুঁথি-তে লিখিত 'নূতন উষা' নামে যে কবিতাটির কথা উপরে উল্লেখ করেছি, পাণ্ডুলিপির সেই পৃষ্ঠাতেই মূল রচনার ডান পাশে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদ্য-পঙ্‌ক্তি, কয়েকটি চিত্রকলার নিদর্শন, ইংরেজিতে নিজের নাম-স্বাক্ষর, কয়েকবার D.N. Tagore [দেবেন্দ্রনাথ না দ্বিজেন্দ্রনাথ?] নামটি লেখা ছাড়া 'Hecate Thacroon' কথাটি অন্তত তিনবার লিখিত হয়েছে। আমরা জানি, অন্তরঙ্গ মহলে কাদম্বরী দেবী 'হেকেটি নামে অভিহিত হতেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "কাদম্বরী দেবীর নারীহৃদয় ত্রিবেণীসংগম ক্ষেত্র ছিল। কবি বিহারীলালকে শ্রদ্ধা, স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রকে প্রীতি ও দেবর রবীন্দ্রনাথকে স্নেহদ্বারা তিনি আপনার করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইজন্য অন্তরঙ্গ আত্মীয়রা বলিতেন ত্রিমুণ্ডী 'হেকেটি'।"[২২] কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের কবিতার একজন ভক্ত-পাঠিকা ছিলেন এ-কথা রবীন্দ্রনাথই আমাদের জানিয়েছেন—কিন্তু পূর্বের আলোচনাতেই দেখেছি, বিহারীলালের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকের ঘটনা ও 'নূতন উষা' কবিতার রচনাকাল শ্রাবণ ১২৮৪-র পরে নয়। সুতরাং কাদম্বরী দেবীর 'হেকেটি' নামকরণের সঙ্গে বিহারীলালকে যুক্ত করা সম্ভবত কষ্টকল্পনার পর্যায়ে পড়ে। তাই আমাদের পূর্ব-কথিত বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, ত্রিমুণ্ডী দেবী হেকেটি থেকে নয়, ম্যাকবেথ নাটকের ডাইনী-প্রধানা হেকেটির সূত্রেই কাদম্বরী দেবীর উক্ত নামকরণ এবং সম্ভবত দেবর-বৌদির ঠাট্টার সম্পর্ক থেকেই তিনি উক্ত অভিধা লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এমন কথাও ভাবা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'ভানু' নাম হয়তো কাদম্বরী দেবীরই দেওয়া। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে যে রচনা লিখেছিলেন, তাতে আছে : 'আমাকে যাহারা চেনে সকলেই তো আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না, এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না। এক-একজনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এইজন্য আমরা যাহাকে ভালোবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই; কারণ সকলের সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ।'[২৩]—সম্ভবত এই অংশের মধ্যে উক্ত নামকরণের ইতিহাসটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী—পরমাত্মীয় এই দম্পতির সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত, আমরাও এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা আগেই করেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই হাওয়া বদল করতে যেতেন গঙ্গার ধারের বাগানে—শ্রীরামপুরের কাছে চাঁপদানিতে ঠাকুরপরিবারের একটি

নিজস্ব বাগানই ছিল। বর্তমান বৎসরেও বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স-স্ত্রীক সম্ভবত গঙ্গার ধারে কোনো বাগানে কিছুদিন অবস্থান করেন—রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী হন।

১২৮৪ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহি-টি যদি কালের গর্ভে লুপ্ত না হত, তাহলে আমরা এই গঙ্গাতীর-বাস সম্পর্কে সম্ভবত কিছু বিস্তৃত খবর দিতে পারতাম। তার অভাবে অনেকটাই অনুমানের আশ্রয় নিতে হবে। এ-সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় মালতীপুঁথি-তে; এর 54/২৮খ পৃষ্ঠায় 'শৈশব সঙ্গীত' শীর্ষনাম-যুক্ত একটি কবিতার উপরে লেখা আছে : 'বোটে লিখিয়াছি—মঙ্গলবার/২৪ আশ্বিন/ ১৮৭৭'—খ্রিস্টীয় পঞ্জিকা-অনুযায়ী তারিখটি হল 9 Oct [এইটিই রবীন্দ্রনাথের স্থান ও সন-তারিখ-যুক্ত প্রথম কবিতা; লক্ষণীয়, বাংলা তারিখের সঙ্গে ইংরেজি সাল ব্যবহৃত হয়েছে—এই অভ্যাসটি তিনি পরবর্তীকালেও রক্ষা করেছেন]। সম্ভবত, গঙ্গাতীরবর্তী উক্ত বাগান থেকে বোটে কলকাতায় ফেরার সময়ে কবিতাটি লেখা। পরবর্তী ১ কার্তিক [মঙ্গল 16 Oct]-এর মধ্যে তিনি জোড়াসাঁকোয় ফিরে এসেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মালতীপুঁথি-তেই 57/৩০ক পৃষ্ঠায়—এই তারিখ দিয়ে তিনি ঐ দিন 'বাড়িতে' 'কবি-কাহিনী' রচনা শুরু করেছিলেন। 'বাড়িতে' শব্দটি লেখার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল তার আগে বাড়ির বাইরে ছিলেন বলেই।

'শৈশব সঙ্গীত' ও মালতীপুঁথি-র আরও কয়েকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করার আগে আশ্বিন সংখ্যা [১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা] ভারতী-র সূচিপত্রটি একবার দেখে নেওয়া যাক:

৯৭-১০৩ 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক': [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

১০৩-১১ 'মেঘনাদবধ কাব্য' : 'তঃ—' ['ভঃ—'; রবীন্দ্রনাথ] দ্র র°র°১৫ [শতবার্ষিক সং]। ১২৫-৩৩

১১১-১৩ 'আগমনী' [কবিতা] : [? রবীন্দ্রনাথ]

১১৩-২০ 'কুমারপাল' : রামদাস সেন

১২০-৩৫ 'জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা' : 'সূঃ' [সঃ; সত্যেন্দ্রনাথ]

১৩৫ 'ভানুসিংহের কবিতা' : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২। ১৮-১৯ [১৩ নং]

১৩৬-৩৭ 'উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে' : 'বঃ—' [রাজনারায়ণ বসু]

১৩৮-৪৪ 'করুণা।/ভূমিকা [১৩৮-৪০] ও প্রথম পরিচ্ছেদ [১৪০-৪৪] : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র করুণা ২৭। ১১৭-২৪

১৪৪ 'উৎসর্গ-গীতি' ['তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ'] : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র গীতবিতান ৩। ৮১৯

এই তালিকার মধ্যে 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' ও 'উৎসর্গ-গীতি' সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। 'আগমনী' ['সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া/ফুটিল প্রভাত তারা'] কবিতাটি সজনীকান্ত দাসের তালিকায় থাকলেও রবীন্দ্রনাথ এটি সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ করেননি কিংবা আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো কাব্য-সংগ্রহে গৃহীত হয়নি। ড সুকুমার সেন লিখেছেন : 'কবিতাটির সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নাই। ইহার আরম্ভ, "সুধীরে নিশায় [নিশার] আঁধার ভেদিয়া।" রবীন্দ্রনাথের মধ্য-কৈশোরক কালের রচনায় "সুধীরে" শব্দের প্রয়োগ একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।'[২৪] ড সেন-কথিত এই লক্ষণটি ও বঙ্গসুন্দরী-র ছন্দের অনুবর্তন ছাড়া কবিতাটির মধ্যে আর এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে না, যাতে এটিকে নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রনাথের বলে চিহ্নিত করা যায়। রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত ও কবিওয়ালাদের রচিত আগমনী গানের স্পষ্ট প্রভাব কবিতাটিতে লক্ষিত হয়। বাংলা

সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয় ও অক্ষয় চৌধুরীর এই ধরনের রচনায় আসক্তির ফলে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই উমা-মেনকা কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সুতরাং দুর্গাপূজার মাসে প্রকাশিত পত্রিকার জন্য এইরকম একটি ফরমায়েশি কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু এ-ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করাও কঠিন।

'ভানুসিংহের কবিতা' প্রকাশের সূচনা এই মাসেই, এরপর কেবল কার্তিক সংখ্যা ছাড়া বৈশাখ ১২৮৫ পর্যন্ত *ভারতী*-র পরবর্তী প্রত্যেকটি সংখ্যায় এবং পরেও মাঝে মাঝে এই শিরোনামে কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান কবিতাটি প্রথম প্রকাশের সময়ই শিরোনামের নীচে সুর-নির্দেশ করা হয়েছে 'মল্লার' বলে এবং পাদটীকায় লিখিত হয় : 'এই ব্রজ-গাথাগুলি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে ও দীর্ঘ হ্রস্ব রক্ষা করিয়া সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে না পড়িলে শ্রুতি-মধুর হয় না—প্রত্যুত হাস্য-জনক হইয়া পড়ে।' এ-ছাড়া কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের অর্থও পাদটীকায় প্রদত্ত হয়েছিল। বর্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে [২। ১৮-১৯] ও গীতবিতানে [২। ৪৪০] পদটিকে যে-আকারে ও রূপে পাওয়া যায়—'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা'—*ভারতী*-তে তার আকার [৪টি ছত্র অতিরিক্ত] ও রূপ [প্রথম পঙক্তিটি 'সজনী গো—/আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা'] দুই-ই স্বতন্ত্র। ভারতী-তে প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন সংস্করণে কত বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পদটি বর্তমান আকার ধারণ করেছে, আগ্রহী পাঠক ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-র 'পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ'-এ [আশ্বিন ১৩৭৬] তার পরিচয় লাভ করতে পারবেন।

পদটি ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কোনো সময়ে লেখা—আমরা আগেই সঞ্জীবনী সভা-প্রসঙ্গে জানিয়েছি গঙ্গার ধারে রাজনারায়ণ বসু-সহ সভার সদস্যেরা "'আজি উন্মাদ পবনে' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গান" গেয়েছিলেন, সেটি ১২৮৩ সালেরই ঘটনা। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলী-র [১৩০৩] ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫। ১৬ বৎসর বয়সের লেখা—আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্তীকালের লেখাও আছে'—এটি তারই প্রথম পর্যায়ভুক্ত।

ভারতী-র প্রথম দুটি সংখ্যায় 'ভিখারিণী গল্প দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কাহিনী রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। বর্তমান সংখ্যা থেকে দীর্ঘতর কাহিনী রচনার সূচনা হল 'করুণা' দিয়ে। শরৎকুমারী চৌধুরানী লিখেছেন : 'ছোট গল্প প্রথমে যেটি প্রকাশিত হয়, তাহা রবিবাবুর, পরে তাঁহার একটি গল্প ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে থাকে।'[২৫] এই গল্পটি 'করুণা'। জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে অন্য এক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচনাটির কথা উল্লেখ করেছেন : "এই সকল বই [জামাই-বারিক ইত্যাদি] পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল, বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি;—প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাল্যরচনা "করুণা" নামক গল্প তাহার নমুনা।'[২৬] মাঘ ১২৮৪ ও আষাঢ় ১২৮৫ সংখ্যা ছাড়া ভাদ্র ১২৮৫ সংখ্যা পর্যন্ত ভারতী-তে কাহিনীটির ২৭টি পরিচ্ছেদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। রচনাটি সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন : 'আশ্বিন [১২৮৫] মাসে বিলাত যাত্রা করায় বইটি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উপন্যাস-রচনা বিষয়ে কবির পরবর্তী জীবনের অভ্যাস দেখিয়া মনে হয় তিনি 'করুণা' মাসে মাসে লিখিয়া পত্রিকায় দিতেছিলেন। সমগ্র বইখানি একসঙ্গে লেখেন নাই।'[২৭] পরে অবশ্য তিনি এই মত পরিবর্তন করেছেন : "'করুণা' উপন্যাস সম্পূর্ণ হয় নাই—এ কথা ঠিক নয়। কাহিনীটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্ষুদ্র উপন্যাসটি কিস্তিতে কিস্তিতে লেখা কি না বলা যায় না।"[২৮] সজনীকান্ত দাস, ড সুকুমার সেন ও আরো

অনেকে কাহিনীটি অসমাপ্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ড জ্যোতির্ময় ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়' [1969] নামক গবেষণা-গ্রন্থে 'করুণা' যে সম্পূর্ণ হয়েছিল তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। এ-বিষয়ে আমাদেরও দ্বিমত নেই।

অল্পবয়সের অনেক রচনার মতো 'করুণা'-ও রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি। দীর্ঘকাল পরে গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড [১৩৭০] ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তবিংশ খণ্ডে [পৃ ১১৭-৮৪] উপন্যাসটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্তত একবার রচনাটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ১৭ আশ্বিন ১২৯১ [2 Oct 1884] তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি দীর্ঘ পত্রে[২৯] চন্দ্রনাথ বসু 'করুণা' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পত্রটি থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর কাছে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ভারতী-র দুটি খণ্ড পাঠিয়ে দিয়ে কাহিনীটি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চান, হয়তো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা বিষয়েও তাঁর অভিমত প্রার্থনা করেছিলেন। চন্দ্রনাথ কাহিনীটির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দোষ ও গুণ দুই-ই দেখিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'গল্পটি পুস্তকাকারে ছাপান আবশ্যক'। তা-সত্ত্বেও এটি কেন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি তা বলা শক্ত।

সাহিত্য-আলোচনা আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত বলে কাহিনীটির সাহিত্যিক গুণাগুণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। কিন্তু তথ্যের দিক থেকে যেটি লক্ষণীয় সেটি হল যে, রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যে-সময়ে 'নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিকেই খুব বড়ো' করে দেখে প্রেম ও নৈরাশ্যের এক ভাবালু স্বপ্নময় জগতে পরিভ্রমণরত, গদ্যে সেই সময়ে তিনি বাস্তবের অনেক কাছাকাছি এসে জীবন ও মনের রহস্যকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এর কারণও আছে। কাব্যে মধুসূদনের আদর্শকে তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেননি, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার তাঁর ভালো লাগলেও সেই পথ তাঁর কবিস্বভাবের পক্ষে অনুকরণীয় ছিল না; বিহারীলালের রচনাদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বটে, কিন্তু তাঁর আত্মবিকাশের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং কবিতার বিষয়ে ও প্রকাশভঙ্গিতে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের পথ তাঁকে নিজেই খুঁজে নিতে হয়েছে। কিন্তু গদ্যে—বিশেষ করে কাহিনী চিত্রণে—বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির উপন্যাস ও দীনবন্ধুর নাটকসমূহের দ্বারা বাস্তব জীবনকে সাহিত্যে রূপ দেবার আদর্শ মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠেছে, বাংলা গদ্যের প্রকাশক্ষমতাও তখন যথেষ্ট। সুতরাং গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই অল্পবয়সে যে-ধরনের পরিণতি অর্জন করেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধি এত তাড়াতাড়ি তাঁর আয়ত্তে আসেনি। রবীন্দ্রসাহিত্যে করুণা-র গুরুত্ব প্রধানত এই দিক থেকেই। আরও লক্ষণীয়, সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রধানত সাধুভাষা ব্যবহার করলেও কোথাও কোথাও তাঁর অজ্ঞাতসারেই চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

'করুণা' রচনার সূত্রপাত সম্ভবত ভাদ্র মাসে 'ভিখারিণী' গল্পটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার পরেই। আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ কাহিনীটি একসঙ্গে লিখে শেষ করেননি, পরবর্তী কালের অভ্যাস-মতোই প্রতিটি সংখ্যার জন্য কয়েকটি করে পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। এটি আন্দাজ করা যায় একটি হিসাব থেকে—প্রথম পাঁচটি সংখ্যায় যেখানে ভূমিকা-সহ মাত্র ১১টি পরিচ্ছেদ ছাপা হয়েছে, [রবীন্দ্র-রচনাবলীতে মোটামুটি ৩০ পৃষ্ঠা], চৈত্র থেকে ভাদ্র মাসের মধ্যে পাঁচটি সংখ্যায় সেখানে প্রকাশিত পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ১৭টি [৩৮ পৃষ্ঠা]—শুধু ভাদ্র সংখ্যাতেই ৫টি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য মনে রাখা দরকার যে, ফাল্গুন মাসের

শেষেই রবীন্দ্রনাথের বিলাত-যাত্রার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছিল এবং ৫ আশ্বিন ১২৮৫ তিনি ইংলণ্ডের উদ্দেশে বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়েছিলেন। যাত্রার আগেই যাতে রচনাটি সমাপ্ত হয়ে যেতে পারে, সেই কারণেই শেষের দিকে তিনি অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে লেখনী চালনা করেছিলেন, এমন মনে করা ভুল হবে না।

এইবার ফিরে যাওয়া যাক মালতীপুঁথি-র 'শৈশব সঙ্গীত' কবিতার প্রসঙ্গে। আগেই বলা হয়েছে পাণ্ডুলিপির 54/২৮খ চিহ্নিত পৃষ্ঠায় কবিতাটি লেখা শুরু হয়—শীর্ষনামের পাশেই লেখা : 'বোটে লিখিয়াছি—মঙ্গলবার/২৩ আশ্বিন ১৮৭৭', আমরা বলেছি সম্ভবত গঙ্গাতীরের বাগান [? চন্দননগর] থেকে বোটে কলকাতা ফেরার পথেই তিনি এটি রচনা করেন। এই পৃষ্ঠাটির অপর পিঠ অথাৎ 54/২৮ক পৃষ্ঠায় একটি প্ল্যানচেট আসরের বিবরণ আছে, সেটি নিশ্চয়ই অনেক পরে লেখা; কারণ এর শেষ লাইনটি 'গুণদাদাকে এনেই তুমি যাবে কি?'—অবশ্যই গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর [২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ শুক্র 3 Jun 1881] পরবর্তী কোনো সময়কেই নির্দেশ করে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য সময়ে পৃষ্ঠাটি সাদাই থেকে গিয়েছিল। 'শৈশব সঙ্গীত' কবিতাটির উপরের অংশে কিছু কিছু লেখা দেখা যায়—তার মধ্যে 'R N Tagore' স্বাক্ষর কয়েকটি, 'D N Tagore' লেখা একবার, কবিতাটির-ই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ছত্র বা তার অংশ ছাড়াও 'Grand fellow Raban' ও 'Rabana was a Grand fellow' কথাগুলি লিখিত হয়েছে। 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' প্রবন্ধটিও হয়তো কিস্তিতে কিস্তিতে লিখে ভারতী-তে প্রেরিত হচ্ছিল, এটি তার একটি প্রমাণ-স্বরূপ গণ্য হতে পারে; প্রবন্ধটির তিনটি কিস্তি প্রকাশিত হয়ে যাবার পরেও বিষয়টি তখনও তাঁর মন অধিকার করে রেখেছিল, অসতর্কভাবে লেখা এই দুটি বাক্য বা বাক্যাংশ তার চিহ্ন বহন করছে।

[মালতীপুঁথি-র উল্লিখিত পৃষ্ঠার উপরাংশে এই হিজিবিজি লেখা আমাদের কাছে কিছু সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। কালিতে লেখা নানা বাক্য ও বাক্যাংশের অন্তরালে পেনসিলে অপেক্ষাকৃত পরিণত হস্তাক্ষরে লেখা চারটি ছত্রের আভাস পাওয়া যায়। এর বেশির ভাগই পড়া যায় না, শুধু প্রথম ছত্রে 'শোন গো', তৃতীয় ছত্রে 'শ্যামল সলিল আরসী মাঝারে' এবং শেষ ছত্রে 'নলিনী' শব্দটি পড়া যায়। সন্দেহ হয়, ছত্রগুলি 'শুন নলিনী মেল গো আঁখি' গানটির খসড়ার অংশ—হস্তাক্ষর অনেকটা 14/৭খ ও 27/১৫ক পৃষ্ঠায় লেখা 'বল বল দেখি লো,/নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো?' গানটির মতো। এই গানটি সম্ভবত আমেদাবাদ বা বোম্বাই অবস্থানকালে রচিত—'শুন নলিনী' গানটিও তাই। কিন্তু গানের ছত্র চারটি এই পৃষ্ঠাতেই লেখা হল কেন বোঝা মুশকিল। চেষ্টা করলে লেখাটির উপর 'Turkhud' শব্দটিও পড়া যায়।]

'শৈশব সঙ্গীত' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মানসিকতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ-প্রকৃতির পরিবেশে কল্পনাকে সাথী করে যে সুখের জীবন কবি কাটিয়েছেন, বর্তমানের দুঃখজ্বালা সেই অতীত সুখকে এক দারুণ দুরাশাময় ভবিষ্যতের গর্ভে নিক্ষেপ করছে, এইটিই কবিতার মর্মকথা। অনেক দিন আগে লেখা মালতীপুঁথির-ই 'প্রথম সর্গ' শীর্ষক কবিতাটির সঙ্গে 'শৈশব সঙ্গীত'-এর কয়েকটি বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়—সেখানকার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে যেন নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'প্রথম সর্গ'তে আছে :

দরিদ্র গ্রামের সেই ভাঙ্গাচোরা পথ,
গৃহস্থের ছোটখাট নিভৃত কুটীর
যেখানে কোথা বা আছে, তৃণ রাশি রাশি

কোথা বা গাছের তলে বাঁধা আছে গাভী
অযত্নে চিবায় কভু গাছের পল্লব

—'শৈশব সঙ্গীত'-এ চিত্রটি এইভাবে অঙ্কিত হয়েছে :

ভাঙ্গা চোরা বেড়াগুলি, উঠেছে লতিকা তায়
ফুল ফুটি করিয়াছে আলা!
ওদিকে পড়িয়া মাঠ, দূরে দুচারিটি গরু
চিবায় নবীন তৃণদল।
কেহ বা গাছের ছায়ে, কেহ বা খালের ধারে
পান করে সুশীতল জল।

'প্রথম সর্গ' শীর্ষক কবিতাটি অসম্পূর্ণ, 'শৈশব সঙ্গীত'-ও সম্ভবত তাই—কারণ পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির শীর্ষে 'ভূমিকা' কথাটি লেখা হয়েছে, আর সেই কারণেই হয়তো এটি ভারতী-তে প্রকাশিত হয়নি, ইচ্ছা ছিল এটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার--যা কোনো কারণে সম্ভব হয়নি। ফলে দীর্ঘকাল পরে ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'শৈশব সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থে বর্তমান আকারেই এটি সংকলিত হয়, কিন্তু সেখানে কবিতাটির নূতন নামকরণ করা হয়—''অতীত ও ভবিষ্যৎ।

'শৈশব সঙ্গীত' কবিতাটি 54/২৮খ পৃষ্ঠাতেই শেষ হয়নি, এর শেষ দশটি ছত্র আছে 57/৩০ক পৃষ্ঠায়, বোঝা যায় পাণ্ডুলিপির বিচ্ছিন্ন পাতাগুলি সাজানোর সময়ে '55/২৯ক' ও '56/২৯খ' চিহ্নিত পাতাটি ভুলক্রমে স্থান পরিবর্তন করেছে। যাই হোক, ঐ 54/২৮খ পৃষ্ঠায় 'শৈশব সঙ্গীত' কবিতাটি যেখানে শেষ হয়েছে এবং ১ কার্তিক 'কবিকাহিনী' রচনার যেখানে শুরু—এর মধ্যবর্তী অংশে দুটি কবিতা দেখা যায়, যা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। কবিতা-দুটি অবশ্যই ২৪ আশ্বিন [9 Oct] ও ১ কার্তিক [16 Oct] —মধ্যবর্তী এই সাতদিনের কোনো সময়ে লিখিত হয়েছিল।

'শৈশব সঙ্গীত'-এর পরবর্তী কবিতা 'আমার এ মননজ্বালা কে বুঝিবে সরলে' পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ ছিল—*ভারতী* বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি—এমনকি প্রায় সাত বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন 'তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি' 'শৈশব সঙ্গীত' গ্রন্থে প্রকাশ করেন, তখনও এটিকে তার অন্তর্ভুক্ত করেননি। অবশ্য 'ভূমিকা'য় কৈফিয়ৎ-স্বরূপ তিনি জানিয়েছিলেন, 'আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই'—সেই হিসেবে বলা যেতে পারে এই কবিতাটির মধ্যে তিনি কোনো গুণ দেখতে পাননি। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্যরূপ। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই সময়ে লিখিত যে কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সুরটি ধ্বনিত হয়েছে, সেগুলি তিনি হয় প্রকাশ করেননি, নাহয় কোনো কাহিনীমূলক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। আমরা আগেই দেখেছি, 'নূতন উষা' কবিতাটির একাংশ ললিতার উক্তি-রূপে 'ভগ্নহৃদয়'-এ স্থান পেয়েছে এবং অপর অংশটি 'হিমালয়'-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণনার অঙ্গীভূত হয়ে নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জনের চেষ্টা করেছে। 'শৈশব সঙ্গীত'-এর 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামকরণ হয়তো এই কারণে। এই আত্মগোপন-প্রয়াসের মূল সম্ভবত পারিবারিক প্রতিবেশের মধ্যে নিহিত ছিল। সেই

কারণেই এই যুগটি রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে গাথা বা কাহিনী-কাব্যের যুগ। গাথা বা কাহিনীগুলির মধ্যে কবিস্বভাব পুরুষ বা নারীর সাক্ষাৎ প্রায়ই পাওয়া যায় এবং তাদের পরিণতি প্রায়শই বিয়োগান্ত। এইভাবে কাহিনীর কোনো চরিত্রের অন্তরালে আত্মগোপন করে নিজের মনের প্রেম ও নৈরাশ্যের রূপটি চিত্রিত করা তাঁর পক্ষে অনেক নিরাপদ বলে মনে হয়ে থাকতে পারে। চেষ্টাটি হয়তো সবসময়ে তাঁর সচেতন মন থেকে উৎসারিত হয়নি, কিন্তু সতর্কতার চিহ্নও খুব দুর্লক্ষ্য নয়। সেই কারণেই এই পর্বে প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া শক্ত [অবশ্য কয়েকটি গান-জাতীয় রচনা এর ব্যতিক্রম—যেমন অগ্র ১২৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ছিন্ন লতিকা'; গীতবিতানে এটিকে 'জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল' এই সুর-তাল-নির্দেশ-সহ পাওয়া যায়]। রবীন্দ্রনাথের এই কৌতূহলোদ্দীপক মানসিকতার পরিচয় মেলে এমন-কি 'করুণা' উপন্যাসেও। সেখানে তিনি 'ভূমিকা'য় করুণার পরিচয়টি দিয়েছেন এইভাবে : 'সঙ্গিনী-অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্তমাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই।...এইরূপে করুণা তাহার জীবনের প্রত্যুষকাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পিতা ও প্রতিবাসীরা মনে করিতেন যে, চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।'[৩০] কিন্তু এই কাল্পনিকতা কঠোর বাস্তবের সঙ্গে যদি সামঞ্জস্য স্থাপন করতে না পারে, 'এই প্রফুল্ল হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাঙিয়া যায়, এই হাস্যময় অজ্ঞান শিশুর মতো চিন্তাশূন্য সরল মুখশ্রী একবার যদি দুঃখের অন্ধকারে মলিন হইয়া যায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লতাটির ন্যায় জন্মের মতো স্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিলসেকে—বসন্তের বায়ুবীজনে আর বোধ হয় সে মাথা তুলিতে পারে না।'[৩১] রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে লিখিত অনেকগুলি কবিতায় এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অথচ এই মনোভাবকে ঠাট্টা করতেও কিশোর-কবির বাধেনি। নামহীন ঐ গীতিকবিতাটির কয়েকটি পঙ্ক্তি হল:

> [ম্রিয়]মাণ মুখে, এই শুন্যপ্রায় নেত্রে
> [ক]লঙ্ক সঁপিগো আমি তোমাদের হরষে;
> পূর্ণিমা যামিনী যথা মলিন হইয়া যায়
> ক্ষুদ্র এক অন্ধকার জলদের পরশে

এই কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ বসিয়েছেন 'কবিতাকুসুমমঞ্জরী-প্রণেতা কবিবর স্বরূপচন্দ্রবাবু'র মুখে : 'শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে কখনো ছাতে শুয়েছ? চাঁদ যখন ঢলঢল হাসি ঢালতে ঢালতে আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ? আবার সেই হাস্যময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয়, তা কি কখনো সহ্য করেছ।'[৩২] যদিও গদ্যাংশটি উপরোক্ত কবিতার পূর্বে লেখা, তবু বোঝা যায় এই ধরনের 'কবিয়ানা'র—এমন-কি নিজেরও হাস্যকরত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকলেও এর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এগুলিকে লোসমক্ষে প্রকাশ করার ব্যাপারে সংকোচবশতই পত্রিকা বা গ্রন্থে এদের স্থান দেননি।

নামহীন এই গীতিকবিতাটির পরে একই পৃষ্ঠায় 'উপহার গীতি' নামে আর একটি কবিতা লিখিত হয়েছে। এরই নীচে '১লা কার্ত্তিক' তারিখ দিয়ে 'কবিকাহিনী' কাব্যের সূচনা, সুতরাং 'উপহার গীতি'র রচনাকাল

আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহে। কবিতাটির শেষে লেখা আছে ‘Les Poetes হইতে/অনুবাদিত—এবং শিরোনামের পাশে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় ‘ভগ্ন...উপরে’, প্রবোধচন্দ্র সেন সাক্ষ্য দিয়েছেন[৩৩] পাণ্ডুলিপি-প্রাপ্তির সময়ে তিনি নিজে লেখাটির পূর্ণরূপ দেখেছেন—‘ভগ্নহৃদয়ের উপরে’। এর থেকে মনে হতে পারে কবিতাটি মৌলিক রচনা নয় কিন্তু তা নাও হতে পারে।* যাই হোক, রচনার সময়েই কিংবা পরে রবীন্দ্রনাথ এটিকে ‘ভগ্নহৃদয়’ কাব্যের উপহার-গীতি হিসেবে ব্যবহার করার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সেইজন্যই ‘ভগ্নহৃদয়ের উপরে’ এই নির্দেশটুকু লিখে রেখেছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কবিতাটি ‘ভগ্নহৃদয়’ কাব্যের উপহার কবিতা রূপে ব্যবহৃত হয়নি, এমন-কি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তার পরিবর্তে *ভারতী*-তে প্রকাশের সময় ‘উপহার’-রূপে ব্যবহৃত হয় ‘তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা’ গানটি ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ-কালে অন্য একটি দীর্ঘ কবিতা এই উদ্দেশ্যে মুদ্রিত হয়—আমরা যথাসময়ে সে-প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

আলোচ্য ‘উপহার গীতি’ কবিতাটির সঙ্গে এর আগের নামহীন কবিতাটির ভাবের দিক থেকে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়। অতীতের অনুরাগ বর্তমানে বিরক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে, তবুও সেই নিদয়ার কাছেই ভগ্নহৃদয়ের ‘সর্ব্বস্বধন কবিতার মালাগুলি’ সমর্পণ করতে হবে—এই বিষাদ দুটি কবিতাতেই অন্তর্লীন হয়ে আছে। নামহীন কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

জানিতাম ওগো সখি, কাঁদিলে মমতা পাব,
কাঁদিলে বিরক্ত হবে এ কি নিদারুণ?
চরণে ধরিগো সখি, একটু করিও দয়া।
নহিলে নিভিবে কিসে বুকের আগুন!

—‘উপহার গীতি’তে লিখলেন :

একদিন মনে পড়ে, যাহা তাহা গাইতাম
সকলি তোমার সখি লাগিত গো ভাল
নীরবে শুনিতে তুমি, সমুখে বহিত নদী
মাথায় ঢালিত চাঁদ পূর্ণিমার আলো।
সুখের স্বপনসম, সেদিন গেলগো চলি
অভাগা অদৃষ্টে হায় এ জন্মের তরে
আমার মনের গান মর্ম্মের রোদনধ্বনি
স্পর্শও করেনা আজ তোমার অন্তরে।
তবুও—তবুও সখি তোমারেই শুনাইব
তোমারেই দিব সখি যা আছে আমার।
দিনু যা’ মনের সাথে, তুলিয়া লও তা হাতে
ভগ্ন হৃদয়ের এই প্রীতি উপহার।

এই কবিতা-দুটি লেখার কিছুদিন পরেই *ভারতী*-র কার্তিক সংখ্যায় 'শারদ জ্যোৎস্নায়/ভগ্ন হৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস' [পৃ ১৫৪-৫৬] নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুমান করে মন্তব্য করেছেন, 'এই কবিতাটিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু শেষ চার পংক্তিতে "ভানু" দেখিয়া রবীন্দ্রনাথকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে হয়। পংক্তিচারিটি এই :

"নিশি তুমি! আজ হয়ো না প্রভাত,
ভানুর মাথায় পড়ুক বাজ,
কাঁদায়ে চকোরে, ফেলিয়ে আমারে,
মধুর যামিনী, যেয়োনা আজ।"[৩৪]

—সজনীকান্তের যুক্তি মানা সম্ভব নয়, আমাদেরও ধারণা কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লিখিত। উদ্ধৃতির 'ভানু' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের নামান্তর নয়, এর দ্বারা সূর্যকেই বোঝানো হয়েছে। ভাষা ও ছন্দও অক্ষয়চন্দ্রের রচনারীতির অনেক কাছাকাছি। জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য-প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'তখনকার কবির একটি শ্লোক মনে পড়ে—

আমার হৃদয় আমারি হৃদয় [,]
বেচিনি [বেচিনে] তো তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে।

সত্যের দিক দিয়া হৃদয়ের কোনো বালাই নাই, তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অন্য কোনোপ্রকার দুর্ঘটনা নিতান্তই বাহুল্য, কিন্তু যেন তাহা ভাঙিয়াছে এমন একটা ভাবাবেশ মনের নেশার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক—দুঃখবৈরাগ্যের সত্যটা স্পৃহনীয় নয়, কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহার ঝাঁঝটুকু উপভোগের সামগ্রী, এইজন্য কাব্যে সেই জিনিসটার কারবার জমিয়া উঠিয়াছিল'।[৩৫] এখানেও খানিকটা আত্মগোপনের প্রয়াস আছে, তৎকালীন হৃদয়ভাবকে একটু লঘু করে দেখানোর চেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়—কিন্তু 'শারদ জ্যোৎস্নায়...' কবিতা থেকে ১৬শ স্তবকটি যেভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, নিজের লিখিত কবিতা হলে সেভাবে করা সম্ভব হত না।* এটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, তার একটি প্রমাণ, ভারতী-র ফাল্গুন সংখ্যায় 'বিজন চিন্তা।/কল্পনা' শীর্ষক প্রবন্ধে এর প্রথম দুটি ছত্র উদ্ধৃত করে প্রতিবাদ করা হয়েছে, আমাদের ধারণা 'বিধবা' নামে লিখিত উক্ত প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথেরই লেখা [পরে আমরা এটি সম্পর্কে আলোচনা করব]। আসলে Les Poetes থেকে কবিতাটি অনুবাদ করতে রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। সুতরাং মালতীপুঁথি-র এই কবিতাটি তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না, আর অক্ষয় চৌধুরী এর বিষয়বস্তু লঘু করার জন্যই হালকা চালে 'শারদ জ্যোৎস্নায়...' কবিতাটি লিখে বলতে চেয়েছিলেন:

বিষাদের ঘোর কেন রবে তবে,
ভাবনায় কেন দলিত হ'ব,

চাহে না পৃথিবী, চাহিনা পৃথিবী,
আপনার ভাবে আপনি র'ব!

—বয়সের ও শিক্ষাদীক্ষার বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও অক্ষয়চন্দ্র সত্যই রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন। তাই প্রবন্ধের মাধ্যমে উত্তর-প্রত্যুত্তর, এমন-কি রবীন্দ্রনাথের কবিতারও ভাবগ্রাহী প্রতি-কবিতা রচনা করতে [যেমন, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অবলম্বনে লিখিত 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী'] তিনি উদ্বুদ্ধ হতেন। আলোচ্য কবিতাটি তারই একটি নিদর্শন।

মালতীপুঁথি-তে 'উপহার গীতি' কবিতাটি যেখানে শেষ হয়েছে তারই নীচে 'কবি-কাহিনী' কাব্যের সূত্রপাত। অবশ্য পাণ্ডুলিপিতে কোনো শিরোনাম নেই, কেবল স্থান-কাল নির্দেশিত হয়েছে : 'বাড়িতে ১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার' [16 Oct 1877]। এর পর পাণ্ডুলিপির 58/৩০খ, 37/২০ক, 38/২০খ, 35/১৯ক, 36/১৯খ, 59/৩১ক ও 60/৩১খ পৃষ্ঠায় কবিকাহিনীর প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের খসড়া রূপটি পাওয়া যায়, *ভারতী*-তে প্রকাশের সময় যার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় সর্গের সম্পূর্ণটি ও অন্য তিনটি সর্গের অনেক অংশ পাণ্ডুলিপিতে নেই, এমন হতে পারে পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে কিংবা পত্রিকার জন্য প্রেস-কপি তৈরি করার সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অংশ নতুন করে লিখে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, চতুর্থ সর্গের শেষে [পাণ্ডুলিপিতে কোনো সর্গ বিভাগ নেই] একটি কাল-নির্দেশ পাওয়া যায় : '১২ই কার্তিক/শনিবার [27 Oct]/৪ দিন লিখি নাই।' অর্থাৎ ১লা থেকে ১২ই কার্তিকের মধ্যে চার দিন বাদ দিয়ে মাত্র আট দিনে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। মালতীপুঁথি-র নির্দেশ-অনুযায়ী কাব্যটি আট দিনে লিখিত হলেও এটি প্রকাশযোগ্য রূপ পেতে আরও অনেকদিন লেগেছে এবং এর জন্য আরও একটি পাণ্ডুলিপি বা প্রেস-কপি তৈরি হয়েছিল, যার কোনো সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পৌষ থেকে চৈত্র ১২৮৪—এই চার মাসে ভারতী-তে কাব্যটির চারটি সর্গ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড [১৩৭২] ও ২য় খণ্ডে [১৩৭৫] 'কবি-কাহিনী'-র পাণ্ডুলিপি ও চিত্তরঞ্জন দেব-কৃত সুবিস্তৃত 'তথ্য-সংকলন' মুদ্রিত হয়েছে। তথ্যানুরাগী পাঠকের পক্ষে এগুলির পর্যালোচনা আবশ্যিক কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যটি প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> এই প্রথম বৎসরের *ভারতীতেই* 'কবিকাহিনী' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে-বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে,—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অথাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।[৩৬]

এর মূল কথাটা আমাদের গ্রাহ্য হলেও, নিজের অল্প বয়সের রচনা-সম্পর্কে পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের কথা সর্বাংশে মান্য করবার কোনো কারণ নেই। নিজের অল্প বয়সের লেখা সম্পর্কে কারো কারো অতিরিক্ত মমতা দেখা গেলেও বেশি ভাগ নামী লেখকেরই একধরনের কৃপামিশ্রিত ঔদাসীন্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও

তার ব্যতিক্রম নন। পরবর্তীকালে শিল্পসাধনায় যে সিদ্ধি তিনি অর্জন করেছিলেন, তার তুলনায় আলোচ্য যুগের রচনার দুর্বলতা তাঁর কাছে পীড়াদায়ক লাগতেই পারে, এবং সেটা আরো বেশি করে লাগে সেগুলির সঙ্গে তাঁর নিজের নাম যুক্ত আছে বলেই। সেই কারণে তাঁকে রচনার মান সম্পর্কে সতর্ক হতে হয়েছে, বাল্যরচনা যার মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ সুস্পষ্ট তাকে নিঃশেষে বর্জন করার দিকে তাঁর এত আগ্রহ! কিন্তু ঐতিহাসিকের মনোভাব অন্যপ্রকার। তাঁর আকর্ষণের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত সমসাময়িক সাহিত্যের পটভূমিকায় আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, দ্বিতীয়ত পরিণত রবীন্দ্র-মানসের প্রাথমিক সূত্র সন্ধান। এই দিক দিয়ে কবি-কাহিনী-র গুরুত্ব অসাধারণ, কিন্তু সে আলোচনা আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যের বহির্ভূত।[৩৭]

'বনফুল' সমগ্র কাব্য হিসেবে সাময়িক-পত্রে আগে প্রকাশিত হলেও, 'কবি-কাহিনী'-ই পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা। ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 5 Nov 1878 [২০ কার্তিক ১২৮৫]। যথাস্থানে আমরা বিষয়টি পুনরুত্থাপন করব।

এইবার কার্তিক সংখ্যা [১। ৪] ভারতী-র সূচিপত্রটি দেখা যাক। [উল্লেখযোগ্য, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিল ৫০০ কপি করে, কিন্তু আশ্বিন সংখ্যা থেকেই ১০০০ কপি করে ছাপা আরম্ভ হয়। ক্যাশবহি-তে ২৩ কার্তিকের হিসাবে দেখা যায়, 'বঃ নেহাজাদ্দিন দপ্তরি/দঃ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাহার ভারতী ১০০০ কপী করিয়া ২০০০ কপী ভারতী বান্দাইবার মূল্য শোদ' ৯ ল০। *ভারতী*-তে 'মূল্যপ্রাপ্তি' তালিকায় দেখা যায় ১১ আশ্বিন থেকে ১০ অগ্রহায়ণ এই দু-মাসে নতুন গ্রাহকের সংখ্যা ১২৯ জন।]

১৪৫-৫৪ 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

১৫৪-৫৫ 'শারদ জ্যোৎস্নায়/ভগ্ন হৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস' [কবিতা] : [? অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]

১৫৬-৬০ 'বঙ্গ সাহিত্য' : [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]

১৬১-৬৪ 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র র°র° ১৫ [শতবার্ষিক সং]। ১৩৩-৩৭

১৬৪-৭০ 'গুজরাটে নাম করণ' : 'শ্রীস—' [সত্যেন্দ্রনাথ]

১৭০-৮০ 'করুণা'/দ্বিতীয়—চতুর্থ পরিচ্ছেদ : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র করুণা ২৭।১২৪-৩৪

১৮০-৮৩ 'স্বাস্থ্য' [ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়]

১৮৩-৮৬ 'প্রাচীন ভারতের শিল্প। /কালজ্ঞান-সাধন শিল্প' : কালীবর বেদান্তবাগীশ

১৮৬-৯২ 'সম্পাদকের বৈঠক।'/বাতুলদিগের উপর সূর্য্যের প্রভাব; কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যের অন্তঃপ্রয়োগ; ইঁদুর-ধরা মেয়ে; ভল্‌টেয়ারের উক্তি; মশার বাদ্য-যন্ত্র; রুষিয়াতে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা : [? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

এই সূচির অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের রচনা ও 'শারদ জ্যোৎস্নায়...' কবিতাটি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। অন্যান্য রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং আমরা অগ্রহায়ণ সংখ্যার সূচিটি উদ্ধার করছি :

১৯৩-২০০ 'প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালী' : 'ত—'

২০০-০৬ 'ঝান্সীর রাণী: : 'ভ—' [রবীন্দ্রনাথ] দ্র ইতিহাস [১৩৬২]। ১০৩-১৩

২০৬-০৭ 'ভানুসিংহের কবিতা' ['গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে'] : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২।

১২-১৩ [৮ সংখ্যক]

২০৭-০৯ 'প্রাচীন ভারতের শিল্প' : [কালীবর বেদান্তবাগীশ]

২০৯-১৬ 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

২১৭-২৩ 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' : 'শ্রীস—' [সত্যেন্দ্রনাথ]

২২৩-২৯ 'বঙ্গসাহিত্য' : 'চ—' [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]

২২৯-৩৪ 'করুণা'/পঞ্চম পরিচ্ছেদ : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র করুণা ২৭। ১৩৪-৩৯

২৩৪-৪০ 'প্রাপ্ত-গ্রন্থ' [সংক্ষিপ্ত সমালোচনা]

২৪৮ 'ছিন্ন লতিকা ['সাধের কাননে মোর'] : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র শৈশবসঙ্গীত অ-১। ৪৬৪-৬৫

এই সূচির অন্তর্গত 'ঝান্‌সীর রাণী' রচনাটি 'ভ' স্বাক্ষরযুক্ত, যেটি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়বাহী। তাছাড়া মালতীপুঁথি-র 32/১৭খ পৃষ্ঠায় 'ঝান্সী রাণী' শিরোনামে একটি গদ্যরচনা পাওয়া যায়, যার সঙ্গে ভারতী-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির মধ্যবর্তী অনেক অংশের বিষয় ও ভাষার সাদৃশ্য আছে। মালতীপুঁথি-তে প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ খসড়া সম্ভবত করা হয়নি। কারণ পূর্ববর্তী 31/১৭ক পৃষ্ঠায় একটি দীর্ঘ কবিতা ['এস আজি সখা বিজন পুলিনে'] দেখা যায়, যা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আর 'ঝান্সী রাণী' এই শিরোনাম দিয়ে খসড়াটির শুরু হয়েছে, সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় *ভারতী*-তে এর পূর্বে যে অংশটি দেখা যায় তা পরে যুক্ত। কিন্তু রচনাটির শেষাংশ মালতীপুঁথি-র কোনো বিলুপ্ত পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছিল কিনা বলা যায় না। খসড়াটি পড়লেই বোঝা যায়, এটি কোনো ইংরেজি রচনার অনুবাদ; *ভারতী*-র প্রবন্ধের শেষেও লিখিত হয়েছে, "ইংরাজী ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি'। অবশ্য প্রবোধচন্দ্র সেন যেমন অনুমান করেছেন যে এটি 'ঘরের পড়া' যুগে ভারতীয় ইতিহাস পাঠের অঙ্গ হিসেবে রচিত হয়েছিল, সেটি যথার্থ না হতেও পারে। 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' প্রবন্ধ রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ যেমন কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ও একটি ইংরেজি পত্রাংশ উক্ত প্রবন্ধে ব্যবহার করার জন্যই অনুবাদ করেছিলেন, এটিও তেমনি 'ঝান্‌সীর রাণী' প্রবন্ধ-রচনার উদ্দেশ্যে তথ্য-সংকলনের নিদর্শনও হতে পারে—1859, 1858 প্রভৃতি কয়েকটি খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ খসড়াটিতে যেভাবে করা হয়েছে তাতে এমন অনুমান করা খুব একটা অযৌক্তিক নয়। ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস অবলম্বনে লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবনী রচনা করে প্রবন্ধের শেষে উল্লিখিত হয়েছে : 'আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।' এই প্রতিশ্রুতি রবীন্দ্রনাথ কখনোই রক্ষা করেননি, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহুদিন পরে ১৩১০ বঙ্গাব্দে 'মরাঠী হইতে' লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবনকাহিনী রচনা করে প্রকাশ করেন 'ঝাঁশির রাণী' [30 Sep 1903] নামে।

প্রবন্ধটি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, সঞ্জীবনী সভার প্রেরণা এটির পিছনে কাজ করেছিল বলে মনে হয়। উল্লেখযোগ্য যে, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত Jan 1877 থেকে খণ্ডাকারে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' প্রকাশ করতে শুরু করেন। আমরা সঞ্জীবনী সভার আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে যা অনুমান করেছি, এই গ্রন্থ প্রকাশের কাল তারই অন্তর্বর্তী। রবীন্দ্রনাথ যেখান থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করে থাকুন-না কেন, জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ ও অকুতোভয়তা প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। তিনি এর শুরুতেই লিখেছেন : 'আমরা একদিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্বের

নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্যবহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেদিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীরপুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্য-সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যুঝাযুঝি করিয়া বেড়াইতেছেন।'[৩৮] তখনকার দিনের অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন 'সিপাহি যুদ্ধের সময় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহাদের বীর্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন',[৩৮] কিন্তু এঁরা যে যথার্থ বীরের মর্যাদা পাবার যোগ্য এ-সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না, আর সেই কারণেই 'সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার' করে তাঁর জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর মধ্যে আমাদের যেটি বিস্মিত করে সেটি হল, রাজরোষের ভয়ে যেখানে 'দিল্লী দরবার' কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত না হয়ে পরে ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল সেখানে বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁতিয়া টোপীর প্রাণদণ্ড-প্রসঙ্গে নির্দ্বিধায় লিখতে পেরেছিলেন :

ইংরাজেরা যদি স্বার্থপর বণিক জাতি না হইতেন, যদি বীরত্বের প্রতি তাঁহাদের অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগ্য বীরের এরূপ বন্দীভাবে অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইত না, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তরমূর্তি এতদিনে ইংলণ্ডের চিত্রশালায় শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত। যে ঔদার্যের সহিত আলেকজাণ্ডার পুরুরাজের ক্ষত্রিয়োচিত স্পর্ধা মার্জনা করিয়াছিলেন সেই ঔদার্যের সহিত তাঁতিয়াটোপীকে ক্ষমা করিলে কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতির পক্ষে আরো গৌরবের বিষয় হইত না? যাহা হউক, ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।'[৩৯]

প্রবন্ধের অন্যত্রও 'বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাস' 'অসভ্য ইংরাজ সৈনিক' প্রভৃতি মন্তব্য লেখকের মনোভাবটি সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছে।

'ভানুসিংহের কবিতা' 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে' রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি অনুযায়ী এই শ্রেণীর কবিতাগুচ্ছের মধ্যে প্রথম লিখিত হয়েছিল, আমরা এ-সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। ভারতী-তে প্রকাশিত হবার সময়েই 'বিহাগড়া রাগিণীর উল্লেখ দেখে মনে হয় কবিতাটিতে ইতিমধ্যেই সুর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথম সংস্করণ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' [১২৯১]-তে গানটির সুর 'ঝিঁঝিট'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 'অশ্রুমতী' [শ্রাবণ ১২৮৬] নাটকের তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মলিনার গান-রূপে এটি ব্যবহৃত হয়; এখানে গানটির শীর্ষে 'রাগিণী ঝিঁঝিট' লেখা দেখে মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'আমোদর গান' হিসেবে এটিতে নতুন করে সুর-যোজনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গীকৃত]। ভানুসিংহের কবিতা এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। গানটির প্রথম স্বরলিপিও করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'স্বরলিপি-গীতিমালা' [১৩০৪]-তে। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে এর নামকরণ করা হয় 'অভিসার'। আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'সজনি গো/আঁধার রজনী [শাওন গগনে] ঘোর ঘনঘটা' গানটিরও 'অভিসার' নাম দেওয়া হয়।

'ছিন্ন লতিকা' *ভারতী*-তে ও শৈশবসঙ্গীত-এ গীতিকবিতা রূপেই মুদ্রিত হয়। কিন্তু 'রবিচ্ছায়া' [বৈশাখ ১২৯২] গ্রন্থে সুর-তালের উল্লেখ পাওয়া যায় : 'জয়জয়ন্তী-ঝাঁপতাল'। সুরটি সম্ভবত হারিয়ে গেছে, ফলে এর কোনো স্বরলিপি পাওয়া যায় না।

মালতীপুঁথি-তে 60/৩খ পৃষ্ঠায় 'কবি-কাহিনী' যেখানে শেষ হয়েছে, তার নীচে ১৫ ছত্রের একটি ছোটো মিত্রাক্ষর ত্রিপদীতে লিখিত কবিতা আছে, তার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হল : 'পাষাণ হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়?'

প্রবোধচন্দ্র সেন কবিতাটির বহিরঙ্গের ও অন্যান্য পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে :

এটি প্রথমে লিখিত হয়েছিল পেন্‌সিলে, পরে অনেক অংশের উপরেই যদৃচ্ছাক্রমে কালি বুলানো আছে। এই কবিতাটির উপরে লেখা আছে, 'শনিবার—অগ্রহায়ণ ১৮৭৭'। এই তারিখটাও পেন্‌সিলে লেখা, তার উপরে কালি বুলানো হয় নি। কবিতাটির প্রথম লাইনের উপরেও কালি বুলানো হয় নি। তাতে মনে হয় উক্ত তারিখটা এই কবিতাটিরই রচনার তারিখ। কিন্তু তারিখটা অসম্পূর্ণ। অগ্রহায়ণ মাসের কোন্ দিন তা লেখা নেই। তার জায়গায় আছে একটি লম্বা রেখা (ড্যাশ)। মনে হয় বাংলা তারিখটা মনে ছিল না বলে ওই জায়গাটা ফাঁক রাখা হয়েছিল। ১৮৭৭ অথাৎ বাংলা ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শনিবার ছিল চারটি—৩, ১০, ১৭ ও ২৪ তারিখে। ইংরেজি তারিখ যথাক্রমে নভেম্বর ১৭, ২৪ এবং ডিসেম্বর ১ ও ৮। কবিতাটি এই চার দিনের কোনো এক দিনে রচিত হয়ে থাকবে।[৪০]

পাণ্ডুলিপির ঐ একই পৃষ্ঠায় 'ওকি সখি কেন করিতেছ...' [পাণ্ডুলিপির জীর্ণতার জন্য কবিতাটির প্রায় প্রতিটি চরণেরই শেষের একটি-দুটি শব্দ লুপ্ত], 'ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিবনা আর' এবং 'হারে বিধি কি দারুণ অদৃষ্ট আমার'—এই তিনটি ছোটো কবিতা পাওয়া যায়, যার কোনোটিই কোথাও প্রকাশিত হয়নি। সব-ক'টি কবিতারই বিষয় ভগ্নহৃদয়ের গভীর বিষাদ যা তাঁর এই সময়ের কবিতার—এমন-কি প্রবন্ধেরও—অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবিতাগুলি একই সময়ে লিখিত বলে অনুমান করা যায়।

পৌষ সংখ্যা [১। ৬] *ভারতী*-র সূচিপত্রটি এইরূপ :

২৪১-৪৭ 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

২৪৮-৬৪ 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' : 'সঃ—' [সত্যেন্দ্রনাথ]

২৬৪-৬৮ 'কবি-কাহিনী'/প্রথম সর্গ : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র কবি-কাহিনী অ-১। ৫-১৩

২৬৮-৭৪ 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' : 'ভঃ—' দ্র র°র°১৫ [শতবার্ষিক সং]। ১৩৮-৪৫

২৭৪-৭৮ 'প্রাচীন-সিংহলের বাণিজ্য' : 'প্রঃ—' [?]

২৭৮-৮৪ 'বঙ্গ-সাহিত্য' : [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]

২৮৪-৮৮ 'করুণা'/ষষ্ঠ-সপ্তম পরিচ্ছেদ : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র করুণা ২৭। ১৩৯-৪৩

২৮৮ 'ভানুসিংহের কবিতা' : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২।১৪-১৫ [১০ সংখ্যক]

এই সংখ্যায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধের প্রকাশিত অংশটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এতে হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড থেকে অনেকগুলি উদ্ধৃতি যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি যুদ্ধকাণ্ড থেকে দুটি বড় অংশ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনুবাদ করেছেন। নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই কিশোর সমালোচকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমটি এখানে লক্ষণীয়।

'ভানুসিংহের কবিতা' ['বাজাও রে মোহন বাঁশী']-টি বর্তমানে যে-আকারে দেখা যায়, *ভারতী*-র [প্রথম সংস্করণেরও] পাঠ সে-তুলনায় দীর্ঘতর। *ভারতী*-তে অপ্রচলিত শব্দের অর্থও পাদটীকায় প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনো-রকম সুর-নির্দেশ লক্ষিত হয় না, কিন্তু প্রথম সংস্করণে রাগ হিসেবে 'মূলতান' নির্দেশ দেখা যায়, সম্ভবত সুরটি পরবর্তীকালে দেওয়া। কাব্য গ্রন্থাবলী-তে কবিতাটির শিরোনাম দেওয়া হয় 'ব্যাকুলতা'।

*ভারতী*র ক্যাশবহি-তে ২২ পৌষ [শনি 5 Jan 1878] তারিখে একটি হিসাব দেখা যায় : 'বাহিরের এবং নিজ বাটীর/বাবুদিগের আহারের ব্যায়/গুঃ ছোটবাবু মহাশয় ১৮ ॥ল৯'। হিসাবটি অতর্কিতে পত্রিকার অন্তরালের একটি চিত্র দেখে নিতে আমাদের সাহায্য করে। ব্যয়টি করা হয়েছে ভারতী-র তহবিল থেকে,

সুতরাং 'ছোটবাবু' অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে বাইরের কিছু অতিথি ও বাড়ির কয়েকজনকে নিয়ে যে আহারাদির আয়োজন হয়েছিল বোঝা যায় তা *ভারতী*-কে কেন্দ্র করেই, হয়তো পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী ও কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী একত্রিত হয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। অবশ্য আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি, আরও স্পষ্ট করে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। কবে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল তাও নিশ্চিত করে বলা যাবে না, কারণ হিসাবটি নিশ্চয়ই ব্যয় হয়ে যাবার পরে লেখা।

ভারতী-র মাঘ সংখ্যার [১।৭] সূচিপত্রটি দীর্ঘতর এবং অর্ধেকের বেশি রবীন্দ্র-রচনায় পূর্ণ :

২৮৯-৯৬ 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' : 'শ্রীস—' [সত্যেন্দ্রনাথ]

২৯৬-৩০০ 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' : [?] দ্র দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯। ৫৩-৫৪

৩০০-০৪ 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

৩০৪-১০ 'বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য' : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯। ৫৫-৫৭

৩১১-১৩ 'স্বাস্থ্য' : 'যঃ—' [ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়]

৩১৩-১৮ 'ভারতী-বন্দনা' : [বিভিন্ন জনের লেখা] দ্র শৈশবসঙ্গীত অ-১। ৪৬৫-৬৭ [প্রথম কবির রচিত অংশটুকু]

৩১৮-২৫ 'কবি-কাহিনী'/দ্বিতীয় সর্গ : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র কবি-কাহিনী অ-১। ১৩-২৮

৩২৫-৩১ 'সম্পাদকের বৈঠক।/অনুবাদ।'

৩২৫ 'বিচ্ছেদ'/'শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে'/শকুন্তলা : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র রূপান্তর। ৭৩

৩২৬ 'বিচ্ছেদ'/'প্রতিকূল বায়ুভরে, ঊর্ম্মিময় সিন্ধু 'পরে'/Moore's Irish Melodies: [রবীন্দ্রনাথ]

৩২৬ 'বিদায় চুম্বন'/'একটি চুম্বন দাও প্রমোদা আমার'/Burns: [রবীন্দ্রনাথ]

৩২৬-২৭ 'কষ্টের জীবন'/'মানুষ কাঁদিয়া হাসে'/Byron: [রবীন্দ্রনাথ]

৩২৭ 'জীবন উৎসর্গ'/'এস এস এই বুকে নিবসে তোমার'/Moore's Irish Melodies: [রবীন্দ্রনাথ]

৩২৭-২৮ 'ললিত নলিনী/(কৃষকের প্রেমালাপ)'/Burns

৩২৮ 'বিদায়'/'যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে'/Mrs. Opie*

৩২৯-৩১ 'মদন ভস্ম'[স্ম]/'সময় লঙঘন করি নায়ক তপন'/কুমারসম্ভব : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

৩৩১ 'সঙ্গীত'/'কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে'/সেক্স্পিয়র

৩৩২-৩৪ 'ছিটওয়ালা সিবিলিয়ান সাহেব': 'বঃ—' [রাজনারায়ণ বসু]

৩৩৪-৩৫ 'প্রাপ্ত গ্রন্থ।' [সংক্ষিপ্ত সমালোচনা]

৩৩৬ 'ভানুসিংহের কবিতা' : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী [১৩৭৬] ৮৩-৮৪ ['হম সখী দারিদ নারী']

এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' ও 'বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধ দুটি সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠি, অগ্র ১৩৪৬ সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে অন্তর্ভুক্ত করেও মন্তব্য করেছেন,'রচনা: দুইটি

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয় আছে' [পৃ ৩১৩]; কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য [১৩৬৭] গ্রন্থে এই বাক্যটি বাদ দিয়েছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচনা দুটির কোনো উল্লেখই করেননি। ড সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এ-দুটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা ধরে নিয়ে এদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন [দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব। ৩৫৩, ৩৬৪-৬৫]। পুলিনবিহারী সেনও 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'ভারতী প্রথম বর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী'তে উক্ত রচনায়দ্বয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রবন্ধ দুটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন। প্রবন্ধ দুটি পাঠ ও পর্যালোচনা করে আমাদের কিন্তু মনে হয়েছে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা হলেও, প্রথমটি তাঁর রচনা নয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ *Golden Book of Tagore* [1931]-এ দ্বিতীয় প্রবন্ধটিকেই তাঁর রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন।†

আমাদের বিশ্বাস, 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' প্রবন্ধটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। প্রবন্ধটির শেষাংশে আছে

> এখন সমাজে তিন দল উত্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা সকলি ভাঙ্গিতে চান। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা সকলি রাখিতে চান। যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা যাহা ভাল তাহাই রাখিতে চান, যাহা মন্দ তাহাই ভাঙ্গিতে চান। এইরূপে উপরি-উক্ত দুইটি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শেষোক্ত শক্তির উত্তেজনায় সমাজ ঠিক উন্নতির সরল-পথে চলিতেছে।
>
> উন্নতির পথ মধ্যবর্ত্তী, উন্নতির পথ এক-ঝোঁকা নহে।...যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাও উন্নতিশীল নহেন, যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাই প্রকৃত উন্নতি শীল।[৪১]

প্রকৃতপক্ষে এই বক্তব্য আদি ব্রাহ্মসমাজের এবং মনে রাখা দরকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে উক্ত সমাজের সম্পাদক। কেশবচন্দ্র সেন-পরিচালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা উন্নতিশীল বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন এবং যাবতীয় সংস্কার-মূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করতেন। আর তাঁদের এই অত্যুৎসাহী সংস্কার-কার্যের প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল হিন্দুদের গোঁড়ামিও ধীরে ধীরে দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছিল, যা কিছুদিন পরেই শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণানন্দ স্বামী ও *বঙ্গবাসী* পত্রিকার প্রচারে এক বিচিত্র রূপ লাভ করেছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিশ্বাস করতেন তাঁরা এরই ভিতরে মধ্যপথ অবলম্বন করে যথার্থ উন্নতিশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন। 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' প্রবন্ধটি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য। তাছাড়া এর ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষার মতো নয়, বরং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গদ্যের সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

'বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য' সেখানে রবীন্দ্র-গদ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বহন করছে :

> ভারতবর্ষের ধ্বংসাবশিষ্ট সভ্যতার ভিত্তির উপর ইউরোপীয় সভ্যতার গৃহ নির্ম্মিত হইলে সে কি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্য হইবে! ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্ব্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিম দেশীয় তৎপর ভাব, ইউরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণ-শীলতা, পূর্ব্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্য্যকরী বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কি পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে। ইউরোপীয় ভাষার তেজ ও আমাদের ভাষার কোমল, ইউরোপীয় ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও আমাদের ভাষার গাম্ভীর্য্য, ইউরোপীয় ভাষার প্রাঞ্জলতা ও আমাদের ভাষার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আমাদের ভাষার কি উন্নতি হইবে! ইউরোপীয় ইতিহাস ও আমাদের কাব্য উভয়ে মিশিয়া আমাদের সাহিত্যের কি উন্নতি হইবে! ইউরোপের শিল্প বিজ্ঞান ও আমাদের দর্শন উভয়ে মিলিয়া আমাদের জ্ঞানের কি উন্নতি হইবে![৪২]

ভাব ও ভাষার এই ক্রমোচ্চশীলতা রবীন্দ্র-গদ্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাজীবনই বলে গিয়েছেন। তাঁর আর-একটি প্রিয় তত্ত্বের সাক্ষাৎও আমরা এই রচনাতে পাই : 'অভাবের উৎপীড়ন হইতে অবসর পাইলেই জ্ঞানের দিকে মনুষ্যের নেত্র পড়ে। এইরূপে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসু নেত্রের সম্মুখে জ্ঞানের দ্বার ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে থাকে।'—এই অবসরতত্ত্ব বা Philosophy of Leisure রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের একটি অন্যতম ভিত্তি। প্রবন্ধটির নাম 'বাঙ্গালীর

আশা ও নৈরাশ্য' হলেও আশার সুরটিই এখানে প্রধান, নৈরাশ্যের কারণ যেটুকু আছে কিশোর সমাজতত্ত্ববিদ্ তার প্রতিকারের অমোঘ উপায়ও নির্দেশ করেছেন—ব্যবসায় ও ব্যায়াম।

এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। হিন্দুমেলার দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন এই বৎসর ২৬ মাঘ [বৃহ 7 Feb 1878] থেকে ৩০ মাঘ [সোম 11 Feb] পর্যন্ত মহারানী স্বর্ণময়ীর কাঁকুরগাছির বাগানে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের কোনো বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়নি, সুতরাং বলা সম্ভব নয় প্রবন্ধ দুটি হিন্দুমেলায় পঠিত হয়েছিল কিনা। কিন্তু এদের বিষয়বস্তু হিন্দুমেলার উপযোগী এ-কথা এ-প্রসঙ্গে মনে হতেই পারে, যদিও উক্ত অনুষ্ঠানের পূর্বেই এগুলি *ভারতী*-তে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।

'ভারতী বন্দনা' কবিতাটি পাঁচজন কবি কর্তৃক দেবী ভারতীর স্তুতি-রূপে পরিকল্পিত। 'শৈশব-সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থে প্রথম কবির উক্তি অংশটিই শুধু সংকলিত হয়েছে। এতে মনে হয় বাকি চারটি অংশ অন্য চারজন কবির দ্বারা রচিত। আভ্যন্তরীণ বিচারে আমাদের অনুমান দ্বিতীয় কবি অক্ষয় চৌধুরী, তৃতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং পঞ্চম কবি সম্ভবত বিহারীলাল চক্রবর্তী। চতুর্থ কবি সম্পর্কে কিছু অনুমান করা কঠিন, কখনো-কখনো মনে হয় এটিও রবীন্দ্রনাথের লেখা, কিন্তু সেক্ষেত্রে শৈশবসঙ্গীত-এ অংশটি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে।

'সম্পাদকের বৈঠক'-এর অন্তর্গত অনুবাদ-কবিতাগুলির মধ্যে কুমারসম্ভব-এর তৃতীয় সর্গের 'মদন ভস্ম' অংশের অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ-কৃত, এ-সম্পর্কে পূর্বে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি।* অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটির সন্ধান পাওয়া যায় মালতীপুঁথি-তে; যেমন 'বিচ্ছেদ'-শীর্ষক কবিতা দুটি ['শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে' শকুন্তলার 'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং' শ্লোকের অনুবাদ এবং 'প্রতিকূল বায়ুভরে, উর্ম্মিময় সিন্ধু পরে' Thomas Moore-এর *Irish Melodies* গ্রন্থের 'The Journey Onwards'—'As slow our ship her foamy track' কবিতার প্রথম স্তবকের অনুবাদ], 'কষ্টের জীবন' [Byron-এর *Childe Harold's Pilgrimage* গ্রন্থের Canto the Third-এর ৩২, ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক স্তবকের অনুবাদ], এবং 'জীবন-উৎসর্গ' [Moore-এর 'Come, rest in this bosom, my own stricken deer' কবিতার অনুবাদ]। অন্যান্য অনুবাদগুলির অনুরূপ পাণ্ডুলিপি না পাওয়া গেলেও সেগুলিও রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ বলেই অনুমিত হয়।

'ভানুসিংহের কবিতা' ['হম সখি দারিদ নারী']-র সুরের উল্লেখ আছে ভৈরবী বলে, কিন্তু সুরটি সম্ভবত হারিয়ে গেছে। বস্তুত প্রথম সংস্করণের [১২৯১] পর কবিতাটিকেই নির্বাসিত করা হয়। বহুদিন পরে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-র 'পাঠান্তর-সংবলিত-সংস্করণ' [আশ্বিন ১২৭৬]-এ পদটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

এবার ফাল্গুন সংখ্যা [১।৮] ভারতী-র সূচিটি দেখা যাক:

৩৩৭-৪৪ 'প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী।' : 'ত—'

৩৪৫-৫১ 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।/(পরিশিষ্ট)' : 'শ্রীস—' [সত্যেন্দ্রনাথ]

৩৫১-৫৪ 'প্রাচীন ভারতের শিল্প': [কালীবর বেদান্তবাগীশ]

৩৫৪-৬০ 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

৩৬০-৬৩ 'কবি-কাহিনী'/তৃতীয় সর্গ : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র কবি-কাহিনী অ-১। ২৮-৩৩

৩৬৩-৬৬ 'বিজন চিন্তা।/কল্পনা': 'বিধবা' [? রবীন্দ্রনাথ]

৩৬৬-৬৭ ‘মেঘনাদ-বধ কাব্য’ [শেষ কিস্তি] : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র র°র°১৫ [শতবার্ষিক সং]। ১৪৫-৪৮

৩৭০-৭২ ‘অভিনয় সমালোচনা’ : [? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

৩৭৩-৭৪ ‘স্বাস্থ্য’ : ‘য—’ [ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়]

৩৭৫-৭৮ ‘করুণা’/অষ্টম-দশম পরিচ্ছেদ : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র করুণা ২৭। ১৪৩-৪৭

৩৭৮-৮০ ‘প্রাপ্ত গ্রন্থ’

৩৮০-৮১ ‘ভানুসিংহের কবিতা’ : [রবীন্দ্রনাথ]

৩৮০-৮১ [‘সখিরে পিরীত বুঝবে কে?’] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী [১৩৭৬]। ৮১-

৩৮১ [‘সতিমির রজনী, সচকিত সজনী’] দ্র ঐ ২।১৩-১৪ [৯ সংখ্যক]

৩৮১-৮৩ ‘সম্পাদকের বৈঠক। /বায়রণের কথোপকথনকালীন উক্তি’

৩৮৩-৮৪ ‘বাল্যসখী’ [কবিতা] : ‘স্ব—’ [স্বর্ণকুমারী দেবী]

‘মেঘনাদ-বধ কাব্য’ সমালোচনা এই সংখ্যাতেই শেষ হয়; কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ থেকে দুটি দীর্ঘ অনুবাদ-উদ্ধৃতি দিয়ে [একটি ‘হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত’, অন্যটি স্ব-কৃত] যেভাবে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে, তাতে মনে হয় এটি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত সমাপ্তি নয়। তাছাড়া প্রমীলার চিতারোহণ এবং সীতা ও সরমার চরিত্র আলোচনা ছাড়া মেঘনাদ-বধ কাব্যের সাহিত্য-বিচার কিছুতেই শেষ হতে পারে না। তাই সমালোচনা-প্রবন্ধটিকে অসমাপ্ত মনে করাই সংগত। [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪]।

‘ভানুসিংহের কবিতা’ শিরোনামে এই সংখ্যায় দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম কবিতাটি প্রথম সংস্করণে ১৫-সংখ্যক কবিতা-রূপে প্রকাশিত হবার পর পরবর্তী সব সংস্করণেই বর্জিত হয়েছে। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। অপর কবিতাটিকে অবশ্য এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয়নি। মিশ্র জয়জয়ন্তী রাগে ও ত্রিতালে নিবদ্ধ ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি-সহযোগে কবিতাটি গান রূপে আজও যথেষ্ট পরিচিত। কাব্য গ্রন্থাবলী-তে কবিতাটির শিরোনাম দেওয়া হয় ‘প্রতীক্ষা’। বর্তমানে পদটি যে-আকারে পাওয়া যায় *ভারতী*-তে তার অতিরিক্ত আরো ১২টি ছত্র ছিল।

উপরে উদ্ধৃত সূচিপত্রে যে-রচনাটি আমাদের সর্বাধিক কৌতূহলাক্রান্ত করেছে সেটি হল ‘বিধবা’ লিখিত ‘বিজন চিন্তা/কল্পনা’ শীর্ষক আত্মভাবনা-মূলক প্রবন্ধটি। রচনা-শেষে লিখিত ‘বিধবা’ শব্দটির জন্যই সম্ভবত প্রবন্ধটির প্রতি কাবোর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি। আমাদের ধারণা, প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। প্রবন্ধটি আরম্ভ হয়েছে এই ভাবে :

এই মহাকল্লোলময় মহানগরের এক প্রান্তে এক খানি পর্ণ-কুটীরে আমার বাস। আমি সংসারী নহি, কেন না আমার সংসার নাই—আমি বিধবা, আমার আদর করিবার স্বামী নাই, সান্ত্বনা করিবার বন্ধু নাই, স্নেহ কিনিবার বিভব নাই, যত্ন লাভের সামর্থ্য নাই। ছিন্ন তৃণবৎ আমি সংসার-সাগর-স্রোতে একলাই ভাসিতেছি, একলাই উঠিতেছি, একলাই পড়িতেছি।...আমি এখন খুব স্বাধীন, অথচ স্বাধীনতায় সুখ পাই না। মনের ভিতর যেন কেমন একটা হু হু করিতে থাকে।...মনে করিয়াছিলাম যে, যখন কাহারো সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই তখন কিসের উদ্বেগ, যখন আমি আর মোহের অধীন নহি তখন আর কিসের যাতনা, যখন মায়ায় আবদ্ধ নহি তখন কিসের ভাবনা, কিন্তু অপরিমিত স্বাধীনতাতেই কি সুখ?

সমকালীন রবীন্দ্র-মানসিকতার সঙ্গে এই প্রবন্ধের ভাব-সাদৃশ্য সুপ্রচুর, তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্যও এর প্রতি ছত্রে দেখতে পাওয়া যায়। একটু পরেই তিনি লিখেছেন : 'যে লোক বলিয়াছেন—

"আমার হৃদয় আমারি হৃদয়।

বেচিনিত তাহা কাহারো কাছে।"

তিনি মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। এরূপ গর্ব্বিত আস্ফালন কোন হৃদয়-সম্পন্ন মানুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। আমার হৃদয় আছে যখনি ভাবিতে পারিলাম তখন ইহাও নিশ্চয় যে সে হৃদয় পরাধীন—হয় কোন ব্যক্তি বিশেষের নয় কোন বস্তু বিশেষের। কিন্তু এই প্রকার পরাধীনতা কি বিষাদের?' পূর্বোক্ত 'শারদ জ্যোৎস্নায়...' কবিতা থেকে উদ্ধৃত দুটি ছত্র, আমরা আগেই বলেছি, সম্ভবত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গদ্যে ও পদ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের নিদর্শন পরবর্তী কালে কয়েকটি দেখা গেছে [যেমন, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১২৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রের 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'প্রত্যুত্তর' ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের 'নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা অবলম্বনে অক্ষয়চন্দ্র 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' রচনা করেছিলেন]। বর্তমান সময়ে এই ধরনের রচনার একটি পরিচয় আমরা 'শারদ জ্যোৎস্নায়..' কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে দিয়েছি, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি সম্ভবত আর একটি নিদর্শন। অপর একটি নিদর্শন আছে চৈত্র সংখ্যার 'সান্ত্বনা' ও 'অশ্রুজল' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে, এগুলি সম্পর্কে আমরা আর একটু পরেই আলোচনা করব।

'অভিনয় সমালোচনা' প্রবন্ধটি ন্যাশানাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-কর্তৃক নাট্য-রূপায়িত মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' অভিনয়-প্রসঙ্গে লিখিত। খুব সম্ভব এটি লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই নাট্যরূপটি প্রথম অভিনয় হয় ৮ পৌষ [শনি 22 Dec 1877] তারিখে। রাম ও মেঘনাদ চরিত্রে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং, রাবণ চরিত্রে অমৃতলাল মিত্র ও প্রমীলা-রূপে বিনোদিনী অপূর্ব অভিনয় করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে যাওয়া বিষয়ে ঠাকুরবাড়ির কোনোরকম শুচিবায়ুতা ছিল না। এইরূপ অভিনয়-দর্শনের কয়েকটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। বর্তমান অভিনয়-অনুষ্ঠানে 'মেঘনাদ-বধ কাব্য'-সমালোচক রবীন্দ্রনাথের উপস্থিত থাকা খুবই স্বাভাবিক।

'বাল্যসখী' *ভারতী*-তে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রত্ম কবিতা।

চৈত্র ১২৮৪ সংখ্যা ভারতী-র প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যা হলেও, এই সংখ্যাতেই বর্ষ সমাপ্ত করা হয়। এর সূচিপত্রটি এইরূপ :

৩৮৫-৮৯ 'বোম্বাই রায়ৎ' : 'শ্রীস—' [সত্যেন্দ্রনাথ]

৩৯২-৯৯ 'কবি-কাহিনী'/চতুর্থ সর্গ [সমাপ্ত] : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র কবি-কাহিনী অ-১। ৩৪-৪৬

৩৯৯-৪০১ 'সান্ত্বনা' : 'ভ—' [রবীন্দ্রনাথ]

৪০১-০৫ 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

৪০৬-০৮ 'অশ্রুজল' : 'চ—' [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]

৪০৮-১৩	'করুণা'/একাদশ-চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র করুণা ২৭। ১৪৭-৫৩
৪১৪-১৮	'উদ্ভিদ' : 'য—' [ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়]
৪১৯-২২	'স্বাস্থ্য' : 'য—' [ঐ]
৪২২	'ভানুসিংহের কবিতা' ['বাদর বরখন, নীরদ গরজন'] : [রবীন্দ্রনাথ] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২। ১৯ [১৪ নং]
৪২৩-২৬	'বঙ্গসাহিত্য' : 'চ' [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]
৪২৬-২৩	'সম্পাদকের বৈঠক' : 'ছিটওয়ালা সিভিলিয়ান' [রাজনারায়ণ বসু],...
৪৩২	'প্রাপ্তগ্রন্থ'

এই সংখ্যার ভানুসিংহের কবিতা'তে 'রাগিণী মল্লার' সুর নির্দেশ করা থাকলেও এটির স্বরলিপি পাওয়া যায় না। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে কবিতাটিকে 'বর্ষা' শিরোনাম দেওয়া হয়।

'ভ—' ও 'চ—' স্বাক্ষরে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'সান্ত্বনা' ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'অশ্রুজল' নামে দুটি প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমাদের ধারণা, দুটি প্রবন্ধ পরস্পর সম্পর্কান্বিত এবং এদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বিষাদময় কবিতা-সমূহ, 'শারদ জ্যোৎস্নায়...' এবং উপরোক্ত 'বিজন চিন্তা/কল্পনা' প্রবন্ধের যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

আমার সময়ে সময়ে কেমন মন খারাপ হইয়া যায়, হয় হউক্‌গে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অমনি লোকে সান্ত্বনা দিতে আইসে কেন?...সান্ত্বনা দিতে হইলে প্রায়ই লোকে কহিয়া থাকে, তোমার কিসের দুঃখ? আরোত কত লোক তোমার মত কষ্ট পাইতেছে। এমন কষ্টকর সান্ত্বনা আর নাই,...যে একথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে আইসে, স্পষ্টই বোধ হয় আমার দুঃখে তাহার কিছুমাত্র মমতা হয় নাই; কারণ সে আমার দুঃখকে এত তুচ্ছ বলিয়া জানে, যে, এত ক্ষুদ্র দুঃখে তাহার মমতাই জমিতে পারে না,...একজন যে গম্ভীর ভাবে বসিয়া বসিয়া আমার অশ্রুজলের সমালোচনা করিতেছে ইহা জানিতে পারা অতি কষ্টকর।..তুমি যদি আমার শোকের কারণ দেখিয়া কষ্ট পাইয়া থাক ত আইস, তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে, নহিলে তোমার যদি মনে হইয়া থাকে, দুর্ব্বল হৃদয়, অল্পেতেই কষ্ট পাইতেছে, উহাকে একটু থামাইয়া থুমাইয়া দিই, তবে তোমায় কাজ নাই, তোমার সান্ত্বনা দিতে হইবে না।*

সম্ভবত এরই উত্তরে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী 'অশ্রুজল' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'হায়, সংসারে এই অশ্রুতে অশ্রুর প্রত্যুত্তর কি দুর্লভ! অশ্রুতে অশ্রু মিশান' দূরে থাকুক অনেক সময়ে অনেক স্থলে অশ্রুর উত্তরে কেবল মাত্র তিরস্কার বা বিরক্তিই প্রতিদান পাওয়া যায়। ...মর্ত্ত্যলোকের কোন কোন পিশাচ পিশাচীদের চক্ষুর্দ্বয় এমন বজ্রায়সে নির্ম্মিত, যে ভগ্ন-হৃদয়ের অনর্গল অশ্রুলহরীতে অশ্রু মিশান দূরে থাকুক, তাহাতেই তাহারা ঘৃণার হাস্য, উপেক্ষার কটাক্ষ বর্ষণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।...কিন্তু ভগ্নহৃদয়ের অশ্রু থামিবার নহে, পাষাণ হৃদয়ের মমতাও পাইবার নহে'। রচনাটির মধ্যে গভীর হৃদয়ভাবের বর্ণনার ছলে হাস্য-পরিহাসের সুরটি অশ্রুত থাকবার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত কবিতাটিও মনে পড়া স্বাভাবিক :

পাষাণ হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়?...
হেরিলে গো অশ্রুরাশি, বরষে ঘৃণার হাসি,
বিরক্তির তিরষ্কা[স্কা]র তীব্র বিষময়।...
ভগ্নবুকে কেন আর, বজ্র হানে বার বার...

—সব-ক'টি রচনাতেই 'ভগ্ন-হৃদয়' কথাটির পৌনঃপুনিক ব্যবহারও লক্ষণীয়।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' অনুষ্ঠানের দুটি বিবরণ আগেই আমরা উদ্ধার করেছি। এই বৎসর তৃতীয় অনুষ্ঠানটির সংবাদ পাওয়া যায়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার 18 Feb 1878 [Vol. XXV, No. 7] সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি প্রকাশিত হয়: 'Saturday, 16th February. ...There were two interesting social gatherings this evening, ...the other conversazione at Babu Debendranath Tagore's to which his son Babu Dijendranath Tagore invited native authors and scholars. Both the reunions went off very well. At the last a little cherub in the person of a grand-daughter of Babu Debendranath Tagore, a sweet little girl of about ten or eleven years, discoursed angelic music. The amiable host was very attentive to his guests.' এই 'দেবদূতী'টি হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবী ছাড়া আর কেউ নন। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে ৫ ফাল্গুন ১২৮৪ তারিখে। পত্রিকার বিবরণটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, প্রতিভা দেবীর সংগীত-পরিবেশন ছাড়া অনুষ্ঠান-সূচিতে আর কিছু ছিল কি না, রবীন্দ্রনাথ কোনো অংশ গ্রহণ করেছিলেন কিনা, সংবাদটিতে তার কোনো উল্লেখ নেই। সমকালীন অন্যান্য সংবাদপত্র, যা আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে, এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। যাই হোক, এটি যে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' নামেই চিহ্নিত হয়েছিল* সংবাদে তার কোনো উল্লেখ না থাকলেও ভারতীর ক্যাশবহি থেকে তা জানা যায়। ২৮ মাঘ [শনি 9 Feb] তারিখের হিসাব দেখা যায় : 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভায়/সভ্যগণের নিকট পত্র লেখায়/মাশুল ৪৯ খানার কার্তি০ আনা হিঃ—৩/০'; এইরূপে অন্তত ৬১ জনকে পত্রের দ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সেটি আমরা জানতে পারি ১২ ফাল্গুন তারিখের হিসাব থেকে : 'দ° বিদ্বজ্জন সমাগম সভায়/নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতে যেসমস্ত/টীকীট ভারতীর তহবিল হইতে দেওয়া হয় তাহা ফেরৎ পাওয়া যায়...৩ ´০'। দেখা যাচ্ছে, প্রথমে *ভারতী*-র পক্ষ থেকেই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হলেও পরে ঠাকুরবাড়ির সরকারী তহবিল থেকে সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। বস্তুত পরবর্তীকালে অনুষ্ঠানটিকে 'ভারতী-উৎসব' নামেও অভিহিত করা হয়েছে, তা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব। যদিও হিসাবে ৬১ জনকে পত্র পাঠানোর কথা জানা যায়, তবু মনে হয় আগের দুটি সমাগম-এর মতো এটিতেও প্রায় একশো জন উপস্থিত ছিলেন, কারণ স্থানীয় অনেককেই নিশ্চয় মৌখিকভাবেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-জীবনের বোধ হয় সব চেয়ে বড়ো ঘটনার সূত্রপাত ঘটল এই বৎসরেই। তাঁর স্কুলজীবন ও তার পরিণতির কথা আমরা আগেই জেনেছি। প্রায় দু-বছর তিনি বিদ্যালয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন। সম্ভবত অভিভাবকেরাও এই সময়ে এ নিয়ে চিন্তা করাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের সবাপেক্ষা প্রতিভাবান ছেলেটি কেবল কবিতা লিখে দিন কাটিয়ে দিক এটাও তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া শক্ত ছিল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার একটা সুযোগও এই সময়ে পাওয়া গেল। সত্যেন্দ্রনাথের সিভিল সার্ভিস চাকুরির নিয়মানুযায়ী তাঁর দু-বছরের ফার্লো ছুটি নেবার সময় হয়েছিল। এই ছুটি নেওয়ার ভূমিকা-স্বরূপ তিনি এই বৎসরের গোড়াতেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছুটি নিয়ে সেখানে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বে তিনি দেবেন্দ্রনাথের কাছে প্রস্তাব করলেন যে রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর সঙ্গী করে নেবেন। [বস্তুত, এ-ধরনের প্রস্তাব আগের বছরেই নেওয়া হয়েছিল, তখন সত্যপ্রসাদও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।] দেবেন্দ্রনাথও এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ভারতী যখন দ্বিতীয়

বৎসরে পড়িল [অর্থাৎ বৈশাখ ১২৮৫-তে] মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন, আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আর-একটি অযাচিত বদান্যতায় আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।'[৪৩] এ-সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন : 'কথা ছিল, পড়াশুনা করিব, ব্যারিস্টর হইয়া দেশে ফিরিব।' কিন্তু সাম্প্রতিক একটি আবিষ্কার বিষয়টির একটি অন্যরূপ চিত্র তুলে ধরেছে। ১২ ফাল্গুন ১৩৮৫ [25 Feb 1979] তারিখের রবিবাসরীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় শোভন বসু 'রবীন্দ্রনাথ আই সি এস হতে চেয়েছিলেন?' প্রবন্ধে এবং ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫ [9 Mar 1979] তারিখের *অমৃত* [পৃ ১০-১১] সাপ্তাহিকে মৃদুলকান্তি বসু 'রবীন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান হতে চেয়েছিলেন' প্রবন্ধে বিষয়টির উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। আমরা এই দুটি প্রবন্ধ থেকে নিম্নে আলোচিত তথ্যগুলি আহরণ করেছি।

তথ্যগুলির উৎস হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট আর্কাইভস-এ রক্ষিত একটি ফাইল; ফাইলটির কভারে লিখিত আছে : File No. 4/1878/Government of Bengal/General Department/ Miscellaneous BRANCH/Proceedings for March 1878/Number of Proceedings/*1-2*/Subject/*Application from Robindranath Tagore praying for a certificate of his age for the Indian Civil Service Examination*/Date of Proceedings./*13-3-78*' এই ফাইলে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্রে লেখা আছে:

To

The Secretary to the Government of Bengal.

Sir,

As I intend to proceed to England for the purpose of competing at the Indian Civil Service Examination I beg to request the favor of your granting me a certificate of my age as required by the Rules. I beg to submit my Horoscope in evidence of my age and to express my readiness to appear at the time & place which you may be pleased to appoint to prove the same.

Calcutta
The [12]th March, 1878.

I have the honor to be Sir,
Your obedient servant,
[Rabi]ndranath Tagore

এই পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে একটি কোষ্ঠীও পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেটি ফাইলের মধ্যে পাওয়া যায়নি। [এই কোষ্ঠীটি সম্ভবত সরকারী দপ্তর থেকেই হারিয়ে যায়, কারণ ১২ অগ্র ১২৮৬ তারিখে ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায় : 'ব° রামচন্দ্র আচার্য্য/দং শ্রীযুত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্ঠী/হারাইয়া যাইবায় নূতন কুষ্ঠী তৈয়ারির জন্য/উক্ত আচার্য্যকে মূল্য দেওয়া যায়...১২'। এই কোষ্ঠীটিরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।]

উক্ত ফাইলে রবীন্দ্রনাথের আবেদনপত্রের সঙ্গে ছোটো দুটি চিঠিও আছে। তার একটি লিখেছেন জানকীনাথ ঘোষাল বেঙ্গল গভর্মেন্টের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে : 'My dear Rajendra

Baboo,/Herewith I send that application of Baboo Robindra N. Tagore, & his Horoscope [এইখানে 'some.little books' কথা কটি লিখে আবার কেটে দেওয়া হয়েছে, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন কোষ্ঠী-ঠিকুজি সাধারণ রীতি অনুযায়ী লম্বা তুলোট কাগজে না লিখে ছোটো পুস্তকাকারের কাগজে লিখিত হয়েছিল] We shall feel greatly obliged to you by your forwarding them to the [? police) today with instructions to expedite the matter. Yours truly/ Janokeenath Ghosal/13th March, 1878.' এর সঙ্গে আর-একটি হলুদ রঙের লম্বা ছোটো কাগজে নীল পেনসিলে জনৈক Stapleton-কে লেখা একটি চিঠি পাওয়া যায়; চিঠিটির সব কথা পড়া যায় না, শেষে লেখা আছে: 'The young man̄ [is] leaving Calcutta [? shortly] & he is willing to take his certificate with him. He goes with his brother Mr. S.N. Tagore, Judge of some place in Bombay.'

এই অনুরোধের ফলে কাজ হয়েছিল; ৬৯ নং ফাইলের March/78-এর 1/2B নং প্রোসিডিংসে 13-3-78 তারিখে নোট লেখা হয় : 'This may be forwarded to the Commr. of Police Calcutta, with the request that he will be so good as to call on the Police Magistrate to enquire into and report on the application with the least practicable delay.' এই তারিখেই ফাইলটি মূল আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজ-সহ পুলিস কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

20 Mar 1878 [বুধ ৮ চৈত্র] রবীন্দ্রনাথের বয়সের প্রমাণপত্র স্বাক্ষরিত হয়; সেটি এইরূপ :[৪৪]

Certificate of the date of the birth/of *Baboo Robindra Nath Tagore* proceeding to England.

I HEREBY certify that *Babu Robindra Nath Tagore* a candiddate/for admission to compete for the Indian Civil Service, has submitted the proofs of his birth to the Magistrate of the *Calcutta* district, and/has satisfied that officer that he was born about the date stated by him, viz./*6th May 1861 (One thousand Eight hundred and Sixty one).*

FORT WILLIAM.

The *20th March*, 18*78.*

Sd/- Illegible

Secretary to the Government of Bengal in the General Department.

—অর্থাৎ 20 Mar [বুধ ৮ চৈত্র] তারিখে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তাঁর বয়সের প্রমাণপত্র অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রমাণপত্র জোড়াসাঁকো থেকে আমেদাবাদে তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয় ২৯ আষাঢ় ১২৮৫ [শুক্র 12 Jul 1878] তারিখে। এই বিলম্বের কারণ অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়।"[৪৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চতুর্থ নাট্য-রচনা ও দ্বিতীয় প্রহসন 'এমন, কর্ম্ম আর ক'রব না' [Apr 1900-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে 'অলীকবাবু' নামকরণ করা হয়] বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী 7 Jul 1877 [শনি ২৪ আষাঢ়] প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয়ের এতাবৎ উল্লিখিত তারিখ—1877—যদি ঠিক হয়, তাহলে সম্ভবত এই

গ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তীকালেই তা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারতী প্রকাশের আয়োজন নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে নাট্যাভিনয়ের বন্দোবস্ত করা একটু শক্ত বলেই মনে হয়। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ' [১৩৭৬] গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ-কথা'-য় [পৃ ৬৫৭] লিখিত হয়েছে, "এমন কর্ম আর করব না' 'বিদ্বজ্জন সমাগমে'র ১৮৭৭ সালের অধিবেশনে প্রথম অভিনীত হয়।" এই তথ্য সম্পাদক কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করেননি, কিন্তু আমরা 1877-এ 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর কোনো বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি। ৫ ফাল্গুন [16 Feb 1878]-এ যে অধিবেশনের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তাতে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে কোনো কথা নেই। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় লইয়া মতভেদ আছে। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম্ম আর করব না' প্রহসনে (১৮৭৭) তিনি অলীকবাবু ভূমিকা অভিনয় করেন। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিতেন, রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম 'মানময়ী' নামক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সঙ্কলিত এক গীতি-নাটিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি পুস্তকে এই নাটিকাটিই ভ্রমক্রমে 'মানভঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়াছে।"[৪৬] খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও প্রায় একই কথা লিখেছেন, 'বহু পূর্ব্বে (১৮৭৬?) তিনি আত্মীয়দের সম্মুখে বাটিতে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "মানময়ীতে" 'মদনের' ভূমিকা এবং 'বিবাহ উৎসব' গীতিনাট্যে একটি স্ত্রী-ভূমিকা (১৮৭৭?) ও "এমন কর্ম্ম আর করব না" প্রহসনে 'অলীক বাবুর ভূমিকা অভিনয় করেন (১৮৭৭)।...এই প্রহসনে জোড়াসাঁকো বাড়ীর অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের একজন সহযোগী অভিনেতা ছিলেন তাঁহার বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, 'সত্যসিন্ধু'র ভূমিকায়।'[৪৭] কিন্তু এই তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল কি না সে-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 'মানময়ী' প্রকাশিত হয় ১৮০২ শকে [১২৮৭ : 1880], রচনাকালও একই সমসাময়িক বলে মনে হয়—সুতরাং 1876-এ 'মানময়ী'-তে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অপরদিকে স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা 'বিবাহ-উৎসব'-এর রচনা ও অভিনয় অনেক পরের কথা—হিরন্ময়ী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে সম্ভবত 1884-এর গোড়ার দিকে এটি অভিনীত হয়েছিল—আর 'বিবাহ উৎসব' বলতে খগেন্দ্রনাথ যদি 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যের কথা বুঝিয়ে থাকেন তাহলে সেটির রচনা ও অভিনয় হয় 1879-এ, রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে। সুতরাং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যাভিনয় বিষয়ে একটু সংশয় থেকে যাবেই। তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করলে সিদ্ধান্ত করতে হয় 1877-এর দ্বিতীয়ার্ধের কোনো এক সময়ে তিনি 'এমন কর্ম্ম আর ক'রব না' প্রহসনে 'অলীকবাবু'র ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন, দর্শক ছিলেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বন্ধুরা। ঠাকুরপরিবারের মহিলারাই নারীচরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—সজনীকান্ত দাস অন্য এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে কাদম্বরী দেবী 'হেমাঙ্গিনী'র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন[৪৮]—এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই অভিনয়ের সঠিক তারিখ ও বিবরণ কেউ রক্ষা করেননি। পরবর্তীকালে প্রহসনটি বহুবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই অভিনীত হয়েছে, তার অনেকগুলির বিবরণ অবশ্য বিভিন্ন জনের রচনায় রক্ষিত হয়েছে—প্রসঙ্গত তার কিছু কিছু বর্ণনা পরে যথাস্থানে আমরা উদ্ধৃত করব।*

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

এখানে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ সংকলিত হল।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে [May 1877] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দুই শিশুপুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কবীন্দ্রনাথ এবং শিশুকন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। খবরটি সমাচার চন্দ্রিকা-র ২ জ্যৈষ্ঠ সোম 14 May [৬৬। ২৮] সংখ্যায় প্রকাশিত হয় : 'বিগত সপ্তাহে সিভিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ইংলণ্ড গিয়াছেন। সত্যেন্দ্র বাবুও শীঘ্র ছুটি লইয়া ইংলণ্ড যাইবেন।—এদেশীয়দিগের ইংলণ্ড গমন করা একটি রোগ হইয়া পড়িয়াছে।' সংবাদটি পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার সুরটিও লক্ষণীয়। এই পত্রিকাটিই ৭ শ্রাবণ শনি 21 Jul [৬৬। ৮৬] সংখ্যায় লেখে : 'আমাদেবাদের [আমেদাবাদের] সিবিল এবং সেসন জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী নিজ পুত্র কন্যাদিগের সহিত লিবারপুলে পৌঁছিয়াছেন। সন্তানদিগকে বিলাতে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াই গমনের উদ্দেশ্য। —কালে কালে কত কি হবে?' ইংলণ্ড যাত্রা ও প্রবাস-সম্পর্কে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'স্মৃতিকথা'য় বলেছেন : 'তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ আন্দাজ বিলেত যাই, যতদূর মনে আছে। সেই সময় এক ইংরেজ দম্পতী বিলেত যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বোধ হয় ওদের ভাষা কায়দাকানুন শেখবার জন্য। কারণ আমার স্বামী ইংরেজ সভ্যতার খুব ভক্ত ছিলেন। কিন্তু জাহাজে সমুদ্রপীড়ার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়েছিল, প্রায়ই শুয়ে থাকতুম। তখন রামা বলে আমাদের এক সুরতী চাকর ছিল, তাছাড়া এক মুসলমান চাকর বিলেত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই দেশে ফিরে গেল। সে জাহাজে আমাদের খুব যত্ন করেছিল।' [পুরাতনী। ৩৮] 'বিলেতে আমার যে ছেলেটি অসময়ে হয়, তার মাথাটা ভাল করে হয়নি, শীঘ্রই মারা গেল।...তার উপরের চোবি বলে' ছোট ছেলেটিও বিলেতে মারা যায়।' [ঐ। ৪০] দর্পনারায়ণ ঠাকুর-বংশীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে সপরিবারে লণ্ডনে বাস করতেন। তিনিই জ্ঞানদানন্দিনী ও তাঁর পুত্রকন্যাদের অভিভাবক-স্থানীয় ছিলেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে যান, তখনও চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা ইংলণ্ডে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ঠিকানাতেই প্রেরিত হয়েছে।

সমাচার চন্দ্রিকা ৬ অগ্র মঙ্গল 20 Nov [৬৬।১৭২] সংখ্যায় একটি সংবাদ পরিবেশন করে : 'গত ২৬শে কার্ত্তিক সোমবার কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া চীন দেশে যাত্রা করিয়াছেন।' এ-বিষয়ে সাধারণী-র [৯। ৪, ৪ অগ্র] সংবাদটি হল : 'গত শনিবার ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া চীনযাত্রা করিয়াছেন।'—এই দুটি সংবাদকে মিলিয়ে মনে হয় ২৬ কার্তিক শনিবার 10 Nov তারিখে দেবেন্দ্রনাথ সারদাপ্রসাদকে নিয়ে চীনদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। উক্ত সংবাদটি দিয়ে সমাচার চন্দ্রিকা লেখে : 'দেবেন্দ্রবাবু বৎসরের মধ্যে অধিক কালই দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। কখন জল পথে কখন স্থল পথে কখন বা হিমালয় শিখরে ভ্রমণ করিয়া বিষয় ও ঈশ্বর চিন্তা করিয়া বেড়ান। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম চিন্তা হয় না, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যেন দেবেন্দ্র বাবুর কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করেন। কখন দুই প্রভুর উপাসনা করা যায় না, অতএব সংসার ও ঈশ্বর এই উভয় প্রভুর উপাসনা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বুঝিবেন, ঈশ্বরকেই একমাত্র প্রভু জ্ঞান করিয়া সংসারকে নির্লিপ্ত ভাবে সেবা করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়া গিয়াছেন, সংসারী হইয়া যিনি সংসারী নহেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।'

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের কাছে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা কোন্ রূপে প্রতিভাত হত।

চীনে দেবেন্দ্রনাথ খুব অল্পদিনের জন্যই গিয়েছিলেন কারণ *ধর্ম্মতত্ত্ব* পত্রিকার ১ মাঘ [১২। ১] সংখ্যায় লেখা হয় : 'বিগত বুধবার (২৬ পৌষ 9 Jan 1878] ভক্তিভাজন শ্রীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদিগের আচার্য্য মহাশয়ের নূতন ভবনে আসিয়া সকলের সহিত সদালাপ করিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়া গিয়াছেন। নূতন মুদ্রিত উৎকৃষ্ট রূপে বাঁধান দশ বার খণ্ড "ব্রহ্মধর্ম" পুস্তক উপহার দিয়াছেন।...পুনরায় তিনি জলীয় বায়ু সেবনের জন্য পদ্মানদীর উপরে বিচরণ করিতেছেন।'

২৪ ফাল্গুন [বৃহ 7 Mar 1878] দ্বিজেন্দ্রনাথের দুই পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে উপনয়ন হয়। ঠাকুরবাড়িতে এই পদ্ধতি অনুসারে এইটিই দ্বিতীয় উপনয়ন-অনুষ্ঠান, প্রথমটি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথদের বেলায়। ২৭ ফাল্গুন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী দুজনকে উপদেশ প্রদান করেন [দ্র তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ ১৮০০ শক। ১৪-১৫]।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' পুনরভিনীত হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ২৪ ও ৩১ বৈশাখ [শনি 5, 12 May 1877]। সমাচার চন্দ্রিকা দুটি অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে : 'গত শনিবার সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনেতৃগণের মধ্যে লক্ষ্মণ সিংহ, বিজয়, সরোজিনী, রোষেণারা এবং রাণীর অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। শূন্যে কালীর আবির্ভাব বড় আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সরোজিনীর অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ ব্যথিত হন। চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে সরোজিনীর খেদোক্তি, রোষেণারার বলিদান এবং রাজপুত মহিলাগণের চিতায় প্রাণত্যাগ অতীব মনোহারী হইয়াছিল' [২৭ বৈশাখ] এবং 'গত কল্য শনিবার...গ্রেট ন্যাশনালে সরোজিনীর অভিনয় অতীব মনোহারি হইয়ছিল, এমন কি অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফলকথা বলিতে কি এরূপ অভিনয় বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর কখন হয় নাই' [২ জ্যৈষ্ঠ]। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সরোজিনীর ভূমিকায় প্রখ্যাত নটী বিনোদিনী অভিনয় করতেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

১১ মাঘ [বুধ 23 Jan 1878] আদি ব্রাহ্মসমাজের অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বদিন ১০ মাঘ দেবেন্দ্রনাথের ভবনে রাত্রি সাতটায় 'ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ পাঠ' দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ১১ মাঘ সকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মসংগীত যেটি গীত হয়, সেটি দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা :

ভৈরোঁ—ঝাঁপতাল। অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান।

দেবেন্দ্র-ভবনে সায়ংকালীন অনুষ্ঠানে বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন ও নিম্নোক্ত ব্রহ্মসংগীতগুলি গীত হয় :

নট্ বেহাগ—ঝাঁপতাল। জয় পরম শুভ-সদন, ব্রহ্ম-সনাতন [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

কেদারা—সুরফাঁকতাল। দরশন দাও হে হৃদয়-সখা [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

বসন্ত—সুরফাঁকতাল। আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে [ঐ]

খাম্বাজ—ধামাল। ব্যাকুল হয়ে তব আশে প্রভু এসেছি তব দ্বারে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

সিন্ধু—চৌতাল। কঠিন দুখ পাই হে মোহান্ধকারে [ঐ]

খাম্বাজ—একতালা। পরম দেব ব্রহ্ম জগজন-পিতামাতা [ঐ]

বাহার—কাওয়ালি। হৃদয়ের মম যতনের ধন তুমি হে [ঐ]

দেখা যাচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুজনে মিলে এবারের মাঘোৎসবে গানের ডালি সাজিয়েছিলেন। *তত্ত্ববোধিনী* বা অন্যত্র প্রকাশিত বিবরণে রবীন্দ্রনাথের অংশ গ্রহণের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু আমরা অনুমান করে নিতে পারি, সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বকর্মের সাথী এই সুকণ্ঠ কিশোর অবশ্যই সংগীতের দলে তাঁর যথাযযাগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এই বৎসরটি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একাধিপত্য, খ্রিস্টধর্মানুরক্তি, ভক্তিবাদের আতিশয্য, আদেশবাদ, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্ন প্রভৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। কখনও কখনও তা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল, এই সব প্রসঙ্গ আমরা পূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। বর্তমানে কুচবিহারের নাবালক হিন্দু রাজা যোলো বছরের কম বয়স্ক নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কিঞ্চিদধিক তেরো বছর বয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীয় বিবাহকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ভাঙনে পর্যবসিত হল। প্রধানত কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বিধিবদ্ধ 1872-র ৩ আইন বা সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্টে অভিভাবকদের সম্মতি সাপেক্ষে পাত্রের বয়স আঠারো ও পাত্রীর বয়স চৌদ্দ নির্ধারিত হয়েছিল। তাছাড়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ অনুসারে শালগ্রাম শিলা আনয়ন, অগ্নিসাক্ষী বা হোম এবং অন্যান্য হিন্দু আচার পালনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বয়স ও আচার পালনকে উপলক্ষ করে আদি ব্রাহ্মসমাজকে বহুবার উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের নিন্দাভাজন হতে হয়েছে। এখন সেই দুটি অভিযোগ তাঁর স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কেশবচন্দ্রেরই বিরুদ্ধে উত্থাপিত হল। [আশ্চর্যের বিষয়, আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ১৩ ফাল্গুন রবি 24 Feb 1878 বিকেল সাড়ে চারটায় অ্যালবার্ট হলে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার 'বিবাহ সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য' একটি সভা হয়, *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা-ও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দেয়।] কিন্তু কেশবচন্দ্র বলেন, 'আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করা যেরূপ পাপ মনে করি, এই বিবাহদানে বিরত হওয়া আমার পক্ষে সেইরূপ পাপ, এ প্রকার বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমি যেমন ঈশ্বরাদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই প্রকার আদেশেই এই বিবাহদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'[৪৯] বিবাহ হয় ২৩ ফাল্গুন বুধ 6 Mar 1878 তারিখে; কেশবচন্দ্র জাতিচ্যুত—পাত্রপক্ষ এইরূপ অভিযোগ করায় তিনি যথারীতি কন্যাসম্প্রদান করতে পারেননি, তাঁর হয়ে এই কাজ করেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন। কেশবচন্দ্র তাঁর কন্যার বিবাহে বাল্যবিবাহদান ও পৌত্তলিকতাদোষে দূষিত হয়েছেন, এই অভিযোগ করে প্রতিবাদীদল তাঁকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত করার জন্য প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। প্রতিবাদীদলের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি। এই উপলক্ষে তাঁরা 17 Feb থেকে সমালোচক ও 21 Mar থেকে *Brahmo Public Opinion* নামে বাংলা ও

ইংরেজি দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। নানাপ্রকার গোলযোগের পর পরবর্তী বৎসরে ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ [বুধ 15 May 1878] তারিখে টাউন হলে প্রতিবাদী-দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত এক সভায় একটি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। নূতন ব্রাহ্মসমাজের নাম হয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্ম ও নানা সমাজসংস্কার-মূলক কাজকর্মে এই সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু একটি ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে তিনটি ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হওয়ায় ও তাদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ ইত্যাদির ফলে ব্রাহ্মধর্মান্দোলন যে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেই সুযোগে এক প্রতিক্রিয়াশীল নব্য হিন্দুধর্ম কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় আমরা যথাস্থানে লাভ করব। আলোচ্য পর্বের ঘটনাবলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই কোনো যোগ ছিল না, কিন্তু পরবর্তী কালে নানাভাবে তিনি এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন, রবীন্দ্রজীবনে সেইজন্যেই এই ঘটনাগুলির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

ভারতী পত্রিকার ইতিহাসে এর প্রচ্ছদটির গুরুত্ব আছে। কারণ, 'অনেক গবেষণার পর' এই প্রচ্ছদটির পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং এটিকে অবলম্বন করে প্রথম বর্ষের ভারতী-তে অন্তত দুটি কবিতা ও সম্পাদকের ভূমিকার মূল বক্তব্যটি রচিত হয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পরবর্তীকালেও ঠাকুরবাড়ির বালক-বালিকাদের একটি অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু হ. চ. হ. বা হরিশ্চন্দ্র হালদার যে স্টেজ তৈরি করে দেন, তাতেও ছবিটি ব্যবহৃত হয়েছিল তার পরিচয় আছে হিরন্ময়ী দেবীর লেখায় : "*ভারতী*'র মলাটে তখন বীণাপাণির যে ছবি থাকিত, আমাদের ষ্টেজের শিরোভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল সেই ছবি।'[৫০] সুতরাং *ভারতী*-র প্রচ্ছদ ও তার শিল্পী টি. এন. দেব বা ত্রৈলোক্যনাথ দেব সম্পর্কে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা আছে। কমল সরকার দেশ পত্রিকায় [6 Oct 1979] '"*ভারতী*'র প্রচ্ছদ" প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমরা প্রধানত এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলির উপরেই নির্ভর করেছি।

শরৎকুমারী দেবী লিখেছেন : 'আর্ট ষ্টুডিয়োর দেবী সরস্বতীর ছবির অনুকরণে ভারতীর মলাটের ব্লক প্রস্তুত হয়'—এই আর্ট স্টুডিও হল বউবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'। এর উদ্দেশ্য ছিল 'to paint portraits, land-scapes and scenes from mythology, history, novels, drama, in an improved and scientific style hitherto unknown to the native Arts in Bengal' [The Bengalee, Vol. XX, No. 43, 8 Nov 1879]। প্রখ্যাত শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর নেতৃত্বে নবকুমার বিশ্বাস, ফণীভূষণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র পাল প্রমুখ গবর্মেন্ট আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রেরা এই স্টুডিওটি প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের লিথোগ্রাফিক প্রথায় মুদ্রিত বিভিন্ন চিত্র তৎকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, 'সরস্বতী' ছবি তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু 1879-এ যে স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয়, Jun-Jul 1877-এ সেই স্টুডিও থেকে প্রকাশিত ছবির অনুকরণে *ভারতী*-র প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কন কী করে সম্ভব হল, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত।

অনুমান করতে হয় যে, সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও Nov 1879-এ প্রতিষ্ঠিত হলেও, ছোটো আকারে তার কাজকর্ম—হয়তো অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর একক প্রচেষ্টায়—আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আর্ট স্টুডিও-র ছবিটি লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে মুদ্রিত হলেও, ভারতী-র প্রচ্ছদটি কাঠ খোদাই করে তৈরি করা হয়। প্রচ্ছদ-শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেবের জন্ম 1847-এ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুরে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা ও শিক্ষাব্রতী উমেশচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে হরিনাভি স্কুলে তাঁর শিক্ষালাভ ঘটে। পরে তাঁরই প্রভাবে ত্রৈলোক্যনাথ কেশবচন্দ্রের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে সারাজীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করে যান। বামাবোধিনী ও ভারত সংস্কারক পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষও ছিলেন তিনি। গবর্মেন্ট আর্ট স্কুলে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে উডএনগ্রেভার হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ও গ্রন্থে অজস্র কাঠখোদাই চিত্র তাঁরই রচনা। ভারতী-র সঙ্গেও তিনি দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভারতীর ক্যাশবহি-তে দেখা যায় ১৫ আষাঢ় [28 Jun 1880] তারিখে উডকাটের জন্য তাঁকে উনিশ টাকা বারো আনা দেওয়া হয়েছে। Sep 1928-এ প্রায় একাশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

আমরা জানি, ভারতী-র প্রথম সংখ্যা থেকেই কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য-এর দীর্ঘ বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এই সমালোচনা অবশ্যই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সমসাময়িক কোনো পত্রিকায় এ-বিষয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য আমাদের চোখে পড়েনি। কিন্তু খুচরো কিছু মন্তব্যের বদলে যা পাওয়া গেছে, তা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন 'মেঘনাদবধ প্রবন্ধ' [গ্রন্থ নং ২৬৮০; ২৫৩৩ নং আরও একটি কপির উল্লেখ তালিকায় আছে, কিন্তু সেটির সন্ধান পাওয়া যায়নি; গ্রন্থতালিকায় বইটির প্রকাশকাল ১২৮৭ বঙ্গাব্দ] নামে ৮৯ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ আছে, যার শেষে লেখা : 'কাশ্যধীতি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি* কৃত। "মেঘনাদবধ প্রবন্ধ" সমাপ্ত।' বইটির ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে ৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নেই, ৮০-৮৯ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের শিরোনাম 'মাইকেল-চরিত।/(জীবন-চরিত গ্রন্থে দর্শন কর।)'—বোঝা যায় বইটিতে মোট তিনটি প্রবন্ধ ছিল, প্রথমটি ১-৩২ পৃষ্ঠায় 'ভারতীতে সমালোচনার সমালোচনা', ৩৩-৭৯ পৃষ্ঠায় অজ্ঞাতনামা একটি প্রবন্ধ এবং শেষেরটি উক্ত 'মাইকেল-চরিত'। এর মধ্যে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হল প্রথম রচনাটি।

সাধু-চলিত ও ইংরেজি-বাংলা মেশানো অপাঠ্য গদ্যে বইটি লেখা; লেখক এই রীতি সমর্থনও করেছেন : 'ভাষা চলিতে চলিতে ইংরাজী কথা ব্যবহার হয়েছে, অনুবাদ করা হয় নাই বাঙ্গালা অক্ষরেও দেওয়া হয় নাই তার বিবেচনা এই ইংরেজী বাঙ্গালা সংস্কৃতাদি জানে এমন ব্যক্তি যেমন এই মহাকাব্য পড়িবার অধিকারী, তেমনি ঐরূপ ব্যক্তিই এ criticism পড়িবার অধিকারী।...এরূপ স্থলে অনুবাদাদি চেয়ে মিশ্র ভাষাই শোভা পায়।' এই যুক্তিতে লেখক তাঁর রচনায় অনুবাদ না করেই দেবনাগরী অক্ষরে বাল্মীকির রামায়ণ থেকে ও গ্রীক অক্ষরে হোমারের ইলিয়াড থেকে দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

তর্কচূড়ামণি তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন এইভাবে : 'ভারতীতে যে Spiritএ সমালোচনা করা হইয়াছে তাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে অতি রাগ ও রুক্ষ্ম Spiritএ। ভাল অগ্রে দেখা যাউক এঁদের আপত্তি কটী।' এই বলে তিনি একাদিক্রমে ১০ পর্যন্ত এবং তারও মধ্যে a b c d প্রভৃতি উপবিভাগ করে ভারতী-র সমালোচনার মূল অভিযোগগুলি সংকলন করেছেন এবং একে একে সেগুলি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তা তিনি করুন, আজ তাঁর যুক্তি-প্রমাণাদিতে আমাদের আগ্রহ বোধ না করাই স্বাভাবিক; কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগে এই তথ্যটি যে তাঁর এত আয়োজন একটি ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচনার প্রতিবাদের কারণে। যোগীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না, তিনি বি. এ. পাস করেছিলেন কি না তাও আমাদের জানা নেই, কিন্তু 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা...' ইত্যাদির সমালোচনা করার পর একজন বি. এ. পাস তার জবাব লিখছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে উদ্বেগের বর্ণনা জীবনস্মৃতি-তে করেছেন এই প্রসঙ্গে সেকথা আমাদের মনে পড়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে রচয়িতার নামের বদলে কেবল 'ভ' অক্ষরটি থাকায় নিতান্ত অন্তরঙ্গ জন ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে লেখকের আসল পরিচয় জানা সম্ভব ছিল না, ফলে ভুল বোঝার আশঙ্কা ছিল। এক্ষেত্রে ঘটেছেও তাই। রচয়িতার নাম জানা না থাকায় 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা...' গানটির জন্য সমস্ত প্রশংসা যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন, এখানে তেমনি সমস্ত নিন্দা বর্ষিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি। প্রবন্ধের শেষে লেখক সেই কাজই করেছেন :

Unhappy Bharati! Will she now retract this review? (নিষ্কর্ম্মার editorই ও head masterই) দেখ্‌লেই বোধ হয় যে, a public চটান লেখা, এ দুষ্ট ভারতী!!... মেঘনাদবধ নামক মহাকাব্যের Depthএ কখনই প্রবেশ করা হয় নাই, আর সে প্রবেশের ক্ষমতা ও তাঁর পুণ্যও নাই তিনি দার্শনিক চক্ষে কাব্য বিচার করিয়াছেন তা সে দর্শন ঠিক হইলেও একার্য্য ঠিক হইত। Philosophy এবং কাব্য ভিন্ন, ঘরে বসে চাকরের কাছে পড়লে কি বিদ্যা হয়, comparative ভালরূপ professor কাছে, ভাল টোলে বা কালেজে পড়লে বুদ্ধি মার্জ্জিত হইতে পারিত অথবা বাল্মীকি অংশ হেম ভট্টাচার্য্যের চরণ বন্দনা করিলে বুদ্ধি সুপথগামিনী হইত।...বোধ করি মাইকেল বিচারালয় সংক্রান্ত মহাপুরুষ (council) ছিলেন, তিনি কলিকাতা বিখ্যাত বিষয় মহাধুর্ত্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ইহাদের প্রতি কুলে কোন কার্য্য করিয়াছিলেন বা মতে মত দেন নাই, তাতেই তদ্বংশীয়েরা (তাঁরে আর কি করবেন তাহার সাধারণ-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।)...সাহিত্যদর্পণকার বলেন—রসবুঝিতে পুণ্য চাই—সে পুণ্য অত বড় মহাবংশে Peerali সব গোল করে গিয়াছেন!!!*

বহুদিন পরে নব্যভারত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় যোগীন্দ্রনাথ বসু-লিখিত 'মেঘনাদবধচিত্র নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি সমালোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে লেখেন : 'বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।'[৫১]

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হলেও সমকালীন একটি পত্রিকায় যে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন সুনীল দাস E. Lekhbridge-সম্পাদিত The Calcutta Review [Vol. IXV (1877) pp. xv-xvi] পত্রিকায় প্রকাশিত ভারতী-র প্রথম দুটি সংখ্যার সমালোচনা থেকে :

The articles on the late Michael M.S. Dutta's epic of *Meghanadabadha* have given rise to considerable discussion in the vernacular press. We think that the view taken by the writer of these articles is correct. Mr. Dutta's Ravana is a failure. And what else could it be? Mr. Dutta

himself wrote to one of his friends—'I despise Ram and his rabble but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow.' This means that the poet was a lover of physical power—not of moral beauty. He could perceive grandeur in the forcible abduction of a chaste and virtuous princess in plunder, rapine, and vaulting ambition, but not in that filial love and obedience which could exchange an empire for a wilderness. Milton's 'Satan' is a success, not because Milton loved Satan but because he loved to hate him. The poet of Paradise Lost did not consider Satan 'a grand fellow'. Mr. Dutta's Satan is a failure, because Mr. Dutta loved not to hate him. He has invested 'Ravana' with feminine frailty, with the view of exciting in the readers' mind commiseration for a doomed scourge and oppressor of the human race. To excite sympathy with wickedness and vice is not the function of true poetry; nor is that man a true poet who finds grandeur in vice and wickedness. Wickedness is an 'odurate' and a 'steadfast' thing. To make it weep like a woman is to confess ignorance of its very nature.[৫২]

উল্লেখপঞ্জি

১ ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩।৭

২ পুরাতন প্রসঙ্গ। ২৯৭

৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১৫১

৪ ভারতী, শ্রাবণ। ১-৩

৫ 'ভারতীর ভিটা'। ৩৭৩

৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১৫২

৭ পুরাতন প্রসঙ্গ। ২৯৭

৮ 'ভারতীর ভিটা'। ৩৭৪

৯ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

১০ 'ভারতীর ভিটা'। ৩৭৩

১১ 'মালতী পুথির একচল্লিশ পৃষ্ঠা' : অমৃত, ২৬ মাঘ ১৩৮৫। ৩৯

১২ 'ভারতীর ভিটা'। ৩৭৪

১৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১৫২

১৪ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২৪৬, তথ্যপঞ্জী ৭০ ॥৩

১৫ তত্ত্ব, মাঘ ১৮০৬ শক [১২৯১]। ২০৫

১৬ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।১৪০

১৭ দ্র সা-সা-চ ৯। ৯৫। ৫৭

১৮ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৫

১৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩। ৩২৫

২০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৭২

২১ ঐ ১৭।৩৫৩-৫৪

২২ রবীন্দ্রজীবনী ১। ১১৫

২৩ জীবনস্মৃতি-গ্রন্থপরিচয় ১৭। ৪৮৯

২৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩। ৪৪, পাদটীকা ১

২৫ ‘ভারতীর ভিটা’। ৩৭৪

২৬ জীবনস্মৃতি-গ্রন্থপরিচয় ১৭। ৪৬৮; রবীন্দ্রবীক্ষা ১৩ এ [১৩৯২]। ৩৬

২৭ রবীন্দ্রজীবনী ১।৮২-৮৩

২৮ ঐ ১।৫২৯, ‘সংযোজন’

২৯ দ্র বি.ভা.প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯১। ৪২০-২৩

৩০ করুণা ২৭।১১৭

৩১ ঐ ২৭। ১২১

৩২ ঐ ২৭। ১২৩

৩৩ দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।১৫২, পাদটীকা ২

৩৪ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২২৩; পাঠের ভুল সংশোধিত।

৩৫ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]।১০৩-০৪; রচনাবলী-সংস্করণে ১৭। ৩৭৭-৭৮ পৃষ্ঠার মুদ্রণে ছাড় আছে।

৩৬ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৪-৫৫

৩৭ দ্র শঙ্খ ঘোষ : ‘কবিকাহিনী’, ছন্দোময় জীবন [১৪০০]। ১৩-২৭

৩৮ ইতিহাস [১৩৬২]। ১০৩

৩৯ ঐ। ১০৪

৪০ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।১৪৮

৪১ ভারতী, মাঘ। ২৯৮-৯৯

৪২ ঐ। ৩০৪

৪৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৬

৪৪ দ্র সনৎকুমার বাগচী : রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ [১৪০০]। ১৭৯ [লিপিচিত্র]

৪৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮৪

৪৬ *শনিবারের চিঠি*, পৌষ ১৩৪৬। ৪৪৫-৪৬

৪৭ রবীন্দ্র-কথা। ১৯২-৯৩

৪৮ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২৩৩

৪৯ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ২। ১১৮৬-৮৭

৫০ 'কৈফিয়ৎ': ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩। ১৬

৫১ *সাধনা*, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯। ৪৪২

৫২ সুনীল দাস : ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী [১৩৯১]। ১২-১৩

---

* পরিস্থিতিটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন শরৎকুমারী চৌধুরানী; 'তখন "জ্ঞানাঙ্কুরের" চিহ্ন মাত্র ছিল না, "বঙ্গদর্শন" মধ্যাহ্ন-আকাশ হইতে ঢলিয়া পড়িয়াছে, আর "আর্য্যদর্শন" ধূমকেতুর মত বোধ হয় ছয় মাস বা নয় মাস অন্তর কদাচিৎ দেখা দিত।'—'ভারতীর ভিটা', বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫১।১১৩; শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী [সাহিত্য পরিষদ সং, ১৩৫৭]। ৩৭৫ [এই প্রবন্ধ থেকে পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান সংস্করণটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে।]

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বিবাহের পর অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী শরৎকুমারী পিতার সহিত আবার লাহোরে চলিয়া গিয়াছিলেন। বছর পাঁচেক পরে তিনি কলিকাতায় স্বামীর কাছে আসেন; অক্ষয়চন্দ্র তখন সিমলা অঞ্চলে [মানিকতলা স্ট্রীট] একটি বাটিতে অবস্থান করেন। এই সময়ে 'ভারতী' প্রকাশের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।' [সা-সা-চ ৭৬।৮-৯]—এই বর্ণনায় সামান্য ত্রুটি আছে। অক্ষয়চন্দ্রের বিবাহ হয় ২৯ ফাল্গুন ১২৭৭ [12 Mar 1871]—সুতরাং বিবাহের ছ'বছরের বেশি সময় পরে শরকুমারী স্বামীগৃহে প্রত্যাগমন করেন।

* পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্থানটির নাম 'জনেশ্বর' পড়েছেন, কিন্তু তখনকার দিনে 'ন'-এর নীচে বিন্দু দিয়ে [বা কখনো না দিয়ে] 'ল লেখা হত। দ্র "ভারতী'র ক্যাশবই ও গ্রাহক তালিকা" : দেশ, ৩ Aug 1977। ৫৭

* জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৪; এই প্রসঙ্গে 'প্রথম পাণ্ডুলিপি'র পাঠটিও উদ্ধার-যোগ্য : 'ইতিপূর্ব্বেই আমি বালক-স্বভাবসুলভ স্পর্দ্ধার সহিত মেঘনাদবধকাব্যের একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। পাঠকসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন এই অমর কাব্যকে লাঞ্ছিত করিয়া আমি মনে মনে ভারি একটা বাহাদুরি লইতেছিলাম। সেই দাম্ভিক লেখাটা দিয়া ভারতীতে আমি প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।'

† বিষয়টির গুরুত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন ড পশুপতি শাশমল এবং তাঁর 'মালতী পুঁথির একচল্লিশ পৃষ্ঠা' প্রবন্ধে [*অমৃত*, ১৮। ৩৭, ২৬ মাঘ ১৩৮৫, পৃ ৩৮-৪৪] এ-নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বহু তথ্য ও বিশ্লেষণে পূর্ণ এই মূল্যবান প্রবন্ধটি উৎসাহী পাঠককে পড়তে অনুরোধ করি।

* পাণ্ডুলিপিতে শব্দগুলি এমনভাবে লিখিত, যার থেকে নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত করা কঠিন। অনাথনাথ দাস ব্যক্তিগত পত্রে অনুমান করেছেন, ভিক্টর য়্যুগোর *Les Contemplations* কাব্যের *Les Poetes* কবিতাটির অনুবাদ এখানে করবেন বলে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, যা কোনো কারণে সম্ভব হয়নি। কবিতাটি মূল কবিতার পাশেই সাদা পাতায় অনূদিত হয় : 'ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া'। একটি সম্ভাবনা হিসেবে বিষয়টি আমরা উল্লেখ করলাম, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত করা দুরূহ।

* [Oct] 1887-এ দার্জিলিং থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্তবকটির একটি প্যারডিও রচনা করেন : 'আমার কোমর আমারই কোমর,/বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে!।/ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,/আমার কোমর আমারই আছে!' দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৪, পত্র ২

* আমরা পূর্ববর্তী সংস্করণে লিখেছিলাম, এই কবিতাটিই সামান্য পরিবর্তিত আকারে ['যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়'] *ভারতী*-র আষাঢ় ১২৮৫-সংখ্যায় মুদ্রিত হয় [পৃ ১৪১], কিন্তু সেখানে কবির নাম 'মূর'। কিন্তু মঞ্জুলা ভট্টাচার্য 22 Jun 1986 তারিখের রবিবাসরীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় 'রবীন্দ্রনাথ, মূর ও এমিলিয়া ওপি' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, দুটি অনুবাদের প্রথম ছত্রদুটি সদৃশ হলেও প্রকৃতপক্ষে সে-দুটি স্বতন্ত্র কবিতা। Mrs. Emelia Opie-রচিত কবিতাটির প্রথম ছত্র : 'Go youth beloved, in distant glades'। শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে মূল কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন। এর জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

† 'At the age of sixteen he discussed the promotion of material prosperity in Bengal, and the possibilities of building up a new civilization through the meeting of East and West in an essay entitled *Hope and Despair of Bengalis* published in the *Bhatati*.'—'RABINDRANATH TAGORE THE HUMANIST'. pp. 298-99

* পৌষ ১২৮৪ সংখ্যায় 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এই সর্গেরই অন্তর্গত ৬৭, ৬৯ ও ৭৪ [এই শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রনাথ কেউ-ই অনুবাদ করেননি] সংখ্যক শ্লোকের সমিল পয়ার বা ত্রিপদীতে অনুবাদ করেছেন। আমরা তাঁর-কৃত অনুবাদের প্রথম দুটি অংশ ও

মালতীপুঁথি-তে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ পাশাপাশি উদ্ধৃত করছি, তাতে প্রমাণিত হবে শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথ-ই নন, অক্ষয়চন্দ্রও রবীন্দ্রকৃত অনুবাদের সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন :

ঈষৎ চঞ্চল হল তাপসের মন
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে সাগর যেমন
বিম্বাধর উমামুখে তখন মহেশ
একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ।
* * *
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ করি নিবারণ,
দিগন্তের চারিধার, ফিরায়ে নয়ন তাঁর
দেখিতে লাগিলা কোথা বিকৃতি-কারণ।

—*ভারতী*, পৌষ ১২৮৪। ২৮১

অমনি হইলা হর ঈষৎ অধীর
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি সম
উমার মুখের পরে মহেশ তখন
একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ।...

মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ করিয়া দমন
বিকৃতির হেতু কোথা দেখিবার তরে
দিগন্তে করিল দেব ত্রিনয়ন-পাত।

—রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ১০-১১

* তু° 'আমার এ মনোজ্বালা কে বুঝিবে সরলে।
কেন যে এমন করে, ম্রিয়মান [7] হোয়ে থাকি।
কেন যে নীরবে হেন বসে থাকি বিরলে।...
হে সখী হে সখাগণ, আমার মর্ম্মের জ্বালা।
কেহই তোমরা যদি না পার গো বুঝিতে,

কি আগুন জ্বলে তার নিভৃত গভীর তলে।
কি ঘোর ঝটিকাসনে হয় তারে যুঝিতে।
তবে গো তোমরা মোরে শুধায়োনা শুধায়োনা
কেন যে এমন করে রহিয়াছি বসিয়া
বিরলে আমারে হেথা, একলা থাকিতে দাও,..'
-মালতীপুঁথি, পৃ 57/৩০, রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ১। ৮৫

* সাধারণী [৯।১৮, ১৩ ফাল্গুন, পৃ ২১২] অনুষ্ঠানটিকে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামেই অভিহিত করে লেখে : 'স্বপ্নপ্রয়াণে যাহা দেখিয়াছিলাম, এবারকার বিদ্বজ্জন সমাগমে তা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি;

ভাতে যথা সত্য-হেম মাতে যথা বীর। ...। সেই দেব নিকেতন আলো করে কবি ॥২৫ ॥

বাস্তবিক দেব-নিকেতনেই বটে, আর দ্বিজ কবি যথার্থ স্বীয় ঔদার্য্যগুণে আলো করিয়া বিচরণ করিতে ছিলেন। কিসে সকলকেই পরিতুষ্ট এবং আপ্যায়িত করিব এই চেষ্টাতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ অনবরত ব্যাপৃত ছিলেন। বৎসরান্তে এইরূপ যেন চিরদিনই হয়।'

* প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পূর্বোক্ত নোটের খাতায় লিখেছেন :

কবির অভিনয়ে যোগ দেওয়া।

১) "অলীকবাবু" in 'এমন কর্ম্ম আর করবো না' (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পরে বইয়ের নাম হয় অলীকবাবু) 1877, আষাঢ় [মন্মথনাথ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৬৯-৭০] Also কথাবার্ত্তা 4 Jan 1932.

২) As মদন in “মানময়ী” (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)— খগেনবাবুর কাছে [19/1/32] শুনেছি, তিনি দীনুবাবুর কাছে শুনেছেন; কিন্তু কবি বলেন যে তিনি মানময়ীতে কোনো part নেন্ নি [কবি-কথা 29/1/32]।

* ড সুকুমার সেন এই লেখকের লেখা ‘কাননকথা’ [1879] নামে একটি নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন, দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২। ১২০

* ‘মেঘনাদবধ প্রবন্ধ’। 31-32; উল্লেখযোগ্য যে, বানান বা ভাষায় আমরা কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করিনি।

নির্দেশিকা

ব্যক্তি

গ্রন্থ ও পত্রিকা

[পত্রিকার নাম বক্রাক্ষরে]

শিরোনাম

উদ্ধৃত কবিতা বা গানের প্রথম ছত্র

বিবিধ

রবিজীবনী: প্রথম খণ্ড • প্রশান্তকুমার পাল

॥ ই-বুকটি সমাপ্ত হল ॥